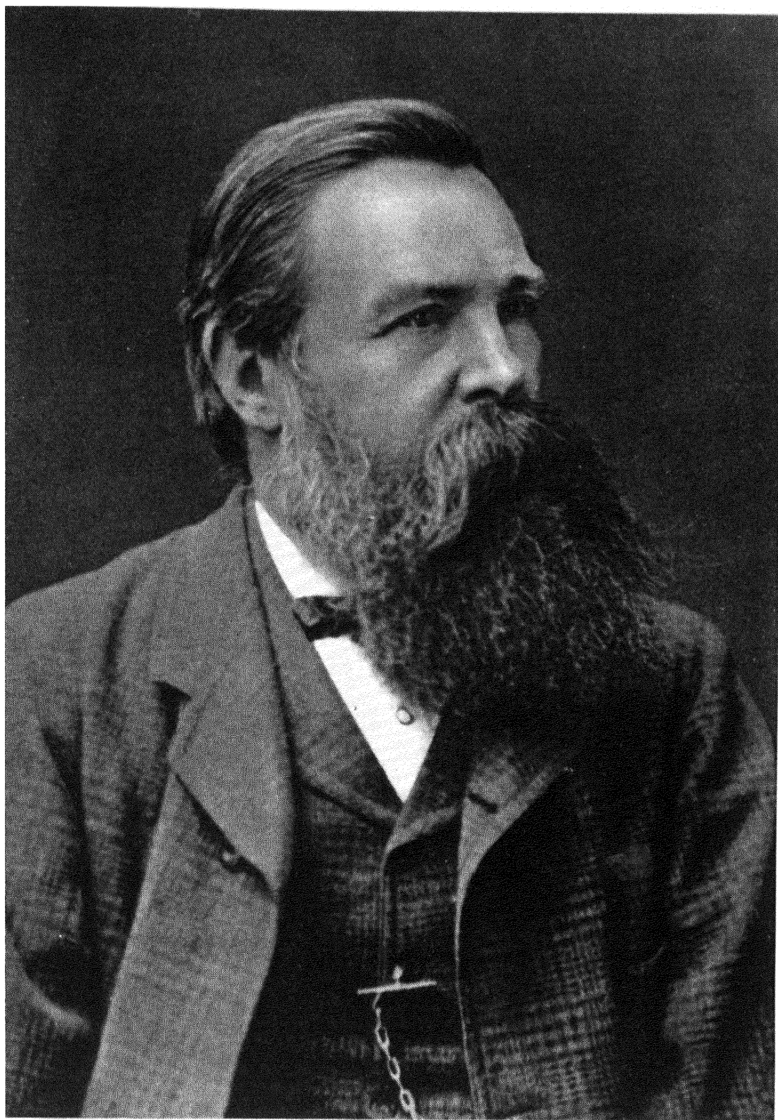


F. Engels

রচনা-সংকলন

দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম
অংশ



প্রগতি প্রকাশন · মস্কো

К. МАРКС, Ф. ЭНГЕЛЬС
ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Том II, часть I

На языке бенгали

প্রকাশকের বক্তব্য

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির অধীনস্থ মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ইনস্টিটিউট রুশ ভাষায় কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের যে নির্বাচিত রচনাবলী দুই খণ্ডে প্রস্তুত করেন, তার দ্বিতীয় খণ্ডের অনুসরণে বর্তমান সংস্করণটি সংকলিত।

অনুবাদ করা হয়েছে কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের দুই খণ্ডে সমাপ্ত নির্বাচিত রচনাবলীর ইংরেজি সংস্করণের দ্বিতীয় খণ্ড থেকে (মস্কো, বিদেশী ভাষায় সাহিত্য প্রকাশালয়)।

পাঠকদের সুবিধার জন্য খণ্ডটি দুই অংশে ভাগ করা হয়েছে।

সূচি

পৃঃ

পৃঃ

কার্ল মার্কস

গোথা কর্মসূচির সমালোচনা

ফ্রেডারিক এঙ্গেলস লিখিত ভূমিকা*

এখানে প্রকাশিত পাণ্ডুলিপিটি — খসড়া কর্মসূচির সমালোচনা এবং সেই সঙ্গে ব্রাকের কাছে লেখা চিঠিটিও — ১৮৭৫ সালে, গোথা ঐক্য কংগ্রেসের** সামান্য কিছুদিন আগে গাইব, আউয়ার, বেবেল ও লিবক্লেখতকে অবগত করার জন্য এবং তারপর মার্কসের কাছে ফেরৎ পাঠাবার জন্য ব্রাকের কাছে পাঠান হয়েছিল। যেহেতু হালে পার্টি কংগ্রেস গোথা কর্মসূচিটিকে পার্টির আলোচ্য বিষয়সূচিতে অন্তর্ভুক্ত করেছে সেহেতু সেই আলোচনায় প্রাসঙ্গিক এই গরুত্বপূর্ণ — বোধহয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ — দলিলটি এখনও প্রকাশ না করলে আমি অপরাধী হতাম বলে আমার ধারণা।

তাছাড়া এই পাণ্ডুলিপির অপর একটি আরও সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য আছে। লাসাল তাঁর প্রচারে একেবারে প্রথম থেকেই যে নীতি গ্রহণ করেছিলেন সে-সম্পর্কে, লাসালের অর্থতাত্ত্বিক মূলনীতি এবং রণকৌশল এই উভয় প্রসঙ্গেই মার্কসের মনোভাব সর্বপ্রথম এই লেখায় স্পষ্ট ও দৃঢ়ভাবে উপস্থিত করা হয়েছে।

এই লেখায় খসড়া কর্মসূচিটিকে যেরকম নির্মম কঠোরতার সঙ্গে ব্যবচ্ছেদ করা হয়েছে এবং যে নির্দয়ভাবে তার ফলাফল বিবৃত করা হয়েছে ও খসড়ার দুর্বলতাগুলি খুলে ধরা হয়েছে, আজ পনের বছর পরে, তাতে আহত হবার মতো কেউ নেই। সুনির্দিষ্ট লাসালীয়রা আজ রয়েছে কেবল বিদেশে নিঃসঙ্গ ধ্বংসাবশেষের মতো, আর

* জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক দলের সুবিধাবাদী নেতৃত্বের বিরোধিতা সত্ত্বেও মার্কসের 'গোথা কর্মসূচির সমালোচনা' *(Kritik des Gothaer Programms)* এঙ্গেলস কর্তৃক প্রকাশিত হয় ১৮৯১-এ। কাউৎস্কির কাছে লেখা এঙ্গেলসের চিঠি (বর্তমান খণ্ডের ৪০-৪৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য) থেকে দেখা যায় যে, এঙ্গেলসকে কয়েকটি বেশী তীব্র অংশকে নরম করে নিতে রাজী হতে হয়েছিল। সংরক্ষিত মূল পাণ্ডুলিপি অনুসারে পূর্ণাঙ্গ পাঠ বর্তমান সংস্করণে পুনরুদ্ধৃত হল। — সম্পাঃ

** গোথা কংগ্রেসে (২২—২৭শে মে, ১৮৭৫) তখনকার দিনের দুটি জার্মান শ্রমিক সংগঠন — লিবক্লেখত ও বেবেলের নেতৃত্বে 'সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টি' [যাদের আইজেনাখীয় (Eisenachers) বলা হত] এবং হাসেনক্লেভার, হাসেলমান ও তোলকের নেতৃত্বে লাসালীয় সংগঠন (সারা জার্মান শ্রমিক সঙ্ঘ) মিলে একটি দল, জার্মানির সমাজতন্ত্রী শ্রমিক পার্টি গঠন করে। — সম্পাঃ

হালেতে গোথা কর্মসূচির রচয়িতারাই সেটিকে নিতান্তই অপ্রতুল* বলে বর্জন করেছেন।

তাসত্ত্বেও, কোনো কোনো জায়গায় এসে যায় না বলে দু-একটি তীব্র ব্যক্তিগত মন্তব্য ও মূল্যায়ন আমি বাদ দিয়েছি এবং তার জায়গায় পর পর বিন্দুচিহ্ন বসিয়েছি। পাণ্ডুলিপিটি আজ প্রকাশ করলে মার্কস নিজেও তাই করতেন। কোনো কোনো জায়গায় ভাষার উগ্রতা এসেছিল দুটি অবস্থার কারণে। প্রথমত, মার্কস ও আমি অন্য যে কোনো আন্দোলনের তুলনায় জার্মান আন্দোলনের সঙ্গে বেশী ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিলাম; তাই এই খসড়া কর্মসূচিতে সন্দেহাতীতভাবে যে পশ্চাদগামী পদক্ষেপ প্রকট হয়ে উঠল, তাতে আমরা বিশেষভাবে বিচলিত হতে বাধ্য। এবং দ্বিতীয়ত, সে সময়, (আন্তর্জাতিকের হেগ কংগ্রেসের পরে তখন সবে দু বছর কেটেছে)**, বাকুনিন ও তাঁর নৈরাজ্যবাদীদের সঙ্গে অতি প্রচণ্ড সংগ্রামে আমরা জড়িয়ে ছিলাম। জার্মান শ্রমিক আন্দোলনে যা-কিছু ঘটেছে তার সবকিছুর জন্যই তারা আমাদের দায়ী করছিল; সুতরাং এই কর্মসূচির গোপন পিতৃত্বের দায়ও আমাদের ওপরই চাপিয়ে দেওয়া হবে একথা আমাদের ধরে নিতে হয়েছিল। এই কথাটা আজ আর বিবেচ্য বিষয় নয়; তাই উক্ত অংশের প্রয়োজনীয়তা আর নেই।

ছাপাখানা সংক্রান্ত আইনের (Press Law) দরুনও কয়েকটি বাক্যকে কেবল পরপর বিন্দুচিহ্ন দিয়ে বোঝানো হয়েছে। কোন কোন জায়গায় আমাকে যে অপেক্ষাকৃত নরম ভাষা ব্যবহার করতে হল, সেগুলিকে সমকোণ বন্ধনীর মধ্যে দেখিয়েছি। এছাড়া সর্বক্ষেত্রে মূলপাঠের প্রতিটি শব্দ যথাযথ রক্ষিত হয়েছে।

লণ্ডন, ৬ই জানুয়ারি, ১৮৯১

এঙ্গেলস কর্তৃক লিখিত
Neue Zeit পত্রিকার ১৮৯১-এর সংখ্যায়
প্রকাশিত

উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত পাঠ অনুসারে মুদ্রিত
জার্মান থেকে ইংরেজি অনুবাদের ভাষান্তর

* সমাজতন্ত্রী বিরোধী আইন (Anti-Socialist Exceptional Law) প্রত্যাহারের পর জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের প্রথম কংগ্রেসে হালে অধিবেশনে ১৮৯০ সালের ১৬ই অক্টোবর তারিখে গোথা কর্মসূচির প্রধান রচয়িতা লিবক্নেখতের প্রস্তাবক্রমে পরবর্তী পার্টি কংগ্রেসের জন্য একটি নতুন খসড়া কর্মসূচি প্রণয়নের সিদ্ধান্ত হয়েছিল। নতুন কর্মসূচিটি (এরফুর্ত কর্মসূচি) ১৮৯১ সালের অক্টোবর মাসে এরফুর্ত কংগ্রেসে গৃহীত হয়। — সম্পাঃ

** ১৮৭২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত প্রথম আন্তর্জাতিকের হেগ কংগ্রেসে প্রধান বিষয় ছিল বাকুনিনপন্থীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ মার্কসের নেতৃত্বাধীন সাধারণ পরিষদকে সমর্থন করে। বাকুনিনকে আন্তর্জাতিক থেকে বহিষ্কার করা হয়। — সম্পাঃ

কার্ল মার্কস

ব্রাকের কাছে লিখিত চিঠি

লণ্ডন, ৫ই মে, ১৮৭৫

প্রিয় ব্রাকে,

ঐক্য কর্মসূচির এই সমালোচনামূলক টীকাগুলি পড়া হলে অনুগ্রহ করে গাইব ও আউয়ার, বেবেল ও লিবক্লেখতের অনুধাবনের জন্য তাঁদের কাছে পাঠিয়ে দেবেন। আমি অত্যন্ত ব্যস্ত আছি এবং আমার কাজ সম্পর্কে ডাক্তারদের বেঁধে দেওয়া সময়-সীমা ইতিমধ্যেই লংঘন করেছি। তাই এত কাগজ লেখা একেবারেই 'আনন্দের' হয়নি। তবু এর প্রয়োজন ছিল যাতে, যাঁদের উদ্দেশ্যে এই টীকাগুলি লেখা, আমাদের সেই পার্টির বন্ধুরা আমার পরবর্তী অবশ্যকরণীয় পদক্ষেপের ভুল অর্থ না করেন। ঐক্য কংগ্রেস শেষ হলেই, মূলনীতি সংক্রান্ত উপরোক্ত কর্মসূচির সঙ্গে আমাদের মতের আমূল পার্থক্য আছে, কর্মসূচির সঙ্গে যে আমাদের কোন সম্পর্কই নেই — এই মর্মে এঙ্গেলস ও আমি একটি সংক্ষিপ্ত ঘোষণা প্রকাশ করব।

এ কাজ অপরিহার্য, কেননা, বিদেশে এরকম একটা ধারণা — একেবারেই ভুল ধারণা — চালু আছে এবং পার্টির শত্রুরা সে ধারণাকে সযত্নে পুষ্ট করছে — যে আমরা এখান থেকে গোপনে তথাকথিত আইজেনাখ দলের আন্দোলন চালাই। এর দৃষ্টান্ত, সম্প্রতি প্রকাশিত একটি রুশ বইয়ে বাকুনিন ঐ দলের সমস্ত কর্মসূচি প্রভৃতির জন্য তো বটেই, এমনকি 'জনতা পার্টির'* সঙ্গে সহযোগিতা শুরু করার প্রথম দিন থেকে লিবক্লেখত যা যা করেছেন তাঁর প্রতিটি কাজের জন্য পর্যন্ত আমাকে দায়ী করছেন।

তা ছাড়াও, আমার মতে, পার্টিকে হতাশ করে দেবে এমন একটা সম্পূর্ণ আপত্তিজনক কর্মসূচি যাতে কূটনৈতিক নীরবতার মধ্য দিয়েও আমার স্বীকৃতি না পায় তা দেখা আমার কর্তব্য।

---

* 'জনতা পার্টির' প্রতিষ্ঠা হয় ১৮৬৫ সালের সেপ্টেম্বরে দার্মস্তাদ শহরে, সরকারীভাবে সংগঠন হয় ১৮৬৮ সালের সেপ্টেম্বরে স্তুতগার্ট কংগ্রেসে। এটি ছিল পেটি বুর্জোয়া শ্রেণীর পার্টি, প্রধানত দক্ষিণ জার্মানির। যুঙ্কার-প্রধান প্রাশিয়ার নেতৃত্বে জার্মানিকে ঐক্যবদ্ধ করার বিসমার্কীয় নীতির বিরোধিতা করে এই দলটি পেটি বুর্জোয়া ফেডারেল নীতি সমর্থন করত। — সম্পাঃ

বাস্তব আন্দোলনের প্রতিটি পদক্ষেপের গুরুত্ব ডজনখানেক কর্মসূচির চেয়ে বেশী। তাই আইজেনাখ কর্মসূচি* **অতিক্রম করে** যাওয়া যদি সম্ভব না হয়ে থাকে — এবং তখনকার অবস্থায় সত্যিই তা' সম্ভব ছিল না — তাহলে উচিত ছিল সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য কেবল একটি চুক্তি করা। মূলনীতির কর্মসূচি (বেশ কিছুকাল মিলিত কাজের মধ্য দিয়ে প্রস্তুত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা না করে) রচনা করার ফলে গোটা দুনিয়ার সামনে এমন কতকগুলি নির্দেশক চিহ্ন দেওয়া হল যা দিয়ে লোকে পার্টির আন্দোলনের স্তরকে পরিমাপ করবে। ঘটনাচক্র বাধ্য করেছিল বলেই লাসালীয় নেতারা এসেছিলেন। মূলনীতি নিয়ে কোন দরাদরি চলবে না, একথা গোড়াতেই তাঁদের বলে দিলে, শুধু সংগ্রামের একটা কার্যক্রম বা মিলিত কাজের জন্য সংগঠনের একটি পরিকল্পনা নিয়েই তাঁদের সন্তুষ্ট থাকতে হত। তার বদলে তাঁদের ম্যান্ডেটে সুসজ্জিত হয়ে আসতে দেওয়া হল, নিজেদের পক্ষ থেকে সেইসব ম্যান্ডেটকে বৈধ বলে স্বীকার করে নেওয়া হল, এবং এইভাবে যাঁদের নিজেদেরই সাহায্য দরকার তাঁদের কাছেই করা হল বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ। আর সবচেয়ে চমৎকার হল এই যে, ওঁরা **আপোষ** কংগ্রেসের **আগেই** ওঁদের এক কংগ্রেস করে আসছেন, অথচ নিজেদের পার্টির সম্মেলন হচ্ছে শুধু post festum।** এখানে স্পষ্টই ছিল সমস্ত সমালোচনার কণ্ঠরোধ করার, নিজেদের পার্টিকে চিন্তা করার পর্যন্ত কোন সুযোগ না দেবার একটা ইচ্ছা। মিলনের ঘটনাটুকুই শ্রমিকদের কাছে সন্তোষপ্রদ, একথা সুবিদিত। কিন্তু এই ক্ষণস্থায়ী সাফল্যের জন্য অতিরিক্ত মূল্য দিতে হচ্ছে না একথা ভাবা ভুল।

তাছাড়া, কর্মসূচিতে যে লাসালীয় আপ্তনীতিকে পূজনীয় করে তোলা হয়েছে সেকথা বাদ দিলেও, এটা কোনো কাজেরই হয়নি।

'পুঁজির'*** ফরাসী সংস্করণের শেষ অংশগুলো শীঘ্রই আপনাকে পাঠাব। ফরাসী সরকারের নিষেধাজ্ঞার দরুন ছাপার কাজ বেশ কিছুকাল বন্ধ ছিল। এই সপ্তাহেই বা আগামী সপ্তাহের গোড়ায় বইটা তৈরী হয়ে যাবে। এর আগের ছ'টি অংশ আপনি

* ১৮৬৯ সালের ৭—৯ই আগস্টে আইজেনাখে অনুষ্ঠিত জার্মান, অস্ট্রীয় ও সুইস সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের নিখিল জার্মান কংগ্রেসে গৃহীত কর্মসূচির কথা বলা হচ্ছে। এ কংগ্রেসে প্রতিষ্ঠিত হয় জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টি, পরে যা পরিচিত হয় আইজেনাখীয় পার্টি হিসাবে। আইজেনাখ কর্মসূচি মোটের উপর আন্তর্জাতিকের দাবির প্রেরণায় রচিত। — সম্পাঃ

** ভোজ শেষ হয়ে যাবার পর, অর্থাৎ অতিবিলম্বে। — সম্পাঃ

*** স্বয়ং মার্কস কর্তৃক সম্পাদিত 'পুঁজি' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ফরাসী অনুবাদ প্যারিসে ১৮৭২—১৮৭৫ সালে অংশে অংশে প্রকাশিত হয়। — সম্পাঃ

পেয়েছেন তো? বের্নহার্দ বেকারের ঠিকানাটাও আমায় অনুগ্রহ করে জানাবেন, তাঁকেও শেষ অংশগুলি পাঠাতে হবে।

*Volksstaat** প্রকাশালয়ের কাজকর্মের ধারা বড় অদ্ভুত। যেমন ধরুন, 'কলোন কমিউনিস্ট বিচার' বইটির এককপি পর্যন্ত আমাকে এখনো পাঠান হয়নি।

শুভেচ্ছাসহ,

ভবদীয়

কার্ল মার্কস

* সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের কথা এখানে বলা হচ্ছে। এটি ছিল লাইপজিগ শহরে এবং চলত পার্টির কেন্দ্রীয় মুখপত্র *Volksstaat* (জনরাষ্ট্র) পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর পরিচালনায় (১৮৬৯ থেকে ১৮৭৬)। — সম্পাঃ

কার্ল মার্কস

জার্মান শ্রমিক পার্টির কর্মসূচির উপর পার্শ্ব-টীকা

১

১। 'শ্রমই সকল সম্পদ ও সকল সংস্কৃতির উৎস **এবং যেহেতু** কার্যকর শ্রম একমাত্র সমাজের ভেতরে ও সমাজের মাধ্যমেই সম্ভব, সেহেতু সমাজের সকল সদস্য সমান অধিকারবলে অটুট পরিমাণে শ্রমফলের মালিক।'

অনুচ্ছেদের প্রথম অংশ: 'শ্রমই সকল সম্পদ ও সকল সংস্কৃতির উৎস।'

শ্রম সকল সম্পদের **উৎস নয়**। শ্রমের মতোই **প্রকৃতিও** সমান পরিমাণেই ব্যবহার-মূল্যের উৎস (এবং বৈষয়িক সম্পদ নিশ্চয়ই এই ব্যবহার-মূল্য দিয়েই গড়া!), আর এই শ্রমও একটি প্রাকৃতিক শক্তিরই, মানুষের শ্রমশক্তির অভিব্যক্তি মাত্র। উদ্ধৃত উক্তিটি অবশ্য সমস্ত শিশুপাঠ্য পুস্তকে স্থান পেয়েছে এবং কথাটি সেহেতু সত্য যেহেতু তার সঙ্গে এইটুকু **ধরে নেওয়া হয়** যে, সংশ্লিষ্ট বস্তু এবং হাতিয়ারগুলির সাহায্যেই শ্রম সম্পন্ন হয়। কিন্তু যে **শর্তই** কোনো কথাকে অর্থসম্পন্ন করে তোলে, এই ধরনের বুর্জোয়া বাক্য দিয়ে সেটাই নীরবে এড়িয়ে যাওয়া কোনো সমাজতন্ত্রী কর্মসূচি মঞ্জুর করতে পারে না। শ্রমের সমস্ত উপায় এবং বিষয়ের আদি উৎস প্রকৃতির সঙ্গে মানুষ শুরু থেকেই যে পরিমাণে মালিকের মতো আচরণ করে, তাকে নিজের অধিকারভুক্ত জিনিষের মতো ব্যবহার করে, সেই পরিমাণে তার শ্রম ব্যবহার-মূল্যের এবং সেইজন্য সম্পদেরও উৎস হয়ে ওঠে। শ্রমে একটা **অতি-প্রাকৃতিক সৃষ্টি শক্তি** আরোপ করার বিশেষ কারণ বুর্জোয়াদের আছে, কেননা শ্রম প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল ঠিক এই সত্য থেকেই সিদ্ধান্ত আসে যে, যে-লোকের নিজের শ্রমশক্তি ছাড়া আর কোনই সম্পত্তি নেই তাকে সমাজ ও সংস্কৃতির সর্ব অবস্থাতেই তাদের ক্রীতদাস হতেই হবে, যারা শ্রমের বৈষয়িক পরিস্থিতিগুলির মালিক হয়ে বসেছে। তাদের অনুমতিক্রমেই কেবল সে কাজ করতে এবং সেই হেতু বেঁচে থাকতে পারে।

আলোচ্য বাক্যটি যেভাবে দাঁড়িয়ে আছে, হয়ত খোঁড়াচ্ছে বললেই ভালো হয়, তাকে আপাতত সেই ভাবে রেখে দেওয়া যাক। এর থেকে কী সিদ্ধান্ত আশা করা যায়? স্পষ্টতই এই:

'শ্রমই যখন সকল সম্পদের উৎস, তখন সমাজে কেউ শ্রমফল হিসাবে ছাড়া অন্যকোনো ভাবে সম্পদ দখল করতে পারে না। সুতরাং সে যদি নিজে কাজ না করে,

তবে সে অন্যের শ্রমের দ্বারা বেঁচে আছে এবং সে তার সংস্কৃতিও অর্জন করছে অন্যের শ্রমের বিনিময়ে।'

এ কথা না বলে, **'এবং যেহেতু'** এই ভাষাগত সংযোজকটির সাহায্যে দ্বিতীয় একটা প্রতিপাদ্য জুড়ে দেওয়া হল, যাতে প্রথমটি থেকে নয় পরেরটি থেকেই সিদ্ধান্ত টানা যায়।

অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় অংশ: 'কার্যকর শ্রম একমাত্র সমাজের ভেতরে ও সমাজের মাধ্যমেই সম্ভব।'

প্রথম প্রতিপাদ্যে বলা হয়েছিল, শ্রমই সকল সম্পদ ও সকল সংস্কৃতির উৎস, সুতরাং শ্রম ছাড়া কোনো সমাজের অস্তিত্ব সম্ভব নয়। এবার আমরা উল্টো শুনছি যে, সমাজ ছাড়া কোনো 'কার্যকর' শ্রম সম্ভব নয়।

ঠিক এই একই ভাবে বলা যেত যে, একমাত্র সমাজের ভেতরেই অকার্যকর শ্রম, এমনকি সমাজের পক্ষে হানিকর শ্রম পর্যন্ত শিল্পের শাখা হয়ে উঠতে পারে, একমাত্র সমাজের মধ্যেই অলস হয়ে বাঁচা সম্ভব ইত্যাদি ইত্যাদি — এক কথায়, রুসোর সবখানিই ঢুকে দেওয়া যেত।

তাছাড়া 'কার্যকর' শ্রম জিনিসটাই বা কি? নিশ্চয় যে শ্রম থেকে বাঞ্ছিত কার্যকর ফল উৎপন্ন হয় সেই শ্রম। বন্য মানুষ (মানুষ তার বানরত্ব শেষ হওয়ার পর ছিল বন্য) যখন পাথর দিয়ে কোন জানোয়ার মারে, ফল সংগ্রহ করে, ইত্যাদি তখন সেও তো 'কার্যকর' শ্রম করছে।

তৃতীয়ত, এই সিদ্ধান্ত: 'এবং যেহেতু কার্যকর শ্রম একমাত্র সমাজের ভেতরে এবং সমাজের মাধ্যমেই সম্ভব, সেহেতু সমাজের সকল সদস্যই সমান অধিকারবলে অটুট পরিমাণে শ্রমফলেব মালিক।'

চমৎকার সিদ্ধান্ত! কার্যকর শ্রম একমাত্র সমাজের ভেতরে এবং সমাজের মাধ্যমেই যদি সম্ভব হয়, তাহলে সমাজই শ্রমফলের অধিকারী এবং তা থেকে ব্যক্তি শ্রমিকদের ভাগে বর্তাচ্ছে শুধু সেইটুকু, যা শ্রমের 'শর্ত' অর্থাৎ সমাজ বজায় রাখার জন্য প্রয়োজন হচ্ছে না।

বস্তুত, **বিশেষ এক একটা কালের প্রচলিত সমাজাবস্থার** ধ্বজাধারীরা বরাবরই এই প্রতিপাদ্যটিকে কাজে লাগিয়েছে। সরকার এবং তার সঙ্গে যুক্ত সর্বকিছুর দাবি আসে সর্বাগ্রে, কেননা এটা নাকি সমাজ শৃঙ্খলা বজায় রাখার সামাজিক সংস্থা। তারপর দাবি আসে বিভিন্ন ধরনের ব্যক্তিগত মালিকানার, কেননা বিভিন্ন ধরনের ব্যক্তিগত মালিকানাই হল সমাজের ভিত্তি, ইত্যাদি। দেখা যাবে এই ধরনের অসার কথাকে ইচ্ছামত ঘোরানো-পেঁচানো যায়।

নিম্নলিখিতভাবে লিখলে তবেই অনুচ্ছেদটির প্রথম ও দ্বিতীয় অংশের মধ্যে কোন বোধগম্য যোগসূত্র থাকে:

'একমাত্র সামাজিক শ্রমরূপেই', অথবা যা একই কথা 'সমাজের ভেতরে ও মাধ্যমে', 'শ্রম সম্পদ ও সংস্কৃতির উৎসে পরিণত হয়'।

এই প্রতিপাদ্যটি তর্কাতীতভাবে সঠিক, কেননা বিচ্ছিন্ন শ্রম (তার বৈষয়িক পরিস্থিতি আছে বলে ধরে নিয়ে) ব্যবহার-মূল্য সৃষ্টি করতে পারলেও সম্পদ সৃষ্টি করতে পারে না, সংস্কৃতিও নয়।

কিন্তু অন্য এই প্রতিপাদ্যটিও তেমনি তর্কাতীত:

'ঠিক যে পরিমাণে শ্রমের সামাজিক বিকাশ হতে থাকে, এবং তার ফলে সে শ্রম সম্পদ ও সংস্কৃতির উৎসে পরিণত হয়, ঠিক সেই পরিমাণে শ্রমিকদের মধ্যে দারিদ্র্য ও নিঃস্বতা এবং অ-শ্রমিকদের মধ্যে সম্পদ ও সংস্কৃতি বাড়তে থাকে।'

এতাবৎ সমস্ত ইতিহাসেরই এই নিয়ম। সুতরাং এক্ষেত্রে প্রয়োজন ছিল 'শ্রম' ও 'সমাজ' সম্পর্কে কেবল কতকগুলি সাধারণ কথামাত্র লিপিবদ্ধ না করে প্রত্যক্ষভাবে দেখিয়ে দেওয়া কীভাবে বর্তমান পুঁজিবাদী সমাজে অবশেষে সেই বৈষয়িক ইত্যাদি পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে যা এই সামাজিক অভিশাপ দূর করতে শ্রমিকদের সক্ষম এবং বাধ্য করে।

আসলে 'অটুট পরিমাণে শ্রমফল' লাসালীয় এই বুলিটিকে পার্টি পতাকার শীর্ষদেশে অঙ্কিত করার উদ্দেশ্যেই ভাষা ও ভাবে একান্ত ভুল এই গোটা অনুচ্ছেদটির অস্তিত্ব। 'শ্রমফল', 'সমান অধিকার' প্রভৃতি সম্পর্কে পরে আমাকে আবার আলোচনা করতে হবে, কেননা পরবর্তী অংশে খানিকটা অন্য ছাঁদে এই একই কথা আবার বলা হয়েছে।

> ২। 'আজকের সমাজে শ্রমের উপায়ে পুঁজিপতি শ্রেণীর একচেটিয়া। এরই থেকে উদ্ভূত শ্রমিক শ্রেণীর পরমুখাপেক্ষিতাই তার সর্বপ্রকার দুর্দশার ও দাসত্বের কারণ।'

আন্তর্জাতিকের নিয়মাবলী থেকে ধার-করা বাক্যটির এই 'মার্জিত' সংস্করণ ভুল।

আজকের সমাজে শ্রমের উপায়ে জমির মালিক (জমিতে একচেটিয়া অধিকার এমনকি পুঁজির একচেটিয়ার ভিত্তি) **এবং** পুঁজিপতিদের একচেটিয়া। আন্তর্জাতিকের নিয়মাবলীর প্রাসঙ্গিক অনুচ্ছেদে একচেটিয়া অধিকারীদের এ শ্রেণী বা ও শ্রেণীর উল্লেখ নেই। সেখানে বলা হয়েছে **'শ্রমের উপায়, অর্থাৎ জীবনের উৎসগুলির** একচেটিয়া'। 'জীবনের উৎসগুলি' — এই কথা যোগ দেওয়ায় যথেষ্ট পরিষ্কার হয়েছে যে শ্রমের উপায়ের মধ্যে জমিও অন্তর্ভুক্ত।

সংশোধনটি ঢোকানো হয়েছে কারণ লাসাল জমি মালিকদের বাদ দিয়ে **কেবল** পুঁজিপতি শ্রেণীকেই আক্রমণ করতেন, কেন করতেন তাও আজ সবাই জানেন। ইংলণ্ডে

পুঁজিপতিরা সাধারণত, যে জমির ওপর তাদের কারখানা দাঁড়িয়ে আছে সে জমিরও মালিক নয়।

> ৩। 'শ্রমকে মুক্ত করতে হলে শ্রমের উপায়গুলিকে সমাজের সাধারণ সম্পত্তিতে উন্নীত করা এবং সামগ্রিক শ্রমের সমবায়িক নিয়ন্ত্রণ ও তার সঙ্গে শ্রমফলের ন্যায্য বণ্টন চাই।'

স্পষ্টতই, 'শ্রমের উপায়গুলিকে সাধারণ সম্পত্তিতে উন্নীত করার' জায়গায় 'সাধারণ সম্পত্তিতে রূপান্তরিত করা' পড়া উচিত। কিন্তু সেটা কেবল প্রসঙ্গক্রমে।

'শ্রমফল' এই কথাটির অর্থ কী? শ্রমের উৎপন্ন না তার মূল্য? যদি পরেরটি হয়, তাহলে কি তার সমগ্র মূল্য, না ব্যবহৃত উৎপাদন-উপায়ের মূল্যের সঙ্গে শ্রম যে নতুন মূল্য যোগ করল কেবল সেইটুকু?

'শ্রমফল' — এই ধারণাটাই অত্যন্ত শিথিল। সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক সংজ্ঞার জায়গায় লাসাল এই ধারণাটিকে বসিয়েছেন।

'ন্যায্য বণ্টন'-ই বা কী জিনিস?

বুর্জোয়ারা কি জোর গলায় বলে থাকে না যে, বর্তমান বণ্টন ব্যবস্থা 'ন্যায্য'? আর সত্যই, বর্তমান উৎপাদন-পদ্ধতির ভিত্তিতে তা কি একমাত্র 'ন্যায্য' বণ্টন নয়? আইনগত সংজ্ঞার দ্বারাই কি অর্থনৈতিক সম্পর্ক নির্ধারিত হয় নাকি বিপরীত, — অর্থনৈতিক সম্পর্ক থেকেই আইনগত সম্পর্কের জন্ম? নানা সমাজতন্ত্রী গোষ্ঠীপন্থীদের মধ্যেও কি 'ন্যায্য' বণ্টন সম্পর্কে নানা বিচিত্র ধারণা নেই?

'ন্যায্য বণ্টন' কথাটি এইসূত্রে কোন অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে তা বুঝতে হলে প্রথম অনুচ্ছেদ এবং এই অনুচ্ছেদটি একসঙ্গে ধরতে হবে। [illegible]রটিতে ধরে নেওয়া হয়েছে এমন এক সমাজ যেখানে 'শ্রমের উপায়গুলি সাধারণের সম্পত্তি এবং সামগ্রিক শ্রম সমবায়িকভাবে নিয়ন্ত্রিত', আর প্রথম অনুচ্ছেদটি থেকে আমরা জানতে পারছি যে, 'সমাজের সকল সদস্য সমান অধিকারবলে অটুট পরিমাণে শ্রমফলের মালিক'।

'সমাজের সকল সদস্য'? যারা কোন কাজ করে না তারাও? 'অটুট পরিমাণে শ্রমফলের' তাহলে আর কী বাকি থাকে? নাকি, সমাজের যে সদস্যরা কাজ করে কেবল তারা? তাহলে, সমাজের সকল সদস্যের 'সমান অধিকার' কোথায় রইল?

অবশ্য, স্পষ্টতই 'সমাজের সকল সদস্য' এবং 'সমান অধিকার' এই উক্তিগুলি নিতান্তই কথার কথা। সারবস্তুটুকু এই যে, কমিউনিস্ট সমাজে প্রত্যেক শ্রমিকের 'অটুট পরিমাণে' লাসালীয় 'শ্রমফল' পাওয়া চাই।

প্রথমে, শ্রমোৎপন্ন এই অর্থে 'শ্রমফল' কথাটি ধরা যাক, তাহলে সমবায়িক শ্রমফল হল **সামগ্রিক সামাজিক উৎপন্ন**।

তার থেকে এখন বাদ দিতে হবে:

প্রথমত, উৎপাদন-উপায়ের যেটুকু ব্যবহারে ক্ষয় পেল তার পূর্তির জন্য একটা অংশ।

দ্বিতীয়ত, উৎপাদন সম্প্রসারণের জন্য আরও একটা অংশ।

তৃতীয়ত, দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক বিপর্যয়জনিত ব্যাঘাত ইত্যাদির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা হিসাবে মজুত বা বীমা তহবিল।

'অটুট পরিমাণ শ্রমফল' থেকে এগুলি বাদ দেওয়া অর্থনৈতিক দিক থেকে আবশ্যিক, এবং লভ্য উপায় ও বল অনুযায়ী এবং কিছুটা সম্ভাব্যতার হিসাব কষে এগুলির পরিমাণ নির্ধারিত হবে; কিন্তু ন্যায়-অন্যায়ের মাপকাঠি দিয়ে কোনোক্রমেই এর হিসাব করা যায় না।

বাকি থাকে সামগ্রিক উৎপন্নের অপর অংশ, ভোগের উপকরণরূপে যা ব্যবহার্য।

এই অংশটিকে বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে ভাগবাঁটোয়ারা করে দেবার আগে এর থেকে ফের বাদ দিতে হবে:

প্রথমত, উৎপাদনের অন্তর্ভুক্ত নয় এমন সব সাধারণ প্রশাসনিক খরচ।

বর্তমান সমাজের তুলনায় এই ভাগটি গোড়া থেকেই বেশ খানিকটা সংকুচিত হবে এবং নতুন সমাজের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আরও কমতে থাকবে।

দ্বিতীয়ত, বিদ্যালয়, স্বাস্থ্য-ব্যবস্থা ইত্যাদি **প্রয়োজন সর্বজনীনভাবে মেটাবার জন্য নির্দিষ্ট অংশ।**

বর্তমান সমাজের তুলনায় এই অংশ গোড়া থেকেই বেশ খানিকটা বেড়ে যাবে এবং নতুন সমাজের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আরও বাড়তে থাকবে।

তৃতীয়ত, অকর্মণ্য প্রভৃতিদের জন্য, এককথায় আজকালকার তথাকথিত সরকারী দরিদ্র-ত্রাণের মধ্যে যা পড়ে তার জন্য **তহবিল।**

লাসালের প্রভাবে কর্মসূচি অত্যন্ত সংকীর্ণভাবে যে 'বণ্টন'টুকুকেই মাত্র বোঝাচ্ছে, অর্থাৎ সমবায়ী সমাজের ব্যক্তি-উৎপাদকদের মধ্যে উপকরণের যে-অংশ বিতরণ করা হয় সেই অংশে এতক্ষণে আমরা এসে পৌঁছলাম।

ইতিমধ্যে, 'অটুট পরিমাণে শ্রমফল' অলক্ষ্যে 'হ্রাসপ্রাপ্ত' ফলে পরিণত হয়ে গেছে। অবশ্য, স্বতন্ত্র ব্যক্তিরূপে উৎপাদক যে অংশ থেকে বঞ্চিত হয়, সমাজের একজন সদস্য হিসাবে সে প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে তারই থেকে উপকার পায়।

'অটুট পরিমাণে শ্রমফল' কথাটি যেভাবে অদৃশ্য হয়েছে এবার 'শ্রমফল' কথাটিও তেমনই একেবারে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে।

উৎপাদন-উপায়গুলির উপর সাধারণ মালিকানার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সমবায়ী সমাজের মধ্যে উৎপাদকেরা তাদের উৎপন্নের বিনিময় করে না; ঠিক তেমনি, উৎপন্নে

নিয়োজিত শ্রমও এখানে সেই উৎপন্নের **মূল্যরূপে,** তার এক বৈষয়িক গুণরূপে দেখা দেয় না, কেননা পুঁজিবাদী সমাজের বিপরীতে এখানে ব্যক্তিগত শ্রম আর পরোক্ষ নয়, থাকছে প্রত্যক্ষভাবে সমগ্র শ্রমের অঙ্গাঙ্গী অংশরূপে। তাই 'শ্রমফল' এই যে কথাটা দ্ব্যর্থক বলে আজকের দিনেই অগ্রাহ্য, তা একেবারেই অর্থহীন হয়ে পড়ছে।

নিজস্ব বুনিয়াদের উপর **বিকাশ লাভ করেছে** এমন এক কমিউনিস্ট সমাজ নয়, বরং তার বিপরীত, পুঁজিবাদী সমাজ থেকে **উদ্ভূত হচ্ছে,** ঠিক এমন কমিউনিস্ট সমাজই আমাদের আলোচ্য এবং তেমন সমাজ কি অর্থনৈতিক, কি নৈতিক; কি বুদ্ধিবৃত্তিগত, সমস্ত দিক থেকে যে পুরাতন সমাজ থেকে সে ভূমিষ্ঠ হয়েছে সেই মাতৃজঠরের জন্মচিহ্ন তখনো বহন করছে। তাই এখানে একজন উৎপাদক সমাজকে যতটা দিচ্ছে ব্যক্তিগতভাবে, সমাজের কাছ থেকে, বাদছাদের পর, ঠিক ততটাই ফেরৎ পাচ্ছে। সমাজকে সে যা দিয়েছে তা হল তার ব্যক্তিগত শ্রম অবদান। উদাহরণস্বরূপ, আলাদা আলাদা কাজের ঘণ্টাগুলি একত্র করে গঠিত হয় সামাজিক শ্রমদিন; নির্দিষ্ট একজন উৎপাদকের ব্যক্তিগত শ্রম-কাল হচ্ছে সেই সামাজিক শ্রমদিনে তার অবদানটুকু, তাতে তার অংশটুকু। সমাজের কাছ থেকে সে এই মর্মে একটি প্রমাণপত্র পাবে যে, (সাধারণ তহবিলের দরুন তার শ্রম বাদ দেবার পর) সে এই পরিমাণ শ্রম দিয়েছে এবং সেই প্রমাণপত্র পেশ করে সে সমাজের ভোগোপকরণ ভান্ডার থেকে সমান শ্রম-মূল্যের ভোগ বস্তু নিয়ে যেতে পাবে। কোন একটা বিশেষরূপে সে সমাজকে যে-পরিমাণ শ্রম দিয়েছে, অন্যরূপে সে ততটাই ফিরে পাচ্ছে।

স্পষ্টতই, এটা যেহেতু সমমূল্যের বিনিময়, সেই হেতু পণ্য-বিনিময়ের একই নীতি এক্ষেত্রেও বলবৎ। আধার ও আধেয় পাল্টে গেছে, কারণ এই পরিবর্তিত অবস্থায় কেউ নিজের শ্রম ছাড়া আর কিছু দিতে পারে না, এবং অপরপক্ষে, ব্যক্তিগত ভোগোপকরণ ছাড়া আর কিছুই ব্যক্তির অধিকারে আসতে পারে না। কিন্তু, বিভিন্ন উৎপাদকদের মধ্যে এই ভোগোপকরণ বণ্টনের ব্যাপারে তুল্যমূল্য পণ্য-বিনিময়ের নীতিই বলবৎ থাকছে: কোনো বিশেষ রূপের নির্দিষ্ট পরিমাণ শ্রমের বিনিময় হচ্ছে অন্যরূপের একই পরিমাণ শ্রমের সঙ্গে।

এইজন্যই, এ ক্ষেত্রে **সমান অধিকার** এখনও নীতির দিক দিয়ে **বুর্জোয়া অধিকার** মাত্র, যদিও নীতি ও প্রয়োগের মধ্যকার বিরোধ আর নেই, অথচ পণ্য-বিনিময়ের বেলায় তুল্যমূল্যের বিনিময় যা হয় সেটা কেবল **গড়পড়তাতেই,** প্রতিটি বিশেষ ক্ষেত্রে নয়।

এটুকু অগ্রগতি সত্ত্বেও, এই **সমান অধিকার** এখনও বুর্জোয়া কাঠামোয় সীমাবদ্ধ হচ্ছে। উৎপাদকেরা যে-শ্রম দিয়েছে, তাদের অধিকারও **সেই অনুপাতে।** এখানে সমতা শুধু এইটুকু যে মাপা হচ্ছে **সমান মানদণ্ড** অর্থাৎ শ্রম দিয়ে।

কিন্তু একজনের চেয়ে আরেকজনের বেশী শারীরিক বা মানসিক শক্তি থাকে, তাই সে একই সময়ে বেশী শ্রম দিতে পারে, অথবা বেশী সময় কাজ করতে পারে। আবার

শ্রমকে মানদণ্ড হিসাবে গ্রহণ করতে হলে, তার স্থিতিকাল ও তীব্রতা দিয়েই তার সংজ্ঞা নির্ণয় করতে হবে, নইলে সে আর মানদণ্ড থাকে না। এই **সমান** অধিকার তাই অসমান শ্রমের জন্য অসমান অধিকার মাত্র। এখানে শ্রেণী-বৈষম্য স্বীকার করা হল না, কারণ প্রত্যেকেই আর সবাই-এর মতো শ্রমিক ছাড়া আর কিছু নয়; কিন্তু বিভিন্ন ব্যক্তির বিশেষগুণের এবং তারই দরুন উৎপাদন-ক্ষমতার অসমতাকে স্বাভাবিক বিশেষ অধিকার হিসাবে মৌন-স্বীকৃতি দেওয়া হল। **সুতরাং আর সব অধিকারেরই মতো এই অধিকারটিও অন্তর্বস্তুর দিক থেকে অসমানতার অধিকার মাত্র।** অধিকারের প্রকৃতিই এই যে, কেবল একটি সমান মানদণ্ড প্রয়োগের মাধ্যমেই তা সম্ভব; কিন্তু বিভিন্ন অসমান ব্যক্তিদের (আর অসমান না হলে তো বিভিন্ন ব্যক্তিই থাকত না) একটি সমান মানদণ্ডে তুলনা সম্ভব কেবল এই অর্থে যে, সমান দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের দেখা হচ্ছে, একটি **নির্দিষ্ট** দিকই কেবল ধরা হচ্ছে — যেমন, বর্তমান ক্ষেত্রে, তাদের দেখা হচ্ছে **কেবল শ্রমিক হিসাবে,** আর কিছুই দেখা হল না, বাকি সবকিছুই উপেক্ষা করা হল। তাছাড়া, কোনো শ্রমিক বিবাহিত, কেউ নয়, একজনের চেয়ে আরেকজনের সন্তান সংখ্যা বেশী ইত্যাদি ইত্যাদি। সুতরাং, একই শ্রম সম্পন্ন করে এবং ফলে, সামাজিক ভোগ্য-ভাণ্ডারের সমান অংশ নিয়েও, কার্যত একজন আর একজনের চেয়ে বেশী পাবে, একজন অপরের চেয়ে বেশী বিত্তবান হবে ইত্যাদি। এইসব ত্রুটি দূর করতে হলে অধিকারকে সমান নয়, অসমানই হতে হবে।

কিন্তু পুঁজিবাদী সমাজ থেকে সুদীর্ঘ প্রসবযন্ত্রণার পর সদ্যোজাত কমিউনিস্ট সমাজের যে প্রথম স্তর সেখানে এইসব ত্রুটি অনিবার্য। অধিকার কখনও সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং তার দ্বারা সর্তবদ্ধ সাংস্কৃতিক বিকাশের চেয়ে বড়ো নয়।

কমিউনিস্ট সমাজের উচ্চতর স্তরে, শ্রমবিভাগের কাছে ব্যক্তির দাসোচিত বশ্যতার এবং তারই সঙ্গে সঙ্গে দৈহিক ও মানসিক শ্রমের পারস্পরিক বৈপরীত্যের যখন অবসান **ঘটেছে; শ্রম যখন আর কেবল জীবন** ধারণের উপায় মাত্র নয়, জীবনেরই প্রাথমিক প্রয়োজন হয়ে উঠেছে; যখন ব্যক্তির সর্বাঙ্গীন বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন-শক্তিও বেড়ে গেছে এবং সামাজিক সম্পদের সমস্ত উৎস অঝোরে বইছে — কেবল তখনই বুর্জোয়া অধিকারের সংকীর্ণ দিগন্তরেখাকে সম্পূর্ণ অতিক্রম করা সম্ভব হবে, সমাজ তার কেতনে মুদ্রিত করতে পারবে — প্রত্যেকে দেবে তার সাধ্য অনুসারে, প্রত্যেকে পাবে তার প্রয়োজনমতো!

বিশেষ একটা পর্বে যেসব ধারণা কিছুটা অর্থপূর্ণ ছিল, কিন্তু আজ পরিণত হয়েছে অচল কথার জঞ্জালে, সেইসব ধারণা একদিকে আপ্তবাক্যের মতো আবার আমাদের পার্টির ওপর চাপিয়ে দেবার চেষ্টা, আবার অন্যদিকে যে-বাস্তবধর্মী দৃষ্টিভঙ্গি বহু চেষ্টার ফলে পার্টির মধ্যে সঞ্চার করা গিয়েছিল এবং আজ যা সেখানে মূল বিস্তার

করেছে, অধিকার ও অন্যান্য তুচ্ছ ধারণা সম্পর্কে গণতন্ত্রী ও ফরাসী সমাজতন্ত্রী মহলে অতি প্রচলিত ভাবাদর্শগত প্রলাপের সাহায্যে তাকে বিপথগামী করা যে কত বড় অপরাধ তা দেখাতে চেয়েছিলাম বলেই একদিকে 'অটুট পরিমাণে শ্রমফল' এবং অপরদিকে 'সমান অধিকার' এবং 'ন্যায্য বণ্টন' নিয়ে আমি এতটা বেশি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করলাম।

এ পর্যন্ত যে বিশ্লেষণ দেওয়া হয়েছে তার কথা একেবারে ছেড়ে দিলেও, তথাকথিত **বণ্টন** নিয়ে এতটা বাড়াবাড়ি করা এবং তারই ওপর প্রধান জোর দেওয়া সাধারণভাবেও ভুল হয়েছে।

ভোগোপকরণের যেরূপ বণ্টনই হোক না কেন, সেটা উৎপাদন পরিস্থিতির বণ্টনের ফল ছাড়া আর কিছু নয়। শেষোক্ত বণ্টন কিন্তু উৎপাদন-পদ্ধতিরই বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে। উদাহরণস্বরূপ, উৎপাদনের বৈষয়িক পরিস্থিতি পুঁজি ও জমির মালিকানা-রূপে অ-শ্রমিকদের অধিকারভুক্ত, আর জনগণ কেবলমাত্র উৎপাদনের ব্যক্তিগত পরিস্থিতির, শ্রমশক্তির মালিক — এই হল পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতির ভিৎ। উৎপাদনের উপাদানগুলি যদি এইভাবে বণ্টিত থাকে, তাহলে ভোগোপকরণের বর্তমান বণ্টন তা থেকে আপনা হতেই সৃষ্টি হয়। আবার উৎপাদনের বৈষয়িক পরিস্থিতি যদি শ্রমিকদেরই নিজস্ব সমবায়ী সম্পত্তি হয়, তাহলে তার থেকেও ঠিক একইভাবে ভোগের উপকরণগুলির ভিন্নতর এক বণ্টন দেখা দেবে। উৎপাদন-পদ্ধতি থেকে স্বাধীনভাবে বণ্টনের বিচার ও আলোচনা এবং সেইহেতু, প্রধানত বণ্টনের উপরেই নির্ভরশীল বলে সমাজতন্ত্রকে দেখাতে যাওয়াটা ইতর সমাজতন্ত্রীরা (এবং আবার তাদের কাছ থেকে গণতন্ত্রীদের একাংশ) বুর্জোয়া অর্থতত্ত্ববিদদের কাছ থেকে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু অনেকদিন আগেই যখন প্রকৃত সম্পর্কটা স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল, তখন আবার পিছু হঠা কেন?

> ৪। 'শ্রম মুক্তি হওয়া চাই শ্রমিক শ্রেণীরই কাজ, তার তুলনায় অন্য সব শ্রেণী **একাকার প্রতিক্রিয়াশীল জনসমষ্টি মাত্র।**'

প্রথম চরণটি নেওয়া হয়েছে আন্তর্জাতিকের নিয়মাবলীর প্রারম্ভিক কথাগুলি থেকে, কিন্তু 'মার্জিত' করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছিল: 'শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তি হওয়া চাই শ্রমিকদের নিজেদেরই কাজ', আর এখানে তার বিপরীতে 'শ্রমিক শ্রেণীকে' মুক্তি-সাধন করতে হবে — কিসের? 'শ্রমের'। এর অর্থ যিনি পারেন বুঝে নিন।

ক্ষতিপূরণ রূপে, দ্বিতীয় চরণটি হল একটি প্রথম শ্রেণীর লাসালীয় উদ্ধৃতি: 'তার (শ্রমিক শ্রেণীর) তুলনায় অন্য সব শ্রেণী **একাকার প্রতিক্রিয়াশীল জনসমষ্টি মাত্র।**'

'কমিউনিস্ট ইশতেহারে' বলা হয়েছে, 'আজকের দিনে বুর্জোয়াদের মুখামুখি যেসব শ্রেণী দাঁড়িয়ে আছে তার মধ্যে শুধু প্রলেতারিয়েত হল **প্রকৃত বিপ্লবী শ্রেণী**। অপর শ্রেণীগুলি আধুনিক যন্ত্রশিল্পের সামনে ক্ষয় হতে হতে লোপ পায়; প্রলেতারিয়েত হল সেই যন্ত্রশিল্পের বিশিষ্ট ও অপরিহার্য সৃষ্টি।*

অচল হয়ে পড়া উৎপাদন-পদ্ধতিতে সৃষ্ট সমস্ত সামাজিক অবস্থানগুলিকে আঁকড়ে রাখতে চায় যে সামন্তপ্রভুগণ ও নিম্ন মধ্যবিত্ত তাদের তুলনায়, বৃহৎ শিল্পের বাহক হিসাবে বুর্জোয়াদের এখানে বিপ্লবী শ্রেণী হিসাবে ধরা হয়েছে। তাই **বুর্জোয়াদের সঙ্গে একত্রে** তারা একাকার প্রতিক্রিয়াশীল জনসমষ্টি নয়।

অপরপক্ষে, শ্রমিক শ্রেণী বুর্জোয়াদের আপেক্ষিকে বিপ্লবী, কেননা সে নিজে বৃহৎ শিল্পের ভিত্তিতে বেড়ে উঠে উৎপাদনের যে পুঁজিবাদী চরিত্রকে বুর্জোয়ারা চিরস্থায়ী করতে চায়, সেইটাকেই ঘুচিয়ে ফেলার চেষ্টা করে। কিন্তু 'ইশতেহারে' একথাও বলা হয়েছে যে, 'তাদের প্রলেতারিয়েত রূপে আসন্ন রূপান্তরের কারণে' 'নিম্ন মধ্যবিত্ত' বিপ্লবী হয়ে উঠছে।

তাই, এদিক থেকে বিচার করলেও, শ্রমিক শ্রেণীর কাছে এরা বুর্জোয়াদের এবং সেই সঙ্গে আবার সামন্ত প্রভুদের সঙ্গেও একজোটে 'একাকার প্রতিক্রিয়াশীল জনসমষ্টি মাত্র' এ কথা বলা অর্থহীন।

গত নির্বাচনের সময় কারিগর, ছোট শিল্প-মালিক ইত্যাদি এবং **কৃষকদের** কাছে কি এই কথাই ঘোষণা করা হয়েছিল যে, 'আমাদের আপেক্ষিকে তোমরা আর বুর্জোয়া ও সামন্ত প্রভুরা একাকার প্রতিক্রিয়াশীল জনসমষ্টি মাত্র'?

লাসালের বিশ্বস্ত অনুগামীরা তাঁর লেখা সুসমাচারগুলি যেমনভাবে জানেন, তাঁর নিজেরও তেমনি 'কমিউনিস্ট ইশতেহারটিও' মুখস্থ ছিল। সুতরাং তিনি যে তাকে এমন স্থূলভাবে বিকৃত করেছেন তার একমাত্র উদ্দেশ্য হল বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে স্বৈরাচারী ও সামন্ততান্ত্রিক প্রতিপক্ষের সঙ্গে তাঁর মৈত্রীটার সাফাই দেওয়া।

শুধু তাই নয়, উপরোক্ত অনুচ্ছেদটিতে তাঁর দৈববাণী-সম উক্তিটিকে একান্ত গায়ের জোরে, আন্তর্জাতিকের নিয়মাবলী থেকে বিকৃতভাবে উদ্ধৃত অংশটির সঙ্গে সঙ্গতি না রেখে টেনে আনা হয়েছে। সুতরাং এটা একটা ধৃষ্টতা মাত্র। এবং বস্তুত শ্রী বিসমার্কের কাছে তা মোটেই অপ্রীতিকর নয়, বার্লিনের মারাত** যার কারবার করেন তেমনি একটা সস্তা ঔদ্ধত্য।

* এই সংস্করণের প্রথম খণ্ডে প্রথম অংশে ৩৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

** বার্লিনের মারাত: স্পষ্টতই লাসালপন্থীদের কেন্দ্রীয় মুখপত্র *Neuer Social-Demokrat* পত্রিকার প্রধান সম্পাদক হাসেলমানের উদ্দেশ্যে শ্লেষাত্মক উক্তি করেছেন মার্কস। — সম্পাঃ

৫। 'সমস্ত সভ্য দেশের শ্রমিকদের পক্ষেই যা এক, সেরূপ প্রচেষ্টার আবশ্যিক ফল হবে বিভিন্ন দেশের জনগণের আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্ব, এ সম্পর্কে সচেতন থেকে শ্রমিক শ্রেণী সর্বাগ্রে **আজকের দিনের জাতীয় রাষ্ট্রের কাঠামোর মধ্যে** নিজের মুক্তি সাধনের চেষ্টা করে।'

'কমিউনিস্ট ইশতেহার' এবং তারও আগের সমস্ত সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে লাসাল শ্রমিকদের আন্দোলনকে সংকীর্ণতম জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বুঝেছিলেন। এখানে তাঁকেই অনুসরণ করা হচ্ছে — এবং তাও আন্তর্জাতিকের কর্মকাণ্ডের পর!

আদৌ লড়াই করতে হলে শ্রমিক শ্রেণীকে যে স্বদেশে **শ্রেণী হিসাবে** নিজেকে সংগঠিত করতে হবে, আর তার নিজের দেশই যে তার সংগ্রামের আশু ক্ষেত্র, এ কথা তো স্বপ্রকাশ। এই অর্থে তার শ্রেণী-সংগ্রাম জাতীয়, অবশ্য সারবস্তুর দিক দিয়ে নয়, 'কমিউনিস্ট ইশতেহারের' ভাষায় 'রূপের দিক দিয়ে'। কিন্তু 'আজকের দিনের জাতীয় রাষ্ট্রের কাঠামো', ধরা যাক জার্মান সাম্রাজ্য, নিজেই আবার অর্থনীতির দিক থেকে বিশ্ববাজারের 'কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত', রাজনীতির দিক থেকে বিভিন্ন রাষ্ট্র নিয়ে গঠিত ব্যবস্থার 'কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত'। প্রত্যেকটি ব্যবসায়ী জানে যে, জার্মান বাণিজ্য একই সঙ্গে বৈদেশিক বাণিজ্যও, আর হের বিসমার্কের মহত্ত্ব নিঃসন্দেহে ঠিক এখানেই যে, তিনি এক ধরনের **আন্তর্জাতিক** নীতি অনুসরণ করে চলেন।

আর জার্মান শ্রমিক পার্টি নিজের আন্তর্জাতিকতাবাদকে কোথায় নিয়ে এসে দাঁড় করাচ্ছে? এই চেতনাটুকুতে যে, তার সমস্ত প্রচেষ্টার ফল হবে **'জনগণের আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্ব'**। বুর্জোয়া শান্তি ও স্বাধীনতা লীগ* থেকে ধার করা একটা কথা, আর তাকেই বিভিন্ন শাসক শ্রেণী ও তাদের সরকারগুলির বিরুদ্ধে মিলিত সংগ্রামে শ্রমিক শ্রেণীগুলির আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্বের সঙ্গে সমার্থক বলে চালাবার মতলব। সেই জন্যেই, জার্মান শ্রমিক শ্রেণীর **আন্তর্জাতিক কাজ** সম্পর্কে এখানে একটি কথাও নেই! আর তার নিজ দেশের যে বুর্জোয়ারা তার বিরুদ্ধে অন্য সমস্ত দেশের বুর্জোয়াদের সঙ্গে ইতিমধ্যেই ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে এবং হের বিসমার্কের আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র নীতির বিপক্ষে তাকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে এই ভাবেই!

বস্তুত, কর্মসূচিটির আন্তর্জাতিকতা অবাধ বাণিজ্য দলের আন্তর্জাতিকতার তুলনায় **পর্যন্ত অনেক নিচু স্তরের**। এরাও দাবি করে যে, তাদের প্রচেষ্টার ফল হবে 'জনগণের আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্ব'। কিন্তু সেই সঙ্গে তারা সে বাণিজ্যকে আন্তর্জাতিক করার জন্য কিছু

* আন্তর্জাতিক শান্তি ও স্বাধীনতা লীগ *(International League of Peace and Freedom)* বুর্জোয়া গণতন্ত্রী ও সর্বাস্তিবাদীদের দ্বারা ১৮৬৭ সালে জেনেভা শহরে প্রতিষ্ঠিত হয়। মার্কসের পীড়াপীড়িতে ও তাঁরই পরিচালনায় প্রথম আন্তর্জাতিক অবিচল সংগ্রাম চালায় লীগের মিথ্যে হামবড়া ধ্বনির বিরুদ্ধে, এ ধ্বনি শ্রমিক শ্রেণীকে শ্রেণী-সংগ্রামের পথ থেকে বিচ্যুত করছিল। — সম্পাঃ

করে, সব দেশের লোকই নিজ নিজ দেশে বাণিজ্য করে চলেছে, এই চেতনাটুকু নিয়েই আত্মসন্তুষ্ট হয়ে থাকে না।

'শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির' অস্তিত্বের ওপর শ্রমিক শ্রেণীর আন্তর্জাতিক কার্যকলাপ কোনক্রমেই নির্ভরশীল নয়। এটা ছিল কেবল সেই কার্যকলাপের জন্য একটি কেন্দ্রীয় সংস্থা গড়বার প্রথম প্রচেষ্টা। সে প্রচেষ্টা আন্দোলনে যে বেগ সঞ্চার করতে পেরেছিল তার মধ্যেই ছিল তার অক্ষয় সাফল্য, কিন্তু প্যারিস কমিউনের* পতনের পর এই **প্রথম ঐতিহাসিক রূপটির** মধ্যে তার সিদ্ধি আর সম্ভব রইল না।

বিসমার্কের *Norddeutsche* তার প্রভুর সন্তোষ বিধান করে যখন ঘোষণা করল যে, জার্মান শ্রমিক পার্টি নতুন কর্মসূচিতে আন্তর্জাতিকতা বর্জন করেছে, তখন সে সম্পূর্ণ সঠিক কথাই বলেছিল।**

২

> 'এইসব মৌলিক নীতি থেকে শুরু করে, জার্মান শ্রমিক পার্টি সবরকম আইনসম্মত উপায়ে **মুক্ত রাষ্ট্র** — **এবং** — সমাজতন্ত্রী সমাজের জন্য, **লৌহকঠোর মজুরি-বিধি সমেত** মজুরি প্রথা — এবং — সর্বপ্রকার শোষণের অবসানের জন্য, সমস্ত সামাজিক ও রাজনৈতিক অসাম্য লোপের জন্য চেষ্টা করে।'

'মুক্ত' রাষ্ট্রের প্রসঙ্গে আমি পরে ফিরে আসব।

তাহলে, এখন থেকে, জার্মান শ্রমিক পার্টিকে লাসালের 'লৌহকঠোর বিধিতে' বিশ্বাসস্থাপন করতে হবে! কথাটা যাতে দৃষ্টি এড়িয়ে না যায়, তাই 'লৌহকঠোর মজুরি-বিধি **সমেত** মজুরি প্রথার অবসান' (কথাটা হওয়া উচিত: মজুরি-শ্রমের প্রথা) এই কথা বলে এক অর্থহীন প্রলাপকে স্থান দেওয়া হয়েছে। মজুরি-শ্রমের অবসান যদি ঘটাতে পারি তাহলে স্বভাবতই তার বিধিরও অবসান হয়, তা সে বিধি 'লোহার' হোক বা স্পঞ্জের হোক। কিন্তু মজুরি-শ্রমের বিরুদ্ধে লাসালের সংগ্রামের প্রায় সবটাই এই তথাকথিত বিধিটিকে কেন্দ্র করে। তাই লাসালের গোষ্ঠী যে জিতেছে এ কথা প্রমাণ

* প্যারিস কমিউন, ১৮৭১ — প্যারিসে প্রলেতারীয় বিপ্লবে গঠিত শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবী সরকার; ইতিহাসের প্রথম প্রলেতারীয় একনায়কত্বের সরকার, প্যারিসে এটি টিকে থাকে ৭২ দিন — ১৮৭১ সালের ১৮ই মার্চ থেকে ২৮শে মে পর্যন্ত। — সম্পাঃ

** মার্ক্‌স *Norddeutsche Allgemeine Zeitung* (উত্তর জার্মান সাধারণ পত্রিকা)-এর ২০শে মার্চ ১৮৭৫-এ প্রকাশিত ৬৭তম সংখ্যার সম্পাদকীয়ের উল্লেখ করছেন। সেখানে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির কর্মসূচির ৫ম ধারা সম্পর্কে বলা হয়েছিল যে, 'সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক আন্দোলন বহুদিক থেকে আগের চেয়ে বিচক্ষণ হয়েছে' এবং 'আন্তর্জাতিককে ত্যাগ করছে'। — সম্পাঃ

করার জন্য, 'মজুরি প্রথার' অবসান করতে হবে 'লৌহকঠোর মজুরি-বিধি **সমেত**', তাকে বাদ দিয়ে নয়।

একথা সবাই জানেন যে, কেবল গ্যেটের 'মহান শাশ্বত লৌহকঠোর বিধি' থেকে ধার নেওয়া 'লৌহকঠোর' কথাটি ছাড়া 'লৌহকঠোর মজুরি-বিধির' কিছুই লাসালের নিজস্ব নয়। **'লৌহকঠোর'** কথাটির ছাপ দেখেই সাঁচ্চা ভক্তরা পরস্পরকে চিনে নেয়। কিন্তু আমি যদি এই বিধিটিকে লাসালের ছাপ সমেত, সুতরাং তাঁর অর্থেই গ্রহণ করি, তাহলে সেই সঙ্গে আমাকে এই বিধিটি সম্পর্কে তাঁর প্রমাণ-পদ্ধতিও গ্রহণ করতে হবে। আর সেটি কী? লাসালের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই, লাঙ্গে দেখিয়েছেন যে, এটি হচ্ছে (লাঙ্গের নিজের দ্বারা প্রচারিত) ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব।* কিন্তু এই তত্ত্ব যদি সঠিক হয়, তাহলেও আবার মজুরি-শ্রমের শতবার অবসান ঘটিয়েও আমি এই 'লৌহকঠোর বিধিটির' অবসান করতে **পারি না,** কেননা বিধিটি সেক্ষেত্রে কেবল মজুরি-শ্রমকেই নয়, **প্রত্যেকটি** সামাজিক ব্যবস্থাকেই শাসিত করবে। সরাসরি এরই ওপর ভিত্তি করে গত পঞ্চাশ বছরের বেশি অর্থতত্ত্ববিদরা প্রমাণ করে আসছেন যে, সমাজতন্ত্র দারিদ্র্যের অবসান ঘটাতে পারে না, **প্রকৃতির মধ্যেই দারিদ্র্যের ভিত্তি রয়েছে,** সমাজতন্ত্র কেবল তাকে **সাধারণ** করে তুলতে পারে, তাকে সমানভাবে গোটা সমাজ জুড়ে ছড়িয়ে দিতে পারে।

কিন্তু এগুলিও আসল কথা নয়। লাসাল যেরকম **ভুলভাবে** এই বিধিটি সূত্রবদ্ধ করেছেন সেকথা **একেবারে ছেড়ে দিলেও,** সত্যই অসহ্য পশ্চাদপসরণ হয়েছে এইখানে।

লাসালের মৃত্যুর পর থেকে **আমাদের** পার্টিতে এই বিজ্ঞানসম্মত উপলব্ধি প্রতিষ্ঠা পেয়েছে যে, আপাতদৃষ্টিতে যা **মনে হয়** মজুরি ঠিক তাই, অর্থাৎ, **শ্রমের মূল্য — বা দর —** নয়, বরং **শ্রমশক্তির মূল্য বা দরের** এক ছদ্মাবৃত রূপমাত্র। এর ফলে, মজুরি সম্পর্কে এতাবৎ প্রচলিত সমগ্র বুর্জোয়া ধ্যান-ধারণা এবং সেই ধারণার বিরুদ্ধে প্রযুক্ত সমস্ত সমালোচনাও চিরদিনের মত বিসর্জিত হয় এবং একথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, মজুরি-শ্রমিক খানিকটা সময় বিনা পয়সায় পুঁজিপতির জন্য (এবং অতএব উদ্বৃত্ত মূল্য ভোগে সেই পুঁজিপতির সহযোগীদের জন্যও) কাজ করে দিচ্ছে কেবল এই কারণেই

* ম্যালথাসবাদ — পুঁজিবাদের আমলে মেহনতী জনগণের নিঃস্বভবনকে 'স্বাভাবিক', জনসংখ্যার পরম আইন রূপে বর্ণনা করার এক প্রতিক্রিয়াশীল মতবাদ। ম্যালথাসবাদ এই নামকরণ হয় ইংলণ্ডের বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ টি. আর. ম্যালথাসের নাম থেকে। ইনি ১৭৯৮ সালে *An Essay on the Principle of Population* (জনসংখ্যার নীতি বিষয়ে নিবন্ধ) নামক রচনায় দেখান যে, জনসংখ্যা যেন জ্যামিতিক প্রগতিতে (১, ২, ৪, ৮, ১৬ ...) বৃদ্ধি পায় আর জীবনধারণের উপকরণ বাড়ে পাটিগাণিতিক প্রগতিতে (১, ২, ৩, ৪, ৫ ...)। ম্যালথাসবাদীরা জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রস্তাব দেয়, মহামারী যুদ্ধ ইত্যাদিকে হিতকর গণ্য করে, যা এদের মতে লোক সংখ্যার সঙ্গে জীবনোপকরণের সঙ্গতি ঘটায়। — সম্পাঃ

তাকে তার নিজের ভরণ-পোষণের জন্য কাজ করতে, অর্থাৎ **বেঁচে থাকতে** দেওয়া হয়; এবং গোটা পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার মূলকথা হল কাজের দিন দীর্ঘতর করে, বা উৎপাদনশীলতার বিকাশ করে, অর্থাৎ শ্রমশক্তির তীব্রতা বাড়িয়ে, এবং অন্যান্য উপায়ে এই বিনা পয়সার শ্রমকে বাড়ান; এবং তারই জন্য, এই মজুরি-শ্রম প্রথা হচ্ছে এক দাস প্রথা, এবং এমন এক দাস প্রথা, যার কঠোরতা শ্রমের সামাজিক উৎপাদন-শক্তির বিকাশের অনুপাতে বাড়ে, তাতে সে শ্রমিকের পাওনা বাড়ুক বা কমুক। এই চেতনার প্রসার আমাদের পার্টিতে ক্রমান্বয়ে বাড়ার পর এখন লাসালের আপ্তবাক্যে ফিরে যাওয়া হচ্ছে, যদিও এটা জানা থাকার কথা যে, মজুরি জিনিসটা কী তাই লাসাল **বুঝতেন না,** বুর্জোয়া অর্থতত্ত্ববিদদের অনুসরণে বিষয়টির বাহ্যরূপকেই তার অন্তর্বস্তু বলে তিনি ধরে নিয়েছিলেন।

ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছে যেন, শেষ পর্যন্ত দাসপ্রথার রহস্য ভেদ করেছে এবং বিদ্রোহে ফেটে পড়েছে এমন একদল ক্রীতদাসের মধ্যে একজন যে ক্রীতদাস তখনও সেকেলে ধ্যান-ধারণার বশ, সে বিদ্রোহের কর্মসূচিতে লিখে দিচ্ছে: দাস প্রথার অবসান চাই কেননা দাস প্রথায় ক্রীতদাসের খোরাকি কোনক্রমেই একটা নির্দিষ্ট অতি নিম্ন সর্বোচ্চসীমার বেশি হতে পারে না!

আমাদের পার্টিতে সর্বসাধারণের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হয়েছে এমন এক চেতনার বিরুদ্ধে আমাদের পার্টির প্রতিনিধিরা যে এমন বিকট আক্রমণ করতে পারলেন এই ঘটনাটুকু থেকেই কি প্রমাণ হয় না যে, কী অপরাধী চপলতা এবং বিবেকহীনতার সঙ্গে এঁরা এই আপোষমূলক কর্মসূচিটি রচনার কাজে হাত দিয়েছিলেন!

'সমস্ত সামাজিক ও রাজনৈতিক অসাম্য লোপ' অনুচ্ছেদটির উপসংহারে এই অনির্দিষ্ট বাক্যাংশটির বদলে বলা উচিত ছিল যে, শ্রেণী পার্থক্য অবসানের সঙ্গে সঙ্গে তার থেকে উদ্ভূত সমস্ত সামাজিক ও রাজনৈতিক অসাম্য আপনা থেকেই মিলিয়ে যাবে।

৩

> '**সামাজিক সমস্যা সমাধানের পথ কাটার** জন্য জার্মান শ্রমিক পার্টি **রাষ্ট্রের সহায়তায় মেহনতী জনতার গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণাধীনে** উৎপাদক সমবায়-সমিতি প্রতিষ্ঠার দাবি করে। শিল্প এবং কৃষিতে এইসব উৎপাদক সমবায়-সমিতি সৃষ্টি করতে **হবে** এমন মাত্রায় **যাতে তার মধ্যে থেকে সমগ্র শ্রমের সমাজতান্ত্রিক সংগঠন উদ্ভূত হয়।**'

লাসালীয় 'লৌহকঠোর মজুরি-বিধির' পর এবার পয়গম্বরী দাওয়াই। তার 'পথটি' বেশ ভালোভাবেই 'কাটা হয়েছে'। বর্তমান শ্রেণী-সংগ্রামের জায়গায় দেখা দিয়েছে খবরের কাগজের কলমনবীশদের এক বচন, 'সামাজিক **সমস্যা**', যার '**সমাধানের**' জন্য 'পথ কাটতে

হবে'। সমাজ রূপান্তরের বিপ্লবী প্রক্রিয়ার পরিবর্তে উৎপাদক সমবায়-সমিতিগুলিকে প্রদত্ত 'রাষ্ট্রীয় সাহায্য' থেকেই 'সমগ্র শ্রমের সমাজতান্ত্রিক সংগঠন' 'উদ্ভূত হবে' আর সেই সমিতিগুলিকে **'সৃষ্টি করছে'** শ্রমিকেরা নয়, **রাষ্ট্র**। রাষ্ট্রীয় ঋণের সাহায্যে একটি নতুন রেলপথেরই মতো সুষ্ঠুভাবে একটা নূতন সমাজও গড়ে তোলা যায় — এ কল্পনা লাসালেরই যোগ্য!

অবশিষ্ট লজ্জাবোধটুকু থেকে 'রাষ্ট্রীয় সাহায্যকে' — 'মেহনতী জনতার' গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়েছে।

প্রথমত, জার্মানিতে 'মেহনতী জনতার' অধিকাংশ প্রলেতারীয় নয়, কৃষক।

দ্বিতীয়ত, জার্মান ভাষায় 'গণতান্ত্রিক' মানে 'জনশাসনানুগত' (volksherrschaftlich)। কিন্তু 'মেহনতী জনতার জনশাসনানুগত নিয়ন্ত্রণ', এর মানে কী দাঁড়ায়? আর বিশেষ করে সেই মেহনতী জনতার ক্ষেত্রে, যারা রাষ্ট্রের কাছে এইসব দাবি পেশ করার মধ্য দিয়ে এই পরিপূর্ণ সচেতনতাই ব্যক্ত করছে যে, তারা শাসন করে না আর শাসন করার মত পরিপক্ক হয়নি!

লুই ফিলিপের রাজত্বকালে, ফরাসী সমাজতন্ত্রীদের **বিরোধিতা করে** যে দাওয়াইটা ব্যুশে দিয়েছিলেন এবং *Atelier** পত্রিকার প্রতিক্রিয়াশীল শ্রমিকেরা যা গ্রহণ করেছিল, এখানে তার সমালোচনায় নামা বাহুল্য হবে। কর্মসূচিতে এই বিশেষ টোটকাটির স্থান দেওয়াটাই প্রধান অপরাধ নয়, সাধারণভাবে শ্রেণী আন্দোলনের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সরে গোষ্ঠীবাদী আন্দোলনের দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের দিকে পিছু হঠাই প্রধান অপরাধ।

শ্রমিকেরা যে সমাজ ব্যাপী, এবং সর্বপ্রথম তাদের নিজের দেশে স্বজাতি ব্যাপী সমবায়ী উৎপাদনের অবস্থা সৃষ্টি করতে চায়, তার একমাত্র অর্থ এই যে, তারা উৎপাদনের বর্তমান অবস্থার পরিবর্তনের জন্য সংগ্রাম করছে; রাষ্ট্রীয় সাহায্যে সমবায়-সমিতি প্রতিষ্ঠার সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। আর বর্তমান সমবায়-সমিতিগুলি সম্পর্কে বলা যায় যে, সরকার বা বুর্জোয়াদের আশ্রয়ে নয়, যে পরিমাণে তারা শ্রমিকদের স্বাধীন সৃষ্টি **কেবল** সেইটুকুই তাদের মূল্য।

৪

এবার গণতন্ত্র সম্পর্কিত অংশে আসা যাক।

ক। 'রাষ্ট্রের মুক্ত ভিত্তি।'

সর্বপ্রথম, দুই পরিচ্ছেদ অনুযায়ী, জার্মান শ্রমিক পার্টি 'মুক্ত রাষ্ট্রের' জন্য চেষ্টিত।

মুক্ত রাষ্ট্র সে জিনিসটা কী?

---

* *Atelier* (কারখানা) ১৮৪০ — ১৮৫০-এর মধ্যে প্যারিসে প্রকাশিত শ্রমিকদের একখানি মাসিক পত্রিকা। পত্রিকাখানি ব্যুশের ক্যাথলিক সমাজতন্ত্রের প্রভাবাধীন ছিল। — সম্পাঃ

যে শ্রমিকেরা বিনীত প্রজার সংকীর্ণ মনোবৃত্তি থেকে মুক্ত হয়েছে, রাষ্ট্রকে মুক্ত করা কোনক্রমেই তাদের লক্ষ্য নয়। জার্মান সাম্রাজ্যে 'রাষ্ট্র' প্রায় রাশিয়ার রাষ্ট্রের মতোই 'মুক্ত'। যে রাষ্ট্র সমাজের ওপর চাপিয়ে দেওয়া এক সংস্থা, তাকে সমাজের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীনে নিয়ে আসাই হল মুক্তি। বর্তমানেও, যে রাষ্ট্ররূপ 'রাষ্ট্রের স্বাধীনতা'কে যতটা বেশী বা কম মাত্রায় সীমাবদ্ধ করে, সে তত বেশি বা কম মাত্রায় মুক্ত।

অন্তত বর্তমান কর্মসূচি গ্রহণ করলে জার্মান শ্রমিক পার্টি এই কথাই প্রমাণ করবে যে তার সমাজতন্ত্রী ধ্যান-ধারণা খুব ভাসাভাসা। কারণ, বর্তমান সমাজকে (এবং ভবিষ্যতের যে কোন সমাজ সম্পর্কেও একথা প্রযোজ্য) বর্তমান রাষ্ট্রের (অথবা ভবিষ্যৎ সমাজের ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রের) **ভিত্তিরূপে** না ধরে, তারা বরং রাষ্ট্রকে তার নিজস্ব **'বুদ্ধিবৃত্তিগত, নৈতিক ও মুক্তিধর্মী বনিয়াদসম্পন্ন'** এক স্বাধীন সত্ত্বারূপে বিবেচনা করছে।

তাছাড়া কর্মসূচিতে **'আজকের দিনের রাষ্ট্র', 'আজকের দিনের সমাজ'** এ কথার যে উচ্ছৃঙ্খল অপব্যবহার করা হয়েছে, এবং যে রাষ্ট্রের কাছে দাবি দাওয়া পেশ করা হচ্ছে তার সম্পর্কে আরও যেসব উচ্ছৃঙ্খল বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে সেটাই বা কী?

'আজকের দিনের সমাজ' হচ্ছে পুঁজিবাদী সমাজ, মধ্যযুগীয় অবস্থার সংমিশ্রণ থেকে কম বেশি মুক্ত, প্রত্যেক দেশের বিশেষ ঐতিহাসিক বিকাশ দ্বারা কম বেশি পরিবর্তিত, কম বেশি বিকশিত; সমস্ত সভ্য দেশে তা বর্তমান। অপরপক্ষে, দেশের সীমানার সঙ্গে সঙ্গে 'আজকের দিনের রাষ্ট্র' বদলে যায়। প্রুশো-জার্মান সাম্রাজ্যে যা, সুইজারল্যান্ডে রাষ্ট্র তা থেকে পৃথক, ইংলণ্ডে রাষ্ট্র আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র থেকে আলাদা। সুতরাং 'আজকের দিনের রাষ্ট্র' একটি কল্পকথা মাত্র।

তা হলেও রূপের বহু বৈচিত্র্য সত্ত্বেও বিভিন্ন সভ্য দেশের বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে এই বিষয়ে অভিন্নতা আছে যে, প্রত্যেকটিরই বনিয়াদ হল পুঁজিবাদের দিক থেকে কম বেশি অগ্রসর আধুনিক বুর্জোয়া সমাজ। তাই এদের মধ্যে কয়েকটি মূলগত সাধারণ বৈশিষ্ট্য বর্তমান। এই অর্থে, 'আজকের দিনের রাষ্ট্রের' কথা বলা যায় সেই ভবিষ্যতের সঙ্গে তুলনা করে, যখন তার বর্তমান মূল, বুর্জোয়া সমাজ, আর বেঁচে থাকবে না।

এরপর প্রশ্ন আসে: কমিউনিস্ট সমাজে রাষ্ট্রের কী রূপান্তর ঘটবে? অন্যভাবে বলতে গেলে, রাষ্ট্রের বর্তমান কর্তব্যের অনুরূপ কী কী সামাজিক কর্তব্য তখনও থেকে যাবে? কেবল বিজ্ঞানসম্মত পথেই এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া যায়। 'রাষ্ট্র' কথাটির সঙ্গে 'জনগণ' কথাটির হাজার রকমের বিন্যাস ঘটালেও সমস্যার সমাধান একবিন্দুমাত্র এগোবে না।

পুঁজিবাদী সমাজ আর কমিউনিস্ট সমাজ, এই দুই-এর মধ্যে রয়েছে একটি থেকে অপরটিতে বিপ্লবী রূপান্তরের এক পর্ব। তারই সঙ্গে সহগামী থাকে একটি রাজনৈতিক

উৎক্রমণ পর্ব যখন রাষ্ট্র **প্রলেতারিয়েতের বিপ্লবী একনায়কত্ব** ছাড়া আর কিছু হতেই পারে না।

কিন্তু কর্মসূচিতে এ বিষয়ে কিম্বা কমিউনিস্ট সমাজের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্র সম্পর্কে কোনো আলোচনা করা হয়নি।

তার রাজনৈতিক দাবিগুলির মধ্যে সেই সব পুরাতন সর্বজনবিদিত গণতান্ত্রিক জপমালার বাইরে আর কিছুই নেই: সর্বজনীন ভোটাধিকার, প্রত্যক্ষ আইনপ্রণয়ন ব্যবস্থা, জনগণের অধিকার, জনবাহিনী ইত্যাদি। এগুলি বুর্জোয়া জনতা পার্টি অথবা শান্তি ও স্বাধীনতা লীগের প্রতিধ্বনি মাত্র। আজগুবি আকারে অতিরঞ্জিত করে না দেখলে এইসব দাবিই ইতিমধ্যে **অর্জিত হয়েছে**। শুধু যে-রাষ্ট্রে এসব আছে সে-রাষ্ট্র জার্মান সাম্রাজ্যের সীমানার মধ্যে অবস্থিত নয়, সে রাষ্ট্র রয়েছে সুইজারল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে। এই ধরনের যে 'ভবিষ্যতের রাষ্ট্র' সেটা আজকের দিনেরই রাষ্ট্র, যদিও তার অস্তিত্ব জার্মান সাম্রাজ্যের 'কাঠামোর' বাইরে।

কিন্তু একটা কথা ভুলে যাওয়া হয়েছে। জার্মান শ্রমিক পার্টি যখন 'আজকের দিনের জাতীয় রাষ্ট্রের' মধ্যে অর্থাৎ তার **নিজের** রাষ্ট্র, প্রুশো-জার্মান সাম্রাজ্যের মধ্যে কাজ করছে বলে সুস্পষ্ট ঘোষণা করছে — বস্তুতপক্ষে তা না হলে তার দাবিগুলির অনেকাংশে কোন মানেই থাকত না, কেননা যা নেই কেবল তাই-ই দাবি করা যায় — সেক্ষেত্রে আসল কথাটা তার ভুলে যাওয়া উচিত হয়নি, অর্থাৎ, এইসব চমৎকার টুকিটাকি রঙচঙে জিনিসগুলো দাঁড়িয়ে আছে জনগণের তথাকথিত সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতির উপর এবং তাই কেবলমাত্র একটা **গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রেই** তা প্রযোজ্য।

লুই ফিলিপ বা লুই নেপোলিয়নের শাসনকালে ফরাসী শ্রমিকদের কর্মসূচি যেভাবে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের দাবি করেছিল সেভাবে দাবি তুলবার সাহস যখন লোকের নেই — এবং তাই বিচক্ষণতা, কেননা বর্তমান অবস্থায় সাবধান হওয়া দরকার, — তখন যে রাষ্ট্র কেবল পার্লামেণ্টীয় রূপ দিয়ে পালিশ করা, সামন্ততান্ত্রিক ভেজালের খাদ মিশ্রিত, বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রভাবে ইতিমধ্যেই প্রভাবিত, আমলাতান্ত্রিকভাবে বানানো আর পুলিশ রক্ষিত সামরিক স্বেচ্ছাতন্ত্র ছাড়া কিছু নয়, তার কাছে যার গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রেই কোন অর্থ থাকতে পারে এমন সব দাবি উপস্থিত করা এবং তারপর সেই রাষ্ট্রকে উপরন্তু এই বলে আশ্বাস দেওয়া যে 'আইনসম্মত উপায়ে' তাকে এইসব জিনিস মানতে বাধ্য করা যাবে বলে ধরে নেওয়া হচ্ছে, এই ছলনা করারও কোন দরকার ছিল না। সে ছলনা সৎও* নয়, শোভনও নয়।

* আইজেনাখীয়দের 'সৎ' আখ্যা দেওয়া হত। এখানে শব্দার্থ নিয়ে খেলা করা হয়েছে। — সম্পাঃ

এমনকি যে ইতর গণতন্ত্র গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের মধ্যেই সত্যযুগের সন্ধান পায় এবং একথা ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করে না যে, বুর্জোয়া সমাজের ঠিক এই সর্বশেষ রাষ্ট্ররূপের মধ্যেই শ্রেণী-সংগ্রামকে লড়ে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করার কথা, এমনকি সেই গণতন্ত্রও পুলিসের দ্বারা অনুমোদিত ও যুক্তির কাছে অননুমোদিত সীমার মধ্যে রয়ে যাওয়া এই ধরনের গণতন্ত্রপনার চেয়ে পাহাড়প্রমাণ উঁচু।

'জার্মান শ্রমিক পার্টি **রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ভিত্তিরূপে** দাবি করে: ক্রমবর্ধমানহারে একটিমাত্র আয়কর' ইত্যাদি কথা প্রমাণ করছে যে, বাস্তবিক পক্ষে 'রাষ্ট্র' কথাটি দিয়ে সরকারী শাসনযন্ত্র বা শ্রম-বিভাগের ফলে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন এক পৃথক সংস্থা রূপ রাষ্ট্রকেই বোঝা হয়েছে। কর আর কিছুর নয় সরকারী শাসনযন্ত্রেরই অর্থনৈতিক ভিত্তি। যে ভবিষ্যতের রাষ্ট্র সুইজারল্যান্ডে বর্তমান সেখানে এই দাবি বেশ ভালভাবেই পূরণ হয়েছে। আয়কর ধরে নেয় যে বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণীর আয়ের বিভিন্ন উৎস আছে আর তাই এ সমাজ পুঁজিবাদী সমাজ। তাই, লিভারপুলের অর্থ ব্যবস্থা সংস্কারকেরা, গ্ল্যাডস্টোনের ভাই-এর নেতৃত্বে বুর্জোয়ারাও যে আলোচ্য কর্মসূচির মতো একই দাবি উপস্থিত করছে তাতে এতটুকুও আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

> খ। 'রাষ্ট্রের মানসিক ও নৈতিক ভিত্তি হিসাবে জার্মান শ্রমিক পার্টি দাবি করে:
>
> ১। রাষ্ট্রের দ্বারা সর্বজনীন ও **সমান প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা**। সার্বজনীন ও বাধ্যতামূলক স্কুলগমন। বিনা বেতনে শিক্ষাদান।'

সমান প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা? কোন ধারণা থেকে এই কথাগুলি লেখা হয়েছে? বর্তমান সমাজে (এবং একমাত্র বর্তমান সমাজ নিয়েই আলোচনা চলছে) সকল শ্রেণীর জন্য শিক্ষা-ব্যবস্থা **সমান** হতে পারে, এই কথাই কি বিশ্বাস করা হচ্ছে? নাকি এই দাবি করা হচ্ছে যে, কেবলমাত্র সেই সামান্য শিক্ষা-ব্যবস্থা, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠ, যা শুধু মজুরি শ্রমিক নয়, কৃষকদেরও আর্থিক অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ, উপরের শ্রেণীগুলিকেও সেইখানে নেমে আসতে বাধ্য করতে হবে?

'সার্বজনীন বাধ্যতামূলক স্কুলগমন। বিনা বেতনে শিক্ষাদান।' প্রথমটি জার্মানিতে পর্যন্ত আছে, দ্বিতীয়টা প্রাথমিক স্কুলের বেলায় আছে সুইজারল্যান্ডে এবং যুক্তরাষ্ট্রে। যুক্তরাষ্ট্রের কোন কোন অঙ্গ রাজ্যে যদি উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও 'বিনা বেতনে' পড়ার ব্যবস্থা থেকে থাকে, তবে কার্যত তার অর্থ হচ্ছে, সাধারণ করের আদায় থেকে উচ্চ শ্রেণীগুলির শিক্ষার খরচা বহন করা। প্রসঙ্গত ক, (৫) ধারায় 'বিনা খরচায় বিচার ব্যবস্থার' যে দাবি করা হয়েছে তার সম্পর্কেও একই কথা খাটে। ফৌজদারী বিচার সব দেশেই বিনা খরচে চলে। দেওয়ানী বিচারের বিষয় প্রায় একান্তই সম্পত্তি নিয়ে বিরোধ এবং

তাই তাতে জড়িত থাকে প্রায় একান্তই মালিক শ্রেণীরা। তাহলে কি জাতীয় তহবিলের খরচায় তারা মামলা চালিয়ে যাবে?

বিদ্যালয় সম্পর্কিত অনুচ্ছেদে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সঙ্গে মিলিয়ে অন্তত টেকনিকাল (তত্ত্বগত এবং ব্যবহারিক) স্কুল দাবি করা উচিত ছিল।

'রাষ্ট্রের দ্বারা প্রাথমিক শিক্ষা' সম্পূর্ণভাবে আপত্তিজনক। প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যয়, শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় গুণাবলী, শিক্ষার বিভিন্ন শাখা নির্ধারণ প্রভৃতি সাধারণ আইনে নির্দিষ্ট করে দেওয়া, আর যুক্তরাষ্ট্রে যেভাবে করা হয় সেইভাবে, এই বিধিবদ্ধ নির্দেশ পালিত হচ্ছে কিনা তা রাষ্ট্রীয় পরিদর্শকদের দিয়ে দেখা, অথবা রাষ্ট্রকে জনগণের শিক্ষাদাতারূপে প্রতিষ্ঠা করা — এ দুয়ের মধ্যে অনেক তফাৎ! বরং, সরকার ও গির্জা উভয়কেই বিদ্যালয়ের উপর কোনো প্রভাব বিস্তার করা থেকে সমান দূরে রাখা দরকার। বিশেষ করে প্রুশো-জার্মান সাম্রাজ্যে (এবং এখানে 'ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রের' কথা বলা হচ্ছে এই বলে কোন বাজে ফিকিরের আশ্রয় নেওয়া চলবে না, এ বিষয়ে ব্যাপারটা কী তা আমরা ইতিপূর্বেই দেখেছি) রাষ্ট্রেরই বরং জনসাধারণের কাছ থেকে খুব কঠোর শিক্ষা পাওয়া প্রয়োজন।

কিন্তু এত গণতান্ত্রিক বাগাড়ম্বর সত্ত্বেও, রাষ্ট্রের উপর লাসালীয় গোষ্ঠীর দাসসুলভ বিশ্বাসের দ্বারা অথবা, সমানই খারাপ কথা, অলৌকিক ঘটনায় গণতান্ত্রিক বিশ্বাসের দ্বারা সমগ্র কর্মসূচিটি আগাগোড়া কলঙ্কিত, কিংবা বলা যেতে পারে যে, এটি হচ্ছে সমাজতন্ত্র থেকে সমান দূরবর্তী এই দুই ধরনের অলৌকিক বিশ্বাসের মধ্যে এক আপোষ।

'বিজ্ঞানের স্বাধীনতা' — উক্তিটি প্রুশীয় সংবিধানের এক অনুচ্ছেদে রয়েছে। তবে এখানেও সে কথা কেন?

'বিবেকের স্বাধীনতা!' Kulturkampf*-এর এই যুগে উদারপন্থীদের পুরান ধ্বনির কথা স্মরণ করিয়ে দেবার ইচ্ছা যদি হয়েই থাকে তাহলে সে কথাটা একমাত্র এই ভাবেই বলা যেত: 'পুলিশের নাক ঢোকানো ছাড়াই, প্রত্যেকের নিজ নিজ ধর্মীয় ও শারীরিক প্রয়োজন পূরণ করতে পারা চাই।' কিন্তু শ্রমিক পার্টির এই প্রসঙ্গে অন্তত এই প্রত্যয়টুকু প্রকাশ করা উচিত ছিল যে, বুর্জোয়া 'বিবেকের স্বাধীনতা' প্রকৃতপক্ষে

* Kulturkampf (সংস্কৃতির সংগ্রাম) — ১৯শ শতকের ৭০-এর দশকে বিসমার্ক সরকারের বুর্জোয়া উদারনীতিক আইন ব্যবস্থাগুলির এই নামকরণ হয়, এই সব ব্যবস্থা চালু হয়েছিল ঐহিক সংস্কৃতির জন্য সংগ্রামের ধ্বনিতে, ক্যাথলিক গির্জা ও 'মধ্য' পার্টির বিরুদ্ধে যা দক্ষিণ-পশ্চিম জার্মান ছোটো ও মাঝারি রাষ্ট্রগুলির আমলাতন্ত্র, জমিদার এবং বুর্জোয়াদের স্বতন্ত্রবাদী প্রুশীয় বিরোধী মতবাদের সমর্থন করত। ৮০-র দশকে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সংহতির উদ্দেশ্যে বিসমার্ক এই সব ব্যবস্থার অধিকাংশই খারিজ করে দেন। — সম্পাঃ

সবধরনের **বিবেকের ধর্মীয় স্বাধীনতা** সহ্য করা ছাড়া আর কিছু নয়, অথচ শ্রমিক পার্টির নিজস্ব চেষ্টা হল বরং বিবেককে ধর্মের কুহক থেকে মুক্ত করা। অবশ্য 'বুর্জোয়া' স্তর অতিক্রম না করাই যেন স্থির হয়েছে।

আমার বক্তব্য শেষ হয়ে এসেছে কেননা কর্মসূচিতে এরপর যে পরিশিষ্ট রয়েছে সেটি তার বৈশিষ্ট্যসূচক অঙ্গ নয়। সুতরাং এ প্রসঙ্গে আমি খুব সংক্ষেপেই সারতে পারি।

২। 'স্বাভাবিক কর্মদিন।'

অন্য কোনো দেশে শ্রমিক পার্টি এরকম একটি অনির্দিষ্ট দাবি করে ক্ষান্ত হয়নি, বাস্তব পরিবেশ অনুযায়ী যা স্বাভাবিক বলে মনে করেছে, সর্বক্ষেত্রেই সেই অনুসারে কর্মদিনের দৈর্ঘ্য তারা বেঁধে দিয়েছে।

৩। 'নারী শ্রমের সংকোচ ও শিশু শ্রমের নিষিদ্ধীকরণ।'

নারী শ্রম সংকোচের ব্যাপারটা কর্মদিন নির্ধারণের অন্তর্ভুক্ত হওয়া চাই, কেননা সেটা কর্মদিনের দৈর্ঘ্য, বিরতি-ছুটি ইত্যাদির সঙ্গে জড়িত। অন্যথায় এর একমাত্র অর্থ এই হতে পারে যে, শিল্পের যেসব শাখা স্ত্রীলোকদের শরীরের পক্ষে বিশেষ অস্বাস্থ্যকর অথবা নৈতিক দিক থেকে স্ত্রীজাতির পক্ষে বিশেষ আপত্তিজনক সেইসব শাখায় স্ত্রীলোকদের কাজ করতে না দেওয়া। তাই যদি উদ্দেশ্য হয়, তবে সে কথা খুলে বলা উচিত ছিল।

'শিশু শ্রমের নিষিদ্ধীকরণ।' এখানে বয়সের সীমা বলে দেওয়া একান্ত অপরিহার্য।

শিশু শ্রমের **সাধারণ নিষিদ্ধীকরণ** বৃহৎ শিল্পের অস্তিত্বের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ, তাই এ কেবল একটি অন্তঃসারশূন্য সদিচ্ছামাত্র।

এই ব্যবস্থার রূপায়ণ যদি সম্ভবও হত, তাহলেও তা হত প্রতিক্রিয়াশীল, কেননা বিভিন্ন বয়ঃক্রম অনুযায়ী কাজের সময় কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ এবং শিশুদের সুরক্ষার জন্য অন্যান্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকলে, অল্পবয়স থেকেই শিক্ষার সঙ্গে উৎপাদনশীল শ্রম মেলানো আজকের সমাজকে পরিবর্তন করার দিক থেকে সবচেয়ে শক্তিশালী এক উপায়।

৪। 'ফ্যাক্টরি, হস্তশিল্প কারখানা ও ঘরোয়া শিল্পের উপর রাষ্ট্রীয় তদারক।'

প্রুশো-জার্মান রাষ্ট্রের কথা মনে রেখে এটুকু নিশ্চয়ই দাবি করা উচিত ছিল যে, আদালত ছাড়া আর কেউ কলকারখানা পরিদর্শকদের অপসারণ করতে পারবে না; যে কোনো শ্রমিক কর্তব্যে অবহেলার জন্য পরিদর্শকদের আদালতে অভিযুক্ত করতে প্যারবে; তাদের ডাক্তারী পেশার অন্তর্ভুক্ত লোক হওয়া চাই।

৫। 'কয়েদী শ্রমের নিয়ন্ত্রণ।'

শ্রমিকদের সাধারণ কর্মসূচির মধ্যে এ একটা অতি তুচ্ছ দাবি। সে যা হোক, স্পষ্ট করে বলা উচিত ছিল যে, প্রতিযোগিতার আশঙ্কায় সাধারণ ফৌজদারী অপরাধীদের প্রতি জানোয়ারের মতো ব্যবহার চলতে দেওয়ার কোন উদ্দেশ্য নেই শ্রমিকদের এবং বিশেষ করে, তাদের উন্নতির একমাত্র উপায়, উৎপাদনশীল শ্রম থেকে তাদের বঞ্চিত রাখারও কোন ইচ্ছা নেই। সমাজতন্ত্রীদের কাছ থেকে অন্তত এইটুকু নিশ্চয়ই আশা করা যেত।

৬। 'একটি কার্যকরী দায়িত্ব আইন।'

'কার্যকরী' দায়িত্ব আইন বলতে কী বোঝান হচ্ছে সেকথা নির্দিষ্ট করে দেওয়া উচিত ছিল।

প্রসঙ্গত লক্ষ্য করা দরকার যে, স্বাভাবিক কর্মদিনের কথায় কারখানা আইনের স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত নিয়মকানুন বা নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রভৃতি সংক্রান্ত অংশের প্রতি নজর দেওয়া হয়নি। এইসব নিয়মকানুন লংঘিত হলেই তবেই দায়িত্ব আইন প্রযোজ্য হয়।

সংক্ষেপে শিথিল সম্পাদনা এই পরিশিষ্টটিরও বৈশিষ্ট্য।

Dixi et salvavi animam meam.*

মার্কস কর্তৃক ১৮৭৫ সালের মে-র গোড়ায় লিখিত
এঙ্গেলস কর্তৃক ১৮৯১-র *Neue Zeit* পত্রিকায় (কিছু কিছু বাদ দিয়ে) প্রথম প্রকাশিত

পাণ্ডুলিপি অনুযায়ী মুদ্রিত
জার্মান থেকে ইংরেজি অনুবাদের ভাষান্তর

* বলে ফেলে আত্মাকে বাঁচালাম। — সম্পাঃ

ফ্রেডারিক এঙ্গেলস

আ. বেবেলের কাছে লেখা চিঠি

লণ্ডন, মার্চ ১৮—২৮, ১৮৭৫

প্রিয় বেবেল,

আপনার ২৩শে ফেব্রুয়ারির চিঠি পেয়েছি এবং আপনার শরীর এতটা ভাল আছে জেনে খুশী হয়েছি।

ঐক্যের ব্যাপারটা সম্পর্কে আমরা কী ভাবছি আপনি জানতে চেয়েছেন। দুঃখের বিষয় আমাদের ভাগ্যও আপনারই মতো। লিবক্লেখত বা অন্য কেউই আমাদের কোনো সংবাদ পাঠায়নি, এবং আমরাও তাই সংবাদপত্রে যেটুকু বেরিয়েছে ততটুকু মাত্রই জানি, আর সে কাগজেও কিছুই ছিল না, শেষপর্যন্ত একসপ্তাহ পূর্বে খসড়া কর্মসূচিটির আবির্ভাব ঘটেছে। অবশ্যই খসড়াটি আমাদের কম বিস্মিত করেনি।

আমাদের পার্টি এত বার বার লাসালীয়দের কাছে মিটমাট বা অন্তত সহযোগিতার প্রস্তাব করেছে এবং হাসেনক্লেভার, হাসেলমান ও ত্যেলকেদের দ্বারা এত বার বার, এমন তাচ্ছিল্যের সঙ্গে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে যে, একজন শিশুও নিশ্চয় এই সিদ্ধান্ত করত: আজ যখন এই ভদ্রলোকেরা নিজেরাই এগিয়ে এসে মিটমাটের কথা তুলছেন তখন তাঁরা নিশ্চয়ই বেশ জবর রকম বেকায়দায় পড়েছেন। তাই এইসব লোকের সুবিদিত চরিত্রের কথা চিন্তা করে সর্ববিধসম্ভব গ্যারাণ্টি শর্তবদ্ধ করার জন্য আমাদের কর্তব্য তাঁদের এই বেকায়দাকে কাজে লাগানো যাতে আমাদের পার্টির ঘাড় ভেঙে তাঁরা শ্রমিকদের জনমতের কাছে নিজেদের ক্ষুণ্ণ মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে না পারেন। চরম ঔদাস্য ও অবিশ্বাসের সঙ্গে তাঁদের গ্রহণ করা উচিত ছিল এবং তাঁরা নিজেদের গোষ্ঠীবাদী আওয়াজগুলি ও 'সরকারী সাহায্যের' দাবি ছাড়তে, এবং মূলত ১৮৬৯ সালের আইজেনাখ কর্মসূচি বা তার বর্তমান কালোপযোগী সংশোধিত কোনো সংস্করণকে গ্রহণ করতে কতটা রাজি তারই ওপর ঐক্যসাধনকে নির্ভর করানো উচিত ছিল। তত্ত্বের ক্ষেত্রে এবং সেইহেতু কর্মসূচির সবচেয়ে নির্ধারক ব্যাপারে লাসালীয়দের কাছ থেকে আমাদের পার্টির **কিছুই শেখার নেই**, কিন্তু লাসালীয়দের পক্ষে আমাদের পার্টির কাছে নিশ্চয়ই শেখার মতো কিছু আছে। ঐক্যের প্রথম শর্ত হওয়া উচিত ছিল যে, তাদের গোষ্ঠীবাদী, লাসালীয় হয়ে থাকা চলবে না, অর্থাৎ সর্বোপরি তাদের

সর্বজনীন সর্বরোগহর দাওয়াই সরকারী সাহায্যের দাবিটিকে একেবারে বর্জন করতে না পারলেও অন্ততঃ একটি গৌণ উৎক্রমণমূলক ব্যবস্থা হিসাবে আরো অনেক সম্ভাব্য ব্যবস্থার মধ্যে ও সহযোগে অন্যতম একটি ব্যবস্থা বলেই স্বীকার করতে হবে। খসড়া কর্মসূচি থেকে প্রমাণ হয় যে, লাসালীয় নেতাদের তুলনায় আমাদের লোকেরা তত্ত্বের ক্ষেত্রে শতগুণে উত্তম কিন্তু রাজনৈতিক চাতুরিতে তাদের চেয়ে ঠিক সেই পরিমাণেই অধম; 'সৎ'রা এবারেও অসৎদের কাছে নির্মমভাবে ঘায়েল হল।

প্রথমত, লাসালের গালভরা, অথচ ইতিহাসের দিক থেকে ভুল এই কথাটা মেনে নেওয়া হয়েছে যে, শ্রমিক শ্রেণীর তুলনায় অন্য সমস্ত শ্রেণী একাকার প্রতিক্রিয়াশীল জনসমষ্টিমাত্র। সামান্য কয়েকটি ব্যতিক্রমের ক্ষেত্রে মাত্র কথাটা সত্য, যেমন, কমিউনের মতো প্রলেতারীয় কোনো বিপ্লবে, অথবা এমন দেশে যেখানে কেবল বুর্জোয়া শ্রেণী রাষ্ট্র ও সমাজকে নিজের ছায়ার মতো করে গড়ে তুলেছে তাই নয়, তার পেছু পেছু গণতন্ত্রী পেটি বুর্জোয়া শ্রেণীও তাকে পুনর্গঠিত করেছে তার চরম পরিণতি পর্যন্ত টেনে নিয়ে। উদাহরণস্বরূপ, জার্মানিতে গণতন্ত্রী পেটি বুর্জোয়ারা যদি এই প্রতিক্রিয়াশীল জনসমষ্টির অংশমাত্র হয়, তা হলে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টি বছরের পর বছর তার সঙ্গে, অর্থাৎ জনতা পার্টির সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে চলল কী করে? *Volksstaat* পত্রিকাই বা তার রাজনৈতিক বিষয়বস্তুর প্রায় সবটাই পেটি বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক *Frankfurter Zeitung** থেকে নিল কী করে? তাছাড়া এটাই বা কী করে হয় যে, বর্তমান কর্মসূচিতে অন্তত সাতটি এমন দাবি স্থান পেয়েছে যেগুলি জনতা পার্টি এবং পেটি বুর্জোয়া গণতন্ত্রীদের কর্মসূচির সঙ্গে সরাসরি ও আক্ষরিকভাবে মিলে যায়? আমি এখানে সাতটি রাজনৈতিক দাবির কথাই বলছি, ১ থেকে ৫ এবং ১ থেকে ২ নং** যার মধ্যে **বুর্জোয়া**-গণতান্ত্রিক নয় এমন একটি দাবিও নেই।

দ্বিতীয়ত, শ্রমিক আন্দোলন যে একটি আন্তর্জাতিক আন্দোলন এই নীতিকে কার্যতঃ সর্বদিক থেকে আজকের মতো অস্বীকার করা হয়েছে, এবং তা করেছে সেই

* Frankfurter Zeitung — *Frankfurter Zeitung und Handelsblatt* (ফ্রাঙ্কফুর্ত গেজেট ও বাণিজ্য পত্র) নামক পেটি বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ধারার একটি দৈনিক কাগজের সংক্ষিপ্ত নাম। মেইন-তীরের ফ্রাঙ্কফুর্ত থেকে প্রকাশিত হয় ১৮৫৬ সাল (উপরোক্ত নামে ১৮৬৬ সাল) থেকে ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত। — সম্পাঃ

** গোথা কর্মসূচির খসড়ার রাজনৈতিক দাবিগুলি ছিল এই রূপ:

'জার্মান শ্রমিক পার্টি রাষ্ট্রের মুক্ত ভিত্তি হিসাবে দাবি করে:

'১। রাষ্ট্রীয় বা গোষ্ঠীর সমস্ত নির্বাচনে. একুশ বা তদূর্ধ্ব বয়স্ক সমস্ত পুরুষের জন্য সর্বজনীন, সমান, প্রত্যক্ষ ও গোপন ভোটাধিকার। ২। প্রস্তাব পেশ ও বাতিল করার অধিকার সমেত জনগণের

লোকেরাই যারা পূর্ণ পাঁচ বছর ধরে অত্যন্ত কঠিন অবস্থার মধ্যেও অশেষ গৌরবের সঙ্গে সেই নীতি তুলে ধরেছিল। যুদ্ধের সময় জার্মান শ্রমিকদের সত্যিকারের আন্তর্জাতিক যে আচরণ ছিল, **প্রধানতঃ** তারই জন্য ইউরোপীয় আন্দোলনের শীর্ষে তাদের স্থান; অন্য কোনো প্রলেতারিয়েতের আচরণ এত ভাল হতে পারেনি। আর আজ সেই নীতিকে তাদের অস্বীকার করতে বলা হচ্ছে এমন এক সময় যখন বিভিন্ন সরকার যে কোনো সংগঠনে এই নীতির প্রকাশ চেষ্টাকে যে পরিমাণে দমন করার প্রয়াস পাচ্ছে, শ্রমিকেরাও বিদেশের সর্বত্র ঠিক সেই পরিমাণে এর ওপর জোর দিচ্ছে! তাহলে শ্রমিক আন্দোলনের আন্তর্জাতিকতাবাদের আর কী রইল? নিজেদের মুক্তির জন্য সংগ্রামে ইউরোপের শ্রমিকদের ভবিষ্য সহযোগিতা পর্যন্ত নয় — না, রইল শুধু ভবিষ্যতে 'জনগণের বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বের', শান্তি লীগের বুর্জোয়াদের 'ইউরোপীয় যুক্তরাষ্ট্রের' ক্ষীণ আশাটুকু মাত্র!

আন্তর্জাতিকের কথা সোজাসুজি উল্লেখ করার অবশ্য কোনই প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু কমপক্ষে অন্তত ১৮৬৯-এর কর্মসূচি থেকে পিছিয়ে না পড়া, এবং এই মর্মে কিছু বলা নিশ্চয়ই উচিত ছিল: **যদিও** জার্মান শ্রমিক পার্টি **সর্বোপরি** তার জন্য বেঁধে দেওয়া রাষ্ট্র সীমানার মধ্যেই কাজ করেছে (গোটা ইউরোপীয় প্রলেতারিয়েতের হয়ে কথা বলার কোন অধিকার তার নেই, বিশেষ করে মিথ্যা কিছু বলার অধিকার তো নেইই), তবু সমস্ত দেশের শ্রমিকদের সঙ্গে সংহতি সম্পর্কে সে সচেতন এবং এই সংহতি থেকে উদ্ভূত দায়িত্ব সে অদ্যাবধি যেভাবে পালন করে এসেছে অতঃপরও সেইভাবেই পালন করার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকবে। নিজেকে ঠিক আন্তর্জাতিকের অংশ বলে ঘোষণা বা গণ্য না করলেও এই ধরনের দায়িত্ব থেকে যায়; যেমন, ধর্মঘটে সাহায্য করা এবং ধর্মঘট ভাঙ্গার কাজ না করা; পার্টির মুখপত্রগুলি যাতে বিদেশের আন্দোলন সম্পর্কে জার্মান শ্রমিকদের অবহিত রাখে সে বিষয়ে নজর দেওয়া; মন্ত্রিসভাদের সৃষ্ট যুদ্ধের আশঙ্কা বা বিস্ফোরণের বিরুদ্ধে আন্দোলন; তেমন যুদ্ধের সময় ১৮৭০ ও ১৮৭১ সালের মতো আদর্শস্থানীয় আচরণের অনুরূপ আচরণ ইত্যাদি।

দ্বারা প্রত্যক্ষ আইনপ্রণয়ন। ৩। সর্বজনীন সামরিক শিক্ষা। স্থায়ী সেনাবাহিনীর পরিবর্তে জনবাহিনী। জনগণের প্রতিনিধিত্বমূলক পরিষদ দ্বারা যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্ন নির্ধারণ। ৪। সমস্ত বিশেষ আইনের, বিশেষতঃ মুদ্রণ, সমিতি গঠন ও সভা সম্পর্কে আইনের অবসান। ৫। জনতার আদালত। বিনা খরচায় বিচার।

'জার্মান শ্রমিক পার্টি রাষ্ট্রের মানসিক ও নৈতিক ভিত্তিরূপে দাবি করে:

'১। রাষ্ট্রের দ্বারা সর্বজনীন ও সমান প্রাথমিক শিক্ষা। সর্বজনীন ও বাধ্যতামূলক স্কুলগমন। বিনা বেতনে শিক্ষাদান। ২। বিজ্ঞানের স্বাধীনতা। বিবেকের স্বাধীনতা।' — সম্পাঃ

তৃতীয়ত, আমাদের লোকরা তাদের ওপর সেই লাসালীয় 'লৌহকঠোর মজুরি-বিধি' চাপিয়ে দিতে দিয়েছেন, যে বিধির ভিত্তি এই অতি অচল এক অর্থতাত্ত্বিক মতবাদ যথা, শ্রমিক গড়পড়তা পায় **সর্বনিম্ন** মজুরি, কেননা, ম্যালথাসের জনসংখ্যা সংক্রান্ত তত্ত্ব অনুযায়ী শ্রমিকদের সংখ্যা সব সময়েই অতিরিক্ত (লাসালের ছিল এই যুক্তি)। কিন্তু মার্কস 'পুঁজি'তে বিস্তারিতভাবে প্রমাণ করেছেন যে, মজুরি নিয়ন্ত্রণকারী বিধিগুলি খুবই জটিল, অবস্থা অনুযায়ী কোনো সময় তার মধ্যে একটি প্রধান হয়ে ওঠে, কোন সময় অপর একটি, সুতরাং এই বিধিগুলি কোন অর্থেই লৌহকঠোর নয়, উল্টে বরং নিতান্তই স্থিতিস্থাপক, এবং লাসাল যেভাবে কল্পনা করেছিলেন সেভাবে কয়েক কথায় ব্যাপারটা সেরে দেওয়া যায় না। ম্যালথাস ও রিকার্ডো (শেষের জনকে আবার বিকৃত করে) থেকে যে নিয়মটা লাসাল টুকে নিয়েছেন তার সমর্থনে ম্যালথাসবাদী যে যুক্তি পাওয়া যায়, উদাহরণস্বরূপ 'শ্রমিকদের পাঠমালা' ৫ম পৃষ্ঠায় লাসালের অন্য এক পুস্তিকা থেকে উদ্ধৃতি হিসাবে, তাকে মার্কস 'পুঁজি সঞ্চয়ের প্রক্রিয়া' সংক্রান্ত অংশে বিস্তৃতভাবে খণ্ডন করেছেন। তাই লাসালের 'লৌহকঠোর বিধিকে' গ্রহণ করে আমরা একটি ভুল প্রতিপাদ্য এবং তার ভ্রান্ত যুক্তির সমর্থনে জড়িয়ে পড়ছি।

চতুর্থত, লাসালের রাষ্ট্রীয় সাহায্যকে নিতান্ত নগ্নরূপে, ব্যুশের থেকে লাসাল যেভাবে চুরি করেছিলেন ঠিক সেইভাবেই, কর্মসূচি তার **একমাত্র সামাজিক** দাবি হিসাবে উপস্থিত করেছে। আর করেছে ব্রাকে এই দাবির* চূড়ান্ত নিরর্থকতা বেশ ভালভাবে প্রমাণ করার পর, এবং লাসালীয়দের সঙ্গে সংগ্রামে আমাদের পার্টির প্রায় সমস্ত বক্তাই, হয়ত সবাই এই 'রাষ্ট্রীয় সাহায্যের' প্রকাশ্য বিরোধিতা করতে বাধ্য হবার পর! আমাদের পার্টির পক্ষে নিজেকে এর চেয়ে আর হীন করা সম্ভব ছিল না। আন্তর্জাতিকতাবাদকে নামান হল আমাঁ গ্যোগের স্তরে, আর সমাজতন্ত্রকে সেই বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রী ব্যুশের স্তরে, যে ব্যুশে এই দাবি তুলেছিলেন **সমাজতন্ত্রীদের বিরুদ্ধে,** তাদের পরাস্ত করারই উদ্দেশ্যে!

অবশ্য, তত্ত্বগতভাবে **সমাধান হয়নি** এমন একটি সামাজিক **প্রশ্ন** যেন আজও আমাদের সামনে রয়েছে এমনি ভাব দেখিয়ে 'সামাজিক প্রশ্নের সমাধানের পথ সুগম করা' বলে যে লক্ষ্যের কথা অত্যন্ত পঙ্গুভাবে খসড়া কর্মসূচিতে বিবৃত করা হয়েছে, লাসালীয় অর্থে এই 'রাষ্ট্রীয় সাহায্য', খুব বেশি হলে সেই লক্ষ্য সাধনের উদ্দেশ্যে আরও অনেক ব্যবস্থার মধ্যে **একটি** মাত্র! সুতরাং কেউ যদি বলে: 'জার্মান শ্রমিক

* এঙ্গেলস এখানে ১৮৭৩-এ প্রকাশিত ভিলহেল্‌ম ব্রাকের 'লাসালের প্রস্তাব' পুস্তিকাখানির উল্লেখ করেছেন। — সম্পাঃ

পার্টি মজুরি-শ্রমের অবলুপ্তি এবং তারই সঙ্গে সঙ্গে শিল্পে ও কৃষিতে, এবং সারা জাতির ভিত্তিতে সমবায়ী উৎপাদন প্রতিষ্ঠার মারফৎ শ্রেণী-পার্থক্যের অবসান চায়; আর এই লক্ষ্য সাধনের জন্য উপযোগী প্রতিটি ব্যবস্থাকে সে সমর্থন করে' — সে ক্ষেত্রে কোন লাসালীয়েরও তার বিরুদ্ধে বলার কিছু থাকত না।

পঞ্চমত, শ্রমিক শ্রেণীকে বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন মারফৎ শ্রেণী হিসাবে সংগঠিত করা সম্পর্কে একটি কথাও নেই। এটা একটা অত্যন্ত মৌলিক বিষয়, কেননা এই হল শ্রমিক শ্রেণীর প্রকৃত শ্রেণী সংগঠন, এখানেই সে পুঁজির সঙ্গে তার প্রাত্যহিক সংগ্রাম চালায়, নিজেকে শিক্ষিত করে, এবং আজকের দিনে চরম প্রতিক্রিয়ার মধ্যেও (যেমন বর্তমান প্যারিসে) একে আর কোনো ক্রমেই চূর্ণ করা যায় না। জার্মানিতেও এই সংগঠন যে রকম গুরুত্ব লাভ করছে তার বিচার করে, আমাদের মতে বিষয়টি কর্মসূচিতে উল্লেখ করা এবং পার্টি সংগঠনেও তার জন্য যথাসম্ভব একটা স্থান উন্মুক্ত রাখা একান্তই প্রয়োজন।

আমাদের লোকেরা লাসালীয়দের সন্তুষ্ট করার জন্য এত কিছু করেছে। আর অপরপক্ষ কতটুকু ছাড়ল? কেবল এইটুকু যে, কর্মসূচিতে এমন একগাদা এলোমেলো **নির্ভেজাল গণতান্ত্রিক দাবি** শোভা পাবে যার মধ্যে অনেকগুলিই শুধু মাত্র ফ্যাশনের ব্যাপার, উদাহরণস্বরূপ, 'জনগণের দ্বারা আইনপ্রণয়ন' যে ব্যবস্থা সুইজারল্যান্ডে বিদ্যমান এবং যাতে আদৌ কিছু হলে ভালোর চেয়ে খারাপই হয় বেশী। 'জনগণের দ্বারা **প্রশাসন**' সেটা বরং কাজের হত। প্রত্যেকটি রাজপুরুষ তাদের প্রতিটি সরকারী কাজের জন্য প্রত্যেক নাগরিকের কাছে সাধারণ আদালতে এবং সাধারণ আইন অনুসারে দায়ী থাকবে, সমস্ত স্বাধীনতার এই প্রথম শর্তটিও একইভাবে অনুপস্থিত। বিজ্ঞানের স্বাধীনতা, বিবেকের স্বাধীনতার যে দাবি প্রত্যেকটি উদারপন্থী বুর্জোয়া কর্মসূচিতেই থাকে এবং এখানে কিছুটা তাজ্জব দেখাচ্ছে, সে বিষয়ে আমি আর কিছু বলব না।

স্বাধীন জনগণের রাষ্ট্র পরিণত হল মুক্ত রাষ্ট্রে। ব্যাকরণগত অর্থে মুক্ত রাষ্ট্র হচ্ছে সেই রাষ্ট্র যেখানে রাষ্ট্র তার নাগরিকদের সম্পর্কে মুক্ত, অর্থাৎ স্বৈরাচারী সরকার সমন্বিত রাষ্ট্র। রাষ্ট্র প্রসঙ্গে এই সমগ্র বাখানিটাই বাদ দেওয়া উচিত, বিশেষত কমিউনের পর থেকে; রাষ্ট্র কথাটার প্রকৃত অর্থে কমিউন আর রাষ্ট্রই ছিল না। নৈরাজ্যবাদীরা আমাদের মুখের ওপর 'জনতার রাষ্ট্র' ছুঁড়ে ছুঁড়ে বিরক্ত করে তুলছে, যদিও আগেই প্রুধোঁর বিরুদ্ধে মার্কসের লেখা* পুস্তকটি এবং পরে 'কমিউনিস্ট ইশতেহার' সরাসরি ঘোষণা করেছে যে, সমাজতন্ত্রী সমাজ ব্যবস্থা প্রবর্তনের সঙ্গে রাষ্ট্র আপনা থেকেই মিলিয়ে যাচ্ছে (sich auflöst) এবং অন্তর্হিত হচ্ছে। সুতরাং,

* এখানে 'দর্শনের দারিদ্র্য'এর কথা বলা হয়েছে। — সম্পাঃ

রাষ্ট্র যখন এমন একটি উৎক্রমণকালীন সংস্থামাত্র যা বিপ্লবের সময়, সংগ্রামে ব্যবহৃত হয় বিরোধীপক্ষকে সবলে দমন করে রাখার জন্য তখন মুক্ত জনগণের রাষ্ট্রের কথা বলা নির্জলা প্রলাপ মাত্র: প্রলেতারিয়েত যতক্ষণ রাষ্ট্রকে **ব্যবহার করছে,** ততক্ষণ সে এটা ব্যবহার করছে স্বাধীনতার স্বার্থে নয় তার প্রতিপক্ষকে দমন করে রাখার জন্যই, আর স্বাধীনতার কথা বলা যখনই সম্ভব হচ্ছে, তখনই রাষ্ট্র হিসাবে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব আর থাকবে না। তাই আমাদের প্রস্তাব, **'রাষ্ট্রের'** বদলে সর্বত্র 'সমাজ' (Gemeinwesen) কথাটি ব্যবহার করা হোক, পুরানো এই সুন্দর জার্মান শব্দটি দিয়ে ফরাসী 'কমিউন' কথাটি বেশ ভালভাবেই বোঝান যায়।

'সর্বপ্রকার শ্রেণী-পার্থক্যের অবসানের' জায়গায় 'সমস্ত সামাজিক ও রাজনৈতিক অসাম্যের অবসান' কথাটিও খুবই সন্দেহজনক। এক দেশ এবং অপর দেশের মধ্যে, এক প্রদেশ এবং অন্য প্রদেশের মধ্যে, এবং এমনকি এক অঞ্চল এবং আর এক অঞ্চলের মধ্যেও জীবনযাত্রার পরিস্থিতিতে **কিছুটা** অসাম্য সবসময়ই থাকবে, সেটা ন্যূনতম মাত্রায় নামিয়ে আনা সম্ভব হলেও কখনই একেবারে দূর করা সম্ভব হবে না। আল্পস অঞ্চলের অধিবাসীদের জীবনযাত্রার পরিস্থিতি সমতলবাসীদের থেকে সবসময়ই আলাদা হবে। সমাজতন্ত্রী সমাজ সমতার রাজ্য এ হচ্ছে সেই প্রাচীন 'মুক্তি, সাম্য, ভ্রাতৃত্বের' ওপর প্রতিষ্ঠিত এক একপেশে ফরাসী ধারণা। তার স্বযুগে ও স্বক্ষেত্রে **বিকাশের এক পর্যায়** হিসাবে সে ধারণা যুক্তিসঙ্গতই ছিল, কিন্তু পূর্বগামী সমস্ত সমাজতন্ত্রী সম্প্রদায়ের একদেশদর্শী ধারণাগুলির মতো এটিকেও এবার অতিক্রম করা দরকার, কেননা এতে লোকের মাথায় কেবল বিভ্রান্তিই সৃষ্টি হয়, অথচ বিষয়টিকে আরও সুনির্দিষ্টভাবে উপস্থিত করার উপায় এখন পাওয়া গেছে।

আমি এখানেই শেষ করছি, যদিও বর্তমান কর্মসূচির প্রায় প্রত্যেকটি শব্দ সমালোচনা করার যোগ্য, তার উপর এর ভাষাটাও হয়েছে ঢিলেঢালা আর নীরস। এই কর্মসূচির চরিত্র এমনই যে এটি গৃহীত হলে তার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত **নতুন** পার্টির প্রতি মার্কস বা আমি **কখনও** আনুগত্য স্বীকার করতে পারব না এবং (এমনকি প্রকাশ্যেও) এর প্রতি কী মনোভাব গ্রহণ করব সেকথা আমাদের খুব গুরুত্ব দিয়েই বিচার করতে হবে। আপনার মনে রাখা দরকার যে, জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির প্রতিটি উক্তি ও কাজের জন্য বিদেশে আমাদেরই দায়ী করা হয়। যেমন করেছেন বাকুনিন তাঁর 'রাষ্ট্রপাট ও নৈরাজ্য' পুস্তকে, সেখানে *Demokratisches Wochenblatt** প্রথম প্রকাশের পর থেকে লিবক্লেখতের বলা বা লেখা প্রতিটি

* *Demokratisches Wochenblatt* (গণতান্ত্রিক সাপ্তাহিকী) ১৮৬৮ – ১৮৬৯ সালে লিবক্লেখতের সম্পাদনায় লাইপজিগ শহর থেকে প্রকাশিত হত। — সম্পাঃ

বেহিসাবী কথার জন্য আমাদের কৈফিয়ৎ দিতে হয়েছে। আমরা এখান থেকে সমস্ত ব্যাপারটা চালাচ্ছি — এই কথা ভাবতেই লোকের ভাল লাগে, অথচ আমার মতোই ভালভাবে আপনিও জানেন যে, আমরা প্রায় কোন ক্ষেত্রেই পার্টির আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিনি, করে থাকলেও করেছি যখন আমাদের মতে কোন ভুল, এবং **কেবল তত্ত্বগত** ভুল করা হয়েছে তখন সম্ভবমত তার সংশোধনের জন্যই। কিন্তু আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন যে, এই কর্মসূচি হল একটা মোড় পরিবর্তন, যে পার্টি এমন কর্মসূচি মেনে নেয় তার প্রতি কোনও রকম দায়িত্ব এর ফলে অস্বীকার করতে আমরা সহজেই বাধ্য হতে পারি।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, কোন পার্টির আনুষ্ঠানিক কর্মসূচি সে আসলে কী করে তার চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ। তাহলেও, **নতুন** একটা কর্মসূচি হচ্ছে সর্বসমক্ষে উত্তোলিত পতাকা এবং বাইরের পৃথিবী এই দিয়েই সেই পার্টিকে বিচার করবে। তাই তার মধ্যে কিছুতেই কোন পশ্চাৎ পদক্ষেপ থাকা উচিত নয়, আইজেনাখ কর্মসূচির তুলনায় এখানে যেমন হয়েছে। অন্যান্য দেশের শ্রমিকেরা এই কর্মসূচিকে কী বলবে, সমগ্র জার্মান সমাজতন্ত্রী প্রলেতারিয়েতের পক্ষে লাসালবাদের কাছে এইভাবে নতজানু হবার ফলে কী ধারণার সৃষ্টি হবে, এসব কথাও ভেবে দেখা দরকার।

সেই সঙ্গে আমি এবিষয়েও নিশ্চিত যে, **এই** ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত ঐক্য এক বছরও টিকবে না। আমাদের পার্টির শ্রেষ্ঠ লোকেদের কি এখন থেকে লৌহকঠোর মজুরি-বিধি আর রাষ্ট্রীয় সাহায্য সম্পর্কে মুখস্থ করা লাসালীয় বয়েৎ তাদের বক্তৃতায় পুনরাবৃত্তি করে যেতে হবে? ধরুন, আপনি এই কাজে লেগেছেন, এটা দেখার মতন ব্যাপার বটে! আর তাঁরা এ কাজ সত্যিই সুরু করলে, তাঁদের শ্রোতারাই শিস দিয়ে তাঁদের বসিয়ে দেবে। অথচ এ বিষয়ে আমার মনে কোন সন্দেহ নেই যে, সেই সুদখোর শাইলক* তার এক পাউন্ড মাংসের জন্য যেমন জিদ ধরেছিল এই লাসালীয়রাও তেমনি কর্মসূচির ঠিক **এইসব** ধারার জন্যই জেদ করছে। বিচ্ছেদ ঘটবে; কিন্তু ইতিমধ্যে হাসেলমান, হাসেনক্লেভার, ত্যেলকে কোম্পানিকে আমরা আবার 'সৎ' লোকে পরিণত করে দেব। বিচ্ছেদের মধ্য থেকে আমরা আরও দুর্বল হয়ে বেরিয়ে আসব আর লাসালীয়রা বেরিয়ে আসবে আরও সবল; আমাদের পার্টি তার রাজনৈতিক সতীত্ব হারাবে এবং নিজেই সাময়িকভাবে তার নিজের পতাকায় যে-সব লাসালীয় বুলি এঁকে নিল তার বিরুদ্ধে আর কখনও মনেপ্রাণে দাঁড়াতে পারবে না এবং তারপর

* শাইলক — উইলিয়ম শেক্সপিয়রের 'ভেনিসীয় বণিক' নামক নাটকের একটি চরিত্র, লোভী নিষ্ঠুর কুসিদজীবী, ঋণ শোধে অসমর্থ তার অধমর্ণের শরীর থেকে শর্ত অনুযায়ী এক পাউন্ড মাংস কেটে নেবার জন্য নাছোরবান্দার মতো জিদ ধরে। — সম্পাঃ

লাসালীয়রা যদি আবার বলে ওঠে যে, তারাই সবচেয়ে সাচ্চা, একমাত্র শ্রমিক পার্টি, আর আমাদের লোকেরা হল বুর্জোয়া, তাহলে এই কর্মসূচিই থাকবে তার প্রমাণ। এর মধ্যে সবকটি সমাজতন্ত্রী প্রস্তাবই হল **তাদের,** আর **আমাদের** পার্টি যা কিছু ঢুকিয়েছে তা হল পেটি বুর্জোয়া গণতন্ত্রীদের কয়েকটি দাবি মাত্র, অথচ সেই কর্মসূচিতেই আবার **আমাদের পার্টিই** সেই পেটি বুর্জোয়াদের 'প্রতিক্রিয়াশীল জনসমষ্টির' অংশ বলে বর্ণনা করেছে।

বর্তমান চিঠিটি আমি এখানেই রেখে দিয়েছিলাম, কেননা আর যাই হোক, বিসমার্কের জন্মদিনের সম্মানে আপনি ছাড়া পাচ্ছেন পয়লা এপ্রিল এবং চিঠিখানি গোপনে পাঠাবার চেষ্টা করতে গিয়ে আটক পড়বে এ ঝুঁকি আমি নিতে চাইনি। এখন আবার ব্রাকের কাছ থেকে একখানা চিঠি সবে এসেছে, তাঁরও এই কর্মসূচি সম্পর্কে গভীর সন্দেহ আছে এবং আমাদের মতামত তিনি জানতে চেয়েছেন। তাই আমি এই চিঠিটি প্রথমেই তাঁর কাছে পাঠাচ্ছি, যাতে তিনি এটি পড়তে পারেন আর আমায় আর একবার কেঁচে গণ্ডূষ করতে না হয়। তাছাড়া, রামের* কাছেও আমি নির্ভেজাল সত্যটা বলেছি, লিবক্লেখতের কাছে লিখেছি কেবল সংক্ষেপে। তাঁর অপরাধ আমি ক্ষমা করব না, কারণ সময় একেবারে পার হয়ে যাবার আগে পর্যন্ত সমস্ত বিষয়টি সম্পর্কে **একটি কথাও** তিনি আমাদের জানাননি (অথচ রাম এবং অন্যান্যদের ধারণা ছিল যে, তিনি আমাদের যথাযথ সংবাদ দিয়েছেন)। অবশ্য এ ধরনের কাজ তিনি বরাবর করে এসেছেন, সেইজন্যই আমাদের দু-জনের, মার্কস ও আমার, তাঁর সঙ্গে বহু পরিমাণ বিরক্তিকর চিঠিপত্র চালাতে হয়েছে। এবার কিন্তু ব্যাপারটা অত্যন্তই খারাপ হয়ে উঠেছে এবং **নিশ্চিতই সহযোগিতা করতে আমরা যাচ্ছি না।**

গ্রীষ্মে যাতে এখানে আসতে পারেন তার ব্যবস্থা করুন। বলা বাহুল্য, আপনি আমার বাড়িতেই থাকবেন, এবং আবহাওয়া ভাল থাকলে আমরা দিন কয়েকের জন্য সমুদ্রতীরে যেতে পারি, তাতে দীর্ঘ কারাভোগের পর আপনি খুবই উপকার পাবেন।

আপনার বন্ধু,

ফ্রে. এ.

* হেরমান রাম *Volksstaat* সংবাদপত্রটির অন্যতম সম্পাদক। — সম্পাঃ

ফ্রেডারিক এঙ্গেলস

কার্ল কাউৎস্কির কাছে লেখা চিঠি

লণ্ডন, ২৩শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৯১

প্রিয় কাউৎস্কি,

গত পরশু তাড়াতাড়ি যে অভিনন্দন পাঠিয়েছি তা নিশ্চয়ই পেয়েছ। এবার তাহলে আমাদের প্রসঙ্গে, মার্কসের চিঠিতে* ফিরে আসা যাক।

চিঠিটি আমাদের বিরোধীদের হাতে হাতিয়ার জোগাবে এ আশংকা অমূলক ছিল। অবশ্য, যে কোনো ব্যাপারেই বিদ্বেষ-প্রণোদিত ইঙ্গিত করা হয়ে থাকে, কিন্তু মোটের ওপর এই নির্মম সমালোচনায় আমাদের প্রতিপক্ষদের ওপর সম্পূর্ণ হতভম্বকর এক প্রতিক্রিয়া হয়েছে ও সৃষ্টি হয়েছে এই মনোভাব: এরকম ব্যাপার যেখানে সম্ভব, সে পার্টির কী প্রচণ্ড আভ্যন্তরীণ শক্তিই না বর্তমান! তুমি যেসব বিরোধী পত্রিকা পাঠিয়েছ (তার জন্য অনেক ধন্যবাদ!) এবং তাছাড়া আমি নিজে অন্যসূত্রে যেগুলি পেয়েছি সবগুলি থেকেই এ কথা বোঝা যায়। এবং অকপটে বলি, দলিলটি প্রকাশ করার সময় আমারও অভিপ্রায় ঠিক তাই ছিল। আমি জানতাম যে, গোড়ায় এখানে সেখানে কোন কোন ব্যক্তির কাছে ব্যাপারটা অপ্রীতিকর হবে, কিন্তু সেটা এড়াবার কোন পথ ছিল না এবং আমার মতে দলিলটির বক্তব্যের গুরুত্ব তার চেয়ে অনেক বেশি। আমি এ কথাও জানতাম যে, একে সহ্য করার মতো ক্ষমতা পার্টির যথেষ্ট আছে আর আমি এও ধরে নিয়েছিলাম যে, পনের বছর আগে ব্যবহৃত এই খোলাখুলি ভাষাও সে হজম করতে পারবে; এই শক্তি-পরীক্ষার প্রতি আঙুল দেখিয়ে ন্যায্য গর্বের সঙ্গে বলা যাবে: এমন সাহস দেখাতে পারে এমন পার্টি আর কোথায়? এ কাজ আপাতত সাক্সনি ও ভিয়েনার ***Arbeiter Zeitung*** এবং ***Züricher Post*** পত্রিকার ওপর** রইল।

* এখানে কার্ল কাউৎস্কি কর্তৃক সম্পাদিত জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির তত্ত্বগত মুখপত্র *Neue Zeit* (নবযুগ) পত্রিকায় এঙ্গেলসের জেদের ফলে প্রকাশিত 'গোথা কর্মসূচির সমালোচনার' কথা উল্লেখ করা হচ্ছে। — সম্পাঃ

** পত্রিকাগুলির মধ্যে প্রথম দুখানি ছিল সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক ও তৃতীয়টি বুর্জোয়া। — সম্পাঃ

২১ নং *Neue Zeit* পত্রিকায় তুমি এই চিঠিখানি প্রকাশ করার দায়িত্ব নিজের ওপর নিয়ে বিশেষ সৌজন্যের পরিচয় দিয়েছ, কিন্তু এ কথাও ভুলে যাবে না যে, যাই হোক আমিই প্রথম ধাক্কাটা দিয়েছি, এবং তদুপরি কিছুটা পরিমাণে আমি তোমাকে এমন অবস্থায় ফেলেছিলাম যে তোমার গত্যন্তর ছিল না। তাই এ ব্যাপারে প্রধান দায়িত্ব আমার নিজের বলে আমি দাবি করছি। আর খুঁটিনাটি ব্যাপারে বিভিন্ন মত তো অবশ্যই সর্বদাই থাকতে পারে। দিৎস ও তুমি যাতে আপত্তি কর তার সবই আমি বাদ দিয়েছি ও বদল করেছি, এবং দিৎস যদি আরও অংশ চিহ্নিত করে দিত, তাহলে আমি যথাসম্ভব গ্রহনেচ্ছু থাকতাম, তার প্রমাণ তোমাদেরকে বরাবরই আমি দিয়ে এসেছি। কিন্তু আসল কথা হল কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা যখন উঠেছে তখন দলিলটা প্রকাশ করাই ছিল **আমার কর্তব্য**। আর বিশেষ করে বর্তমান সময়ে, হালে অধিবেশনে লিবক্লেখত তাঁর যে রিপোর্টে এর কিছুকিছু অংশ বেমালুম নিজের সম্পত্তি বলে চালিয়েছেন এবং কিছু কিছু অংশকে মূলের উল্লেখ না করে আক্রমণের লক্ষ্য হিসাবে খাড়া করেছেন, তার পর মার্কস নিশ্চয়ই মূল লেখাটিকে দিয়ে এই বিকৃতির মোকাবিলা করাতেন এবং তাঁর জায়গায় আমারও তাই করা ছিল কর্তব্য। দুর্ভাগ্যবশত, ঠিক সেই সময়ে দলিলটি আমার হাতে আসেনি। অনেক খোঁজার পর সেটি আমি উদ্ধার করেছি।

তুমি জানিয়েছ যে, বেবেল তোমার কাছে লিখেছেন যে, মার্কস যেভাবে লাসালের মূল্যায়ণ করেছেন তাতে পুরান লাসালীয়দের মধ্যে বিরক্তির সৃষ্টি হয়েছে। তা হয়ে থাকতে পারে। কী জান, এসব লোকে প্রকৃত কাহিনীটা জানে না, এবং তাদের সে সম্পর্কে অবহিত করলে মন্দ হয় না। এইসব লোক যদি একথা না জানে যে, লাসালের সমস্ত নামডাকের ভিত্তি হল এই যে, বছরের পর বছর মার্কস তাঁর নিজের গবেষণার ফলগুলিকে লাসালকে তাঁর নিজস্ব বলে জাহির করতে দিয়েছিলেন, এবং শুধু তাই নয়, অর্থতত্ত্বে ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষার দরুন বিকৃত করতে পর্যন্ত দিয়েছিলেন, তাহলে সে দোষ আমার নয়। কিন্তু মার্কসের মৃত্যুর পর আমি তাঁর সাহিত্যিক ব্যবস্থাপক এবং সে হিসাবে আমার কিছুটা কর্তব্য আছে।

লাসাল আজ ছাব্বিশ বছর হল ইতিহাসের অংশ হয়ে গেছেন। সমাজতন্ত্রী বিরোধী আইনের আমলে তাঁর সম্পর্কে ঐতিহাসিক সমালোচনা স্থগিত রাখা হয়েছিল, কিন্তু অবশেষে আজ সেই সমালোচনাকে ভাষা দেবার এবং মার্কসের আপেক্ষিকে লাসালের অবস্থানটাকে পরিষ্কার করে ধরার সময় এসেছে। যে উপাখ্যান লাসালের প্রকৃত চেহারাকে ঢেকে রেখেছে ও মহিমান্বিত করে তুলেছে তা নিশ্চয়ই পার্টির বিশ্বাসবাণীতে পরিণত হতে পারে না। আন্দোলনে লাসালের অবদানকে যতই উচ্চমূল্য দেওয়া হোক না কেন, সেখানে তাঁর ঐতিহাসিক ভূমিকা দ্ব্যর্থকই থেকে গেছে। সমাজতন্ত্রী-লাসালের

পেছ্‌ পেছ্‌ পায়ে পা মিলিয়ে চলেছিলেন ভণ্ডবাগাড়ম্বরী লাসাল। সর্বক্ষেত্রেই প্রচারক ও সংগঠক লাসালের মধ্য দিয়ে উঁকি মারে হাৎসফেল্‌দ মামলার* আইনজীবী লাসাল— উপায় নির্বাচনে সেই একই চক্ষ্ম্‌লজ্জাহীনতা, কার্যসিদ্ধির হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে যাদের ছ্‌ঁড়ে ফেলা যায় এমন সব সন্দেহজনক ও অসাধ্‌ লোকদের দ্বারা নিজেকে পরিবৃত রাখার সেই একই প্রবণতা। ১৮৬২ সাল পর্যন্ত কার্যক্ষেত্রে তিনি ছিলেন নিতান্তই একজন প্রুশীয় ইতর গণতন্ত্রী, সঙ্গে ছিল জোর বোনাপার্টপন্থী ঝোঁক (মার্কসের কাছে তাঁর লেখা চিঠিগ্‌লি সবে পড়ে দেখলাম); সম্প্‌র্ণ ব্যক্তিগত কারণে তিনি হঠাৎ ঘ্‌রে গেলেন এবং তাঁর আন্দোলন শ্‌র্‌ করলেন। এবং দ্‌-বছর না যেতেই দাবি তুললেন যে, ব্‌র্জোয়াদের বির্‌দ্ধে রাজতন্ত্রের পক্ষ সমর্থন করতে হবে শ্রমিকদের, আর চরিত্রের দিক থেকে তাঁরই অন্‌র্‌প বিসমার্কের সঙ্গে এমনভাবে ঘোঁট পাকাতে লাগলেন যে, নিজের সৌভাগ্যক্রমে তিনি ঠিক সময় গ্‌লিতে নিহত না হলে তাঁর কাজের বাস্তব ফল নিশ্চয়ই শেষ পর্যন্ত আন্দোলনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতায় পরিণতি লাভ করত। তাঁর প্রচারম্‌লক লেখাগ্‌লিতে মার্কস থেকে ধার নেওয়া সঠিক জিনিসগ্‌লি তাঁর নিজস্ব লাসালীয়, অনিবার্যভাবেই ভুল ব্যাখ্যার সঙ্গে এমনভাবে জড়িয়ে গেছে যে দ্‌টিকে আলাদা করা প্রায় অসম্ভব। মার্কসের সমালোচনার দর্‌ন শ্রমিকদের যে অংশটি নিজেদের আহত বলে মনে করছে তারা লাসালকে কেবল তাঁর দ্‌-বছরের আন্দোলনের মধ্য দিয়েই জানেন এবং তাও শ্‌ধ্‌ রঙ্গীন চশমার মধ্য দিয়ে দেখে। কিন্তু ঐতিহাসিক বিচার অনন্তকাল এমন কুসংস্কারের কাছে টুপি খ্‌লে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। মার্কস ও লাসালের মধ্যে হিসাব-নিকাশ চিরদিনের মতো চুকিয়ে দেওয়া আমার কর্তব্য ছিল, সে কাজ সম্পন্ন হল। আপাতত এতেই আমি সন্তুষ্ট থাকতে পারি। তাছাড়া, বর্তমানে আমার অনেক অন্য কাজ আছে। লাসাল সম্পর্কে মার্কসের প্রকাশিত কঠোর রায়ের ফল নিজে থেকেই ফলবে এবং তাতে অপরেও সাহস পাবে। কিন্তু ঘটনাক্রমে আমায় যদি বাধ্য করা হয়, তাহলে আমার আর অন্য কোন পথ থাকবে না: আমায় তখন চিরকালের মতো লাসাল উপাখ্যানকে সাঙ্গ করে দিতে হবে।

Neue Zeit পত্রিকার উপর সেন্সর চাপানো হোক বলে রাইখস্টাগ গ্র্‌পে যে কথা উঠেছে সেটা সত্যিই চমৎকার ব্যাপার। জিনিসটা কী — সমাজতন্ত্রী বিরোধী আইনের আমলে রাইখস্টাগ গ্র্‌পের** একনায়কত্বের প্রেতাত্মা (যে একনায়কত্বের অবশ্য দরকার ছিল আর খ্‌ব ভালভাবেই যা চালিত হয়েছে), না কি এর কারণ হল ফন শ্‌ভাইৎসারের

* ১৮৪৫—১৮৫৪ সালে লাসাল আইনজীবী হিসাবে যে কাউণ্টেস হাৎ বিবাহবিচ্ছেদ মামলাটি চালান, তার কথা বলা হচ্ছে। — সম্পাঃ

** জার্মান রাইখস্টাগের সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক গ্র্‌পের কথা বলা হচ্ছে। — সম্পাঃ

পূর্বতন কঠোর শিক্ষাপ্রাপ্ত সংগঠনের স্মৃতি? বিসমার্কের সমাজতন্ত্রী বিরোধী আইন* থেকে মুক্তির পর, জার্মান সমাজতন্ত্রী বিজ্ঞানকে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির কর্তাদের নিজেদের তৈরি ও চালিত নতুন এক সমাজতন্ত্রী বিরোধী আইনের অধীন করার ধারণাটি সত্যিই চমৎকার। কিন্তু তবে, নির্বন্ধ এই যে, গাছ কখনো আকাশ ছোঁবে না।**

Vorwärts পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ আমায় বিশেষ বিচলিত করেনি।*** কী ঘটেছে সে সম্পর্কে লিবক্নেখতের বিবরণের জন্য আমি অপেক্ষা করব এবং তারপর যতদূর সম্ভব বন্ধুর সুরে উভয়েরই জবাব দেব। *Vorwärts* পত্রিকার প্রবন্ধের কয়েকটি মাত্র ভুল সংশোধন করা দরকার হবে (যেমন, আমরা নাকি ঐক্য চাইনি; ঘটনার দ্বারা নাকি মার্কসের ভুল প্রমাণিত হয়েছে, ইত্যাদি), আর দরকার কয়েকটি সুস্পষ্ট জিনিসের সমর্থন করা। এই জবাব দিয়েই আমি, আমার দিক থেকে, বর্তমান আলোচনা শেষ করতে চাই, অবশ্য যদি নতুন কোন আক্রমণ বা মিথ্যা উক্তি আমাকে তর্ক চালাতে বাধ্য না করে।

দিৎসকে বলবে যে আমি 'উৎপত্তি'**** সম্পর্কে কাজে লিপ্ত আছি। কিন্তু আজই ফিশারের চিঠি পেয়েছি, তিনিও তিনটি নূতন মুখবন্ধ চান!

ভবদীয়

ফ্রে. এ.

* সমাজতন্ত্রী বিরোধী জরুরী আইন জার্মানিতে পাশ হয় ১৮৭৮ সালে। এ আইনে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির সমস্ত সংগঠন ও গণ শ্রমিক সংগঠন নিষিদ্ধ, শ্রমিক সংবাদপত্র বন্ধ ও সমাজতান্ত্রিক সাহিত্য নিষিদ্ধ হয় এবং সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের নির্বাসিত করা হতে থাকে। গণ শ্রমিক আন্দোলনের চাপে সমাজতন্ত্রী বিরোধী আইন তুলে নেওয়া হয় ১৮৯০ সালে। — সম্পাঃ

** একটি জার্মান প্রবাদ যার অর্থ 'যাই হোক, সব জিনিসেরই একটা সীমা আছে'। — সম্পাঃ

*** জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির কেন্দ্রীয় মুখপত্র *Vorwärts* (আগে চল) ১৩ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৯১-র সংখ্যায় সম্পাদকীয় প্রবন্ধে মার্কসের 'গোথা কর্মসূচির সমালোচনা' সম্পর্কে সরকারিভাবে পার্টি কার্যকরী সমিতির মত প্রকাশ করে। এই প্রবন্ধে লাসাল সম্পর্কে মার্কসের মূল্যনিরূপণের তীব্র নিন্দা করা হয়েছিল, এবং মার্কসের সমালোচনা সত্ত্বেও পার্টি গোথার খসড়া কর্মসূচি গ্রহণ করেছে বলে প্রশংসা করা হয়। — সম্পাঃ

**** এঙ্গেলসের 'পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি' বইখানির নতুন সংস্করণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। — সম্পাঃ

ফ্রেডারিক এঙ্গেলস

রাশিয়ায় সামাজিক সম্পর্ক প্রসঙ্গে*

রাশিয়ার ব্যাপারে আমার 'সামান্য জ্ঞান'টুকুও নেই, আছে শুধু 'অজ্ঞতা', সুতরাং প্রকৃত অবস্থাটা জার্মান শ্রমিকদের কাছে বর্ণনা করা এবং বিশেষ করে কী কারণে ঠিক বর্তমান সময়টিতেই অতি সহজে, পশ্চিম ইউরোপের চেয়ে অনেক বেশী সহজে, রাশিয়ায় সামাজিক বিপ্লব সাধন করা যায় তা ব্যাখ্যা করার দায়িত্ব তিনি যে বোধ করেছেন, এই কথা জার্মান শ্রমিকদের কাছে প্রসঙ্গত বলেছেন মিঃ ত্‌কাচভ।

'আমাদের শহুরে প্রলেতারিয়েত নেই, একথা নিঃসন্দেহে সত্যি; কিন্তু সেই সঙ্গেই আমাদের বুর্জোয়াও নেই... আমাদের শ্রমিকদের লড়াই করতে হবে শুধু **রাজনৈতিক ক্ষমতার বিরুদ্ধে — পুঁজির ক্ষমতা** আমাদের দেশে এখনো ভ্রূণাবস্থায়। আর দ্বিতীয় বস্তুটির সঙ্গে লড়াই করার চেয়ে যে প্রথম বস্তুটির সঙ্গে লড়াই করা অনেক সহজ সে বিষয়ে আপনি মশাই নিঃসন্দেহে অবহিত।'

আধুনিক সমাজতন্ত্র যে বিপ্লব সাধনের প্রচেষ্টা চালায় সংক্ষেপে তা হল বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে প্রলেতারিয়েতের বিজয় এবং সকল শ্রেণী-বৈষম্য ধ্বংস করার ভিতর দিয়ে একটি নতুন সমাজ সংগঠনের প্রতিষ্ঠা। এই বিপ্লব যে চালাবে সেই প্রলেতারিয়েতেরই যে শুধু এর জন্যে প্রয়োজন তা নয়, এর জন্যে আরো প্রয়োজন এক বুর্জোয়া শ্রেণীর যার হাতে সমাজের উৎপাদন-শক্তিগুলি এতটা বিকশিত হয়েছে যে শ্রেণী-ভেদগুলির চূড়ান্ত ধ্বংস সাধন সম্ভব। বন্য এবং আধা-বন্যদের মধ্যেও তো প্রায় শ্রেণী-ভেদ থাকে না এবং প্রত্যেক জাতিই এইরকম একটি অবস্থা পার হয়েছে। এই অবস্থার পুনঃপ্রতিষ্ঠার কথা আমরা কল্পনাও করব না এই সরল কারণে যে, সমাজের উৎপাদন-শক্তিগুলির বিকাশের সঙ্গে আবশ্যিকভাবেই সে সমাজ থেকে শ্রেণী-ভেদগুলির উদ্ভব হয়। সমাজের উৎপাদন-শক্তিগুলির বিকাশের একটি নির্দিষ্ট স্তরেই, আমাদের আধুনিক অবস্থার

* বর্তমান প্রবন্ধটি হল পিওত্‌র ত্‌কাচভের লেখা 'মিঃ ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের কাছে খোলা চিঠি' (জুরিখ, ১৮৭৪) পুস্তিকাটির জবাব। — সম্পাঃ

পক্ষে অতি উন্নত একটা স্তরেই, উৎপাদনকে এমন পরিমাণে বাড়ানো সম্ভব যার ফলে শ্রেণী-ভেদের বিলোপ জিনিসটা হতে পারে একটা সত্যকার প্রগতি, সামাজিক উৎপাদন-পদ্ধতিতে অচলতা বা এমনকি অবনতি না ঘটিয়ে স্থায়ী হতে পারে। কেবলমাত্র বুর্জোয়াদের হাতেই উৎপাদন-শক্তিগুলি এসে পৌঁছেছে বিকাশের এই স্তরে। কাজে কাজেই এদিকেও ঠিক প্রলেতারিয়েতের মতোই বুর্জোয়া শ্রেণী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের এক আবশ্যিক পূর্বশর্ত। অতএব যিনি বলবেন যে, যে দেশে **যদিবা** প্রলেতারিয়েত নেই, **সেই সঙ্গে** বুর্জোয়াও তো নেই, সে দেশে এই বিপ্লব সাধিত হবে আরো সহজে, তিনি কেবল প্রমাণ করবেন যে, সমাজতন্ত্রের 'অ-আ-ক-খ' এখনো শিখতে হবে তাঁকে।

মিঃ ত্কাচভের নিজের কথায় রুশ শ্রমিকেরা 'জমির চাষী এবং সেই কারণে প্রলেতারীয় নয়, তারা **মালিক**' — এই রুশ শ্রমিকদের পক্ষে তাই কাজটি সহজতর হবে, কারণ পুঁজির ক্ষমতার বিরুদ্ধে তাদের লড়তে হবে না, তাদের লড়তে হবে শুধু 'রাজনৈতিক ক্ষমতার বিরুদ্ধে', রুশ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে। এবং এই রাষ্ট্রকে 'শুধু দূর থেকেই শক্তি বলে বোধ হয়... জনসাধারণের অর্থনৈতিক জীবনে এর কোনো শিকড় নেই, কোনো নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব এ করে না... আপনাদের দেশে রাষ্ট্র কোনো কাল্পনিক শক্তি নয়। পুঁজির উপর পাকা হয়ে সে দাঁড়িয়ে আছে; নিজের মধ্যেই (!) সে মূর্ত করে কতকগুলি নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক স্বার্থ... আমাদের দেশে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বিপরীত; আমাদের সামাজিক রূপ জন্ম নিয়েছে রাষ্ট্র থেকে, এ রাষ্ট্র আবার যেন ঝুলছে হাওয়ায়, অর্থাৎ বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার সঙ্গে এর কোনো মিল নেই, এর মূল বর্তমানে নয়, অতীতে নিহিত।'

অর্থনৈতিক স্বার্থগুলি যে রাষ্ট্রকে সৃষ্টি করে, **মূর্তি লাভ করার** জন্যে সেই রাষ্ট্রকেই তাদের দরকার — এমন বিভ্রান্ত ধারণা, অথবা রুশ 'সামাজিক রূপ (তার মধ্যে কৃষকের গোষ্ঠীগত সম্পত্তিও অন্তর্ভুক্ত) যে জন্ম নিয়েছে রাষ্ট্র থেকে' — এমন নির্ভীক দাবি, অথবা যে চলতি সমাজ-ব্যবস্থাকে ধরে নেওয়া হয়েছে রাষ্ট্র থেকে উদ্ভূত বলে, তার সঙ্গে এই রাষ্ট্রের 'কোনোই মিল নেই' -- এমন স্ববিরোধ নিয়ে সময় নষ্ট যেন না করি। বরং যে রাষ্ট্র 'হাওয়ায় ঝুলছে' এবং কোনো একটি সম্প্রদায়ের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করছে না, সরাসরি তাকেই পরীক্ষা করা যাক।

ইউরোপীয় রাশিয়ায় কৃষকদের অধিকারে আছে ১০৫ মিলিয়ন দেসিয়াতিন জমি; অভিজাতদের (সংক্ষেপ করার জন্য বৃহৎ ভূস্বামীদের আমি এই আখ্যাই দেব) অধিকারে আছে ১০০ মিলিয়ন দেসিয়াতিন জমি, আবার এর প্রায় অর্ধেকটাই আছে ১৫,০০০ অভিজাতের দখলে, অর্থাৎ তারা প্রত্যেকে গড়ে ৩,৩০০ দেসিয়াতিন জমির অধিকারী। অতএব, কৃষকদের মোট জমি অভিজাতদের মোট জমির চেয়ে সামান্যই বেশী। কাজেই, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে, যে রুশ রাষ্ট্র অভিজাতদের রক্ষা করছে দেশের আধখানা

দখল করে থাকার ব্যাপারে, সেই রাষ্ট্রের অস্তিত্বে অভিজাতদের বিন্দুমাত্রও স্বার্থ নেই! এগিয়ে দেখা যাক। কৃষকেরা তাদের অর্ধেকটার দরুন বছরে ১৯৫ মিলিয়ন রুবল ভূমিকর দেয়, আর অভিজাতরা দেয় ১৩ মিলিয়ন! অভিজাতদের জমি কৃষকদের জমির তুলনায় গড়ে দ্বিগুণ উর্বর, কারণ বেগারী থেকে মুক্তিক্রয়ের সময় জমির সর্বাধিক পরিমাণই শুধু নয়, সর্বোৎকৃষ্ট অংশও কৃষকদের কাছ থেকে নিয়ে অভিজাতদের হাতে তুলে দিয়েছে রাষ্ট্র, এবং এই সর্বনিকৃষ্ট জমির জন্যে অভিজাতদের নিকট সর্বোৎকৃষ্ট জমির দাম দিতে হয়েছে কৃষকদের। অথচ রুশ রাষ্ট্রের অস্তিত্বে রুশীয় অভিজাতদের নাকি কোনোই স্বার্থ নেই!

এই মুক্তিক্রয়ের ফলে কৃষকদের সামগ্রিকভাবে এক অতি শোচনীয় ও সম্পূর্ণ অসহ্য এক অবস্থায় ফেলা হয়েছে। শুধু এই নয় যে, কৃষকদের কাছ থেকে জমির সর্বোৎকৃষ্ট এবং সর্বাধিক অংশ কেড়ে নেওয়া হয়েছে আর তার ফলে — রুশীয় কৃষি পরিস্থিতিতে — জমি থেকে জীবিকা সংগ্রহের দিক দিয়ে কৃষকদের জমির পরিমাণ অতিমাত্রায় ছোট হয়ে গেছে এমনকি দেশের সবচেয়ে উর্বর অঞ্চলগুলিতেও। শুধু এই নয় যে, এরই জন্যে তাদের কাছ থেকে আদায় করা হয়েছে অত্যন্ত চড়া দাম, যে টাকাটা রাষ্ট্র তাদের হয়ে আগাম দিয়েছিল আর তার জন্যে রাষ্ট্রকে এখন তারা সুদ ও আসল শোধ দিচ্ছে কিস্তিবন্দী হিসেবে। শুধু এই নয় যে, ভূমিকরের প্রায় সমগ্র বোঝাটাই চাপানো হয়েছে কৃষকদের ঘাড়ে আর প্রায় ছেড়ে দেওয়া হয়েছে অভিজাতদের এবং তার ফলে সমস্ত ভূমি-খাজনার মূল্য, এমনকি তার বেশীও চলে যাচ্ছে একমাত্র ভূমিকর মেটাতে এবং কৃষকের অন্যান্য সব দেয় — তাদের কথা আমরা পরে বলব — মেটাতে হচ্ছে তার আয়ের মজুরি অংশটা থেকে কেটে নিয়েই। এরপর, এই ভূমিকরের উপরে এবং রাষ্ট্রের দেওয়া আগামের সুদ ও কিস্তি শোধের উপরে স্থানীয় প্রশাসন প্রবর্তনের পর থেকে চেপেছে প্রাদেশিক ও জেলাগত ট্যাক্স। এই 'সংস্কারের' মূল ফল হল কৃষকদের উপর নূতনতর করের বোঝা। রাষ্ট্র তার সমগ্র রাজস্বই রেখে দিল নিজের হাতে অথচ খরচের একটা বৃহৎ অংশ চালান করল প্রদেশে আর জেলায়; আর তা মেটাতে তারাও ধার্য করেছে নতুন নতুন কর, আর রাশিয়ায় তো নিয়মই এই যে, উচ্চতর সম্প্রদায়েরা প্রায় করমুক্ত, কৃষককেই দিতে হয় প্রায় সবটাই।

এমন পরিস্থিতিটি যেন সৃষ্টি করা হয়েছে বিশেষ করে মহাজনের জন্যে; এদিকে রুশদের নিম্ন স্তরে ব্যবসা চালানোর, অনুকূল পরিস্থিতির পুরো সুযোগ নেবার আর তার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য জুয়াচুরির প্রায় অতুলনীয় প্রতিভায় সেখানে মহাজন সর্বত্রই উপস্থিত — প্রথম পীটার বহুদিন পূর্বেই বলেছিলেন যে, একজন রুশ তিনজন ইহুদীর উপরে যায়। ট্যাক্স দেবার সময় যখন কাছে আসে অমনি নগদ অর্থ নিয়ে এগিয়ে আসে মহাজন কুলাক — প্রায়শ একই গ্রাম গোষ্ঠীর ধনী চাষী। কৃষককে যে কোনো উপায়ে

অর্থ পেতেই হবে সুতরাং বিনা আপত্তিতে সে মহাজনের শর্তগুলি মেনে নিতে বাধ্য হয়। এর ফলে কিন্তু কৃষক পড়ে আরো শক্ত সমস্যায় আর দরকার হয় তার আরো আরো নগদ অর্থ। ফসল তোলার সময় এসে পৌঁছোয় শস্যের ব্যাপারী; পারিবারিক খোরাকির জন্যে দরকার যে ফসল তারো একটা অংশ বিক্রয় করতে বাধ্য হয় কৃষক অর্থের প্রয়োজনে। শস্যের ব্যাপারী মিথ্যা গুজব ছড়ায়, তাতে দর কমে, তারপর কম দামে ফসল কেনে, আবার সেই দামেরও একটা অংশ মেটায় চড়া দামের নানারকম সামগ্রী দিয়ে, কারণ trucksystem (নগদ অর্থের বদলে মাল দিয়ে পরিশোধ) রাশিয়ায় খুবই চালু। খুবই পরিষ্কার যে, রাশিয়ার বিরাট শস্য রপ্তানিটা দাঁড়িয়ে আছে প্রত্যক্ষভাবে কৃষক জনগণের অনশনের উপর। কৃষক শোষণের আর একটি পন্থা হল এই: কোনো ফাটকাবাজ দীর্ঘ মেয়াদে রাষ্ট্রীয় জমি ইজারা নেয় সরকারের কাছ থেকে এবং বিনা সারে যতদিন সে জমিতে ভালো ফসল পাওয়া যায় ততদিন চাষ করে নিজে, তারপর সেই নিঃশেষিত জমিকে সে ছোট ছোট জমায় ভাগ করে ফেলে এবং কাছাকাছি অঞ্চলের যেসব কৃষকের নিজের জমির আয়তন ছোট্ট, চড়া খাজনায় সেই জমি তাদের বিলি করে। ওপরে যেমন পেয়েছি ইংরেজি trucksystem, এখানে ঠিক তেমনি পাচ্ছি আইরিশ মধ্যসত্বভোগীকে। সংক্ষেপে এমন কোনো দেশ নেই যেখানে বুর্জোয়া সমাজের আদিম বন্যতা সত্ত্বেও, পুঁজিবাদী পরজীবিতা রাশিয়ার মতো এতটা বিকাশলাভ করেছে, সমগ্র দেশকে ও দেশের সমগ্র জনসাধারণকে নিজের জালে এতটা আবৃত ও বিজড়িত করেছে। আর ধরে নেওয়া হয়েছে যে, যে রুশ রাষ্ট্রের আইন ও আদালত এইসব কৃষক রক্তশোষকদের পিচ্ছিল ও লাভজনক কাজকর্মগুলির রক্ষক সেই রুশ রাষ্ট্রের অস্তিত্বে এদের নাকি কোনো স্বার্থ নেই।

বিগত দশকে, প্রধানত রেলপথ নির্মাণের দৌলতে পিটার্সবুর্গ, মস্কো, ওদেসার যে বৃহৎ বুর্জোয়া শ্রেণী অশ্রুতপূর্ব বেগে বিকাশলাভ করেছে ও গত সংকট যাদের খুব লেগেছে, শস্য, শণ, মসিনা ও চর্বির যে রপ্তানিকারকদের গোটা কারবার গড়ে উঠেছে কৃষকদের দারিদ্র্যের উপর, সমগ্র রুশীয় বৃহদায়তন যে শিল্পের অস্তিত্ব দাঁড়িয়ে আছে কেবল রাষ্ট্র কর্তৃক মঞ্জুর করা রক্ষণ শুল্কের দাক্ষিণ্যে — রাশিয়ার অধিবাসীদের এইসব গুরুত্বপূর্ণ, দ্রুতবর্ধমান অংশের কি কোনো স্বার্থ নেই রুশ রাষ্ট্রের অস্তিত্বে? যে অসংখ্য রাজপুরুষের দল রাশিয়ার উপর ঝাঁক বেঁধে রয়েছে, লুঠ চালাচ্ছে এবং এ দেশে প্রকৃতই একটি সামাজিক সম্প্রদায়ে পরিণত হয়েছে, তাদের কথা নাই তুললাম। তাই যখন মিঃ ত্কাচভ আমাদের নিশ্চয়তা দিয়ে বলেন, রুশ রাষ্ট্রের 'কোনো শিকড় নেই জনসাধারণের অর্থনৈতিক জীবনে, কোনো নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব এ করে না', এ রাষ্ট্র 'ঝুলছে হাওয়ায়', তখন আমার মনে হয় হাওয়ায় যা ঝুলছে তা রুশ রাষ্ট্র নয়, বরং মিঃ ত্কাচভ স্বয়ং।

একথা স্পষ্ট যে, ভূমিদাসত্ব থেকে মুক্তি পাবার পর থেকে রুশ কৃষকের অবস্থা অসহনীয় হয়ে উঠেছে, একে আর বেশী দিন বজায় রাখা যাবে না এবং আর অন্য কারণ না থাকলেও শুধু এই কারণেই একটি বিপ্লব রাশিয়ায় ধূমায়িত হচ্ছে। প্রশ্ন শুধু এই: এ বিপ্লবের ফল কী হতে পারে, এবং কী হবে? মিঃ ত্কাচভ বলেন, এ হবে এক সামাজিক বিপ্লব। এ তো নিছক পুনরুক্তি। প্রতিটি সত্যিকার বিপ্লবই সামাজিক বিপ্লব, কারণ সে নতুন একটি শ্রেণীকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করে আর সেই শ্রেণীকে তার নিজের ধাঁচে সমাজকে পুনর্গঠিত করার সুযোগ দেয়। কিন্তু তিনি বলতে চান যে, এ বিপ্লব হবে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব, পশ্চিম ইউরোপীয় সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য যে সমাজ-গঠন সেই সমাজই এই বিপ্লব রাশিয়ায় প্রতিষ্ঠা করবে এমনকি আমরা পশ্চিমে এ কাজে সাফল্য লাভ করার আগেই, — এবং তা ঘটবে সমাজের এমন একটি অবস্থায় যেখানে বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েত উভয় শ্রেণীই মাত্র বিক্ষিপ্তভাবে এবং বিকাশের এক নিম্নস্তরে বিদ্যমান! আর এটা সম্ভব হবে বলে ধরে নেওয়া হয়েছে কারণ, বলতে গেলে, রুশরাই সমাজতন্ত্রের জন্যে নির্বাচিত, তাদের আর্তেল আছে, আর আছে জমিতে গোষ্ঠীগত স্বত্বাধিকার!

আর্তেলের কথা প্রসঙ্গক্রমে মাত্র উল্লেখ করেছেন মিঃ ত্কাচভ। তবু এখানে আমরা সেটাকে তুলে ধরছি কারণ, গেৎর্সেনের সময় থেকে অনেক রুশীর কাছেই আর্তেল এক রহস্যজনক ভূমিকা পালন করেছে। আর্তেল হল রাশিয়ায় বহুল প্রচলিত এক ধরনের সমিতি, মুক্ত সমবায়ের সরলতম রূপ, যেমন দেখা যায় শিকারের সময় শিকারজীবী উপজাতিদের মধ্যে। এই শব্দটি এবং শব্দার্থ এসেছে স্লাভ থেকে নয়, তাতার থেকে। এ দুটিই দেখা যায় একদিকে কিরগিজ, ইয়াকুৎ প্রভৃতিদের মধ্যে এবং আর একদিকে লাপ, সামোয়েদ ও অপরাপর ফিন জাতিগুলির মধ্যে।* এই কারণেই ফিন ও তাতারদের সংস্পর্শের জায়গায় উত্তরে এবং পূর্বে আর্তেলের প্রথম বিকাশ ঘটে, দক্ষিণে-পশ্চিমে নয়। কঠোর আবহাওয়ার ফলে নানাবিধ শিল্পমূলক কাজের দরকার হয় এবং শহুরে বিকাশের ঘাটতি ও পুঁজির অভাব যথাসম্ভব পূরণ করা হয় এই ধরনের সমবায় দিয়ে। আর্তেলের সবচেয়ে বিশিষ্ট লক্ষণগুলির একটি হল তৃতীয় কোনো পক্ষের কাছে এর সদস্যদের পরস্পরের জন্যে সকল সদস্যের সমষ্টিগত দায়িত্ব, এবং এটি প্রাচীন জার্মানদের পারস্পরিক দায়দায়িত্ব (Gewere), গোত্রীয় প্রতিহিংসা প্রভৃতির মতোই মূলত গোত্রীয় সম্পর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত। — তবে রাশিয়ায় আর্তেল শব্দটির দ্বারা প্রতিটি যৌথ কাজকর্মকেই শুধু বোঝায় না, প্রতিটি যৌথ প্রথা-প্রতিষ্ঠানকেও বুঝিয়ে

* আর্তেলের ব্যাপারে প্রসঙ্গত তুলনীয় «Сборник материалов об артелях в России» (রাশিয়ায় আর্তেল সংক্রান্ত মালমসলাব সংগ্রহ), выпуск 1, С.-Петербург, 1873г. (এঙ্গেলসের টীকা।)

থাকে। — শ্রমিকদের আর্তেলগুলিতে সর্বদাই একজন মণ্ডল (স্তারোস্তা বা স্তারশিনা) নির্বাচিত হয়, সে কোষাধ্যক্ষ, হিসাব রক্ষক প্রভৃতির কাজ এবং যতটা দরকার ম্যানেজারের কাজও চালায়; এবং বিশেষ বেতন পায়। এইসব আর্তেল গঠন করা হয়:

১। সাময়িক কোনো কর্মোদ্যোগের জন্য, এর সমাধা হওয়ার পরই আর্তেল ভেঙে দেওয়া হয়;

২। একই বৃত্তিতে নিযুক্ত ব্যক্তিদের জন্য, যেমন মুটে প্রভৃতিদের জন্য;

৩। স্থায়ী কর্মোদ্যোগের জন্যে, যথার্থ অর্থে যা শিল্প প্রতিষ্ঠান।

সকল সদস্যের মধ্যে চুক্তি সই হওয়ার মধ্য দিয়ে এগুলির প্রতিষ্ঠা হয়। যদি এইসব সদস্য একত্রে মিলে প্রয়োজনীয় পুঁজি যোগাতে না পারে, যা প্রায়ই ঘটে, যেমন পনীর কারখানা আর মাছ-ধরার বেলায় (নৌকা, জাল প্রভৃতির জন্য), তবে তাকে পড়তে হয় মহাজনের কবলে। মহাজন ঘাটতি অর্থ চড়া সুদে আগাম দেয়, এবং পরে কাজটির আয়ের বেশীর ভাগ অংশ পকেটস্থ করে। আরো বেশী নির্লজ্জভাবে শোষিত হয় অবশ্য সেইসব আর্তেল যারা দল বেঁধে কোনো মালিকের কাছে নিজেদের মজুরী শ্রমিক হিসেবে ভাড়া দেয়। নিজের শিল্প কাজের পরিচালনা তারা নিজেরাই করে তাই বাঁচিয়ে দেয় পুঁজিপতির তদারকীর খরচ। পুঁজিপতি এই সদস্যদের থাকবার জন্যে কুঁড়েঘর ভাড়া দেয় এবং আগাম দেয় খোরাকি, আর এরই ফলে ফের উদ্ভূত হয় জঘন্যতম trucksystem। আর্খাঙ্গেলস্ক প্রদেশের কাঠুরিয়া ও আলকাৎরা চোলাইকারীদের অবস্থা এবং সাইবেরিয়ার অনেকগুলি বৃত্তির অবস্থাও এইরকম [তুলনা করুন ফ্লেরভস্কির «Положение рабочего класса в России» (রাশিয়ায় শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা), সেণ্ট পিটার্সবুর্গ, ১৮৬৯।]। অতএব এখানে পুঁজিপতির দ্বারা মজুরি-শ্রমিকদের শোষণকে ভালো রকমেই **সাহায্য করে** এই আর্তেল। অন্যদিকে এমনও আর্তেল আছে যেগুলি নিজেরাই এমন মজুরি-শ্রমিক খাটায় যারা তাদের সমিতির সদস্য **নয়**।

এইভাবে দেখা যায় যে, আর্তেলগুলি হল আদিম আর তাই খুব অপরিণত সমবায়-সমিতির রূপ এবং সেই হিসেবে তা একান্তই রুশীয় অথবা এমনকি স্লাভীয় নয়। যেখানেই প্রয়োজন থাকে সেখানেই এইসব সমিতি গড়া হয়, যেমন, সুইজারল্যাণ্ডে ডেয়ারী খামারীদের মধ্যে, আর ইংলণ্ডে মৎস্যজীবীদের মধ্যে, সেখানে আবার এগুলি নানা ধরনের চেহারায় বর্তমান। যে সিলেজিয়ার খনকেরা (পোলীয়রা নয়, জার্মানরা) চল্লিশের দশকে অনেক জার্মান রেলপথ নির্মাণ করেছিল, তারাও সংগঠিত ছিল পূর্ণাংগ আর্তেলসমূহের মধ্যে। রাশিয়ায় এই রূপটির আধিক্য রুশ জনগণের সমিতিবদ্ধ হওয়ার প্রবল ঝোঁকেরই যে প্রমাণ একথা সত্যি, তবে এই ঝোঁকের সাহায্যে আর্তেল থেকে সোজাসুজি সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সমাজে তাদের লাফিয়ে যাবার মতো সামর্থ্যের প্রমাণ এটা মোটেই নয়। এর জন্যে সর্বোপরি দরকার আর্তেলের নিজেরই বেড়ে ওঠার

সামর্থ্যের, দরকার তার সেই আদিম রূপটি বর্জন করার — যে রূপে আমরা দেখেছি তা পুঁজিকে যত সাহায্য করে মজুরদের তত করে না, — এবং দরকার অন্তত পশ্চিম ইউরোপের সমবায়-সমিতিগুলির পর্যায়ে ওঠার। কিন্তু মিঃ ত্কাচভের কথা এবার বিশ্বাস করলেও (আগে যা ঘটেছে তাতে সেটা নিশ্চিতভাবে বিপজ্জনকের চেয়েও বেশী) ব্যাপারটা সেরকম নয়। বরং তিনি একান্তই তাঁর মতবাদের বৈশিষ্ট্যসূচক গর্বেই এই নিশ্চিতি দিয়েছেন: 'সম্প্রতি জার্মান ধরনের(!) যেসব সমবায় ও ঋণদান সমিতি কৃত্রিমভাবে রাশিয়ায় বসিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাদের সম্বন্ধে বলা যায় যে, সেগুলি আমাদের শ্রমিকদের অধিকাংশের পূর্ণ উপেক্ষাই পেয়েছে এবং প্রায় সর্বত্রই তা ব্যর্থ হয়েছে।' আধুনিক সমবায়-সমিতি অন্তত পক্ষে এটুকু প্রতিপন্ন করেছে যে, তার নিজের দায়িত্বে লাভজনকভাবেই সে বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠান (ল্যাংকাশায়ারের সুতা ও বয়ন শিল্প) পরিচালনা করতে পারে। একাজে আজও আর্তেল শুধু যে অক্ষম তাই নয়, এর যদি আরো উন্নয়ন না ঘটে তবে বৃহৎ শিল্পের দ্বারা একে অবশ্যই ধ্বংসও হতে হবে।

প্রুশীয় সরকারের কাউন্সিলার হাকস্তহাউজেন ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দ নাগাদ রুশ কৃষকের সাধারণ সম্পত্তির কথা আবিষ্কার করেন এবং তাকে এক পরমাশ্চর্য ব্যাপার বলে দুনিয়ার সামনে জাহির করেন, যদিও হাকস্তহাউজেন তাঁর স্বদেশভূমি ভেস্তফালিয়াতেই এর বিলক্ষণ জের তখনো দেখতে পেতেন এবং সরকারী কর্মচারী হিসেবে সেগুলি পুরোপুরি জানা তাঁর কর্তব্যও ছিল। নিজে একজন রুশ জমিদার হয়েও গেৎর্সেন হাকস্তহাউজেনের কাছেই প্রথম জানলেন যে, তাঁর কৃষকেরা জমির স্বত্ব ভোগ করেন যৌথভাবে। আর এ ঘটনাটিকে তিনি ব্যবহার করলেন রুশ কৃষককে সমাজতন্ত্রের প্রকৃত বাহক বলে বর্ণনা করার জন্যে, জরাগ্রস্ত ক্ষয়িষ্ণু যে পশ্চিম ইউরোপের শ্রমিকদের সমাজতন্ত্র গড়ার জন্যে কৃত্রিমভাবে নিজেদের জর্জরিত করতে হচ্ছে তাদের তুলনায় রুশ কৃষকদের আজন্ম কমিউনিস্ট বলে বর্ণনা করার জন্যে। গেৎর্সেনের কাছ থেকে এই জ্ঞান যায় বাকুনিনের কাছে আর বাকুনিনের কাছ থেকে মিঃ ত্কাচভের কাছে। শেষোক্ত ব্যক্তিটির কথা শোনা যাক:

'আমাদের জনগণ... এর বিপুল সংখ্যাধিক অংশ... যৌথ মালিকানার নীতিতে আচ্ছন্ন; বলা যায়, এরা সহজাত প্রবৃত্তিবশেই ঐতিহ্যগতভাবেই কমিউনিস্ট। রুশ জনগণের সমগ্র বিশ্বদর্শনের (আমরা পরে দেখব রুশ কৃষকের বিশ্ব কী পরিমাণ বিস্তৃত) সঙ্গে যৌথ মালিকানার ধারণা এত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত যে, আজকে সরকার যখন বুঝতে শুরু করছেন যে, "সুশৃংখল" সমাজের নীতির সঙ্গে এই ধারণা মোটেই খাপ খায় না এবং এইসব নীতির নামে জনগণের চেতনা ও জীবনের উপর ব্যক্তিগত মালিকানার ধারণাটি চাপিয়ে দিতে চাইছে তখন তারা তা করতে পারে শুধুমাত্র সঙীন আর

চাবুকের সহায়তায়। এ থেকে পরিষ্কার যে, পশ্চিম ইউরোপের জনগণ অধিকতর শিক্ষিত হলেও আমাদের জনগণ স্বীয় অজ্ঞতা সত্ত্বেও তাদের চেয়ে সমাজতন্ত্রের অনেক কাছাকাছি।'

জমির উপর গোষ্ঠীগত মালিকানার প্রথাটি আসলে ভারত থেকে আয়র্ল্যান্ড পর্যন্ত বিকাশের নিম্নস্তরস্থিত সকল ইন্দো-জার্মান জনগণের মধ্যে এমনকি যে সব মালয়দেশ ভারতীয় প্রভাবে বিকাশ লাভ করছে সেখানেও দেখা যায়, যেমন জাভায়। ১৬০৮ সালেই ইংরেজরা সদ্য পদানত উত্তর আয়র্ল্যান্ডে জমির প্রচলিত যৌথ মালিকানাকে অজুহাত করে জমিকে মালিকহীন এবং ক্রাউনে ন্যস্ত হল বলে ঘোষণা করে। ভারতবর্ষে আজকের দিন পর্যন্ত গোষ্ঠী মালিকানার একগাদা বিভিন্ন রূপ বর্তমান। জার্মানিতে এই প্রথাই ছিল সর্বব্যাপক; জায়গায় জায়গায় এখনো যে গোষ্ঠীগত জমি দেখা যায় সেটা তার ধ্বংসাবশেষ এবং প্রায়ই বিশেষত পার্বত্য অঞ্চলে অদ্যাবধি পাওয়া যায় তার সুস্পষ্ট চিহ্ন: যৌথ ভূমির পর্যায়িক পুনর্বণ্টন ইত্যাদি। প্রাচীন জার্মান গোষ্ঠী মালিকানার প্রশ্নে মাউরারের রচনাগুলিই প্রামাণ্য এবং বিষয়ে আরো সঠিক ও বিস্তারিত উল্লেখের জন্য তা পড়ে দেখা যেতে পারে। পোল্যান্ড এবং ছোট রাশিয়া সহ পশ্চিম ইউরোপের সামাজিক বিকাশের একটি বিশেষ স্তরে এই গোষ্ঠী মালিকানা কৃষি-উৎপাদনের উপর একটি শৃংখল, একটি গতিনিরোধক ব্যবস্থায় পরিণত হয় এবং ক্রমে ক্রমে তা বাতিল হতে থাকে। অপরদিকে বড়ো রাশিয়ায় (অর্থাৎ খোদ রুশ দেশে) এটি আজো পর্যন্ত চলে আসছে আর তাতে করে প্রমাণিত হচ্ছে যে, এখানকার কৃষি-উৎপাদন ও তার সহগ গ্রামাঞ্চলের সামাজিক সম্পর্ক এখনো খুবই অপরিণত অবস্থায় আছে। আর প্রকৃতপক্ষে ঘটনাও তাই-ই। রুশ কৃষক বাস করে গ্রাম গোষ্ঠীতে, কেবল এর মধ্যেই তার সমস্ত সত্তা। বিশ্ব জগতের অস্তিত্ব তার কাছে ততটুকুই যতটুকু এ জগৎ তার গ্রাম গোষ্ঠীতে হস্তক্ষেপ করছে। ব্যাপারটি এতখানি এইরূপ যে রাশিয়ায় **মির** এই এ[illegible] শব্দটির অর্থ একদিকে বিশ্ব আর অপরদিকে 'গ্রাম গোষ্ঠী'। কৃষকের কাছে **ভেস মির** অর্থাৎ সারা বিশ্ব কথাটির অর্থ তার গোষ্ঠী সভ্যদের জমায়েৎ। কাজেই রুশ কৃষকদের **বিশ্বদৃষ্টির** কথা যখন মিঃ ত্‌কাচভ বলেন, তখন স্পষ্টতই তিনি **মির** এই রুশ শব্দটিকে বেঠিকভাবে চালান দিয়েছেন। এক একটা গোষ্ঠীর সঙ্গে পরস্পরের এই পরিপূর্ণ বিচ্ছিন্নতার ফলে সারা দেশ জুড়ে একই ধরনের স্বার্থ গড়ে ওঠে, কিন্তু মোটে তা সাধারণ স্বার্থ নয়। সেইটাই হল **প্রাচ্য স্বৈরতন্ত্রের** স্বাভাবিক ভিত্তি এবং ভারত থেকে রাশিয়া পর্যন্ত যেখানেই এই ধরন সামাজিক রূপের প্রাধান্য সেখানেই সর্বদাই সে সমাজ জন্ম দিয়েছে স্বৈরতন্ত্রের, তার অনুপূরণ পেয়েছে তাতে। সাধারণভাবে রুশ রাষ্ট্র শুধু নয়, তার বিশেষ রূপ জার স্বৈরতন্ত্রও শূন্যে ঝুলে থাকার বদলে সেই রুশীয় সামাজিক অবস্থারই এক আবশ্যিক ও যুক্তিসঙ্গত পরিণতি যার সঙ্গে, মিঃ ত্‌কাচভের মতে, এ রাষ্ট্রের 'কোন

মিল নেই'! **বুর্জোয়া** পথে রাশিয়ার আরো অগ্রগতি ঘটলেই এখানেও ধীরে ধীরে গোষ্ঠীগত সম্পত্তির বিনাশ ঘটবে 'সঙীন বা চাবুক' সহযোগে রুশ সরকারের হস্তক্ষেপের কোনো প্রয়োজন ছাড়াই। আর তা আরো এই কারণে যে, রাশিয়ায় গোষ্ঠীগত জমিতে কৃষকেরা ভারতের কোনো কোনো জেলায় আজো যেমন হয়, সেভাবে সমবেতভাবে চাষ করে কেবল ফসলটুকুই ভাগাভাগি করে না। বিপরীতক্রমে, রাশিয়ায় জমিটাই মাঝে মাঝে বিভিন্ন পরিবারের কর্তাদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয় এবং প্রত্যেকেই নিজের ভাগের জমিতে নিজের জন্যেই চাষ করে। তাই গোষ্ঠীর বিভিন্ন সদস্যের সমৃদ্ধির মাত্রায় বৃহৎ বৈষম্য ঘটা সম্ভব আর তা প্রকৃতপক্ষেও বর্তমান। প্রায় সর্বত্রই এদের মধ্যে রয়েছে কিছু কিছু ধনী কৃষক, কখনো কখনো লক্ষপতিও; এরা তেজারতি চালায় আর কৃষক জনগণের রক্ত শোষণ করে। মিঃ ত্কাচভই একথা সবচেয়ে ভালো জানেন। তিনি যখন জার্মান শ্রমিকদের বিশ্বাস করাতে চান যে, সহজাত প্রবৃত্তি অনুসারে ও ঐতিহ্যগতভাবে কমিউনিস্ট এই রুশ কৃষকদের 'যৌথ মালিকানার ধারণা' কেবলমাত্র সঙীন আর চাবুকের জোরেই মুছে দেওয়া সম্ভব, তখনই তিনি কিন্তু তাঁর রুশ পুস্তিকার ১৫ পৃষ্ঠায় লিখেছেন: 'কৃষকদের মাঝে **কুলাকদের** একটি শ্রেণীর উদয় ঘটছে; এই শ্রেণী হল কৃষক অভিজাত শ্রেণী, এরা কৃষকদের আর অভিজাতদের জমি **কেনে** এবং **ইজারা নেয়**।'

উপরে আমরা যাদের বর্ণনা করেছি এরা হল সেই একই ধরনের রক্তশোষক।

গোষ্ঠী মালিকানার উপর সবচেয়ে বড়ো আঘাত যা হেনেছে সেটা হল বেগারির দায়মোচন। জমির বৃহত্তর ও উৎকৃষ্টতর অংশ বিলি করা হল অভিজাত সম্প্রদায়কে; কৃষকদের জন্যে যা রইল তা তাদের বেঁচে থাকার জন্যে কদাচিৎ পর্যাপ্ত এবং প্রায়শই পর্যাপ্ত নয়। উপরন্তু বনগুলো দেওয়া হল অভিজাতদের হাতে; জ্বালানি, টুকিটাকি জিনিসপত্র ও ঘরবাড়ির জন্যে যে কাঠ কৃষক এর আগে বিনামূল্যে আনতে পারত, তা এখন তাকে কিনতে হবে। এইভাবে কৃষকের ভিটে আর জমিটুকু ছাড়া এখন আর কিছু রইল না। না রইল তার এই জমিতে চাষ করার সঙ্গতি, আর না রইল গড়পড়তায় একটা ফসল থেকে পরের ফসল তোলা পর্যন্ত নিজের ও নিজের পরিবারবর্গের জীবিকা জোগানোর মতো পর্যাপ্ত জমি। এই অবস্থার মাঝে আর ট্যাক্স ও সুদের চাপের তলায় জমির গোষ্ঠী মালিকানা আর আশীর্বাদ থাকে না, তা হয়ে দাঁড়ায় শৃংখল। প্রায়ই কৃষকেরা পরিবারসহ অথবা পরিবার ফেলে রেখেই তা থেকে পালায়, যাযাবর মজুর হয়ে জীবিকা অর্জনের জন্যে ফেলে রেখে যায় তাদের জমি।*

* কৃষকের অবস্থা সম্বন্ধে প্রসঙ্গত তুলনীয় কৃষি ব্যবস্থা বিষয়ক সরকারী কমিশনের রিপোর্ট (১৮৭৩) এবং স্কালদিনের «В захолустье и в столице» (এ'দোগ্রামে ও রাজধানীতে), С.-Петербург, 1870г. শেষোক্ত বইটি একজন নরমপন্থী রক্ষণশীলের। (এঙ্গেলসের টীকা।)

একথা পরিষ্কার যে, রাশিয়ায় গোষ্ঠী মালিকানা প্রথার শীর্ষ পর্ব অনেক আগেই শেষ হয়েছে, সব দিক থেকেই দেখা যাচ্ছে এখন সে চলেছে ভাঙনের দিকে। এ সব সত্ত্বেও, এই রূপের সমাজকে উন্নততর স্তরে উন্নীত করার সম্ভাবনা অস্বীকার করা যায় না যদি সে উন্নয়নের পরিবেশ পরিপক্ক হবার সময় পর্যন্ত এ সমাজ বজায় থাকে এবং যদি এর এমন এক ধারায় বিকশিত হবার সামর্থ্য থাকে যাতে কৃষকেরা আর পৃথকভাবে চাষ না চালিয়ে যৌথভাবেই* চাষ চালাচ্ছে; আবার বুর্জোয়া ধারায় টুকরো জমি মালিকানার মধ্যবর্তী স্তরের ভিতর দিয়ে রুশ কৃষকদের যাওয়ার আবশ্যকতা বিনাই এই উন্নতর রূপে উন্নয়ন দরকার। সেটা অবশ্য কেবল তখনই হতে পারে যদি গোষ্ঠী মালিকানা একেবারে ভেঙে পড়ার আগেই পশ্চিম ইউরোপে সাফল্যের সঙ্গে একটা প্রলেতারীয় বিপ্লব সম্পন্ন হয়, এবং তাতে করে এই উত্তরণের জন্যে দরকারী পূর্বসর্তগুলির, বিশেষ করে সেই প্রসঙ্গে তার গোটা কৃষি-ব্যবস্থার যে বিপ্লব অপরিহার্য সেইটুকু সাধন করার জন্যে প্রয়োজনীয় বৈষয়িক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। তাই রুশ কৃষকেরা 'মালিক' হলেও পশ্চিম ইউরোপের সম্পত্তিহীন শ্রমিকদের চেয়ে 'সমাজতন্ত্রের কাছাকাছি' — মিঃ ত্কাচভের এই কথা নিছক একটা বাহবাস্ফোট। ব্যাপার সম্পূর্ণ বিপরীত। রুশীয় গোষ্ঠী মালিকানাকে এখনো যদি কোন কিছু বাঁচাতে পারে, একে এক নতুন এবং সত্যিকারের টেকসই একটা রূপে পরিণতির সুযোগ দিতে পারে, তবে সে হল কেবল পশ্চিম ইউরোপের প্রলেতারীয় বিপ্লব।

মিঃ ত্কাচভ অর্থনৈতিক বিপ্লবকেও যেমন হাল্কাভাবে দেখেন, রাজনৈতিক বিপ্লবকেও তেমনি হাল্কাভাবেই দেখেন। তিনি বলেন, রুশ জনগণ তাদের দাসত্বের বিরুদ্ধে 'অবিরাম প্রতিবাদ করে চলেছে', তার ধরন হল 'ধর্মীয় সম্প্রদায়... ট্যাক্স দিতে অস্বীকৃতি... দস্যুদল (জার্মান শ্রমিকেরা জেনে আনন্দিত হবেন যে, তদনুসারে, শিন্দারহ্যানস** হল জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির ...দাতা)... অগ্নিকাণ্ড... বিদ্রোহ... এবং সেই কারণেই রুশ জনগণকে সহজাত প্রবৃত্তিগতভাবে বিপ্লববাদী আখ্যা দেওয়া যায়।' এবং এইভাবে মিঃ ত্কাচভ স্থিরনিশ্চিত যে, 'যে পুঞ্জীভূত তিক্ততা ও অসন্তোষ... আমাদের জনগণের অন্তরে সর্বদাই ফুটছে, দরকার শুধু কয়েকটি জায়গায়

* পোল্যান্ডে, বিশেষতঃ গ্রদ্নো গুবেনির্য়ায়, যেখানে ১৮৬৩ সালের বিদ্রোহে জমিদারদের অধিকাংশ ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, সেখানে কৃষকেরা এখন প্রায়ই জমিদারদের কাছ থেকে ভূসম্পত্তি কিনে নেয় অথবা ইজারা নেয় এবং সমবেতভাবে **যৌথ স্বার্থে** সে জমি চাষ করে। আর গোষ্ঠী মালিকানা এইসব কৃষকের বহু শতাব্দী আগে থেকেই ছিল না, আর এরা বড়ো রুশী নয়, এরা পোলীয়, লিথুয়ানীয় এবং বেলোরুশী। (এঙ্গেলসের টীকা।)

** শিন্দারহ্যানস (পাষণ্ড হ্যানস) হল বিখ্যাত জার্মান দস্যু জোহান বুক্লারের ডাকনাম। — সম্পাঃ

একই সময়ে তার বিস্ফোরণ ঘটানো'। তখন 'বিপ্লবী শক্তিগুলির মিলন **আপনা থেকেই** গড়ে উঠবে, আর সংগ্রামটা ... জনগণের স্বার্থের অনুকূলেই অবশ্য সমাপ্ত হবে। বাস্তব প্রয়োজন, আত্মরক্ষার সহজাত প্রবৃত্তি' তখন নিজে থেকেই গড়ে দেবে 'প্রতিবাদকারী গোষ্ঠীগুলির মধ্যে এক দৃঢ় ও অটুট মৈত্রী'।

এর চেয়ে আর সহজ এবং প্রীতিকর রূপে কোনো বিপ্লবের বিষয় চিন্তা করা অসম্ভব। তিন চার জায়গায় একই সঙ্গে বিদ্রোহ সুরু হয়ে গেল, অমনি 'সহজাত প্রবৃত্তিগত বিপ্লববাদী', 'বাস্তব প্রয়োজন' আর 'আত্মরক্ষার সহজাত প্রবৃত্তি' মিলে বাকিটুকু নিষ্পন্ন করল 'আপনা থেকেই'। ব্যাপারটা যখন এমন দারুণ সহজ, তখন কেন যে বহুপূর্বেই বিপ্লবটা করা হল না, জনগণকে মুক্ত করে রাশিয়াকে একটি আদর্শ সমাজতান্ত্রিক দেশে রূপান্তরিত করা হল না, সে কথা একেবারেই দুর্জ্ঞেয়।

আসলে ব্যাপারটা একেবারেই অন্য রকম। এই 'সহজাত প্রবৃত্তিগত বিপ্লববাদী' রুশ জনগণ সত্যিই অনেকগুলি বিচ্ছিন্ন কৃষক বিদ্রোহ ঘটিয়েছে **অভিজাত সম্প্রদায়ের** বিরুদ্ধে এবং স্বতন্ত্র এক একজন রাজপুরুষের বিরুদ্ধে; কিন্তু **কখনোই জারের বিরুদ্ধে নয়,** কেবল এক **ভুয়াজার** নেতৃত্ব নিয়ে সিংহাসন দাবি করার ব্যাপারটা ছাড়া। দ্বিতীয় ক্যাথারিনের আমলে সর্বশেষ বৃহৎ একটা কৃষক অভ্যুত্থান সম্ভব হয়েছিল শুধু এই কারণেই যে, ইয়েমেলিয়ান পুগাচভ দাবি করে সে হল ক্যাথারিনের স্বামী তৃতীয় পীটার, পত্নী তাকে নাকি হত্যা করেননি, সিংহাসনচ্যুত করে কারারুদ্ধ করেছিলেন এবং সেখান থেকে সে এখন পালিয়ে এসেছে। উল্টে বরং জারই হল রুশ কৃষকদের চোখে পার্থিব দেবতা: ভগবান অনেক উঁচুতে, জার অনেক দূরে, এই হল তার সংকট মুহূর্তের চিৎকার। এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, বিশেষ করে বেগারির দায়মোচনের পর থেকে কৃষক জনগণ এমন অবস্থায় গিয়ে পড়েছে যে, ক্রমেই আরো বেশি করে সরকার ও জারের বিরুদ্ধে একটা সংগ্রামে নামতে বাধ্য হচ্ছে; কিন্তু 'সহজাত প্রবৃত্তিগত বিপ্লববাদীর' আষাঢ়ে গল্পটা ত্কাচভকে বিকতে হবে অন্য হাটে।

তাছাড়া, এমনকি রুশ কৃষকেরা **যদি** ওই রকম সহজাত প্রবৃত্তিগতভাবে বিপ্লবী হয়েই থাকে, ফুল-তোলা কাপড় বা চায়ের একটা কেৎলি বানানোর মতো ফরমায়েস দিয়ে বিপ্লব বানানো যায় এমন কল্পনাও **যদি** আমরা করি, তবুও আমি জিজ্ঞেস করব: এখানে একান্তই যে শিশুসুলভভাবে বিপ্লবের ধারা কল্পনা করা হয়েছে বারো বছরের বেশী বয়স্ক কারো পক্ষে কি তা অনুমোদনযোগ্য? তাছাড়া, আরো মনে রাখতে হবে যে, এটি লেখা হয়েছে এই বাকুনিন আদর্শে অনুষ্ঠিত প্রথম বিপ্লবের, ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের স্পেনীয় বিপ্লবের অমন চমৎকার ব্যর্থতার পর। সেখানেও তারা কয়েকটি জায়গায়

একইসঙ্গে সুরু করেছিল। সেখানেও ধরা হয়েছিল যে, বাস্তব প্রয়োজন এবং আত্মরক্ষার সহজাত প্রবৃত্তি নিজে নিজেই প্রতিবাদকারী গোষ্ঠীগুলির মধ্যে দৃঢ় ও অটুট মৈত্রী গড়ে তুলবে। কিন্তু ঘটল কী? প্রতিটি গোষ্ঠী, প্রতিটি শহর শুধু নিজেকেই রক্ষা করতে গেল, পারস্পরিক সাহায্যের কোনো প্রশ্নই রইল না, এবং এক পক্ষকালের মধ্যে মাত্র তিন হাজার সৈন্য নিয়ে পাভিয়া একের পর এক শহর পরাস্ত করে এই সমগ্র নৈরাজ্যবাদী গৌরবের অবসান ঘটাল। (আমার লেখা 'বাকুনিনপন্থীদের কাজ' দ্রষ্টব্য, সেখানে ব্যাপারটির বিশদ বিবরণ দেওয়া হয়েছে।)

রাশিয়ায় বিপ্লব যে আসন্ন — এ কথা সন্দেহাতীত। তার আর্থিক ব্যবস্থা চরম বিশৃংখলার মধ্যে। আরো বেশী ট্যাক্স চাপানো যাচ্ছে না, পুরানো রাষ্ট্রীয় ঋণ শোধ করা হচ্ছে নতুন ঋণে, আর প্রত্যেক নতুন ঋণই বেশী বেশী অসুবিধের সম্মুখীন হচ্ছে; শুধু রেলপথ তৈরীর অজুহাতেই আজ অর্থসংগ্রহ সম্ভব! শাসনযন্ত্র অনেক আগেই হাড়হদ্দ দুর্নীতিগ্রস্ত আর রাজকর্মচারীরা তাদের বেতনের চেয়ে চুরি, ঘুষ আর জবরদস্তি আদায়ের উপরই বেশী করে নির্ভর করছে জীবনযাপনে। রাশিয়ার কাছে সবচেয়ে বেশী যা দরকারী, সেই সমগ্র কৃষি উৎপাদন একেবারেই তছনছ হয়ে গেছে ১৮৬১ সালের দায়মোচন বন্দোবস্তের ফলে। বৃহৎ ভূস্বামীদের হাতে যথেষ্ট শ্রমশক্তি নেই, কৃষকদের নেই পর্যাপ্ত জমি, ট্যাক্সের ভারে তারা জর্জরিত আর মহাজনদের শোষণে ছিবড়ে হয়ে পড়েছে, ফলে কৃষি উৎপাদনের পরিমাণ বছর বছর যাচ্ছে কমে। প্রতীচ্যে আমরা যে স্বেচ্ছাচার কল্পনা করতেও পারি না সেই ধরনের স্বেচ্ছাচারিতার বলে প্রাচ্য স্বৈরতন্ত্র খুবই মুশকিলের মধ্যে শুধু বাইরের দিক দিয়ে সবটা এখনো টিকিয়ে রাখছে। শিক্ষিত শ্রেণীগুলির মতামতের সঙ্গে, বিশেষত রাজধানীর দ্রুতবিকাশমান বুর্জোয়াদের সঙ্গে এই স্বৈরতন্ত্রের দ্বন্দ্ব দিনের পর দিন যে বেশী করে প্রকট হয়ে উঠছে শুধু তাই নয়, সে স্বৈরতন্ত্র তার বর্তমান শাসকের মাধ্যমে নিজেই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছে: আজ উদারনীতির কাছে যে ছাড়টুকু মঞ্জুর করছে কাল আবার ভীতিবশত সেটুকুও বাতিল করছে আর তার দ্বারা নিজেকে ক্রমেই হতমান করে তুলছে। এই সবের সঙ্গে রাজধানীতে কেন্দ্রীভূত জাতির শিক্ষিত অংশটির মধ্যে ক্রমবর্ধমান এই স্বীকৃতি বেড়ে উঠছে যে, এই অবস্থা চলতে পারে না, একটা বিপ্লব সমাসন্ন, কিন্তু সেই সঙ্গে এই মোহও জেগে উঠছে যে, এই বিপ্লবকে এক মোলায়েম সাংবিধানিক খাতে পরিচালিত করা যাবে। বিপ্লবের সমস্ত সর্তই এখানে একত্রিত, এমন বিপ্লব রাজধানীর উচ্চতর শ্রেণীদের দ্বারা, এমনকি বোধ হয় স্বয়ং সরকারের দ্বারা সুরু হয়ে যাবে, কিন্তু কৃষকেরা দ্রুতগতিতে তাকে বিকশিত করে তার সংবিধানগত প্রথম পর্যায়ের বাইরে আগিয়ে নেবে; এমন বিপ্লব যা গোটা ইউরোপের কাছে অতীব তাৎপর্যপূর্ণ হবে অন্তত শুধু এই কারণে যে, সমগ্র ইউরোপীয় প্রতিক্রিয়ার এখনো

অক্ষুণ্ণ সর্বশেষ সংরক্ষিত শক্তিটিকেই এ বিপ্লব এক আঘাতে ধ্বংস করবে। এ বিপ্লব নিশ্চিতভাবেই এগিয়ে আসছে। এর বিলম্ব ঘটাতে পারে শুধু দুটি ঘটনা: তুরস্ক অথবা অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে সফল একটি যুদ্ধ যার জন্য দরকার অর্থ এবং দৃঢ় মিত্রদল, অথবা... অকাল অভ্যুত্থানের প্রচেষ্টা যা সম্পত্তিবান শ্রেণীগুলিকে ফের ঠেলে দেবে সরকারের কোলেই।

১৮৭৫-এর এপ্রিলে এঙ্গেলস কর্তৃক লিখিত
১৮৭৫-এ *Volksstaat* পত্রিকায় এবং ১৮৭৫ ও
১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে প্রকাশিত

পুস্তিকার পাঠের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা
সংবাদপত্রের পাঠ অনুসারে মুদ্রিত
জার্মান থেকে ইংরেজি অনুবাদের ভাষান্তর

ফ্রেডারিক এঙ্গেলস

'প্রকৃতির দ্বান্দ্বিকতার' ভূমিকা

প্রাচীন যুগের প্রাকৃতিক-দার্শনিক ধ্যান-ধারণা এবং আরবদের বিক্ষিপ্ত অথচ প্রভূত গুরুত্বসম্পন্ন যে আবিষ্কারগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ না হতেই অবলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল সেগুলির বিপরীতে একমাত্র আধুনিক প্রকৃতি বিজ্ঞানেরই একটা বৈজ্ঞানিক প্রণালীবদ্ধ ও সর্বাঙ্গীন বিকাশ হয়েছে। সমস্ত সাম্প্রতিকতর ইতিহাসেরই মতো এই আধুনিক প্রকৃতিবিজ্ঞানেরও শুরু হয়েছে সেই মহান যুগটি থেকে, যে যুগটিকে আমরা — জার্মানরা — নাম দিয়েছি আমাদের তৎকালীন জাতীয় বিপর্যয়ের নামে Reformation, ফরাসীরা যাকে বলে থাকে Renaissance এবং ইতালীয়রা বলে থাকে Cinquecento* যদিও এই নামগুলির কোনোটির দ্বারা এই যুগের তাৎপর্য পরিপূর্ণভাবে প্রকাশিত হয় না। এই যুগের উদ্ভব পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্ধে। শহরের বার্গারদের (burghers) সমর্থনপুষ্ট হয়ে রাজশক্তি ধ্বংস করল সামন্ত-অভিজাত সম্প্রদায়ের ক্ষমতাকে এবং প্রতিষ্ঠা করল মূলত জাতিসত্তা ভিত্তিক বড়ো বড়ো রাজতন্ত্র, তাদের মধ্যেই আধুনিক ইউরোপীয় জাতিগুলির এবং আধুনিক বুর্জোয়া সমাজের বিকাশ ঘটেছে। শহরের বার্গার ও অভিজাতরা যখন তখনও পরস্পরের সঙ্গে যুঝছে সে সময়ই জার্মানির কৃষকযুদ্ধ শুধু বিদ্রোহী কৃষকদেরই নয়, সেটা তখন কোনো নতুন ঘটনা নয়, কৃষকদের পিছনে পিছনে হাতে লাল ঝাণ্ডা এবং মুখে সম্পত্তির সাধারণ মালিকানার দাবিসহ আধুনিক প্রলেতারিয়েতের আদি পুরুষদের রঙ্গমঞ্চে এনে আগামী শ্রেণী-সংগ্রামের দিকে ভবিষ্যৎবক্তার অঙ্গুলি নির্দেশ করে যায়। বাইজান্টিয়ামের পতনের মধ্যে থেকেও যেসব পাণ্ডুলিপি বেঁচে গিয়েছিল, রোমের ধ্বংসাবশেষ খুঁড়ে যেসব প্রাচীন মূর্তি পাওয়া গিয়েছিল, তাদের মধ্যে প্রাচীন গ্রীসের এক নতুন জগত আত্মপ্রকাশ করল বিস্মিত পশ্চিমের কাছে। এ জগতের উজ্জ্বল রূপের সামনে অদৃশ্য হল মধ্যযুগের প্রেত। ইতালির শিল্পকলার অভাবনীয় প্রস্ফুটন ঘটল, মনে হল যেন এ সেই প্রাচীন যুগের চিরায়ত শিল্পেরই প্রতিফলন, শিল্পকলার তেমন উন্নতি আর কোনোদিন হয়নি। ইতালি, ফ্রান্স ও জার্মানিতে নতুন, প্রথম আধুনিক সাহিত্যের উদ্ভব

* সঠিক অর্থ: পঞ্চ-শত, অর্থাৎ ষোড়শ শতাব্দী। — সম্পাঃ

হল। তার অল্প কিছুকাল পরেই এল ইংরেজী ও স্পেনীয় সাহিত্যের চিরায়ত যুগ। পুরনো orbis terrarum-এর* সীমা ভেঙে গেল। বিশ্ব সত্যি করে আবিষ্কৃত হল কেবল তখনই এবং পরবর্তী বিশ্ববাণিজ্যের ও হস্তশিল্প থেকে কারখানা শিল্পে উত্তরণের ভিত্তি রচিত হল, তা থেকেই আবার আধুনিক বৃহদায়তন শিল্পের সূত্রপাত। গির্জার আধ্যাত্মিক একনায়কত্ব ভেঙে চুরমার হয়ে গেল, জার্মান জাতিগুলির অধিকাংশই গির্জার এই একনায়কত্বকে প্রত্যক্ষভাবে বর্জন করে প্রটেস্টান্ট মত গ্রহণ করল; আর ল্যাতিন জাতিগুলির মধ্যে আরবদের কাছ থেকে প্রাপ্ত আর নব-আবিষ্কৃত গ্রীক দর্শনের দ্বারা লালিত স্বাধীন চিন্তার এক স্ফূর্তিদীপ্ত প্রেরণা ক্রমেই বেশী করে শিকড় গেড়ে বসতে লাগল এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর বস্তুবাদের রাস্তা তৈরি করে দিল।

এ হল মনুষ্যজাতির অভিজ্ঞাত সর্ববৃহৎ প্রগতিশীল বিপ্লব, এই সময়টার প্রয়োজন ছিল মহাকায়দের, সৃষ্টিও করল মহাকায়দের, মননক্ষমতা, আবেগ এবং চরিত্রের দিক দিয়ে মহাকায়, সর্বাঙ্গীণতা ও বিদ্যার দিক থেকে মহাকায়। এই যে মানুষেরা বুর্জোয়া শ্রেণীর আধুনিক শাসনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছিলেন, তাঁদের একেবারেই বুর্জোয়াসুলভ সীমাবদ্ধতা ছিল না। বরং, এ কালের দুঃসাহসিক চরিত্রই কম বেশী পরিমাণে তাঁদের রঞ্জিত করে তুলেছিল। এই সময়কার গুরুত্বপূর্ণ লোকদের মধ্যে এমন কেউই প্রায় ছিলেন না, যিনি বহু ভ্রমণ করেননি, যাঁর চার-পাঁচটা ভাষার উপর দখল ছিল না, যিনি একাধিক ক্ষেত্রে কৃতিত্ব দেখাননি। লেওনার্দো দা ভিঞ্চি শুধু একজন বিরাট চিত্রশিল্পী ছিলেন তাই নয়, তিনি একজন বিরাট গণিতবিদ, যন্ত্রবিদ ও ইঞ্জিনিয়রও ছিলেন। পদার্থবিদ্যার বিভিন্ন শাখা অনেক মূল্যবান আবিষ্ক্রিয়ার জন্য তাঁর কাছেই ঋণী। আলব্রেখত দ্যুরার ছিলেন চিত্রশিল্পী, ক্ষোদক, ভাস্কর, স্থপতি এবং তাছাড়াও, দুর্গ নির্মাণের যে পদ্ধতির তিনি উদ্ভাবন করেন তার বহু ধারণাই অনেকদিন পরে আবার গ্রহণ করেন মঁতালাঁবের ও দুর্গ নির্মাণের আধুনিকতর জার্মান বিজ্ঞান। মেকিয়াভেলি ছিলেন রাজনীতিক, ঐতিহাসিক, কবি এবং তারই সঙ্গে তিনি ছিলেন আধুনিক কালের প্রথম উল্লেখযোগ্য সামরিক গ্রন্থপ্রণেতা। লুথার যে শুধু গির্জার আভ্গিয়াস আস্তাবল** পরিষ্কার করেছিলেন তাই নয়, জার্মান ভাষাকেও

* **Orbis terrarum** আক্ষরিক অর্থে ভূমিখন্ড। এই শব্দটি প্রাচীন রোমানরা ব্যবহার করত পৃথিবীর অর্থে। — সম্পাঃ

** আভ্গিয়াস আস্তাবল — গ্রীক পুরাকথা অনুসারে আভ্গিয়াস রাজার বিরাট এক আস্তাবল ছিল যা বহু বছর ধবে পরিষ্কৃত হয়নি। এই আস্তাবল পরিষ্কার করা হেরাক্লাসের এক অন্যতম কীর্তি বলে ধরা হয়।

রূপক অর্থে আভ্গিয়াস আস্তাবল কথাটি অত্যন্ত অবহেলা, বিশৃঙ্খলা ও আবর্জনার অর্থে ব্যবহৃত হয়। — সম্পাঃ

আবর্জনামুক্ত তিনি করেছিলেন। আধুনিক জার্মান গদ্য তাঁরই সৃষ্টি এবং যে উদাত্ত স্তোত্রটি ষোড়শ শতাব্দীর মার্সাই (Marseillaise)* হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তার কথা ও সুরও তিনি রচনা করেছিলেন। তখনকার দিনের নায়করা তখনও শ্রম-বিভাগের দাস হয়ে পড়েননি, যে শ্রম-বিভাগের একপেশেমি সহ খর্বকারী প্রতিক্রিয়া আমরা প্রায়ই দেখতে পাই তাঁদের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে। কিন্তু তাঁদের যা সবচেয়ে বৈশিষ্ট্য তা এই যে, তাঁদের প্রায় সকলেই সমসাময়িক জীবনস্রোতের গভীরে, ব্যবহারিক সংগ্রামের ভেতর দিয়ে তাঁদের জীবন ও কার্যকলাপ চালিয়ে গেছেন। পক্ষ অবলম্বন করছেন তাঁরা, লড়াইয়ে যোগ দিয়েছেন, কেউ বক্তৃতা ও লেখার দ্বারা, কেউ তরবারি হাতে, অনেকেই উভয়তই। সেইজন্যই তাদের চরিত্রের পরিপূর্ণতা ও শক্তিমত্তা, যা তাঁদের পুরো মানুষ করে তুলেছে। পুঁথিসর্বস্ব মানুষ — এটা দেখা গেছে ব্যতিক্রমের ক্ষেত্রেই, তারা হয় দ্বিতীয় বা তৃতীয় সারির মানুষ, নয় সাবধানী কূপমণ্ডূক, যারা নিজেদের আঙুল পোড়াতে চায় না।

সেই সময়ে প্রকৃতি বিজ্ঞানও চলছিল সাধারণ বিপ্লবের পরিস্থিতিতে এবং এই বিজ্ঞানটি নিজেও পুরোপুরি বৈপ্লবিক ছিল। তার কারণ, সংগ্রাম করে তবেই অস্তিত্বের অধিকার অর্জন করতে হচ্ছিল তাকে। যে মহান ইতালীয়দের কাছ থেকে আধুনিক দর্শনের শুরু, তাদেরই পাশাপাশি ইনকুইজিশনের দাহমঞ্চ ও কারাগারের জন্য শহীদ জোগাতে হয়েছে প্রকৃতিবিজ্ঞানকে। এবং এটা বৈশিষ্ট্যসূচক যে, প্রকৃতি নিয়ে স্বাধীন অনুসন্ধানকে নিপীড়ন করার ব্যাপারে প্রটেস্টাণ্টরা ক্যাথলিকদের ছাড়িয়ে গিয়েছিল। সের্ভেৎ রক্ত চলাচলের ধারা যখন প্রায় আবিষ্কার করে ফেলেছেন, তখন কালভাঁ তাঁকে পুড়িয়ে মারলেন। এবং বলতে কি তাঁকে দু-ঘণ্টা ধরে জীবন্ত ভাজেন কালভাঁ। আর ইনকুইজিশন জিওর্দানো ব্রুনোকে সরাসরি পুড়িয়ে মারাটাকেই যথেষ্ট মনে করেছিল।

যে বৈপ্লবিক কাজটির দ্বারা প্রকৃতিবিজ্ঞান তার স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিল এবং লুথার কর্তৃক পোপের অনুশাসন পুড়িয়ে ফেলার মতো একটা ঘটনার পুনরাবৃত্তি করেছিল, সেটি হচ্ছে কোপের্নিকাসের অমর গ্রন্থটির প্রকাশনা। এই গ্রন্থের মাধ্যমেই কোপের্নিকাস প্রকৃতির ব্যাপারে গির্জা কর্তৃপক্ষকে সরাসরি দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করেছিলেন, যদিও খানিকটা ভয়ে ভয়ে, এবং বলা যেতে পারে মৃত্যুশয্যায় আশ্রয় নেবার পর। ধর্মতত্ত্বের হাত থেকে প্রকৃতিবিজ্ঞানের মুক্তিসাধন সেই সময় থেকেই শুরু হয়,

* এঙ্গেলস এখানে লুথারের স্তোত্র "Ein' feste Burg ist unser Gott" ('প্রভুই আমাদের সত্যকার সহায়')-এর কথা বলছেন। এই গানটিকে হাইনে 'রিফর্মেশনের মার্শাই' আখ্যা দেন তাঁর গ্রন্থ 'জার্মানিতে ধর্ম ও দর্শনের ইতিহাস প্রসঙ্গে', ২য় খণ্ডে। — সম্পাঃ

যদিও, বিশেষ বিশেষ পাল্টা দাবির লড়াইকে আমাদের সময়কাল পর্যন্ত টেনে আনা হয়েছে এবং কারুর কারুর চিত্তে তার এখনো নিষ্পত্তি হয়নি। তারপর থেকে বিজ্ঞানের বিকাশও লম্বা পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে এবং বলা যায় যেন, যাত্রাবিন্দু থেকে দূরত্বের (সময়ের) বর্গফলের অনুপাতে তার শক্তিবৃদ্ধি হয়েছে। এর দ্বারা জগতকে যেন এটাই প্রমাণ করতে হল যে, জৈব-বস্তুর সর্বোচ্চ ফল যে মানব মন তার ক্ষেত্রে গতির নিয়মটি অতঃপর অজৈব-বস্তুর ক্ষেত্রের গতি-নিয়মের ঠিক উল্টো।

প্রকৃতিবিজ্ঞানের বিকাশের প্রথম যে পর্ব এখন শুরু হল, তার প্রধান কাজ ছিল হাতের কাছে এখনি যেসব মালমশলা পাওয়া গিয়েছে সেগুলিকে আয়ত্ত করা। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একেবারে গোড়া থেকে শুরু করতে হয়েছিল। প্রাচীনকাল থেকে পাওয়া গিয়েছিল ইউক্লিড এবং টলেমির সৌর-প্রণালী। আরবরা দিয়ে গিয়েছিল দশমিক হিসাব, বীজগণিতের সূচনা, আধুনিক সংখ্যাচিহ্ন এবং আলকেমি। খ্রীষ্টীয় মধ্যযুগ কিছুই দিয়ে যায়নি। এই পরিস্থিতিতে, সবচেয়ে প্রাথমিক ধরনের যা প্রকৃতিবিজ্ঞান, অর্থাৎ পার্থিব বস্তু ও জ্যোতিষ্ক সমূহের বলবিজ্ঞান, — অনিবার্যভাবেই প্রথম স্থান অধিকার করল এবং তারই সঙ্গে চলল, এরই পরিচারিকা হিসাবে গাণিতিক প্রণালীর উদ্ভাবন ও নিখুঁতীকরণ। মহৎ কীর্তি সম্পন্ন হয় এক্ষেত্রে। নিউটন ও লিনিয়স দ্বারা সূচিত এ পর্বসমাপ্তিতে দেখতে পাই যে, বিজ্ঞানের এই শাখাগুলি একটা পরিণতিতে পেঁছে গিয়েছে। প্রধানতম গাণিতিক প্রণালীগুলির মূল বৈশিষ্ট্য প্রতিষ্ঠিত হল: বিশ্লেষণমূলক জ্যামিতির (analytical geometry), — প্রধানত দেকার্ত প্রতিষ্ঠা করলেন, লগারিথমের (logarithm) — নেপিয়ার এবং অন্তরকলন ও সমাকলনের (differential and integral calculus) — লাইবনিৎস ও সম্ভবতঃ নিউটন। ঘন বস্তু (solid bodies) সম্পর্কিত বলবিদ্যার (mechanics) ক্ষেত্রেও এই কথা বলা চলে, তার প্রধান নিয়মগুলি চিরকালের মতো স্পষ্ট করা হল। সর্বশেষে, সৌরজগতের জ্যোতির্বিদ্যায় কেপলার আবিষ্কার করলেন গ্রহের গতির নিয়ম এবং সেই নিয়মকে নিউটন সূত্রায়িত করে দিলেন বস্তুর গতির সাধারণ নিয়মের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। প্রকৃতিবিজ্ঞানের অন্যান্য শাখাগুলি এইরকম একটা প্রাথমিক পরিণতিতেও এসে পেঁছিতে পারেনি। এই পর্বের শেষ দিকেই মাত্র তরল ও বায়বীয় পদার্থের বলবিদ্যার ক্ষেত্রে আরো চর্চা হয়েছিল। [এলপাইন পার্বত্য স্রোতগুলির নিয়ন্ত্রণের প্রসঙ্গে তরিচেলি (Torrecelli)]* প্রকৃত পদার্থবিদ্যা তখনও তার প্রাথমিক, গোড়ার অবস্থা থেকে একটুও এগিয়ে যেতে পারেনি, ব্যতিক্রম হয়েছে কেবল আলোকবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে (optics)। তার অসাধারণ অগ্রগতি

* পাণ্ডুলিপির মার্জিনে এঙ্গেলস যে টীকা লিখেছিলেন তাই এখানে ও অন্যান্য জায়গায় চৌকো বন্ধনী দিয়ে দেওয়া হল। — সম্পাঃ

যে হয়েছে তা জ্যোতির্বিদ্যার বাস্তব প্রয়োজনের তাগিদেই। ফ্লজিস্টিক তত্ত্ব* দিয়ে রসায়ন তখন কেবলমাত্র আলকেমির হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করেছে। ভূতত্ত্ববিদ্যা তখনও মণিক বিদ্যার ভ্রূণাবস্থার বাইরে যেতে পারেনি; এবং সেইজন্যই পুরাজীববিদ্যা তখন পর্যন্ত গড়ে উঠতেই পারেনি। সর্বশেষ, জীববিদ্যার ক্ষেত্রে প্রধান কাজ ছিল — উদ্ভিদবিদ্যা ও প্রাণীবিদ্যারই শুধু নয়, প্রকৃত শারীরতত্ত্ব ও শারীরসংস্থানেরও প্রচুর মালমশলা সংগ্রহ ও প্রাথমিক বাছাই করা। তখনও পর্যন্ত বিভিন্ন প্রকারের প্রাণরূপের নিজেদের মধ্যে তুলনার, তাদের ভৌগোলিক বণ্টন এবং জলবায়ু প্রভৃতির দিক দিয়ে তাদের জীবনধারণ অবস্থার সম্বন্ধে অনুসন্ধানের প্রায় কোনো কথাই ওঠেনি। এবিষয়ে উদ্ভিদবিদ্যা ও প্রাণীবিদ্যা একটা মোটামুটি পরিণতিতে পৌঁছেছিল লিনিয়সের কল্যাণে।

কিন্তু এই পর্যায়ের বিশেষ চরিত্র হচ্ছে এই একটি অদ্ভুত সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গির সংরচন যার কেন্দ্রীয় কথা হচ্ছে -- **প্রকৃতির পরম অব্যয়তার** ধারণা। এই মত অনুযায়ী প্রকৃতির উদ্ভব যেভাবেই হোক না কেন, একবার দেখা দেবার পর তা যতদিন টিকেছে ততদিন একইভাবেই থেকেছে। গ্রহ-ও তাদের উপগ্রহগুলি কোনো এক রহস্যজনক 'প্রথম তাড়না' দ্বারা একবার গতিবেগ পেয়ে যাবার পর চিরকাল ধরে অথবা অন্তত যতদিন না সমস্ত কিছুর শেষ হয়ে যায় ততদিন নির্ধারিত উপবৃত্তে তাদের বারংবার আবর্তন চলতেই থাকছে। তারাগুলি চিরকালের জন্য নিজ নিজ জায়গায় স্থির ও অচল হয়ে আছে; 'বিশ্ব অভিকর্ষের' টানে সেগুলি পরস্পরকে ঠিক জায়গায় রেখে দিয়েছে। কোনোরকম পরিবর্তন না হয়ে পৃথিবী আবহমান কাল ধরে, অথবা যদি বলতে চান সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে, একইরকম থেকে গিয়েছে। এখনকার যে 'পঞ্চমহাদেশ', সেগুলির অস্তিত্বও বরাবর ধরে চলে এসেছে এবং সেগুলির পর্বত, উপত্যকা, নদী, জলবায়ু, গাছপালা, পশুপক্ষীও রয়েছে একইরকম, ব্যতিক্রম হয়েছে কেবল মানুষের হাতে যেটুকু পরিবর্তন বা পুনর্বপন হয়েছে। উদ্ভিদ ও প্রাণীর প্রজাতি প্রথম উদ্ভবের সময় থেকেই চিরকালের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে আছে। সদৃশ অবিরত সদৃশেরই জন্ম দিয়েছে এবং সম্ভবত কোথাও কোথাও সংকরের ফলে নতুন প্রজাতির সৃষ্টি হয়ে থাকতে পারে এটুকু মানাই লিনিয়সের পক্ষে এক মস্ত ব্যাপার। মানুষের যে ইতিহাস বিকাশ পায় কালগতভাবে তার প্রতিতুলনায় প্রকৃতির ইতিহাসে আরোপ করা হল কেবল স্থানগত বিকাশ। প্রকৃতির সমস্ত রকম পরিবর্তন ও বিকাশকে অস্বীকার করা হল। যে প্রকৃতিবিজ্ঞান প্রথম দিকে ছিল এত বৈপ্লবিক, হঠাৎ দেখা গেল তা এক

* ১৮শ শতকে রসায়ন ক্ষেত্রের প্রচলিত মতবাদ অনুসারে দাহ্য বস্তুর দেহে ফ্লজিস্টন নামক বিশেষ এক বস্তুর অস্তিত্ব কল্পনা করা হত, যা নাকি দহন ক্রিয়ার সময় বস্তুর দেহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে যায়। এ তত্ত্বের অযৌক্তিকতা প্রমাণ করেন বিখ্যাত ফরাসী রাসায়নিক আ. ল. লাভুয়াজিয়ে, ইনি সঠিক ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন যে, দহন ক্রিয়া হল দাহ্য বস্তুটির সঙ্গে অক্সিজেন সংযোজনের প্রতিক্রিয়া। — সম্পাঃ

পুরোপুরি রক্ষণশীল প্রকৃতির সম্মুখীন, যেখানে আরম্ভের সময় যা কিছু যেরকম ছিল আজও সব সেইরকমই রয়েছে, আরম্ভের সময় থেকে শুরু করে বিশ্বের অবসান পর্যন্ত বা চিরকালের জন্য সব জিনিস একইরকম থাকবে।

জ্ঞানের দিক দিয়ে এবং এমনকি উপাদান বাছাইয়ের দিক দিয়েও অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের প্রকৃতিবিজ্ঞান প্রাচীন গ্রীকদের চেয়ে যেমন উঁচুতে, সে উপাদানসমূহের ওপর ভাবাদর্শগত দখল ও প্রকৃতি সম্বন্ধে সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গির দিক দিয়ে তা ঠিক তেমনি নিচুতে। গ্রীক দার্শনিকদের মতে বিশ্ব হচ্ছে মূলত সেইরকমই এক ব্যাপার যার উদ্ভব হয়েছে সংপ্লব (chaos) থেকে, যা বিকশিত হয়েছে, যা হয়ে উঠেছে। কিন্তু যে সময়ের কথা আমরা আলোচনা করছি তখনকার প্রকৃতিবিজ্ঞানীদের মতে বিশ্ব হচ্ছে শিলীভূত, অপরিবর্তনীয় একটা কিছু; এবং এঁদের অধিকাংশের কাছেই তা একেবারে এক লহমায় তৈরি গিয়েছে। বিজ্ঞান তখনও ধর্মতত্ত্বের জালে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে। বিজ্ঞান তখন সবকিছুরই চূড়ান্ত কারণ হিসাবে খুঁজতে চাইত ও খুঁজে পেত এমন এক প্রকৃতি-বহির্ভূত তাড়না যাকে প্রকৃতির কিছু দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। এমন যে-আকর্ষণ শক্তিটি নিউটন কর্তৃক বিশ্ব মহাকর্ষ রূপে সাড়ম্বরে ঘোষিত হল, সেই আকর্ষণ শক্তিকে যদি বস্তুর একটি মৌলিক ধর্ম বলেই ধরা হয়, তাহলে অব্যাখ্যাত যে স্পর্শক শক্তির (tangential force) ফলে গ্রহ-উপগ্রহের কক্ষপথ তৈরি হয়েছে, সেটি আসছে কোথা থেকে? অসংখ্য প্রকারের জীবজন্তু ও উদ্ভিদের উদ্ভবই বা হল কেমন করে? সর্বোপরি মানুষ এল কেমন করে, কেননা, এটা তো স্থিরনিশ্চিত যে, মানুষ অনাদিকাল থেকে ছিল না। এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তরে প্রকৃতিবিজ্ঞান অতি প্রায়শই সর্ববস্তুর স্রষ্টাকেই দায়ী করে দিত। এই পর্বের শুরুতে কোপের্নিকাস ধর্মতত্ত্বকে বাতিল করছেন এবং নিউটন পর্বান্ত করছেন এক স্বর্গীয় প্রথম তাড়না প্রকল্প দিয়ে। আলোচিত পর্বের প্রকৃতিবিজ্ঞান যে সর্বোচ্চ সাধারণ বোধে পৌঁছায় সেটি হচ্ছে প্রকৃতি-ব্যবস্থায় একটা উদ্দেশ্যময়তার বোধ, ভল্‌ফের সেই অগভীর পরমলক্ষ্যবাদ (teleology) যাতে বিড়ালের সৃষ্টি হয়েছে ইঁদুর খাবার জন্য, ইঁদুরের সৃষ্টি হয়েছে বিড়ালের খাদ্য হবার জন্য এবং সমগ্র প্রকৃতির সৃষ্টি হয়েছে সৃষ্টিকর্তার বিচক্ষণতা প্রমাণের জন্য। সেই সময়কার দর্শনের এটা একটা বিশেষ যোগ্যতারই পরিচয় যে, সে দর্শন প্রকৃতি সম্বন্ধে সমসাময়িক জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার দ্বারা নিজেকে বিপথগামী হতে দেয়নি, স্পিনোজা থেকে আরম্ভ করে মহান ফরাসী বস্তুবাদীরা পর্যন্ত সে দর্শন বিশ্ব থেকেই বিশ্বকে ব্যাখ্যার জন্য জিদ করত এবং খুঁটিনাটিতে প্রমাণের কাজটা তা ছেড়ে দিয়েছিল ভবিষ্যত প্রকৃতিবিজ্ঞানের উপর।

অষ্টাদশ শতাব্দীর বস্তুবাদীদেরও আমি এই পর্বেরই অন্তর্ভুক্ত করি, কেননা তাঁদের হাতেও উপরে বর্ণিত মালমশলা ছাড়া প্রকৃতিবিজ্ঞানের আর কোনো উপাদান ছিল না। ক্যাণ্টের যুগান্তকারী গ্রন্থ তাঁদের কাছে গোপনই থেকে গিয়েছিল, এবং লাপ্লাস

এসেছিলেন অনেক পরে। আমাদের একথা ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, প্রকৃতি সম্বন্ধে এই অচল দৃষ্টিভঙ্গিটি বিজ্ঞানের প্রগতির ফলে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেও ঊনবিংশ শতাব্দীর সমগ্র প্রথমার্ধ পর্যন্ত তা প্রাধান্য করেছে এবং এমনকি এখনও পর্যন্ত সমস্ত স্কুলেই আসলে সেই শিক্ষাই দেওয়া হয়ে থাকে।*

প্রকৃতিসম্বন্ধীয় এই প্রস্তরীভূত ধারণা প্রথম যিনি ভাঙলেন তিনি কোনো প্রকৃতিবিজ্ঞানী নন, তিনি হচ্ছেন একজন দার্শনিক। ১৭৫৫ সালে **ক্যাণ্টের** 'সাধারণ প্রাকৃতিক ইতিহাস ও নভঃতত্ত্ব' প্রকাশিত হল। প্রথম তাড়নার প্রশ্নটি বাতিল করা হল। পৃথিবী ও সমগ্র সৌর জগতটিকে দেখান হল এমন একটি বস্তুরূপে যা কালক্রমে **গড়ে উঠেছে**। 'পদার্থবিদ্যা! অধিবিদ্যা থেকে সাবধান থেকো!' নিউটনের এই সতর্কবাণীর মধ্যে মননের প্রতি যে বিতৃষ্ণা প্রকাশ পেয়েছিল প্রকৃতিবিজ্ঞানীদের বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের যদি সে বিতৃষ্ণা কিছু কম থাকত, তাহলে তাঁরা ক্যাণ্টের এই একটিমাত্র প্রতিভাদীপ্ত উদ্ভাবন-থেকেই এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারতেন যার ফলে তাঁরা অবিরাম বিচ্যুতি ও ভুলপথে অপরিসীম সময় ও শ্রমের অপব্যয় থেকে বাঁচতেন। তার কারণ,পরবর্তী সমস্ত অগ্রগতির যাত্রাবিন্দুটি ছিল ক্যাণ্টের আবিষ্কারের মধ্যে। পৃথিবী যদি গড়ে উঠা একটি ব্যাপার হয়, তাহলে পৃথিবীর বর্তমান ভূতাত্ত্বিক, ভৌগোলিক ও জলবায়ুগত অবস্থা ও তার উদ্ভিদ ও জীবজন্তু এসবও একইরকমভাবে গড়ে উঠা ব্যাপার। পৃথিবীর তাহলে একটা প্রসারগত সহ-অবস্থানের রূপে শুধু নয়, কালগত — পরম্পরার রূপে একটা ইতিহাস আছে। যদি সঙ্গে সঙ্গেই এই পথে দৃঢ়ভাবে আরও অনুসন্ধান চালিয়ে

* যে ব্যক্তির বৈজ্ঞানিক কর্ম এই ধারণার অবসানের দিক দিয়ে বিশেষ মূল্যবান উপাদান জুগিয়েছিল, সেই ব্যক্তিই ১৮৬১ সালেও কী রকম অটুটভাবে এই ধারণাকেই আঁকড়ে ধরে থাকতে পারেন, তা দেখতে পাওয়া যাবে নিম্নলিখিত ক্ল্যাসিক কথাগুলিতে:

'আমরা যতটা বুঝতে পারছি সেদিক থেকে আমাদের সৌর জগতের সমস্ত ব্যবস্থাবলীর লক্ষ্য হচ্ছে যা আছে তা রক্ষা করা এবং দীর্ঘদিন ধরে অপরিবর্তনীয় ভাবে চালিয়ে যাওয়া। ঠিক যেমন অতি পুরাকাল থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত পৃথিবীর কোনো জীবজন্তু ও কোনো উদ্ভিদ কোনোরকম উন্নততর অবস্থায় বা সাধারণভাবে কোনোরকম ভিন্নতর অবস্থায় পৌঁছয়নি, ঠিক যেমন সমস্ত জীবসত্তাতেই আমরা পাই **পাশাপাশি** বর্তমান স্তর, পরস্পরের **অনুগামী** স্তর নয়, ঠিক যেমন আমাদের নিজেদের প্রজাতিটি দৈহিক দিক দিয়ে সর্বদাই একই রকম রয়েছে, — ঠিক তেমনি সহ-অবস্থিত মহাজাগতিক বস্তুগুলির মধ্যে প্রচুর বৈচিত্র্য থাকলেও আমাদের এরকম ধারণা করে নেওয়ার কোনো কারণ নেই যে, এই রূপগুলি বিকাশের বিভিন্ন স্তর মাত্র। বরং উল্টে, সৃষ্টির সবকিছুই স্বক্ষেত্রে **সমান** নিখুঁত।' (ম্যাড্‌লার, 'জনবোধ্য জ্যোতির্বিদ্যা', বার্লিন, ১৮৬১, ৫ম সংস্করণ, পৃঃ ৩১৬।) (এঙ্গেলসের টীকা।) — উল্লিখিত বইখানির সম্পূর্ণ নাম হচ্ছে: J. H. Mädler, *Der Wunderbau des Weltalls oder populäre Astronomie* (মহাজগতের অপরূপ কাঠামো বা জনবোধ্য জ্যোতির্বিদ্যা), 5 Aufl. Berlin, 1861. — সম্পাঃ

যাওয়া হত, তাহলে এতদিনে প্রকৃতিবিজ্ঞান আজকের চেয়ে অনেকবেশী অগ্রসর হয়ে যেত। কিন্তু দর্শনে আর কী সুফল হত? অনেক বছর পরে যতদিন না লাপ্লাস এবং হেরশেল ক্যাণ্টের রচনার অন্তর্বস্তুকে আরও ব্যাখ্যা ও বিশদে প্রমাণিত করলেন এবং এইভাবে ক্রমশ 'নীহারিকা প্রকল্পটি'* স্বীকৃতির আয়োজন করে দিলেন, ততদিন পর্যন্ত ক্যাণ্টের রচনার আশু ফল কিছু হয়নি। পরবর্তী আবিষ্কারগুলির ফলে অবশেষে এই অনুমানের জয় সাধিত হল। তাদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে: স্থির তারাগুলির প্রকৃত গতি; মহাশূন্যে প্রতিবন্ধক মাধ্যমের অস্তিত্ব প্রমাণ; বর্ণালীগত বিশ্লেষণ দ্বারা মহাজাগতিক বস্তুর রাসায়নিক অভিন্নতা এবং ক্যাণ্ট অনুমিত ভাস্বর নীহারিকাবৎ পিণ্ডের অস্তিত্ব প্রমাণ। [পৃথিবীর আবর্তনের উপর জোয়ার-ভাটার প্রতিবন্ধমূলক প্রক্রিয়ার বিষয়টিও কেবল এখন বোঝা গিয়েছে। এই বিষয়টিও ক্যাণ্টেরই আবিষ্কৃত।]

প্রকৃতি **বর্তমান** শুধু তাই নয়, তার **উদ্ভব** ও **রূপান্তর** ঘটে, এই উদীয়মান উপলব্ধির সমর্থন যদি অন্য একটা মহল থেকে না পাওয়া যেত, তাহলে পৃথিবীতে অপরিবর্তনীয় জীবসত্তার বাস, এই অনুমানের সঙ্গে পৃথিবী পরিবর্তনশীল এই ধারণার স্ববিরোধ বিষয়ে অধিকাংশ প্রকৃতিবিজ্ঞানীরা এত শীঘ্রই সচেতন হয়ে উঠত কিনা তাতে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে। ভূতত্ত্ববিদ্যার উদ্ভব হল ও তা দেখিয়ে দিল যে, পৃথিবীর ভূস্তরগুলি একটার পর একটা গড়ে উঠেছে এবং একটার পর একটা জমা পড়েছে তাই নয়; লুপ্ত জীবজন্তুর খোলস ও কঙ্কাল এবং এখন-আর-নেই এরকম গাছপালার গুঁড়ি, পাতা ও ফলও রয়েছে এইসব স্তরে। সমগ্র পৃথিবীটারই শুধু নয়, পৃথিবীর বর্তমান উপরিতল ও পৃথিবীতে যেসব গাছপালা ও জীবজন্তুর বাস তাদের সমস্তেরই যে একটা কালগত ইতিহাস আছে এটা স্বীকার করতে রীতিমতো সাহস দরকার হয়েছিল। স্বীকৃতি এল প্রথমে নিতান্ত অনিচ্ছাসহকারেই। পৃথিবীর বিপ্লব সম্বন্ধে ক্যুভিয়ের তত্ত্বটি ভাষার দিক দিয়ে বৈপ্লবিক হলেও সারবস্তুর দিক দিয়ে প্রতিক্রিয়াশীল। এই তত্ত্বে একটিমাত্র দৈব-সৃষ্টির জায়গায় ধারাবাহিক বারম্বার সৃষ্টিকার্যের কথা বলা হয়েছে, এবং অলৌকিককে করে তোলা হয়েছে প্রকৃতির প্রধান কারিকা। সৃষ্টিকর্তার মর্জি অনুযায়ী হঠাৎ হঠাৎ বিপ্লবের বদলে পৃথিবীর ধীর রূপান্তরের ক্রমিক প্রক্রিয়ার তত্ত্ব উপস্থিত করে লাইয়েলই প্রথম ভূতত্ত্ববিদ্যায় একটা কাণ্ডজ্ঞান এনে দিলেন।**

জীব প্রজাতিকে স্থির বলে মনে করে নেওয়ার যে ধারণা, সে ধারণার সঙ্গে তাঁর

* জ্যোতিষ্কাদি ভাস্বর নীহারিকাপুঞ্জ থেকেই উদ্ভূত, এই অনুমান। — সম্পাঃ

** লাইয়েলের মতের, অন্ততঃ তাঁর মতের প্রাথমিক চেহারায়, এটি হচ্ছে এই যে, পৃথিবীর উপর যে শক্তির ক্রিয়া চলছে, সে শক্তিকে তিনি গুণগত ও পরিমাণগতভাবে স্থির বলে মনে করেছেন। পৃথিবীর ক্রমে ক্রমে ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়ার কথা তিনি স্বীকার করেননি। তাঁর মতে একটা নির্দিষ্ট দিকে পৃথিবীর বিকাশ হচ্ছে না; নিতান্তই বদল হচ্ছে একটা সঙ্গতিহীন, আপতিক ধারায়। (এঙ্গেলসের টীকা।)

যে কোনো পূর্বসূরীর চাইতে লাইয়েলের তত্ত্বের অমিল বেশি। পৃথিবীর উপরিভাগ ও তার সর্বপ্রকার জীবন পরিস্থিতির ক্রমিক রূপান্তরের ধারণা থেকে সরাসরি এল জীবসত্তাগুলির ক্রমিক রূপান্তর ও পরিবর্তমান পরিবেশের সঙ্গে তাদের খাপ খাইয়ে নেওয়ার ধারণা, প্রজাতির পরিবর্তনশীলতার ধারণা। কিন্তু শুধু ক্যাথলিক চার্চের ক্ষেত্রেই নয়, প্রকৃতিবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও ঐতিহ্য হল একটা মহান শক্তি। অনেক বছর ধরে লাইয়েল নিজেই এই বিরোধকে দেখতে পাননি; লাইয়েলের ছাত্ররা তো আরো কম। তার একমাত্র কারণ হল সেই শ্রম-বিভাগ যা তখনকার প্রকৃতিবিজ্ঞানে ইতিমধ্যেই প্রাধান্য পেয়েছে, যার ফলে প্রত্যেকে তার নিজের বিশেষ ক্ষেত্রে কমবেশী আবদ্ধ হয়ে পড়ে, খুব কম লোকই থাকে, যাদের সামগ্রিক দৃষ্টি নষ্ট হয় না।

ইতিমধ্যে পদার্থবিদ্যার বিরাট অগ্রগতি হয়েছে। তিনজন ভিন্ন ব্যক্তি প্রায় একইসঙ্গে তার ফলাফলের সারসংকলন করেন ১৮৪২ সালে, প্রকৃতিবিজ্ঞানের এই শাখাটির দিক থেকে এই অগ্রগতি যুগান্তকারী। হিলব্রনে মেয়ার এবং ম্যাঞ্চেস্টারে জাউল প্রমাণ করে দেন যে, তাপ যন্ত্রশক্তিতে এবং যন্ত্রশক্তি তাপে রূপান্তরিত হয়। তাপের যান্ত্রিক তুল্যমূল্য নির্ধারণের ফলে এটা তর্কাতীত হয়ে ওঠে। একই সময়ে গ্রোভ, পেশাগতভাবে যিনি প্রকৃতিবিজ্ঞানী নন, ইংরাজ আইনজীবী, তিনি ইতিমধ্যেই উপনীত পদার্থবিদ্যার বিভিন্ন ফলাফলকে গুছিয়ে প্রমাণ করলেন যে, সমস্ত তথাকথিত ভৌত শক্তি, — যান্ত্রিক শক্তি, তাপ, আলো, বিদ্যুৎ চৌম্বক শক্তি, এমনকি তথাকথিত রাসায়নিক শক্তিও নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে শক্তির বিন্দুমাত্র ক্ষয় না ঘটিয়ে পরস্পরে রূপান্তরিত হয় এবং এইভাবে পদার্থ অনুশীলন দ্বারা আরেকবার ডেকার্টের এই প্রতিপাদ্যও প্রমাণিত হল যে, জগতে যে গতি রয়েছে তার পরিমাণ হচ্ছে নির্দিষ্ট। তার ফলে বিশেষ বিশেষ ভৌত শক্তিগুলি, অর্থাৎ বলতে গেলে পদার্থবিদ্যার অপরিবর্তনীয় সব 'প্রজাতি', বস্তুর গতির বিভিন্নকৃত নানা রূপে পরিণত হল, যা এক থেকে অন্যে বদলে যাচ্ছে কতগুলি নির্দিষ্ট নিয়মানুযায়ী। এই পরিমাণ ভৌত শক্তি বর্তমান, এই যে আপাতিকতা তা বিজ্ঞান থেকে বর্জিত হল ভৌত শক্তির আন্তর্সংযোগ ও পারস্পরিক রূপান্তর প্রমাণিত হওয়ার পর। ইতিপূর্বে জ্যোতির্বিদ্যার মতো, পদার্থবিদ্যাও যে ফলাফলে এসে পৌঁছল তা বিজ্ঞানের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তরূপে অবধারিতভাবেই গতিষ্ণু বস্তুর চিরন্তন চক্রের দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করল।

লাভুয়াজিয়ের এবং বিশেষ করে ডলটনের পর থেকে রসায়নবিজ্ঞানের আশ্চর্যরকম দ্রুত বিকাশের ফলে প্রকৃতিসম্বন্ধীয় পুরানো ধারণার বিরুদ্ধে আর একটি দিক থেকে আক্রমণ হল। যে সব যৌগিক বস্তু এযাবৎ কেবল জীবন্ত জীবসত্তার মধ্যেই সৃষ্ট হয়ে এসেছে, অজৈব উপায়ে তা প্রস্তুত করার ফলে প্রমাণিত হল যে, রসায়নের নিয়মগুলি জৈব ও অজৈব উভয় ক্ষেত্রেই সমানভাবে কার্যকর এবং জৈব ও অজৈব প্রকৃতির মধ্যে যে

ব্যবধানকে ক্যাণ্টও চিরকালের মতো অনতিক্রম্য বলে মনে করেছিলেন, সে ব্যবধান এর ফলে বহু পরিমাণে দূর হল।

পরিশেষে, গত শতাব্দীর* মধ্যভাগ থেকে নিয়মিতভাবে যেসব বৈজ্ঞানিক পরিভ্রমণ ও অভিযান সংগঠিত হয়েছিল সেই সবের ফলে, পৃথিবীর সর্বাংশে যেসব ইউরোপীয় উপনিবেশ আছে সেখানে বসবাসকারী বিশেষজ্ঞদের দ্বারা সেগুলির সম্বন্ধে আরো পূর্ণাঙ্গ যে অনুসন্ধান চালান হয়েছিল তার ফলে, এবং অধিকন্তু সাধারণভাবে পুরাজীববিদ্যা শারীরতত্ত্ব ও শারীরসংস্থান-বিদ্যার অগ্রগতি, বিশেষত অনুবীক্ষণযন্ত্রের প্রণালীবদ্ধ ব্যবহারের ও কোষের আবিষ্কারের পর থেকে প্রাণীতত্ত্বের গবেষণার ক্ষেত্রেও এত বেশী উপাদান সংগৃহীত হয়েছিল যে, তুলনামূলক পদ্ধতির প্রয়োগ সম্ভব ও আবশ্যক হল। [ভ্রূণবিদ্যা।] একদিকে বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণীর ক্ষেত্রে জীবনাবস্থা নির্ধারণ করা হল তুলনামূলক পদার্থ-ভূগোল দ্বারা; অপরদিকে বিভিন্ন জীবসত্তার পারস্পরিক তুলনা করা হল তাদের অনুরূপ (homologous) অঙ্গের ক্ষেত্রে এবং সেটা শুধু জীবসত্তার পরিণত অবস্থার ক্ষেত্রেই নয়, বিকাশের সর্বপর্যায়েই। এই গবেষণা যত বেশী গভীর ও সুনির্দিষ্ট ভাবে চলল ততই উপরে বর্ণিত অপরিবর্তমান স্থির নির্দিষ্ট জৈব প্রকৃতির অনড় ছকটা তার স্পর্শে ভেঙে পড়তে লাগল। উদ্ভিদ ও প্রাণীর ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতিগুলি যে ক্রমেই বেশী করে ভেদাভেদ মিলিয়ে মিশে যেতে লাগল শুধু তাই নয়, এমন সব প্রাণী পাওয়া গেল যেমন amphioxus** এবং lepidosiren*** যারা পূর্বেকার সমস্ত শ্রেণী-বিভাগকে যেন বিদ্রূপ করল [ceratodus**** ও archeopteryx*) প্রভৃতি]। পরিশেষে এমন সব জীবসত্তারও দেখা পাওয়া যেতে লাগল, যা উদ্ভিদ-জগত নাকি প্রাণী-জগত কার অন্তর্ভুক্ত বলা কঠিন। পুরাজীববিদ্যা সংক্রান্ত রেকর্ডের ফাঁকগুলো ক্রমেই বেশী করে পূরণ হয়ে যেতে লাগল এবং তার ফলে নিতান্ত একগুঁয়ে ব্যক্তিকেও স্বীকার করতে হল যে, সামগ্রিকভাবে জীবজগতের বিবর্তন-ইতিহাস ও স্বতন্ত্রভাবে জীবসত্তাগুলির বিবর্তন-ইতিহাস এই দুইয়ের মধ্যে এক জাজ্বল্যমান সমান্তরাল ধারা আছে। যে গোলকধাঁধার মধ্যে উদ্ভিদতত্ত্ব ও প্রাণীতত্ত্ব

* অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দী। — সম্পাঃ

** Amphioxus — মাছের মতো ছোট প্রাণী, ৫ সেণ্টিমিটার লম্বা, ভারত মহাসাগরে ও প্রশান্ত মহাসাগরের মালয় দ্বীপপুঞ্জ ও জাপানের কাছে, ভূমধ্যসাগরে, কৃষ্ণসাগরে ও অন্যান্য জায়গাতেও পাওয়া যায়। মেরুদণ্ডহীন প্রাণী থেকে মেরুদণ্ডী প্রাণীতে উৎক্রমণ-রূপ। — সম্পাঃ

*** Lepidosiren — ফুসফুসযুক্ত জাতের মাছ, ফুলকা ফুসফুস দুই আছে; দক্ষিণ আমেরিকায় পাওয়া যায়। — সম্পাঃ

**** Ceratodus — ফুলকা ফুসফুস দুই আছে এরকম মাছ, অস্ট্রেলিয়ায় পাওয়া যায়। — সম্পাঃ

*) Archeopteryx — একরকম প্রাণী, পক্ষিশ্রেণীভুক্ত, যার মধ্যে সরিসৃপের বৈশিষ্ট্যও একই সঙ্গে দেখা যায়। এই প্রাণী এখন বিলুপ্ত। — সম্পাঃ

ক্রমশই বেশী করে হারিয়ে যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছিল তা থেকে বেরিয়ে আসার এরিয়াডেন (Ariadne's) সূত্র পাওয়া গেল। বৈশিষ্ট্যের ব্যাপার যে, সৌরজগতের চিরন্তনতার নীতির বিরুদ্ধে ক্যাণ্টের আক্রমণের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই, ১৭৫৯ সালে প্রজাতিসমূহের নির্দিষ্টতার ধারণার বিরুদ্ধে ভল্‌ফও প্রথম আক্রমণ করলেন ও বংশগতির তত্ত্ব ঘোষণা করলেন। কিন্তু তাঁর ক্ষেত্রে যেটা শুধু একটা অপূর্ব অনুমান মাত্র ছিল, সেটাই অকেন, লামার্ক ও বেরের হাতে সুনির্দিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করল এবং সেটাকেই ঠিক একশত বৎসর পরে ১৮৫৯ সালে ডারউইন বিজয় গর্বে বিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত করলেন। প্রায় এই সঙ্গেই দেখা গেল যে কোষ ও প্রোটোপ্ল্যাজ্‌ম্‌ (protoplasm) আগে সমস্ত জীবসত্তার শেষ গঠনগত উপকরণ বলেই সাব্যস্ত হয়েছিল, তাকে স্বাধীনভাবে জীবন্ত সর্বনিম্ন জৈব রূপ হিসাবেও পাওয়া যাচ্ছে। এই আবিষ্কারের ফলে শুধু যে জৈব ও অজৈব প্রকৃতির মধ্যকার ব্যবধানই ন্যূনতম হয়ে গেল তাই নয়; জীবসত্তার ক্রমোদ্ভবের তত্ত্বে পূর্বে যে প্রধান মূল বাধাটি ছিল সেটাও এর ফলে দূর হয়ে গেল। প্রকৃতি সম্বন্ধে এই নব বোধ তার সমস্ত প্রধান প্রধান দিক থেকে সুসম্পূর্ণ হয়ে উঠল: সমস্ত রকমের অনড়তা ভেঙে গেল; সব স্থিরতা খসে গেল; যে সমস্ত বৈশিষ্ট্যকে চিরন্তন মনে করা হত, সেগুলি হয়ে উঠল অস্থায়ী, প্রমাণিত হল যে, প্রকৃতির সবটাই চিরন্তন প্রবাহ ও চক্রে ধাবিত।

* * *

এই ভাবে আমরা আবার ফিরে গেলাম গ্রীক দর্শনের মহান প্রতিষ্ঠাতাদের মনন-ভঙ্গিতে: ক্ষুদ্রতম কণিকা থেকে বৃহত্তম বস্তু পর্যন্ত, বালুকণা থেকে সূর্য পর্যন্ত, প্রটিস্টা (protista) থেকে মানুষ পর্যন্ত সমস্ত প্রকৃতিরই অস্তিত্ব এক চিরন্তন উদয় ও বিলয়ের মধ্যে, এক নিরন্তর প্রবাহের মধ্যে, এক বিরামহীন গতি ও পরিবর্তনের মধ্যে। একটা মূল পার্থক্য কেবল এইখানে যে, গ্রীকদের কাছে যা ছিল একটি প্রতিভাদীপ্ত আন্দাজ সেটা আমাদের কাছে হল অভিজ্ঞতাভিত্তিক একান্তই বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলস্বরূপ, এবং তাই এটা ঢের বেশী নির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট রূপ ধারণ করেছে। অবশ্য এই চক্রগতির হাতেনাতে প্রমাণের মধ্যে ফাঁক নেই এমন নয়; কিন্তু ইতিমধ্যেই পাকাপাকি যা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে, তার তুলনায় এই ফাঁকগুলি নিতান্ত তুচ্ছ এবং বছরে বছরে সেগুলি ক্রমেই ভরে যাচ্ছে। তাছাড়া, খুঁটিনাটি প্রমাণের ব্যাপারে অসম্পূর্ণতা না থেকে পারে না, কেননা, মনে রাখতে হবে যে, গ্রহান্তর জ্যোতির্বিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, ভূবিদ্যা — বিজ্ঞানের এই মূল শাখাগুলির বৈজ্ঞানিক অস্তিত্ব মাত্র একশ বছরের এবং শারীরতত্ত্বে তুলনামূলক পদ্ধতির উদ্ভব কেবল পঞ্চাশ বছর আগে; আর, প্রায় সমস্ত প্রাণন বিকাশের মূল রূপ যে কোষ, তার আবিষ্কার চল্লিশ বছরও নয়!

* * *

ছায়াপথের প্রত্যন্ততম নক্ষত্র চক্রের দ্বারা পরিবেষ্টিত আমাদের এই মহাজাগতিক দ্বীপের অগণিত সূর্য ও সৌরজগতের বিকাশ ঘটেছে ঘূর্ণ্যমান দীপ্তিময় বাষ্পপুঞ্জের সংকোচন ও শীতলতাপ্রাপ্তির ফলে। এই বাষ্পপুঞ্জের গতির নিয়ম কী তা হয়তো উদ্ঘাটিত হবে কয়েক শতকের পর্যবেক্ষণ থেকে নক্ষত্রদের প্রকৃত গতির হদিশ পাবার পর। স্বভাবতই এই বিকাশ সর্বক্ষেত্রে সমান গতিতে হয়নি। আমাদের নাক্ষত্রিক জগতে এমন অন্ধকার দেহ, যা নিতান্ত গ্রহ নয় সুতরাং মৃত সূর্য, তার অস্তিত্বের কথা জ্যোতির্বিদ্যায় ক্রমেই অনুমিত হচ্ছে (ম্যাডলার)। অন্যদিকে, (সেকির মতানুযায়ী) বাষ্পীভূত নীহারিকাপুঞ্জের একাংশ আমাদের নক্ষত্রমণ্ডলের মধ্যে রয়েছে অসম্পূর্ণ সব সূর্যের আকারে, এর ফলে — ম্যাডলার যা বলেন, — এই অনুমান বাতিল হয় না যে, অন্য নীহারিকাগুলি হল সুদূরবর্তী মহাজাগতিক দ্বীপপুঞ্জ, যার যার বিকাশের আপেক্ষিক স্তরটি নির্ণীত হতে পারে স্পেক্ট্রোস্কোপ দ্বারা।

এই একটি স্বতন্ত্র নীহারিকাপিণ্ড থেকে কী ভাবে সৌরজগত বিকশিত হয়ে ওঠে তা অদ্যাবধি অতুলনীয় এক কৃতিত্বে বিশদভাবে দেখিয়েছেন লাপ্লাস। পরবর্তী কালের বিজ্ঞান তাঁর কথাকে ক্রমেই বেশী করে সমর্থন করেছে।

এইভাবে স্বতন্ত্র এক একটা দেহ যা তৈরী হল, সূর্য তথা তার গ্রহ ও উপগ্রহ — এই সবের মধ্যে প্রথমে পদার্থের যে গতিরূপটার প্রাধান্য থাকে তাকে আমরা বলি তাপ। এমনকি এখনও সূর্যের মধ্যে যে তাপ রয়েছে তার মধ্যে উপাদানগুলির রাসায়নিক যৌগিকের কোনো প্রশ্নই ওঠে না। এইরকম অবস্থায় তাপ কী পরিমাণে বিদ্যুৎ বা চৌম্বক শক্তিতে পরিণত হয় তা ক্রমাগত সৌর পর্যবেক্ষণের পরই দেখা যাবে। একথা আজ প্রমাণিত বললেই চলে যে, সূর্যের মধ্যে যে যান্ত্রিক গতি আছে তার উদ্ভব একান্তই তাপের সঙ্গে ভারের সংঘাত থেকে।

এক একটা দেহ যতই ছোটো, ততই তাড়াতাড়ি তা ঠাণ্ডা হয়। সবার আগে হয় উপগ্রহ, গ্রহানুপুঞ্জ, উল্কা, — আমাদের চাঁদ যেমন বহু আগেই নির্বাপিত হয়ে গেছে। গ্রহগুলি হয় আরো ধীরে, এবং কেন্দ্রীয় দেহটি হয় সবচেয়ে ধীরে।

ক্রমিক শীতলভবনের সঙ্গে সঙ্গে গতির যে ভৌত রূপগুলি পরস্পরে রূপান্তরিত হতে থাকে তারা ক্রমশই সামনে আসে ও নিজেদের জাহির করে, অবশেষে এমন একটা পর্যায় আসে যখন রাসায়নিক আকর্ষণ দেখা দিতে থাকে, পূর্বের রাসায়নিকভাবে অভিন্ন উপাদানগুলি একের পর এক রাসায়নিকভাবে বিভিন্ন হয়ে উঠতে থাকে, রাসায়নিক ধর্ম অর্জন করে ও পরস্পর যৌগিক মিলনে বাঁধা পড়ে। এগুলি ক্রমাগত বদলাতে থাকে তাপ হ্রাস পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, যা শুধু আলাদা আলাদা উপাদানগুলিকেই নয়, উপাদানের আলাদা আলাদা সংযোজনকেও ভিন্ন ভিন্নভাবে প্রভাবিত করে এবং তার ফলে গ্যাসীয় পদার্থের একাংশের প্রথমে তরল

ও পরে কঠিন পদার্থে রূপান্তর এবং এভাবে উদ্ভূত নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গেও তা বদলায়।

গ্রহের উপরিভাগটি শক্ত হয়ে আসে এবং উপরে জল সঞ্চিত হয় সেটা ঠিক সেই সময় যখন কেন্দ্রীয় দেহ থেকে প্রাপ্ত তাপের তুলনায় গ্রহের নিজস্ব উত্তাপ ক্রমশই বেশী বেশী হ্রাস পেতে থাকে। আবহবিদ্যা বলতে আজ আমরা যা বুঝি তারই পরিধিগত সব ব্যাপার ঘটতে থাকে গ্রহের বায়ুমণ্ডলে, তার উপরিভাগটা হয়ে ওঠে ভূতাত্ত্বিক পরিবর্তনের ক্ষেত্র; সেখানে ভূগর্ভের জ্বলন্ত তরলের ধীর ক্ষীয়মান বাহ্যিক ফলাফলের চেয়ে বায়ুমণ্ডলের অধঃক্ষেপণজনিত স্তর ক্রমবর্ধমান প্রাধান্য পেতে থাকে।

পরিশেষে তাপমাত্রা যদি এমন সাম্য অর্জন করে যে গ্রহের উপরিভাগের এক বড় অংশের তাপমাত্রা এলবুমেনের (albumen) জীবন ধারণের উপযুক্ত তাপকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে না, তাহলে অন্যান্য রাসায়নিক পূর্বশর্তগুলি অনুকূল থাকলে জীবন্ত প্রোটোপ্ল্যাজমের উদ্ভব হয়। এই পূর্বশর্তগুলি কী তা এখনও আমরা জানি না। তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই, কেননা এখনও পর্যন্ত এলবুমেনের রাসায়নিক সূত্রটি পর্যন্ত স্থির হয়নি, এমনকি রাসায়নিকভাবে বিভিন্ন এলবুমেন বস্তু কতগুলি আছে তাও আমরা জানি না — এবং কেননা, মাত্র বছর দশেক আগে এই সত্যটি জানা গিয়েছে যে, সম্পূর্ণ গঠনহীন যে এলবুমেন, তাতে জীবনের সমস্ত মূল প্রক্রিয়াগুলি ঘটে থাকে যথা, পরিপাক, নিঃসরণ, গতি, সংকোচন, উত্তেজনাপ্রসূত প্রতিক্রিয়া এবং পুনরুৎপাদন।

পরবর্তী অগ্রগতি ঘটতে এবং এই গঠনহীন এলবুমেন থেকে কেন্দ্র (nucleus) ও ঝিল্লি (membrane) গঠিত হয়ে প্রথম কোষ তৈরি হতে সম্ভবত হাজার হাজার বছর লেগেছে। এই প্রাথমিক কোষই আবার সমগ্র জৈবজগতের রূপায়ণের ভিত্তি রচনা করে দিয়েছে। পুরাজীববিদ্যাগত রেকর্ডের সমগ্র তথ্যের ভিত্তিতে আমাদের পক্ষে এটা অনুমান করা যায় যে, প্রথমেই বিকশিত হয়েছে কৌষিক ও অকৌষিক প্রটিস্টার অসংখ্য প্রজাতি। তাদের মধ্যকার একমাত্র Eozoon canadense* আমরা পেয়েছি, এবং তাদের মধ্যে কতগুলি রূপ ক্রমশ পৃথকীভূত হয়ে পরিণত হয়েছে প্রাথমিক উদ্ভিদে, আর কতগুলি প্রাথমিক প্রাণীতে। এই প্রাথমিক প্রাণীগুলি থেকেই মূলত পরবর্তী পৃথকীভবন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিকশিত হয়েছে প্রাণী-জগতের অগণিত শ্রেণী, বর্গ, বংশ, প্রকার ও প্রজাতি এবং শেষপর্যন্ত মেরুদণ্ডী প্রাণী — এই রূপের মধ্যেই স্নায়ুতন্ত্রের পূর্ণতম বিকাশ ঘটে, — এবং শেষত, এদের মধ্য থেকেই এসেছে সেই মেরুদণ্ডী প্রাণীটি যার মধ্য দিয়ে প্রকৃতি আত্মচেতনা লাভ করে, অর্থাৎ মানুষ।

---

* Eozoon canadense — কানাডায় প্রাপ্ত একটি খনিজ দ্রব্য, যাকে প্রাচীনতম প্রাথমিক জীবসত্তার অবশেষ বলে মনে করা হত। ১৮৭৮ সালে কার্ল মোবিয়াস এই খনিজ দ্রব্যের জৈবিক উদ্ভব ভুল বলে প্রতিপন্ন করেন। — সম্পাঃ

মানুষের উদ্ভবও পৃথকীভবনের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই এবং সেটা শুধু ব্যক্তিগতভাবে নয়, অর্থাৎ একটিমাত্র ডিম্বকোষ থেকে প্রকৃতিসৃষ্ট জটিলতম জীবসত্তা হিসাবে পৃথকীভূত হওয়া নয়, ইতিহাসগত হিসাবেও। হাজার হাজার বছরের সংগ্রামের পর যখন হাত আর পায়ের পার্থক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারা গেছে তখনই মানুষ বানর থেকে স্বতন্ত্র হয়ে উঠতে পারল এবং ভিত্তি রচিত হল পৃথকোচ্চারিত কথার ও মস্তিষ্কের সেই প্রবল বিকাশের যা সেই থেকে মানুষ ও বানরের মধ্যকার ব্যবধানকে একেবারে অনতিক্রম্য করে দিয়েছে। শুরু হল হাতের বিশেষ ব্যবহার, যার অর্থ **হাতিয়ারের** উদ্ভব এবং হাতিয়ারের অর্থ বৈশিষ্ট্যসূচক মানবিক ক্রিয়া, প্রকৃতির উপর মানুষের রূপান্তরকারী প্রতিক্রিয়া, অর্থাৎ উৎপাদন। সংকীর্ণতম অর্থে জীবজন্তুরও হাতিয়ার আছে, কিন্তু সেটা হল তাদের দেহেরই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেমন দেখা যায় পিঁপড়া, মৌমাছি, বীবর প্রভৃতির ক্ষেত্রে। জীবজন্তুরাও উৎপাদন করে, তবে চতুষ্পার্শ্বস্থ প্রকৃতিতে তাদের উৎপাদনপ্রসূত প্রভাব প্রায় কিছুই নয়। একমাত্র মানুষই প্রকৃতির উপর নিজের ছাপ মেরে দিতে পেরেছে শুধু উদ্ভিদ ও জীবজন্তুর আলাদা আলাদা প্রজাতিকে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় সরিয়ে নিয়ে গিয়ে নয়, তার নিজের বাসস্থানের জলবায়ু এবং বাইরের চেহারাকে এমনভাবে পরিবর্তন করে, এমনকি গাছপালা ও জীবজন্তুগুলিকেও এমনভাবে বদলিয়ে দিয়ে যে, একমাত্র পৃথিবীটার সামগ্রিক নির্বাপণ ছাড়া মানুষের কার্যকলাপের এইসব ফলাফলের অবলোপ কিছুতেই হবে না। এবং এই কার্য মানুষ সাধন করেছে প্রধানত এবং মূলত তার **হাতের** সাহায্যে। এমনকি প্রকৃতির রূপান্তরের জন্য মানুষের এখন পর্যন্ত সবচেয়ে শক্তিশালী যে হাতিয়ার সেই বাষ্পযন্ত্রও হাতিয়ার বলেই শেষ পর্যন্ত নির্ভর করে হাতের উপর। কিন্তু ধাপে ধাপে হাতের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিকাশ হল মস্তিষ্কেরও, চৈতন্য দেখা দিল, প্রথমে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবহারিক প্রয়োজনের ফলাফলগুলি সৃষ্টি করার অবস্থা সম্বন্ধে চেতনা, তারপরে, তার ভিত্তিতে অধিকতর ভাগ্যবান জাতিগুলির মধ্যে এল সেইসব প্রাকৃতিক নিয়ম সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি যা এই সব প্রয়োজনীয় ফলাফল নিশ্চিত করে দেয়। আর প্রকৃতির নিয়ম সম্বন্ধে জ্ঞানের দ্রুত বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির উপর প্রক্রিয়া ঘটাবার উপায়ও বাড়তে লাগল। যদি হাতের সঙ্গে সঙ্গেই এবং অংশত হাতের ক্রিয়ার ফলেই মস্তিষ্কও বিকশিত হয়ে না উঠত, তাহলে শুধুমাত্র হাতের সাহায্যে বাষ্পযন্ত্র কখনই তৈরি করা যেত না।

মানুষের সঙ্গে সঙ্গে আমরা পেঁছাচ্ছি **ইতিহাসের** ক্ষেত্রে। জীবজন্তুরও ইতিহাস আছে, অর্থাৎ তাদের উৎপত্তির ও বর্তমান অবস্থা পর্যন্ত তাদের ক্রমিক বিবর্তনের ইতিহাস। তবে এ ইতিহাস তাদের হয়ে অন্যের করে দেওয়া এবং সে ইতিহাসে তারা নিজেরা যেটুকু অংশ নিচ্ছে সেটা ঘটছে তাদের জ্ঞান বা আকাঙ্ক্ষা ছাড়াই। অপরপক্ষে,

কথাটির সংকীর্ণ অর্থে, মানুষ জীবজন্তু থেকে যতই পৃথক হয়ে ওঠে ততই সচেতনভাবে মানুষ নিজেরাই ইতিহাস গড়ে তোলে, ততই এই ইতিহাসের উপর অ-পূর্বজ্ঞাত ফলাফলের ও অনিয়ন্ত্রিত শক্তির প্রভাব কম হয় এবং পূর্বনির্ধারিত লক্ষ্যের সঙ্গে ইতিহাসের ফলাফলটির মিলও ততই বেশী নিখুঁত হয়ে ওঠে। অবশ্য যদি আমরা এই পরিমাপ-পদ্ধতিতে মানবেতিহাসকে বিচার করি, এমনকি আজকের দিনের সবচেয়ে উন্নত জাতিগুলির সম্বন্ধেও এই পরিমাপ-পদ্ধতি প্রয়োগ করি, তাহলে আমরা দেখব যে, এক্ষেত্রে এখনও প্রস্তাবিত লক্ষ্য ও উপনীত ফলাফলের মধ্যে এক বিরাট অসামঞ্জস্য রয়েছে; দেখব যে পূর্ব-অজ্ঞাত ফলাফলের প্রভাবই বেশী এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী চালু শক্তিগুলির চেয়ে অনিয়ন্ত্রিত শক্তিরই পরাক্রম অনেক বেশী। এবং ততদিন তা না হয়ে পারে না যতদিন মানুষের সবচেয়ে মূল ঐতিহাসিক কার্যকলাপ, অর্থাৎ যে কার্যকলাপের দ্বারা মানুষ জীবজন্তুর স্তর থেকে মানবিক স্তরে উন্নীত হয়েছে এবং যা তার অন্যান্য সমস্ত কার্যের বৈষয়িক ভিত্তি, অর্থাৎ তার জীবনধারণের উপকরণ উৎপাদন, মানে আজকের দিনে সামাজিক উৎপাদন, সেই অনিয়ন্ত্রিত শক্তির অবাঞ্ছিত ফলাফলেরই ঘাতপ্রতিঘাতের সবিশেষ অধীন হয়ে থাকছে এবং বাঞ্ছিত ফল পাওয়া যাচ্ছে নিতান্ত ব্যতিক্রম হিসাবেই, বেশীর ভাগ সময়েই ফলাফলটা হচ্ছে প্রত্যাশার ঠিক উল্টো। সবচেয়ে শিল্পোন্নত দেশগুলিতে আমরা প্রকৃতির শক্তিকে আয়ত্তাধীন করেছি এবং সে শক্তিকে মানবকল্যাণে নিয়োজিত করতে পেরেছি; তাতে করে উৎপাদন অসংখ্যগুণ বাড়িয়ে তুলেছি আমরা, যার ফলে এখন একজন শিশুও যে উৎপাদন করে তা আগে একশ জন সাবালক মানুষও করতে পারত না। কিন্তু উৎপাদনের এই উন্নতির ফল হয়েছে কী? ফল হয়েছে ক্রমবর্ধমান অতিরিক্ত শ্রম এবং জনগণের ক্রমবর্ধমান দুর্দশা এবং প্রতি দশ বছর অন্তর এক একটি প্রচন্ড সংকট। অবাধ প্রতিযোগিতা ও জীবনধারণের জন্য সংগ্রাম, অর্থতাত্ত্বিকেরা যাকে সর্বোচ্চ ঐতিহাসিক কীর্তি বলে ঘোষণা করেন, সেটা যে **জীবজগতেরই** স্বাভাবিক অবস্থা, এইটে দেখিয়ে ডারউইন মানবজাতির উদ্দেশে এবং বিশেষ করে তাঁর স্বদেশবাসীর উদ্দেশে কী তিক্ত ব্যঙ্গ করে গেলেন সেটা তিনি জানতেন না। সাধারণভাবে উৎপাদন যেমন বাকি জীবজগত থেকে মানুষকে প্রজাতি হিসাবে উন্নীত করে দিয়েছে, ঠিক তেমনি সামাজিকভাবে মানুষকে অন্য জীবজগতের থেকে উন্নীত করতে পারে শুধুমাত্র সামাজিক উৎপাদনের সচেতন সংগঠন, — যার মধ্যে উৎপাদন ও বণ্টন হবে পরিকল্পনা অনুযায়ী। ইতিহাসের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিদিনই এইরকম সংগঠন আরো অপরিহার্য ও সম্ভব হয়ে উঠছে। সেই থেকেই ইতিহাসের এক নতুন যুগ শুরু হবে, যে-যুগে মানুষের নিজের এবং তার সঙ্গে তার কার্যকলাপের সমস্ত শাখার, বিশেষ করে প্রকৃতিবিজ্ঞানের এমন এক অগ্রগতি দেখা যাবে, যার সামনে আগেকার সমস্ত অগ্রগতি ম্লান হয়ে যাবে।

তাহলেও, 'উদ্ভূতের বিলোপ ন্যায্য'।* কোটি কোটি বছর কেটে যেতে পারে, লক্ষ লক্ষ পুরুষের জন্ম ও মৃত্যু এসে যেতে পারে, তবু অমোঘ নিয়মের মতোই এমন একদিন আসবে যখন সূর্যের উত্তাপ হ্রাস পেতে পেতে এমন হবে যাতে মেরুপ্রদেশ থেকে এগিয়ে আসা বরফকে আর গলাতে পারবে না; যখন মানুষ ক্রমেই বেশী করে বিষুবরেখা অঞ্চলে এসে ভিড় করতে থাকবে এবং শেষ পর্যন্ত সেখানেও জীবনধারণের উপযুক্ত উত্তাপ পাবে না, যখন ক্রমশ জীবসত্তার শেষ চিহ্নটুকু পর্যন্ত বিলুপ্ত হয়ে যাবে; চাঁদের মতো নির্বাপিত ও জমে যাওয়া একটা গোলক হিসাবে গভীরতম অন্ধকারের মধ্যে পৃথিবীটা তখন সমান নির্বাপিত সূর্যের চারিদিকে আবর্তিত হতে থাকবে ক্রমশ সংকীর্ণ কক্ষপথে ও পরিশেষে তার উপর গিয়ে পড়বে। কোনো কোনো গ্রহের এই অবস্থা হবে পৃথিবীর আগেই, কোনো কোনো গ্রহের হবে পরে। সুসংবদ্ধ ব্যবস্থাধীন বিভিন্ন গ্রহ-উপগ্রহ সমেত যে উজ্জ্বল ও উত্তপ্ত সৌরজগৎ দেখতে পাই, তার বদলে তখন দেখা যাবে একটা ঠাণ্ডা, মৃত গোলক মহাশূন্যের মধ্যে তার নির্জন পথ পরিক্রমা করে চলেছে। এবং আমাদের এই সৌরজগতের যে অবস্থা হবে, দ্রুত বা বিলম্বে তাই হবে আমাদের মহাজাগতিক দ্বীপের অন্য সমস্ত মণ্ডলের, হবে অন্য সমস্ত অসংখ্য মহাজাগতিক দ্বীপের মণ্ডলগুলিতে, এমনকি সেগুলিতেও, যাদের আলো পৃথিবীতে সে আলো দেখার মতো জীবন্ত মানুষ থাকতে থাকতে কখনো এসে পৌঁছবে না।

এইরকম সৌরমণ্ডলের জীবনেতিহাস যখন সম্পূর্ণ হয়ে যাবে এবং যখন সীমাবদ্ধ সবকিছুরই যা ভবিতব্য সেই মৃত্যুতে এসে পৌঁছাবে, তখন কী হবে? তারপরেও কি সূর্যের মৃতদেহটি মহাশূন্যের মধ্যে চিরকাল ধরে আবর্তিত হতে থাকবে এবং একদিন যেসব প্রাকৃতিক শক্তি অসীম বিচিত্র বিভিন্ন রূপে রূপায়িত হয়েছিল সেই সমস্ত শক্তি চিরকালের জন্য একটিমাত্র গতিরূপে অর্থাৎ আকর্ষণ রূপে পরিবর্তিত হয়ে যাবে? অথবা, সেকি যেমন বলেছিলেন (পৃঃ ৮১০) 'প্রকৃতিতে কি এইরকম শক্তি আছে যে শক্তি মৃত জগতকে আবার প্রজ্জ্বলিত নীহারিকার মূল অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে আসতে পারে এবং তাকে আবার নবজন্মের জন্য জাগিয়ে তুলতে পারে? আমরা জানি না।'

২×২ = ৪, অথবা বস্তুর আকর্ষণ তার দূরত্বের বর্গফল অনুযায়ী বাড়ে কমে, এগুলি আমরা যে অর্থে জানি অন্তত সে অর্থে আমরা জানি না। কিন্তু তাত্ত্বিক যে প্রকৃতিবিজ্ঞান প্রকৃতি সম্বন্ধে যতদূর সম্ভব একটা সুসমঞ্জস সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলে এবং এই দৃষ্টিভঙ্গি ব্যতীত আজকাল একেবারে চিন্তাহীন কোনো 'হাতুড়ে বিজ্ঞানী'ও (empiricist) কোথাও এগুতে পারে না, সেই তাত্ত্বিক প্রকৃতিবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আমাদের প্রায়ই অসম্পূর্ণভাবে জ্ঞাত রাশি নিয়ে চলতে হয়; এবং জ্ঞানের ত্রুটি সবসময়ই

* গ্যেটের 'ফাউস্ট'এর মেফিস্টোফিলিসের কথা। — সম্পাঃ

পরিপূরণ করে নিতে হয়েছে চিন্তার যুক্তিপূর্ণ সঙ্গতি দিয়ে। গতির ধ্বংস নেই — এই নীতিটি আধুনিক প্রকৃতিবিজ্ঞানকে নিতে হয়েছে দর্শন থেকে, এই নীতিকে বাদ দিলে প্রকৃতিবিজ্ঞানের অস্তিত্বই আর থাকে না। কিন্তু বস্তুর গতি শুধুমাত্র স্থূল যান্ত্রিক গতিই নয়, শুধুমাত্র স্থান-পরিবর্তনের গতিই নয়; উত্তাপ, আলো, বৈদ্যুতিক ও চৌম্বক শক্তি, রাসায়নিক সম্মিলন ও বিভাজন, জীবন ও সর্বশেষে চেতনা — এ সবই বস্তুর গতি। এই কথা যদি বলা হয় যে, বস্তু তার অস্তিত্বের সমগ্র অনন্তকালের মধ্যে কেবল একবার এবং তার চিরন্তনতার তুলনায় মাত্র অসীম ক্ষুদ্র একটু সময়ের জন্য তার গতিকে পৃথকীভূত করতে এবং তাতে করে সে গতির সমগ্র ঐশ্বর্য বিকশিত করে তুলতে পেরেছিল এবং তার পূর্বে ও পরে বস্তুর গতি চিরকাল ধরে শুধুমাত্র স্থান-পরিবর্তনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকছে, তবে সে কথা বলা আর বস্তুকে মর ও গতিকে ক্ষণস্থায়ী বলার অর্থ একই। গতির অবিনাশ্যতাকে শুধুমাত্র পরিমাণগতভাবে নয়, গুণগতভাবেও বুঝতে হবে। যে বস্তুর নিছক যান্ত্রিক স্থান-পরিবর্তন নিশ্চয়ই অনুকূল অবস্থায় তাপ, বিদ্যুৎ, রাসায়নিক ক্রিয়া ও জীবনে রূপান্তরিত হবার সম্ভাবনা রাখে, কিন্তু সেই অনুকূল অবস্থা যে বস্তু নিজের ভিতর থেকে সৃষ্টি করতে পারে না, এইরকম বস্তুর **গতি বাজেয়াপ্ত গতি**; যে গতির বিভিন্ন উপযোগী রূপে রূপান্তরিত হবার ক্ষমতা শেষ হয়ে গিয়েছে, যে গতির তখনও dynamis* থাকতে পারে বটে, কিন্তু energeia** থাকে না, এবং তাই তা আংশিকভাবে ধ্বংস পেয়েছে। দুই কিন্তু অকল্পনীয়।

এইটুকু নিশ্চিত এমন এক সময় ছিল যখন আমাদের এই মহাজাগতিক দ্বীপটির পদার্থ এমন এক পরিমাণ গতিকে -- সে গতিটি কী রকম তা অবশ্য এখনও আমরা জানি না — উত্তাপে রূপান্তরিত করেছিল, যা থেকে অন্তত ২ কোটি তারা সমেত (ম্যাডলারের মতানুযায়ী) বহু সৌরমণ্ডল বিকাশ লাভ করতে পেরেছিল, যার ক্রমিক বিনাশও সমান নিশ্চিত। এই রূপান্তর হল কী ভাবে? আমাদের এই সৌরজগতের ভবিষ্যৎ caput mortuum*** যে আবার কোনোদিন নতুন সৌরজগতের কাঁচামালে পরিবর্তিত হবে কিনা সে বিষয়ে ফাদার সেকি যেমন কম জানেন, উপরোক্ত প্রশ্ন সম্পর্কেও আমরা ঠিক তেমনি কম জানি। কিন্তু তাহলে, হয় আমাদের নির্ভর করতে হবে একজন সৃষ্টিকর্তার উপর, আর না হয় এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে আমরা বাধ্য হব যে, আমাদের এই মহাজাগতিক দ্বীপের সৌরমণ্ডলগুলির প্রজ্জ্বলিত কাঁচামালটির উদ্ভব হয়েছে প্রাকৃতিক উপায়ে, গতিশীল পদার্থের মধ্যে **প্রকৃতিগতভাবে**

* Dynamis — সম্ভাব্যতা। — সম্পাঃ

** Energeia — কার্যকারিতা। — সম্পাঃ

*** Caput mortuum — আক্ষরিকভাবে 'মৃত মস্তক', এখানে 'মৃত অবশেষ' এই অর্থে। — সম্পাঃ

অন্তর্নিহিত গতিরই রূপান্তরের ফলে, এবং তাই পদার্থই তার পরিস্থিতির পুনঃসৃষ্টি করবে, এমনকি কোটি কোটি বছর পরে হলেও, এবং কমবেশি আকস্মিকভাবে হলেও, তবু আকস্মিকতার মধ্যেই যে আবশ্যিকতা নিহিত থাকে, সেই আবশ্যিকতাসহ।

এইরকম রূপান্তরের সম্ভাবনা ক্রমেই বেশী বেশী স্বীকৃত হচ্ছে। ক্রমশ এই ধারণাতেই লোকে উপনীত হচ্ছে যে, জ্যোতিষ্কগুলি শেষ পর্যন্ত পরস্পরের উপর পতিত হবেই, এবং সেগুলির সংঘাতের ফলে কী পরিমাণ উত্তাপ সৃষ্টি হবে তার হিসাব পর্যন্ত কষছে। জ্যোতির্বিজ্ঞান থেকে আমরা যে নতুন তারাগুলি হঠাৎ জ্বলে ওঠার কথা এবং পরিচিত তারাগুলির উজ্জ্বলতা একইরকমভাবে হঠাৎ বেড়ে যাওয়ার কথা জানতে পারি, সে সবেরও সহজ ব্যাখ্যা এই সংঘর্ষ। আমাদের এই গ্রহসমষ্টি সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে এবং সূর্য ঘুরছে আমাদের মহাজাগতিক দ্বীপের ভিতরে — শুধু তাই নয়, এই আমাদের সমগ্র মহাজাগতিক দ্বীপটিও ঘুরছে মহাশূন্যের মধ্যে অন্য মহাজাগতিক দ্বীপের সঙ্গে সাময়িক আপেক্ষিক ভারসাম্য রক্ষা করে, কেননা স্বাধীনভাবে ভাসমান দেহের এমনকি আপেক্ষিক ভারসাম্যও থাকতে পারে তখনই, যখন বিভিন্ন গতি পরস্পর দ্বারা শর্তবদ্ধ। তাছাড়া, অনেকে অনুমান করে নিয়েছে যে, মহাশূন্যে সর্বত্র একইরকম তাপমাত্রা নয়। সর্বশেষে আমরা এও জানি যে, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র একটু অংশ ব্যতীত আমাদের এই মহাজাগতিক দ্বীপের অসংখ্য সূর্যের উত্তাপের সমস্তটাই মহাশূন্যে বিলীন হয়ে যায়, মহাশূন্যের তাপমাত্রার এক সেন্টিগ্রেডের দশ লক্ষভাগের একভাগও বৃদ্ধি করতে পারে না। এই বিপুল পরিমাণ তাপ যায় কোথায়? মহাজাগতিক শূন্যকে উত্তপ্ত করতে গিয়ে এই তাপ কি চিরকালের জন্য বিক্ষিপ্ত হয়ে যাচ্ছে এবং কার্যত এর অস্তিত্বও কি শেষ হয়ে যাচ্ছে? তার অস্তিত্ব কি কেবল তত্ত্বের ক্ষেত্রে, এই তথ্যে যে মহাজাগতিক শূন্য উত্তপ্ত হয়েছে এক ডিগ্রির দশ বা ততোধিক শূন্য সমেত এক দশমিক পরিমাণ? এইরকম অনুমানে কিন্তু গতির অবিনশ্বরতা অস্বীকার করা হয়। তাতে এই সম্ভাবনাই মেনে নেওয়া হয় যে, শূন্যস্থ সত্তাগুলি একের পর এক পরস্পরের উপর পতিত হওয়ায় তাদের সমস্ত যান্ত্রিক গতি তাপে রূপান্তরিত হবে ও সেই তাপ মহাশূন্যে ছড়িয়ে পড়বে, সুতরাং 'শক্তির অবিনশ্বরতা' সত্ত্বেও সাধারণভাবে সমস্ত গতির অবসান ঘটবে। (এই প্রসঙ্গে এটাও লক্ষ্য করা যেতে পারে যে, গতির অবিনশ্বরতার বদলে শক্তির অবিনশ্বরতা কথা বলাটি কী রকম অসঙ্গত।) সুতরাং আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, মহাশূন্যে বিকিরিত তাপ কোনোভাবে অন্য এক ধরনের গতিতে নিশ্চয় রূপান্তরিত হতে সক্ষম এবং তাতে করে ফের সঞ্চিত ও সক্রিয় হয়ে উঠতে পারবে। কী ভাবে, তা দেখানো হবে ভবিষ্যতের প্রকৃতিবিজ্ঞানের কর্তব্য। এতে নির্বাপিত সূর্য থেকে আবার প্রজ্জ্বলিত বাষ্পে রূপান্তর হওয়ার প্রধান অসুবিধাটা আর থাকে না।

তাছাড়া, অনন্তকালের ক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমে জগৎগুলির চিরন্তন পুনরাবৃত্তির কথাটা

তো অনন্ত মহাশূন্যে অসংখ্য জগতের সহাবস্থানেরই যুক্তিসম্মত অনুপূরণমাত্র। এই নীতির প্রয়োজনীয়তাকে ড্রেপারের মতো তত্ত্ব-বিরোধী ইয়াংকী মস্তিষ্কও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে।*

এ হচ্ছে পদার্থের গতির একটা চিরন্তন চক্র। এই চক্র অবশ্যই তার কক্ষ সম্পূর্ণ করে এমন পর্বকালে যার পরিমাপ করার জন্য আমাদের জাগতিক বৎসর মোটেই যথেষ্ট নয়, এই চক্রে সর্বোচ্চ বিকাশের কালটুকু, অর্থাৎ জৈবজীবনের কালটুকু, এবং তদধিক, আত্মচেতন ও প্রকৃতি-চেতন জীবের জীবনকালটুকু ঠিক তেমনি নগণ্য যেমন নগণ্য সে জীবন ও চৈতন্যের ক্রিয়াক্ষেত্রটুকু; এই চক্রে পদার্থের অস্তিত্বের প্রত্যেকটি নির্দিষ্টরূপ — তা সে সূর্যই হোক বা নীহারিকা হোক, স্বতন্ত্র কোনো প্রাণীই হোক আর প্রাণী-প্রজাতিই হোক, রাসায়নিক সংযোজনই হোক আর রাসায়নিক বিভাজন হোক, — সবই সমান ক্ষণস্থায়ী; সেখানে চিরন্তনভাবে পরিবর্তনশীল, চিরন্তনভাবে গতিশীল পদার্থ এবং তার গতি ও পরিবর্তনের নিয়মগুলি ছাড়া কিছুই চিরন্তন নয়। কিন্তু স্থান ও কালের দিক থেকে যতবারই এবং যত নির্মমভাবেই এই চক্রটি পরিপূর্ণ হোক না কেন, যত কোটি সূর্য ও পৃথিবীর উদ্ভব ও বিলোপ হোক না কেন, কোনো সৌরজগতের কোনো একটিমাত্র গ্রহেও জৈবজীবনের পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে যত দীর্ঘ সময়ই লাগুক না কেন, স্বল্প কালের মতো একটা প্রাণোপযোগী পরিস্থিতি পেয়ে জীবের মধ্য থেকে চিন্তাশক্তিসম্পন্ন মস্তিষ্কযুক্ত প্রাণীর বিকাশ ও পরে তেমনি নির্মমভাবে ধ্বংস হবার আগে যত অসংখ্য রকমের জীবের আবির্ভাব ও তিরোভাব হোক না কেন, — এই বিষয়ে আমরা নিশ্চিত যে, এই সমগ্র রূপান্তরের মধ্যে পদার্থ চিরকালই একই রকম থেকে যায়, তার কোনো ধর্মই কোনোদিন নষ্ট হতে পারে না, এবং সেই জন্যই যে অমোঘ আবশ্যিকতায় তা এই পৃথিবীতে চিন্তাশীল মনরূপ, তার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিকে নিশ্চিহ্ন করবে, ঠিক সেই একই আবশ্যিকতায় তা অন্য কোনো স্থানে, অন্য কোনো কালে অবশ্যই তার উদ্ভব ঘটাবে।

১৮৭৫-৭৬ সালে এঙ্গেলস কর্তৃক লিখিত
১৯২৫ সালে প্রথম প্রকাশিত

পাণ্ডুলিপি অনুসারে মুদ্রিত
জার্মান থেকে ইংরেজি অনুবাদের ভাষান্তর

* অনন্ত মহাশূন্যে জগতের অসংখ্যতা থেকে এই ধারণাই আসে যে, অনন্তকালের ক্ষেত্রে জগৎসমূহের ক্রমপর্যায় চলেছে।' ড্রেপার, 'ইউরোপের মনন বিকাশের ইতিহাস', দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৩২৫। (এঙ্গেলসের টীকা।)

J. W. Draper, *History of the Intellectual Development of Europe*, vols I-II, London, 1864. — সম্পাঃ

ফ্রেডারিক এঙ্গেলস

বানর থেকে মানুষের বিবর্তনে শ্রমের ভূমিকা

সমস্ত সম্পদের উৎস হল শ্রম — অর্থতত্ত্ববিদরা এ কথাই বলেন। যে প্রকৃতির কাছ থেকে পাওয়া উপাদানকে শ্রম রূপান্তরিত করে সম্পদে, সেই প্রকৃতির পরেই শ্রমের স্থান। কিন্তু শুধু এই নয়, এর চাইতেও তার গুরুত্ব অপারিসীমভাবেই বেশী। সমস্ত মানবিক জীবনের প্রাথমিক মূলগত শর্ত হল শ্রম এবং তা এতটা পরিমাণে যে একদিক থেকে বলতে হবে যে, স্বয়ং মানুষই হল শ্রমেরই সৃষ্টি।

লক্ষ লক্ষ বছর আগে পৃথিবীর ইতিহাসে এমন একটি যুগ ছিল ভূতাত্ত্বিকেরা যাকে অভিহিত করেন তৃতীয় ভূস্তর যুগ (টার্শ্যারি পিরিয়ড) বলে। সেই যুগের এক সময়, যা এখন পর্যন্ত সঠিকভাবে নির্ণীত হয়নি, খুব সম্ভবত সেই যুগের শেষের দিকে, গ্রীষ্মমণ্ডলের কোথাও — হয়তো বা বর্তমানে ভারত মহাসাগরের গর্ভে নিমজ্জিত এক বিশাল মহাদেশে — বিশেষভাবে উন্নত কিছুটা মনুষ্যাকৃতি এক বানর জাতির বাস ছিল। আমাদের এই পূর্বপুরুষদের একটা মোটামুটি বিবরণ দিয়েছেন ডারউইন। তাদের সারা দেহ ছিল লোমে আবৃত, আর ছিল দাড়ি ও সূঁচোলো কান। তারা বাস করত গাছে গাছে দল বেঁধে।

অনুমান করা যায়, তাদের যে জীবনধারায় গাছে ওঠা-নামার ব্যাপারে হাতের কাজ ছিল পা থেকে ভিন্ন, তারই প্রত্যক্ষ পরিণাম হিসাবে ভূমির উপর দিয়ে হাঁটাচলার সময় তারা হাতের সাহায্য নেবার অভ্যাস থেকে ক্রমে ক্রমে নিজেদের মুক্ত করতে এবং সোজা হয়ে দাঁড়াবার ভঙ্গি আয়ত্ত করতে শুরু করল। **বানর থেকে মানুষে উত্তরণে** এই হল **চূড়ান্ত পদক্ষেপ।**

বর্তমানের সমস্ত মনুষ্যাকৃতি বানরই দুপায়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতে এবং চলাফেরা করতে পারে। কিন্তু তা কেবল জরুরী প্রয়োজনের সময়ে আর নেহাতই আনাড়ীর মতো। তাদের স্বাভাবিক চলাফেরা হল আধা-সোজা হয়ে দাঁড়াবার ভঙ্গিতে, হাতও সেজন্য কাজে লাগে। তাদের অধিকাংশই পাদুটি গুটিয়ে, মাটিতে হাতের মুঠোর গিঁটে ভর

দিয়ে, দীর্ঘ বাহুর সহায়তায় শরীরটাকে এগিয়ে দেয় — ক্রাচের সাহায্যে খোঁড়া মানুষেরা যেমন চলাফেরা করে, অনেকটা সেইরকম। চার পা থেকে দু-পায়ে চলা পর্যন্ত উত্তরণের প্রতিটি পর্যায়ই আজও আমরা সাধারণভাবে বানরদের মধ্যে লক্ষ্য করতে পারি। কিন্তু এদের কারুর কাছেই দু-পায়ে চলাফেরার রীতিটি একটা দায়-সারা ব্যাপারের ছাড়া বেশী কিছু নয়।

আমাদের লোমশ পূর্বপুরুষদের মধ্যে ঋজু দেহ-ভঙ্গি যে প্রথমে প্রচলিত এবং কালক্রমে একটি প্রয়োজন হয়ে দেখা দিল তাতে ধরে নিতে হয় যে, ইতিমধ্যেই নানা বিচিত্র কাজের ভার ক্রমেই বেশি করে হাতের উপর এসে পড়েছিল। এমনকি বানরদের মধ্যেও হাত ও পায়ের ব্যবহারে কিছুটা পার্থক্য দেখা যায়। আগেই বলা হয়েছে গাছে ওঠা-নামার ব্যাপারে হাতের কাজ পায়ের কাজ থেকে পৃথক। কিছু নিম্নতর স্তন্যপায়ীদের মধ্যে সামনের থাবা যে কাজ করে থাকে, বানরের হাতও মুখ্যত খাবার জোগাড় ও আঁকড়ে ধরার সেই একই কাজ করে। অনেক বানর আবার গাছে গাছে হাতের সাহায্যে নিজেদের জন্য বাসা তৈরি করে; এমনকি আবহাওয়া থেকে রক্ষা পাবার জন্য ডালের ফাঁকে ফাঁকে শিম্পাঞ্জীদের মতো ছাউনিও নির্মাণ করে। শত্রুর বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্য তারা হাত দিয়ে লাঠি ধরে অথবা ফল আর পাথর নিক্ষেপ করে তার বিরুদ্ধে। বন্দীদশায় মানুষের অনুকরণলব্ধ কতকগুলি সহজ কাজও তারা হাতের সাহায্যে করে থাকে। কিন্তু ঠিক এখানেই লক্ষ্য করা যায় যে, বানরদের মধ্যে এমনকি যারা সর্বাধিক মনুষ্যাকৃতিবিশিষ্ট তাদেরও অপরিণত হাত, আর শত সহস্র বৎসর যাবৎ শ্রমের ফলে সবিশেষ উন্নত মানুষের হাতের মধ্যে ব্যবধান কত বিরাট। উভয়েরই অস্থি ও পেশীর পরিমাণ ও বিন্যাস একই রকম। তবুও নিম্নতন স্তরের বন্য মানুষদের হাত এমন শত শত কাজ করতে পারে যা কোনো বানরের হাতের পক্ষে অনুকরণ করা সাধ্যাতীত। এমনকি পাথরে তৈরি স্থূলতম একখানা ছুরিও বানরের হাতে গড়া সম্ভব হয়নি।

তাই, বানর থেকে মানুষে উত্তরণের হাজার হাজার বৎসর ধরে আমাদের পূর্বপুরুষেরা যে সব কাজকর্মে তাদের হাতকে ক্রমে ক্রমে অভ্যস্ত করে তুলেছিল, গোড়ার দিকে সেগুলির নেহাতই সাদাসিধে ধরনের হওয়ার কথা। নিম্নতন স্তরের বন্য মানুষেরা, এমন কি যাদের দেহগতভাবে অবনতি এবং সঙ্গে সঙ্গে পশুসুলভ অবস্থায় অধোগতি ঘটেছে বলে অনুমান করা হয়, তারাও এই উত্তরণকালীন প্রাণীদের তুলনায় ঢের বেশী উন্নত। মানুষের হাতে পাথর থেকে প্রথম ছুরিখানা তৈরি হবার আগে হয়ত এমন এক দীর্ঘ যুগ অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, যার তুলনায় আমাদের পরিচিত এই ঐতিহাসিক যুগকে মনে হবে একান্তই নগণ্য। কিন্তু তারই মধ্যে চূড়ান্ত পদক্ষেপটা নেওয়া হয়ে গিয়েছিল: **হাত হল মুক্ত,** তখন থেকে তা অর্জন করে যেতে পারল ক্রমেই

বেশি বেশি নৈপুণ্য ও কৌশল; এবং এইভাবে অর্জিত উন্নততর নমনীয়তা সঞ্চারিত হল বংশপরম্পরায়, বৃদ্ধি পেল পুরুষানুক্রমে।

তাই হাত শুধু শ্রমের অঙ্গ নয়, **শ্রমের সৃষ্টিও**। কেবলমাত্র শ্রম, নিত্যনতুন কর্মপ্রক্রিয়ার সঙ্গে অভিযোজন, এইভাবে অর্জিত পেশী, রগ এবং দীর্ঘতর কালক্রমে অস্থিরও বিশেষ বিকাশের উত্তরাধিকার, এবং জটিল থেকে জটিলতর নূতন নূতন কর্মপ্রক্রিয়ায় উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত এই নৈপুণ্য প্রয়োগের ফলেই মানুষের হাত হয়েছে এত উচ্চ মাত্রায় নিখুঁত যে, সে যেন মায়াজালে সৃষ্টি করতে পেরেছে রাফায়েলের চিত্রকলা, তুরভাল্দসনের ভাস্কর্য আর পাগানিনির সঙ্গীত।

কিন্তু হাত শুধু নিজে নিজেই বেঁচে থাকেনি। অত্যন্ত জটিল এক সমগ্র জীবসত্তার একটি মাত্র অঙ্গ হল এই হাত। যা কিছু হাতের উপকারে এসেছে, তা সেই হাত যার সেবা করে সেই সমগ্র দেহেরও উপকারে এসেছে। আর তা হয়েছে দু-ভাবে।

প্রথমত ডারউইন কথিত বিকাশের পরস্পর-সম্পর্কের নিয়ম অনুযায়ী। এই নিয়ম অনুসারে জীবদেহের পৃথক পৃথক অংশের বিশেষ বিশেষ আকৃতির সঙ্গে সর্বদাই অন্যান্য অংশের কতকগুলি আকৃতির নিবিড় সম্পর্ক থাকে — বাহ্যত এই দুয়ের মধ্যে কোন যোগাযোগ না থাকা সত্ত্বেও। তাই যে সমস্ত প্রাণীর কোষকেন্দ্রহীন লাল রক্তকোষ আছে এবং যাদের মস্তকের পশ্চাম্ভাগ দ্বৈতগ্রন্থন (condyles) সহযোগে মেরুদণ্ডের প্রথম ক্ষুদ্রাস্থির (first vertebre) সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, বিনা ব্যতিক্রমে তাদের সকলেরই সন্তানদের স্তন্যদানের জন্য স্তনগ্রন্থি (lacteal gland) আছে, ঠিক তেমনি যে সমস্ত স্তন্যপায়ী জীবের ক্ষুর দ্বিধাবিভক্ত, রোমন্থনের জন্য তাদের পাকস্থলীও সবসময়ে বহুকক্ষ-সমন্বিত (multiple stomach) হয়ে থাকে। সম্পর্ক ব্যাখ্যা না করা গেলেও দেখা যাচ্ছে, কতকগুলি আকৃতি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শরীরের অন্যান্য অংশের আকৃতিতেও পরিবর্তন ঘটে। নীল-চোখওয়ালা একেবারে শাদা রঙের বিড়াল সবসময়েই কিংবা বেশীর ভাগ সময়েই বধির হয়। মানুষের হাতের ক্রমবর্ধমান উন্নতি, এবং ঋজু-চলনভঙ্গির জন্য পদদ্বয়ের তদনুযায়ী অভিযোজন এই ধরনের পারস্পরিক সম্পর্কের নিয়মানুযায়ী নিঃসংশয়েই জীবসত্তার অন্যান্য অংশের উপর প্রতিক্রিয়া ঘটিয়েছে। তবে, এই প্রক্রিয়া সম্পর্কে গবেষণা হয়েছে এত কম যে, সাধারণভাবে ঘটনাটিকে বিবৃত করা ছাড়া আমরা আর বেশী কিছু করতে পারি না।

জীবদেহের অন্যান্য অংশের উপর হাতের বিকাশের যে প্রত্যক্ষ ও প্রামাণ্য প্রতিক্রিয়া ঘটেছে, তা ঢের বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আগেই বলা হয়েছে, আমাদের বানর পূর্বপুরুষরা যূথবদ্ধ হয়ে থাকত; প্রাণীদের মধ্যে সবচাইতে সামাজিক যে প্রাণী সেই মানুষের আশু উৎপত্তি কোন যূথ-বিমুখ পূর্বপুরুষদের মধ্যে অনুসন্ধান করা স্বভাবতই অবাস্তব। হাতের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে, শ্রমের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির উপরে যে প্রভুত্ব শুরু হল, তা

প্রতিটি নতুন অগ্রগতিতেই মানুষের দিগন্তরেখাকে প্রসারিত করে দিল। প্রাকৃতিক বস্তুপুঞ্জের নতুন নতুন অজ্ঞাতপূর্ব গুণাগুণ মানুষ ক্রমাগত আবিষ্কার করে চলল। অপর পক্ষে, পারস্পরিক সহায়তা ও যৌথ কর্মোদ্যমের দৃষ্টান্ত ক্রমাগত বাড়িয়ে, এবং প্রত্যেকের কাছে এই যৌথ কর্মোদ্যমের সুবিধা তুলে ধরে শ্রমের বিকাশ অনিবার্যই সমাজের সদস্যদের নিবিড়তর বন্ধনে আবদ্ধ করতে সাহায্য করল। সংক্ষেপে বলা যায় যে, গড়ে উঠবার পথে মানুষ এমন একটি পর্যায়ে এল যখন পরস্পরকে **কিছু বলার প্রয়োজন** তাদের হল। এই প্রেরণা তার নিজস্ব অঙ্গ সৃষ্টি করল; স্বরের দোলন দ্বারা ক্রমাগত উন্নততর স্বরগ্রাম সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বানরের অপরিণত কণ্ঠনালী ধীর অথচ স্থির গতিতে রূপান্তরিত হয়েছিল। ক্রমে ক্রমে মুখের প্রত্যঙ্গগুলি একটার পরে একটা স্পষ্ট ধ্বনি উচ্চারণ করতে শিখল।

শ্রম থেকে এবং শ্রমের সঙ্গেই যে ভাষার উৎপত্তি, প্রাণীদের সঙ্গে তুলনা করলে এই ব্যাখ্যাই একমাত্র নির্ভুল ব্যাখ্যা বলে প্রতিপন্ন হয়। প্রাণীদের মধ্যে যারা সবচাইতে উন্নত, এমনকি তাদের পক্ষেও পরস্পরকে-যেটুকু জানাবার থাকে সেটুকু তারা স্পষ্টোচ্চারিত উক্তি ছাড়াই জানাতে সক্ষম। প্রকৃতির রাজ্যে কোন প্রাণীই কথা বলার অথবা মানুষের ভাষা বুঝবার অক্ষমতার জন্য অসুবিধা বোধ করে না। মানুষের কাছে পোষমানার পরে অবশ্য অবস্থাটা দাঁড়ায় সম্পূর্ণ আলাদা। মানুষের সাহচর্যে কুকুর এবং ঘোড়ার কান উচ্চারিত কথা বুঝবার মতো এতটা উন্নতি লাভ করে যে, নিজেদের ধারণার পরিধির মধ্যে যে কোনো ভাষা তারা সহজেই বুঝতে পারে। অধিকন্তু, মানুষের প্রতি ভালোবাসা, কৃতজ্ঞতা ইত্যাদি অজ্ঞাতপূর্ব অনুভূতির ক্ষমতাও তারা আয়ত্ত করেছে। এসব প্রাণী নিয়ে যাঁদের ঘনিষ্ঠ কারবার তাঁদের পক্ষে বিশ্বাস না করে প্রায় উপায় নেই যে, এমন অনেক দৃষ্টান্ত আছে যা থেকে বোঝা যায় যে, এরা **আজকাল** মনে করে যে এদের কথা বলার অক্ষমতা নিশ্চয়ই একটা খুঁত। অবশ্য দুর্ভাগ্যবশত তার প্রতিকারের আর কোন সম্ভাবনা নেই, কেননা এদের বাক্-যন্ত্রগুলি একটি নির্দিষ্ট ধরনে অতিরিক্ত মাত্রায় বিশেষীকৃত হয়ে গেছে। তবু উপযুক্ত অঙ্গ যাদের আছে, সীমাবদ্ধভাবে তাদের এই অক্ষমতাও লোপ পেতে পারে। পাখির মুখযন্ত্র স্বভাবতই মানুষের মুখযন্ত্র থেকে একেবারে স্বতন্ত্র, তবুও প্রাণীদের মধ্যে একমাত্র পাখিই পারে কথা বলা শিখতে, আর পাখিদের মধ্যে যার স্বর সবচাইতে বিকট সেই শুকপাখিই কথা বলে সবচাইতে ভালো। যেকথা সে বলে, তার অর্থ সে বোঝে না — কেউ যেন এ আপত্তি না তোলেন। একথা সত্য যে, নিছক কথা বলা আর মানুষের সাহচর্যের আনন্দেই শুকপাখি ঘণ্টার পর ঘণ্টা অবিরতভাবে তার মুখস্থ করা বুলি বারংবার বকে চলে। কিন্তু নিজের ধারণার পরিধির মধ্যে সে যে-সব কথা বলে তা বুঝবার শিক্ষাও সে আয়ত্ত করতে পারে। একটা শুকপাখিকে এমন করে গালাগালির ভাষা আওড়াতে শেখান যাতে সে তার অর্থ সম্পর্কে

একটা ধারণা করতে পারে (গ্রীষ্মমণ্ডল থেকে যে নাবিকেরা ফিরে এসেছে তাদের কাছে এ একটা মস্ত বড় মজার খেলা), তারপর পাখিটিকে উত্ত্যক্ত করে তুলুন — শীগগিরই দেখতে পাবেন যে, বার্লিনের ফল-ফেরিওয়ালাদের মতো সেও জানে কেমন নির্ভুলভাবে তার গালাগালির ভাষাগুলি ব্যবহার করতে হয়। এটা ওটা চাইবার বেলাতেও তাই।

প্রথমত শ্রম, তার পর ও তার সঙ্গে কথা — এই দুটি হল প্রধানতম প্রেরণা যার প্রভাবে বানরের মস্তিষ্ক ক্রমে ক্রমে মানুষের মস্তিষ্কে রূপান্তরিত হল। সমস্ত রকমের সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও মানুষের এ মস্তিষ্ক অনেক বড়, অনেক নিখুঁত। মস্তিষ্কের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে চলল তার সবচাইতে নিকট হাতিয়ার — সংবেদন ইন্দ্রিয়গুলির বিকাশ। কথা বলতে পারার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে যেমন অনিবার্যভাবেই শ্রবণেন্দ্রিয়ের উন্নতি হয়, তেমনি মস্তিষ্কের সামগ্রিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে চলে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের উন্নতি। মানুষের তুলনায় ঈগলপাখি অনেক দূরের জিনিস দেখতে পায়; কিন্তু মানুষের চোখ ঈগলের তুলনায় কোনো জিনিসের মধ্যে ঢের বেশী কিছু দেখে। মানুষের তুলনায় কুকুরের ঘ্রাণগ্রহণের শক্তি অনেক বেশী; কিন্তু মানুষের কাছে বিভিন্ন গন্ধ বিভিন্ন জিনিসের নির্দিষ্ট প্রতীক, কুকুর কিন্তু তার শতাংশকেও তফাৎ করে ধরতে পারে না। গোড়ার দিককার স্থূলতম পর্যায়ের স্পর্শানুভূতিই বানরের আছে, শ্রমের মাধ্যমে মানুষের হাতের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই শুধু বিকশিত হয়েছে সেই স্পর্শানুভূতি।

মস্তিষ্ক ও সহগ ইন্দ্রিয়গুলির বিকাশ, চেতনার ক্রমবর্ধমান স্বচ্ছতা এবং বিমূর্তীকরণ ও বিচার-ক্ষমতা শ্রম ও বাক্‌শক্তির উপরে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে তার ফলে শ্রম ও বাক্‌শক্তি উভয়েই ক্রমাগত বিকাশের নিত্যনূতন প্রেরণা লাভ করে। মানুষ যখন চূড়ান্তভাবে বানর থেকে পৃথক হয়ে গেল তখন এই বিকাশের ধারা মোটেই সমাপ্ত না হয়ে সমগ্রভাবে বিপুল অগ্রগতি ঘটিয়েই চলতে থাকে যদিও বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন জাতির মধ্যে এই বিকাশের গতি ও ধারায় বিভিন্নতা দেখা দিয়েছে এবং কোথাও কোথাও বা স্থানীয় অথবা সাময়িক পশ্চাদ্গতিতে এমনকি ব্যাহতও হয়েছে। তারপরে পরিপূর্ণ মানুষের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যে একটি নতুন উপাদান অর্থাৎ **সমাজ** সক্রিয় হয়ে ওঠে তাতে করে এই পরবর্তী বিকাশ একদিকে যেমন একটা প্রবল সম্মুখ প্রেরণা লাভ করেছে, অন্যদিকে তেমনি চালিত হয়েছে আরো সুনির্দিষ্ট ধারায়।

মানুষের জীবনে* একটি মুহূর্তের যা তাৎপর্য পৃথিবীর ইতিহাসে লক্ষ লক্ষ বছরের তাৎপর্য তার বেশি নয় এবং এই লক্ষ লক্ষ বছর নিশ্চয়ই পার হয়ে গিয়েছিল গাছে-চড়া বানরের দঙ্গল থেকে মানবের সমাজ উদিত হবার আগে। কিন্তু তবুও শেষ

* এ বিষয়ে একজন প্রামাণ্য লেখক স্যার উইলিয়ম টমসন গণনা করে দেখিয়েছেন যে, পৃথিবী যখন উদ্ভিদ ও প্রাণীদের বাসের উপযোগী যথেষ্ট শীতলতা লাভ করল তারপর থেকে সম্ভবতঃ আজ পর্যন্ত **দশ কোটি বৎসরের কিছু বেশি সময়** অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে। (এঙ্গেলসের টীকা।)

পর্যন্ত সে অভ্যুদয় ঘটেছিল। এই বানরদের একটা দঙ্গলের সঙ্গে তুলনায় মানুষের একটা সমাজেরও ফের কোন্ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আমাদের নজরে পড়ে? **শ্রম**। ভৌগোলিক অবস্থা অথবা প্রতিবেশী পালগুলির প্রতিরোধের ফলে নির্ধারিত একটা খাদ্যাঞ্চলে চরে বেড়িয়েই বানর দল সন্তুষ্ট ছিল। নূতন খাদ্যাঞ্চলের জন্য এরা স্থান হতে স্থানান্তরে যেত ও সংগ্রাম করত, কিন্তু নিজেদের মলমূত্র দিয়ে নিজেদের অজানতেই ভূমিকে উর্বর করা ছাড়া সে ভূমি তাদের যতটুকু দিত তার চাইতে বেশি আদায় করে নিতে তারা পারত না। সম্ভাব্য সমস্ত খাদ্যাঞ্চল অধিকৃত হয়ে গেলেই আর বানরদের সংখ্যাবৃদ্ধি হতে পারত না; প্রাণীসংখ্যা বড়ো জোর স্থির হয়ে থাকত। কিন্তু সমস্ত প্রাণীই বহুল পরিমাণে খাদ্য অপচয় করে, এবং প্রায়ই খাদ্যের পরের ফসলকে বীজেই বিনষ্ট করে। যে হরিণী পরের বছরে বাচ্চা দেবে শিকারী তাকে ছেড়ে দেয় কিন্তু নেকড়ে ছাড়ে না। গ্রীসের ছাগেরা ছোট ছোট ঝোপঝাড়গুলি বড় হবার আগেই নিঃশেষিত করে দেশের পাহাড় পর্বতগুলোবে একেবারে ন্যাড়া করে দিয়েছে। জন্তুদের এই 'লুঠেরা অর্থনীতি' প্রজাতির ক্রমরূপান্তরে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে কারণ, এরই জন্য নতুন অনভ্যস্ত খাদ্যগ্রহণে বাধ্য হয়ে তাদের রক্ত নূতন রাসায়নিক গঠন লাভ করে এবং সমগ্র দৈহিক গঠন ক্রমে ক্রমে পরিবর্তিত হয় আর একদা প্রতিষ্ঠিত প্রজাতির মৃত্যুও ঘটে। আমাদের পূর্বপুরুষদের বানর থেকে মানুষে উত্তরণে এই লুঠেরা অর্থনীতির অবদান যে প্রচুর সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। বুদ্ধিবৃত্তি ও অভিযোজন ক্ষমতায় বানরদের যে জাতিটা ছিল অন্যান্য সকলের তুলনায় অনেক বেশী অগ্রসর তারা এই লুঠেরা অর্থনীতির ফলে খাদ্যোপযোগী উদ্ভিদের ক্রমাগত সংখ্যাবৃদ্ধি এবং এই উদ্ভিদের ক্রমাগত বেশি ভোজ্য অংশাদি ভক্ষণ করতে বাধ্য হয়। সংক্ষেপে বলা যায় যে, এর ফলে খাদ্যে এল নিত্য নতুন বৈচিত্র্য আর তাই শরীরে প্রবেশ করল নিত্য নতুন বিচিত্র উপাদান, এবং তৈরি হল বানর থেকে মানুষে উত্তরণের উপযোগী রাসায়নিক অবস্থা। কিন্তু যথার্থ অর্থে এইসব এখনও শ্রম নয়। শ্রমের শুরু হল হাতিয়ার তৈরি করা থেকে। কিন্তু প্রাচীনতম হাতিয়ার বলতে কী পাই, — প্রাগৈতিহাসিক মানুষের বংশানুক্রমিকভাবে প্রাপ্ত যে সামগ্রীগুলি আবিষ্কৃত হয়েছে, তথা আদিমতম ঐতিহাসিক জাতিগুলির এবং সমসাময়িক কালের অসভ্যতম বন্যদের জীবনযাত্রার ধরনের দিক থেকে বিচার করলে যা সবচেয়ে প্রাচীন? প্রাচীনতম হাতিয়ার ছিল শিকার করার এবং মাছ ধরার হাতিয়ার — প্রথমটিকে অস্ত্র হিসাবেও ব্যবহার করা হত। কিন্তু শিকার আর মাছ ধরার ক্ষেত্রে একান্তই উদ্ভিজ্জ খাদ্য থেকে সেই সঙ্গে মাংসাহারে উত্তরণের কথাও ধরে নিতে হয় এবং বানর থেকে মানুষে উত্তরণে এ হল আর একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়। আমিষ আহার্যের মধ্যে দেহযন্ত্রের বিপাক-প্রক্রিয়ার একান্ত অপরিহার্য উপাদানগুলি প্রায় তৈরি অবস্থাতেই থাকে। আমিষ আহারের ফলে পরিপাকের সময়

হল সংক্ষেপিত শুধু তাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভিদ জীবনের অনুরূপ অন্যান্য উদ্ভিদসুলভ দৈহিক ক্রিয়ারও সময় সংক্ষেপিত হল আর এইভাবে যথার্থ অর্থে প্রাণী-জীবনের সক্রিয় অভিব্যক্তির জন্য লাভ হল আরও সময়, উপাদান ও আকাঙ্ক্ষা। আর নির্মীয়মাণ মানুষ উদ্ভিজ্জ জগৎ থেকে যতটা সরে যায়, জন্তু-জীবন থেকেও ততটাই সে উন্নীত হতে থাকে। আমিষের সঙ্গে সঙ্গে নিরামিষ আহারে অভ্যস্ত হবার ফলে যেমন বন্য বিড়াল ও কুকুর মানুষের পরিচারকে পরিণত হয়েছিল, নিরামিষের সঙ্গে সঙ্গে আমিষ আহার গ্রহণের অভ্যাসে তেমনি নির্মীয়মাণ মানুষের দৈহিক শক্তি ও স্বাধীনতা লাভে প্রচুর সাহায্য হল। সে যা হোক, আমিষ আহারের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ফল ফলেছিল কিন্তু মস্তিষ্কের উপরে, পুষ্টি ও বিকাশ লাভের উপযোগী উপাদানসমূহ তা লাভ করতে লাগল আগের চেয়ে অনেক বেশি, এবং সুতরাং বংশপরম্পরায় তা আরও দ্রুত ও নিখুঁত বিকাশ পেতে পারল। নিরামিষ-আহারীদের প্রতি সর্ববিধ শ্রদ্ধা সত্ত্বেও এ সত্য স্বীকার করতে হবে যে, আমিষ আহার ছাড়া মানুষের উদ্ভব সম্ভব হয়নি। তাই আমরা যত জাতির কথা জানি, তাদের সকলের মধ্যে এই আমিষ আহার যদি কোনো না কোনো সময়ে তাদের মধ্যে নরখাদকবৃত্তির সৃষ্টি করে থাকে তবুও তা নিয়ে আজকাল মাথা ঘামাবার দরকার নেই (বার্লিন-বাসীর পূর্বপুরুষ ওয়েলটৌবিয়ান বা উইলজিয়ানরা দশম শতাব্দী পর্যন্তও তাদের মাতাপিতার মাংস খেত)।

আমিষ আহার দুটি ক্ষেত্রে এমন নতুন অগ্রগতি ঘটিয়েছিল, যার গুরুত্ব চূড়ান্ত: আগুনকে কাজে লাগানো আর জন্তুজানোয়ারকে পোষ মানানো। প্রথমটি পরিপাক-প্রক্রিয়াকে আরো সংক্ষেপিত করে কারণ মুখ, বলা যেতে পারে, আধাআধি-পরিপক্ক খাদ্য পেয়ে গেল। দ্বিতীয়টি শিকার ছাড়াও মাংস পাবার জন্য নতুন ও অধিকতর নিয়মিত এক উৎস খুলে দিয়ে মাংসের সরবরাহ আরও বাড়িয়ে দিল। শুধু তাই নয়, এর ফলে মানুষ দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যাদিও পেল, উপাদানের দিক থেকে অন্তত মাংসের সমানই এই নতুন খাদ্যের মূল্য। তাই এই দুটি অগ্রগতিই প্রত্যক্ষভাবে মানুষের মুক্তির নতুন উপায় হিসাবে কাজ করল। মানুষ ও সমাজের বিকাশসাধনে এই দুটি অগ্রগতির পরোক্ষ ফলগুলির তাৎপর্য সুবিপুল হলেও এদের সবিস্তারে আলোচনা করতে হলে আমাদের অনেকটা দূরে সরে যেতে হয়।

মানুষ যেমন ভক্ষণযোগ্য যে-কোনো আহার্যই গ্রহণ করতে শিখল, তেমনি সে শিখল যে-কোনও জলবায়ুতেই বাস করতে। পৃথিবীতে বাসোপযোগী সমস্ত অঞ্চলের উপরে ছড়িয়ে পড়ল মানুষ, সেই একমাত্র প্রাণী যে শুধু নিজেরই চেষ্টায় এ কাজ করবার ক্ষমতা রেখেছিল। অন্য যত প্রাণী — যেমন গৃহপালিত পশু, পরগাছা কীট-পতঙ্গ — যারা সমস্ত রকমের জলবায়ুতে জীবনধারণে অভ্যস্ত হয়েছে তারা নিজেদের বলে এ রকম হয়নি, তারা এগিয়েছে মানুষেরই পিছু পিছু। মানুষের আদি বাসভূমির

একটানা উষ্ণজলবায়ু থেকে উৎক্রান্তি ঘটল শীতলতর অঞ্চলগুলিতে যেখানে শীতে গ্রীষ্মে বৎসর বিভক্ত, ফলে দেখা দিল নতুন প্রয়োজন: ঠাণ্ডা আর আর্দ্র বায়ুর হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য আশ্রয় আর পোষাক, সুতরাং শ্রমের নতুন নতুন শাখা আর সঙ্গে সঙ্গে নূতন কর্মকাণ্ডও, তা মানুষকে ক্রমশ পশু থেকে আরও বেশি পৃথক করে দিল।

শুধু ব্যক্তিজীবনেই নয় সমাজজীবনেও হাত, বাক্‌যন্ত্র আর মস্তিষ্কের সহযোগিতার ফলে মানুষ ক্রমশ জটিল থেকে জটিলতর কাজ করবার, বৃহৎ থেকে বৃহত্তর লক্ষ্য স্থাপন ও সাধন করার ক্ষমতা লাভ করল। বংশপরম্পরায় শ্রম নিজেই হয়ে উঠতে লাগল আরও বিচিত্র, আরও নিখুঁত, আরও বহুমুখী। শিকার পশুপালনের সঙ্গে যুক্ত হল কৃষি, তারপর এল সুতা-কাটা, কাপড়-বোনা, ধাতুর কাজ, মৃৎশিল্প, নৌচালনা। বাণিজ্য ও শিল্পের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত আত্মপ্রকাশ করল কলা ও বিজ্ঞান। উপজাতি থেকে অভ্যুদয় হল জাতির আর রাষ্ট্রের। এল আইন, রাজনীতি, আর সেই সঙ্গে মানব মনের উপর মানবিক ব্যাপারের অতিকল্পিত প্রতিবিম্ব — ধর্ম। এই যেসব সৃষ্টি সর্বাগ্রে দেখা দিল মানস কীর্তি হিসাবে এবং মানবসমাজে প্রাধান্য করছে বলে মনে হল তার সামনে কর্মতৎপর হাতের অপেক্ষাকৃত সাদাসিধে সৃষ্টিগুলি গিয়েছিল পিছনে পড়ে, এবং সেটা আরও এই কারণে যে, সমাজ-বিকাশের অতি প্রারম্ভিক পর্যায়েই যে মন শ্রমের পরিকল্পনা নিত (উদাহরণস্বরূপ আদিম পরিবারের উল্লেখ করা যেতে পারে) সেই মনই পরিকল্পিত শ্রমকে অন্যের দ্বারা সম্পন্ন করিয়ে নিতে পারত। সভ্যতার দ্রুত অগ্রগতির সমস্ত কৃতিত্ব আরোপ করা হল মনের উপর, মস্তিষ্কের বিকাশ ও সক্রিয়তার উপর। প্রয়োজন দিয়ে কাজের ব্যাখ্যা না করে (যে করেই হোক প্রয়োজনগুলিই প্রতিফলিত হয়, চেতনা পায় মনের মধ্যে) চিন্তা দিয়ে কাজের ব্যাখ্যা করতে মানুষ অভ্যস্ত হল। এইভাবে কালক্রমে সৃষ্টি হল বিশ্ব সম্পর্কে ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গি, বিশেষ করে প্রাচীন যুগের শেষ থেকে তাই মানুষের মনকে প্রভাবিত করেছে। আজও এতখানি তার শাসন যে এমনকি ডারউইনপন্থী অতিবস্তুবাদী প্রকৃতিবিজ্ঞানীরা পর্যন্ত মানুষের উৎপত্তি সম্পর্কে স্পষ্ট কোন ধারণা করতে এখনো অক্ষম, কেননা ভাববাদী প্রভাবের আওতায় তাঁরা এ ব্যাপারে শ্রমের ভূমিকাকে দেখেন না।

আগেই বলা হয়েছে যে, মানুষের মতো অতখানি না হলেও প্রাণীরাও তাদের কার্যাবলীর দ্বারা তাদের বহিঃপ্রকৃতির পরিবর্তন সাধন করে আর তাদের পরিবেশে সম্পন্ন এই পরিবর্তনগুলি আবার পরিবর্তন-সংঘটনকারীর উপরেও ফের প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, তাদের কিছুটা পরিবর্তিত করে। কারণ প্রকৃতিতে বিচ্ছিন্নভাবে কিছুই ঘটে না। প্রত্যেকটা ঘটনা অন্য কিছুকে প্রভাবিত করছে, এবং অন্য কিছুই আবার প্রভাবিত করছে প্রত্যেকটিকে। সর্বতোমুখী এই গতি এবং পারস্পরিক ক্রিয়া-

প্রতিক্রিয়ার কথা ভুলে যাওয়া হয় বলেই প্রধানত আমাদের প্রকৃতিবিজ্ঞানীরা সহজতম জিনিসগুলি পর্যন্ত স্পষ্ট করে দেখতে অক্ষম হন। আমরা দেখেছি ছাগেরা কী করে গ্রীসে নতুন অরণ্য-সৃষ্টি রোধ করেছে। সেণ্ট হেলেনা দ্বীপে আগত প্রথম নাবিকেরা যে ছাগ ও শুকর ছেড়ে দিয়েছিল তারা সেখানকার পুরানো গাছপালা প্রায় সম্পূর্ণ খেয়ে ফেলেছিল আর এইভাবে তারা পরবর্তীকালের নাবিক ও উপনিবেশিকদের দ্বারা আনীত গাছপালার প্রসারের জন্য ভূমি প্রস্তুত করে দেয়। কিন্তু পরিবেশের উপর পশু-প্রাণীরা যদি কোনো স্থায়ী ফলাফল রেখে যায় তো সেটা ঘটে অনিচ্ছাকৃতভাবে এবং খোদ প্রাণীগুলির দিক থেকে দেখলে এটা আকস্মিক ঘটনা মাত্র। পশুপ্রাণী থেকে মানুষ যতটা সরে যায়, ততই কিন্তু প্রকৃতির উপর তাদের প্রতিক্রিয়ার চরিত্র দাঁড়ায় পূর্বচিন্তিত পরিকল্পিত একটা ক্রিয়া যার লক্ষ্য হল আগে থেকে জানা নির্দিষ্ট কতকগুলির উদ্দেশ্যের সাধন। কী করছে তা না জেনেই জন্তুজানোয়ারেরা কোনো স্থানের উদ্ভিজ্জ ধ্বংস করে ফেলে। মানুষ তাকে ধ্বংস করে এইভাবে মুক্ত জমিতে ফসলের বীজ বপন অথবা এমন গাছপালা বা দ্রাক্ষালতা রোপণ করবার জন্য, যা থেকে অনেকগুণ সে ফেরত পাবে বলে জানে। উপকারী গাছপালা এবং গৃহপালিত পশু দেশ থেকে দেশে স্থানান্তরিত করে সে সমগ্র মহাদেশের জীব ও উদ্ভিদ জগত বদলে দেয়। শুধু কি তাই! কৃত্রিম প্রজননের দ্বারা মানুষ উদ্ভিদ এবং পশুদের এমনভাবে পরিবর্তিত করে যে তাদের চেনাই যায় না। যেসব বন্য উদ্ভিদ থেকে আমাদের বিভিন্ন শস্যাদির উদ্ভব হয়েছে এখনও তার সন্ধান সফল হয়নি। যে কুকুরদের নিজেদের মধ্যেই এত পার্থক্য সেই কুকুরেরা আর তেমনি অসংখ্য জাতের ঘোড়ারা যে কোন বন্য জন্তু থেকে উদ্ভূত হয়েছে তা এখনও তর্কের ব্যাপার হয়ে রয়েছে।

অবশ্য কোনো পরিকল্পিত এবং পূর্বচিন্তিত ধারা অনুযায়ী পশুদের কাজ করবার ক্ষমতা আমরা নাকচ করতে চাই না। বরং যেখানেই প্রোটোপ্ল্যাজম, জীবন্ত অ্যালবুমেন রয়েছে ও প্রতিক্রিয়া ঘটাচ্ছে অর্থাৎ নির্দিষ্ট বহিঃপ্রেরণার ফলে একান্ত সরলতম হলেও কতকগুলি নির্দিষ্ট গতি-প্রক্রিয়া চালিয়ে থাকে, সেখানেই একটি পরিকল্পিত কর্মধারা ভ্রূণাবস্থায় নিহিত থাকে। স্নায়ু কোষের (nerve cell) কথা দূরে থাক এমনকি যেখানে কোন কোষ নেই সেখানেও এ রকম প্রতিক্রিয়া চলে। অচেতনভাবে হলেও পতঙ্গভুক্ লতারা যেভাবে তাদের শিকার ধরে তা একদিক থেকে একইরকমভাবে পরিকল্পিত দেখায়। স্নায়ুতন্ত্রের (nervous system) বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে প্রাণীদের মধ্যে সচেতন ও পরিকল্পিত কাজের ক্ষমতাও আনুপাতিকভাবে বেড়ে চলে এবং স্তন্যপায়ীদের মধ্যে তা বেশ উন্নত পর্যায়ে পেঁছায়। ইংলণ্ডে শেয়াল শিকারের সময় সকলেই প্রতিদিন লক্ষ্য করে থাকবেন, কেমন নির্ভুলভাবে শেয়াল তার অনুসরণকারীদের চোখ ফাঁকি দেবার জন্য স্থানটি সম্পর্কে তার চমৎকার জ্ঞান

কাজে লাগিয়ে থাকে, এবং ভূমির যে অনুকূল বৈশিষ্ট্যগুলির জন্য তার গায়ের গন্ধ হারিয়ে যায় সেটা সে কত ভালোভাবে জানে ও কাজে লাগায়। মানুষের সঙ্গে সাহচর্যের ফলে আরও উন্নতিপ্রাপ্ত আমাদের গৃহপালিত পশুদের মধ্যে ঠিক শিশুসুলভ বুদ্ধিমাত্রার চালাকি আমরা প্রতিদিন লক্ষ্য করতে পারি। কারণ, মায়ের গর্ভে মানুষের ভ্রূণের পরিণতির ইতিহাস যেমন কীট থেকে আরম্ভ করে কোটি কোটি বৎসর ধরে আমাদের প্রাণী পূর্বপুরুষদের শারীরিক বিবর্তন ইতিহাসের শুধু এক সংক্ষেপিত পুনরাবৃত্তি, মানবশিশুর মানসিক বিকাশও ঠিক তেমনি এই পূর্বপুরুষদেরই, অন্তত পরবর্তী কালের পূর্বপুরুষদের বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশের আরও সংক্ষেপিত এক পুনরাবৃত্তি। তবু সমস্ত পশুপ্রাণীর সমস্ত পরিকল্পিত ক্রিয়াতেও পৃথিবীর উপর তাদের ইচ্ছাশক্তির ছাপ এঁকে দিতে পারেনি। তার জন্যে দরকার হল মানুষের।

সংক্ষেপে বললে, প্রাণীরা শুধু বহিঃপ্রকৃতিকে **ব্যবহার করে** এবং কেবলমাত্র নিজের উপস্থিতি দ্বারা প্রকৃতির মধ্যে পরিবর্তন আনে; মানুষ কিন্তু তার পরিবর্তন দ্বারা প্রকৃতিকে তার উদ্দেশ্য-সাধনে লাগায়, প্রকৃতির উপর **প্রভুত্ব করে**। এই হল মানুষের সঙ্গে অন্যান্য প্রাণীর চূড়ান্ত ও মূলগত পার্থক্য। আর পুনরপি শ্রমই ঘটিয়েছে এই পার্থক্য।

প্রকৃতির উপর মানুষের এই জয়লাভে আমরা যেন খুব বেশী আত্মপ্রসাদ লাভ না করি। কারণ ঐরকম প্রতিটি জয়লাভের জন্যই প্রকৃতি আমাদের উপর প্রতিহিংসা গ্রহণ করে। একথা সত্য যে, প্রত্যেকটি জয়ের ফলাফল সর্বাগ্রে আমাদেরই ধারণানুসারী। কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয় ক্ষেত্রে এর ফলাফল হয় সম্পূর্ণ পৃথক এবং অভাবিতপূর্ব, আর প্রায়ই তা প্রথমকে ব্যর্থ করে দেয়। মেসোপটেমিয়া, গ্রীস, এশিয়া মাইনর এবং অন্যান্য জায়গায় যে মানুষ কৃষি-উপযোগী জমি পাবার জন্য অরণ্যকে নির্মূল করে দিয়েছিল, তারা স্বপ্নেও কোনদিন ভাবতে পারেনি যে, অরণ্যের সঙ্গে সঙ্গে এইভাবে জলীয় বাষ্প সংগ্রহ ও ধারণ করবার কেন্দ্রগুলিও নিঃশেষিত করে তারা এই দেশগুলির বর্তমান বিধ্বস্ত অবস্থার ভিত্তি স্থাপন করে যাচ্ছিল। উত্তরের ঢালু জমিতে যে পাইন অরণ্যগুলিকে এত যত্নে রক্ষা করা হয়েছে আল্‌প্‌সের ইতালীয়রা যখন দক্ষিণ ঢালুতে সেই পাইন অরণ্যগুলিকেই নিঃশেষ করে ফেলল, তখন তাদের একটু ধারণা ছিল না যে, তারা এইভাবে তাদের পার্বত্য পশুপালনের মূলেই কুঠারাঘাত করছে; এতে করে যে তারা বছরের বেশীর ভাগ সময়ের জন্য তাদের পার্বত্য ঝোরাগুলির জল অপহরণ করছে ও বর্ষাকালের সময় সমতল ভূমিতে তাদের আরো উন্মত্ত জলস্রোত সম্ভব করে তুলছে, এ ধারণা তাদের ছিল আরো কম। ইউরোপে যারা আলু ছড়িয়েছিল তাদের মনেও আসেনি যে, শ্বেতসার জাতীয় এই আলুর সঙ্গে সঙ্গে তারা গ্রন্থিস্ফীতি (Scrofula) রোগের বীজাণুও ছড়িয়ে দিচ্ছে।

প্রতিটি পদক্ষেপে এইভাবে আমাদের স্মরণ রাখতে হয় যে, বিজেতা যেমন বিজিত জাতির উপর আধিপত্য বিস্তার করে, আমরা কোনো অর্থেই সেভাবে, প্রকৃতির বাইরে দাঁড়িয়ে প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব করি না। বরং রক্ত, মাংস আর মস্তিষ্ক নিয়ে আমরা প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত, প্রকৃতির মধ্যে আমাদের অস্তিত্ব; এবং প্রকৃতির উপর আমাদের সমস্ত প্রভুত্ব এইখানে যে, অন্য সকল জীবের চেয়ে আমাদের এই সুবিধা যে, আমরা প্রকৃতির নিয়ম আয়ত্ত করতে এবং নির্ভুলভাবে প্রয়োগ করতে সক্ষম।

আর সত্য সত্যই দিনে দিনে আমরা এই নিয়মগুলিকে আরও নির্ভুলভাবে জানতে শিখি, প্রকৃতির চিরাচরিত গতিধারার মধ্যে আমাদের হস্তক্ষেপের প্রত্যক্ষতর বা পরোক্ষতর ফলাফল কী হবে তা আমরা বুঝতে পারি। বিশেষ করে বর্তমান শতাব্দীতে প্রকৃতিবিজ্ঞানের বিপুল অগ্রগতির ফলে আমরা ক্রমশ এমন একটি অবস্থায় এসে পেঁাছচ্ছি যে, অন্ততপক্ষে আমাদের সাধারণতম উৎপাদনী কার্যাবলীর অধিকতর পরোক্ষ প্রাকৃতিক ফলগুলি জানতে এবং সেইহেতু নিয়ন্ত্রিত করতে পারি। আর যতই তা ঘটতে থাকবে ততই প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতা মানুষ শুধু অনুভব নয়, উপলব্ধিও করবে, ততই অসম্ভব হয়ে উঠবে মানস ও বস্তু, মানুষ ও প্রকৃতি, দেহ ও আত্মার মধ্যে বিরোধের অর্থহীন অস্বাভাবিক সেই ধারণা, ইউরোপে যার উদ্ভব হয়েছিল চিরায়ত প্রাচীন যুগের পতনের পর এবং সর্বোচ্চ পরিণতি লাভ করেছিল খৃষ্টধর্মে।

উৎপাদন সম্পর্কিত আমাদের কার্যাবলীর অধিকতর পরোক্ষ **প্রাকৃতিক** ফলাফল কিছু পরিমাণ গণনা করা শিখতেই যখন হাজার হাজার বৎসরের প্রয়োজন হয়ে থাকে, তখন তার পরোক্ষ **সামাজিক** প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে অবহিত হতে পারা তো আরোই দুরূহ। আমরা আলু এবং তার ফলে গ্রন্থিস্ফীতি রোগ প্রসারের উল্লেখ করেছিলাম। কিন্তু শ্রমিকদের শুধু একমাত্র আলু খেয়ে বেঁচে থাকার মতো অবস্থায় টেনে আনার ফলে দেশে দেশে জনসাধারণের জীবনধারণের ব্যাপারে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল তার, অথবা আলুমড়কের ফলে ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে যে দুর্ভিক্ষ আয়র্ল্যাণ্ডকে গ্রাস করেছিল, এবং আলু খেয়ে, প্রায় কেবল আলু খেয়েই বাঁচা দশ লক্ষ আইরিশকে কবরে পাঠিয়েছিল এবং আরও বিশ লক্ষ অধিবাসীকে সমুদ্রপারে দেশান্তরিত হতে বাধ্য করেছিল, তার তুলনায় এই গ্রন্থিস্ফীতি রোগ আর কতটুকু? আরবেরা যখন সুরাসার (আলকোহল) পরিস্রুত করতে শিখল, তখন বুঝতেও পারেনি যে, এই করে তারা তখন পর্যন্ত অনাবিষ্কৃত আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের বিলোপ সাধনের প্রধান একটি অস্ত্র তৈরি করেছিল। তারপর কলম্বাস যখন আমেরিকা আবিষ্কার করলেন, তিনি জানতেন না যে, তাতে করে যে দাসপ্রথা ইউরোপে অনেককাল আগেই রহিত হয়েছে তাকে তিনি নবজীবন দান করছেন ও নিগ্রো-ব্যবসার ভিত্তি স্থাপন করেছেন। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে যে মানুষগুলি বাষ্পচালিত এঞ্জিন সৃষ্টি করবার জন্য পরিশ্রম

করছিল তারা ধারণা করতে পারেনি যে, তারা এমন যন্ত্র তৈরি করছে যা সারা পৃথিবীর সামাজিক ব্যবস্থায় আর সবকিছুর তুলনায় বেশী বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটাবে। বিশেষ করে ইউরোপে, অল্প কয়েকজনের হাতে সম্পদ কেন্দ্রীভূত করে বেশীর ভাগ মানুষকে সম্পত্তিচ্যুত করে প্রথমে বুর্জোয়াদের হাতে সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রভুত্ব তুলে দেওয়া এবং তারপর বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েতের মধ্যে এমন শ্রেণী-সংগ্রামের উদ্ভব ঘটানোই তার নির্বন্ধ যার শেষ হতে পারে কেবল বুর্জোয়া শ্রেণীর উচ্ছেদে ও সমস্ত শ্রেণী-বিরোধের অবসানে। কিন্তু এখানেও দীর্ঘ ও প্রায়ই নির্মম অভিজ্ঞতার মারফতে এবং ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করে আমরা ক্রমশ আমাদের উৎপাদনী কার্যাবলীর পরোক্ষ দূরবর্তী প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা করতে শিখছি আর এইভাবে সে ফলাফল নিয়ন্ত্রণ ও নিয়মিতির সম্ভাবনাও আমাদের সামনে দেখা দিচ্ছে।

তবে, এই নিয়মিতি কার্যকরী করতে হলে শুধু জ্ঞান ছাড়াও আরও কিছুর প্রয়োজন। তার জন্য চলতি উৎপাদন-পদ্ধতিতে ও সেই সঙ্গে আমাদের সমসাময়িক সমাজ-ব্যবস্থায় একটা পরিপূর্ণ বিপ্লব প্রয়োজন।

এতদিন পর্যন্ত প্রচলিত সমস্ত উৎপাদন-পদ্ধতির লক্ষ্য ছিল কেবল শ্রমের সবচেয়ে আশু ও প্রত্যক্ষ উপযোগী ফলটুকু লাভ। তার অন্যান্য ফলাফল যা আত্মপ্রকাশ করে কেবল পরে ও ক্রমাগত পুনরাবৃত্তি এবং সঞ্চয়ের মধ্যে কার্যকরী হয় তা পুরোপুরি অবহেলিত হয়েছে। জমির উপর আদিম গোষ্ঠী-মালিকানার সহগামী ছিল একদিকে মানুষের এমন স্তরের বিকাশ যখন হাতের কাছে আশু যা পাওয়া যায় তার মধ্যেই মানুষের পরিধি সীমাবদ্ধ থাকছে এবং অন্যদিকে তার পূর্বশর্ত ছিল লভ্য জমির কিছু উদ্বৃত্তি যাতে এই প্রাথমিক ধরনের অর্থনীতির কোন সম্ভাব্য কুফল সংশোধনের মতো খানিকটা জায়গা থাকছে। এই উদ্বৃত্ত জমি যখন ফুরিয়ে গেল তখন গোষ্ঠী-মালিকানারও অবনতি ঘটল। পরের উন্নততর সমস্ত উৎপাদন-পদ্ধতি কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর সৃষ্টি করে শাসক এবং উৎপীড়িত শ্রেণীর মধ্যে বিরোধের সূত্রপাত করল। এইভাবে উৎপাদন উৎপীড়িত জনগণের ন্যূনতম জীবিকা সরবরাহে যতটা আবদ্ধ না থাকছে সেই পরিমাণে তার চালক শক্তি হল শাসক শ্রেণীর স্বার্থ। বর্তমানে পশ্চিম ইউরোপে প্রভুত্বকারী পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতিতে এটা কার্যকরী হয়েছে অতি পরিপূর্ণ রূপে। যে সমস্ত ব্যক্তি পুঁজিপতি উৎপাদন এবং বিনিময় ব্যবস্থার উপর আধিপত্য করে, তারা তাদের কার্যাবলীর শুধুমাত্র প্রত্যক্ষতম উপযোগী ফলাফল নিয়েই ভাবিত হতে সক্ষম। বস্তুত, সে উপযোগী ফল বলতে উৎপাদিত ও বিনিময়-কৃত দ্রব্যটির উপযোগিতার প্রশ্ন যা আসে তা পর্যন্ত এখন একেবারে পেছনে পড়ে যায়, এবং একমাত্র প্রেরণা হয়ে দাঁড়িয়েছে বিক্রয়জনিত মুনাফা।

* * *

উৎপাদন এবং বিনিময়ের সঙ্গে জড়িত মানবিক ক্রিয়াকলাপের প্রত্যক্ষ-প্রত্যাশিত সামাজিক ফলাফল নিয়েই বুর্জোয়াদের সমাজ-বিজ্ঞান, অর্থাৎ চিরায়ত অর্থশাস্ত্র বেশী মাথা ঘামায়। এ শাস্ত্র যে সামাজিক ব্যবস্থার তত্ত্বগত অভিব্যক্তি তার সঙ্গে এটা সম্পূর্ণ খাপ খায়। ব্যক্তি পুঁজিপতিরা যেহেতু আশু মুনাফার জন্য উৎপাদন এবং বিনিময়ে আত্মনিয়োগ করে, তাই সর্বাগ্রে তার নিকটতম ও আশুতম ফলাফলই হিসাবে নিতে পারে তারা। ব্যক্তি শিল্পোৎপাদক অথবা বণিক যতক্ষণ তার শিল্পোৎপন্ন বা ক্রীত পণ্যটি স্বাভাবিক মুনাফায় বিক্রি করতে পারছে ততক্ষণ সে সন্তুষ্ট, পরে সেই পণ্য অথবা ক্রেতার কী ঘটল তা নিয়ে তার ভাবনা নেই। এই একই ক্রিয়ার প্রাকৃতিক ফলাফল সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। অতি লাভজনক কফি গাছের শুধু **একটি** আবাদের জন্য কিউবার স্পেনীয় বাগিচা-মালিকেরা যখন পর্বতের বুকের অরণ্য ভস্মীভূত করে ছাই থেকে সার জোগাড় করেছিল, তখন গ্রীষ্মমণ্ডলের ভীষণ বারিপাতে অধুনা অরক্ষিত মাটির উপরকার স্তর ভেসে গিয়ে কেবল নগ্ন শিলাস্তর পড়ে থাকবে কিনা এ নিয়ে তাদের কীই বা মাথা ব্যথা! যেমন প্রকৃতি তেমনি সমাজের দিক থেকে বর্তমান উৎপাদন-পদ্ধতি প্রধানত শুধু প্রথম ফলাফল, শুধু নগদ ফলাফল নিয়েই ভাবিত। অথচ এই দেখেও লোকে অবাক হয় যে, এই উদ্দেশ্যে চালিত কার্যাবলীর সুদূরতর ফলাফল একেবারে ভিন্নতর এবং এমনকি একেবারেই উল্টো ধরনের হচ্ছে; প্রতি দশ বৎসরের শিল্পচক্রে যা দেখা যায় এবং 'বিপর্যয়টায়'* জার্মানি পর্যন্ত যার কিছুটা প্রাথমিক অভিজ্ঞতা পেয়েছে, সেই জোগান ও চাহিদার সামঞ্জস্য পরিণত হচ্ছে ঠিক তার বিপরীতে; নিজস্ব শ্রমের উপর প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিগত মালিকানা পর্যন্ত অনিবার্যভাবেই পরিণত হচ্ছে শ্রমিকদের সম্পত্তিহীনতায় অথচ ক্রমশ সমস্ত সম্পদ ক্রমেই কেন্দ্রীভূত হচ্ছে অ-শ্রমিকদের হাতে; [...]**

এঙ্গেলস কর্তৃক ১৮৭৬ সালে লিখিত
প্রথম প্রকাশ ১৮৯৬ সালে *Neue Zeit* পত্রিকায়

পাণ্ডুলিপি অনুসরণে মুদ্রিত
জার্মান থেকে ইংরেজি অনুবাদের ভাষান্তর

* এঙ্গেলস ১৮৭৩ — ১৮৭৪ সালের অর্থসংকটের উল্লেখ করছেন। — সম্পাঃ

** পাণ্ডুলিপি এখানেই আকস্মিকভাবে শেষ হয়েছে। — সম্পাঃ

ফ্রেডারিক এঙ্গেলস

ইউটোপীয় ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র

১৮৯২ সালের ইংরাজি সংস্করণের জন্য বিশেষ ভূমিকা

বর্তমানের এই ছোট পুস্তিকাটি মূলত একটি বৃহত্তর রচনার অংশ। ১৮৭৫ সালের কাছাকাছি বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের privatdocent ডাঃ ও. দ্যুরিং সহসা এবং খানিকটা সরবে সমাজতন্ত্রে তাঁর দীক্ষাগ্রহণের কথা ঘোষণা করেন ও জার্মান জনসাধারণের কাছে একটা বিস্তারিত সমাজতান্ত্রিক তত্ত্বই শুধু নয়, সমাজপুনর্গঠনের একটা সুসম্পূর্ণ ব্যবহারিক ছকও হাজির করেন। বলাই বাহুল্য, উনি তাঁর পূর্ববর্তীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন; সর্বোপরি মার্কসকে পাকড়াও করে তাঁর পুরো ঝাল ঝাড়েন।

ঘটনাটা ঘটে প্রায় সেই সময় যখন জার্মানির সোশ্যালিস্ট পার্টির দুটি অংশ, আইজেনাখীয় ও লাসালীয়রা সবে মিলিত হয়েছে এবং তাতে করে প্রভূত শক্তি সঞ্চয় করেছে তাই নয়, অধিকন্তু তার সমগ্র শক্তিকে সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে নিয়োগের ক্ষমতাও অর্জন করেছে। জার্মানির সোশ্যালিস্ট পার্টি দ্রুত একটা শক্তি হয়ে উঠছিল। কিন্তু শক্তি হয়ে ওঠার প্রথম সর্তই ছিল, এই নবার্জিত ঐক্যকে বিপন্ন করা চলবে না। ডাঃ দ্যুরিং কিন্তু প্রকাশ্যেই তাঁর চারিপাশে একটি জোট পাকাতে শুরু করেন, একটি ভবিষ্যৎ পৃথক পার্টির তা বীজ। সুতরাং প্রয়োজন হয় আহ্বান গ্রহণ করে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ চালানোর, চাই বা না চাই।

কাজটা অতি দুষ্কর না হলেও স্পষ্টতই এক দীর্ঘ ঝামেলার ব্যাপার। এ কথা সুবিদিত যে, আমরা জার্মানরা হলাম সাঙ্ঘাতিক রকমের গুরুভার Gründlichkeit-এর ভক্ত — তাকে র‍্যাডিক্যাল প্রগাঢ়ত্ব অথবা প্রগাঢ় র‍্যাডিক্যালত্ব যা খুশি বলুন। আমাদের কেউ যখন তাঁর বিবেচনানুসারে যা নতুন মনে হচ্ছে এমন একটি মতবাদ বিবৃত করতে চান, তখন সর্বাগ্রে সেটিকে একটি সর্বাঙ্গীন মতধারায় পরিপ্রসারিত করতে হবে তাঁকে। প্রমাণ করে দিতে হবে যে, ন্যায়শাস্ত্রের প্রথম সূত্রটি থেকে বিশ্বের মৌলিক নিয়মগুলি সবই যে অনাদি কাল থেকে বিদ্যমান, তার পেছনে শুধু শেষ পর্যন্ত এই নবাবিষ্কৃত মুকুটমণি তত্ত্বটিতে পেঁছিন ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্য নেই। এবং এদিক থেকে

ডাঃ দ্যুরিং একান্তই জাতীয় মানোত্তীর্ণ। একছিটে কম নয় একেবারে সুসম্পূর্ণ একটা 'দর্শন-ব্যবস্থা' — মনোজাগতিক, নৈতিক, প্রাকৃতিক ও ঐতিহাসিক; সুসম্পূর্ণ একটা 'অর্থশাস্ত্র ও সমাজতন্ত্রের ব্যবস্থা'; এবং পরিশেষে 'অর্থশাস্ত্রের বিচারমূলক ইতিহাস' — অক্টাভো সাইজের তিনটি মোটা মোটা খণ্ড, আকার ও প্রকার উভয়তঃ গুরুভার, সাধারণভাবে পূর্বতন সমস্ত দার্শনিক ও অর্থনীতিবিদদের বিরুদ্ধে এবং বিশেষ করে মার্কসের বিরুদ্ধে তিন অক্ষৌহিণী যুক্তি, মোটকথা একটা পরিপূর্ণ 'বিজ্ঞান বিপ্লবের' প্রচেষ্টা, এরই মোকাবিলা করতে হত। আলোচনা করতে হত সম্ভাব্য সবকিছু প্রসঙ্গ: স্থান কালের ধারণা থেকে Bimetallism পর্যন্ত; বস্তু ও গতির চিরন্তনতা থেকে নৈতিক ভাবনার মরণশীল প্রকৃতি; ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচন থেকে ভবিষ্যৎ সমাজে তরুণদের শিক্ষা — সব। যাই হোক, আমার প্রতিবাদীর ধারাবাহিক সর্বাঙ্গীনতার ফলে এই অতি বিভিন্ন সব প্রসঙ্গে মার্কস ও আমার যা মতামত সেগুলিকে দ্যুরিং-এর বিপরীতে, এবং এযাবৎ যা করা হয়েছে তার চেয়ে আরো সুসম্বন্ধ আকারে বিকশিত করার একটা সুযোগ পাওয়া গেল। অন্যথায়-অকৃতার্থ এ কর্তব্যগ্রহণে সেই ছিল আমার প্রধান কারণ।

আমার জবাব প্রথমে প্রকাশিত হয় সোশ্যালিস্ট পার্টির প্রধান মুখপত্র লাইপজিগ **Vorwärts*** পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রবন্ধ হিসাবে এবং পরে **"Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft"** (শ্রী ও. দ্যুরিং-এর 'বিজ্ঞান বিপ্লব') নামক পুস্তকাকারে, দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় জুরিখে ১৮৮৬ সালে।

সুহৃদ্বর এবং অধুনা ফরাসী প্রতিনিধি সভায় লিল্ প্রতিনিধি পল লাফার্গের অনুরোধে এ বইয়ের তিনটি পরিচ্ছেদ একটি পুস্তিকাকারে সাজিয়ে দিই। তিনি তা অনুবাদ করে ১৮৮০ সালে "Socialisme utopique et Socialisme scientifique" ('ইউটোপীয় ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র') নামে প্রকাশ করেন। এই ফরাসী পাঠ থেকে একটি পোলীয় ও একটি স্পেনীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ১৮৮৩ সালে আমাদের জার্মান বন্ধুরা পুস্তিকাটিকে মূল ভাষায় প্রকাশ করেন। জার্মান পাঠের ওপর ভিত্তি করে ইতালীয়, রুশ, দিনেমার, ওলন্দাজ, রুমানীয় অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমান ইংরাজি সংস্করণের সঙ্গে সঙ্গে পুস্তিকাটি তাহলে দশটি ভাষায় প্রচলিত হল। আর কোনো সমাজতান্ত্রিক পুস্তক এত বেশি অনুবাদ হয়েছে বলে আমার জানা নেই, এমনকি আমাদের ১৮৪৮ সালের 'কমিউনিস্ট ইশ্‌তেহার' বা মার্কসের 'পুঁজি' বইটিও নয়। জার্মানিতে এ বইটির চারটি সংস্করণ হয়েছে, সর্বসমেত ২০,০০০ কপি।

* *Vorwärts* — গোথা ঐক্য কংগ্রেসের পর জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির মুখপত্র। প্রকাশিত হয় লাইপজিগ থেকে ১৮৭৬—১৮৭৮ সালে। — সম্পাঃ

'মার্ক',* এই সংযোজনী লেখা হয়েছিল জার্মানিতে ভূমি সম্পত্তির ইতিহাস ও বিকাশের কিছুটা প্রাথমিক জ্ঞান জার্মান সোশ্যালিস্ট পার্টির মধ্যে প্রচারের উদ্দেশ্য নিয়ে। একাজ তখন বিশেষ জরুরী ঠেকেছিল কারণ সে পার্টির দ্বারা শহুরে মজুরদের অঙ্গীভবন তখন বেশ সম্পূর্ণতার দিকে, পালা এসেছে ক্ষেতমজুর ও চাষীদের। অনুবাদে এ সংযোজনী রেখে দেওয়া হয়েছে, কেননা সমস্ত টিউটোনিক জাতির পক্ষে যা একই সেই ভূমি-ব্যবস্থার আদি ধরনটা এবং তার অবক্ষয়ের ইতিহাস জার্মানির চেয়েও ইংলন্ডে কম সুবিদিত। লেখাটি মূলে যা ছিল তাই রেখে দিয়েছি, মাক্সিম কভালেভস্কি সম্প্রতি যে প্রকল্প দিয়েছেন তার কথা উল্লেখ করা হয়নি; এই প্রকল্প অনুসারে মার্ক-এর সভ্যদের মধ্যে আবাদী ও চারণভূমির বাঁটোয়ারা হয়ে যাবার আগে বেশ কয়েক পুরুষ ধরে এগুলির চাষ হত এজমালি হিসাবে এক একটি বৃহৎ পিতৃতান্ত্রিক পারিবারিক গোষ্ঠী দ্বারা (অদ্যাবধি বর্তমান দক্ষিণ স্লাভোনীয় জাদ্রুগা তার দৃষ্টান্তস্থানীয়), বাঁটোয়ারাটা হয় পরে, যখন গোষ্ঠী বৃদ্ধি পায়, ফলে এজমালি হিসাবে পরিচালনা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। কভালেভস্কির বক্তব্য হয়ত ঠিকই, কিন্তু বিষয়টা এখনো sub judice**।

এ বইয়ে ব্যবহৃত অর্থনৈতিক পরিভাষার মধ্যে যেগুলি নতুন সেগুলি মার্কসের 'পুঁজি' বইটির ইংরাজি সংস্করণ অনুযায়ী। 'পণ্যোৎপাদন' আমরা সেই অর্থনৈতিক পর্যায়কে বলছি যেখানে সামগ্রী উৎপাদন করা হচ্ছে কেবল উৎপাদকের ভোগের জন্য শুধু নয়, বিনিময়ের জন্যও; অর্থাৎ ব্যবহার-মূল্য হিসাবে নয়, **পণ্য হিসাবে**। বিনিময়ের জন্য উৎপাদনের প্রথম সূত্রপাত থেকে আমাদের কাল পর্যন্ত এই পর্যায়টা প্রসারিত; তার পূর্ণ বিকাশ ঘটে কেবলমাত্র পুঁজিবাদী উৎপাদনেই, অর্থাৎ সেই অবস্থায়, যখন উৎপাদন-উপায়ের মালিক পুঁজিপতি মজুরি দিয়ে নিয়োগ করে শ্রমিকদের, শ্রমশক্তি ছাড়া যারা উৎপাদনের সর্ববিধ উপায় থেকে বঞ্চিত তাদের, এবং সামগ্রীর বিক্রয়মূল্য থেকে তার লগ্নীর ওপর যেটা উদ্বৃত্ত হয় সেটি পকেটস্থ করে। মধ্য যুগ থেকে ধরে শিল্পোৎপাদনের ইতিহাসকে আমরা তিনটি যুগে ভাগ করি: ১) হস্তশিল্প, ক্ষুদে ক্ষুদে ওস্তাদ কারুশিল্পী ও তদধীনস্থ জনকয়েক কর্মী ও সাকরেদ, প্রত্যেক শ্রমিকই সেখানে পুরো সামগ্রীটাই তৈরি করে; ২) কারখানা (manufacture), যেখানে অধিকতর সংখ্যক শ্রমিক একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে একত্র হয়ে সম্পূর্ণ সামগ্রীটা উৎপাদন করে শ্রমবিভাগ নীতিতে, প্রত্যেকটা শ্রমিক করে শুধু এক একটা আংশিক কাজ যাতে সামগ্রীটা সম্পূর্ণ হয় শুধু পর পর প্রত্যেকের হাত ফেরতা হয়ে যাবার পর;

* 'মার্ক' — জার্মানির প্রাচীন গ্রামগোষ্ঠী। 'ইউটোপীয় ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র' বইখানির প্রথম জার্মান সংস্করণের সংযোজনীতে এঙ্গেলস পূর্বোক্ত শিরোনামায় পুরাকাল থেকে শুরু করে জার্মান কৃষকসম্প্রদায়ের ইতিহাস সংক্ষেপে বর্ণনা করেন। — সম্পাঃ

** Sub judice — বিচারসাপেক্ষ। — সম্পাঃ

৩) আধুনিক যন্ত্রশিল্প, যেখানে মাল তৈরি হয় শক্তি-চালিত যন্ত্র দ্বারা আর শ্রমিকের কাজ শুধু যন্ত্রের ক্রিয়ার তদারকি ও নিয়ন্ত্রণে সীমাবদ্ধ।

আমি বেশ জানি যে, এ বইয়ের বিষয়বস্তুতে বৃটিশ পাঠক সাধারণের একটা বড়ো অংশের আপত্তি হবে। কিন্তু আমরা, কণ্টিনেণ্ট-বাসীরা যদি বৃটিশ 'শালীনতা' রূপ কুসংস্কারের বিন্দুমাত্র ধারও ধারতাম, তাহলে আমাদের অবস্থা যা আছে তা আরো শোচনীয় হত। আমরা যাকে 'ঐতিহাসিক বস্তুবাদ' বলি, এ বইয়ে তাকেই সমর্থন করা হয়েছে আর 'বস্তুবাদ' শব্দটাই বৃটিশ পাঠকদের বিপুল অধিকাংশের কানে বড়ো বেঁধে। 'অজ্ঞেয়বাদ'* তবু সহনীয়, কিন্তু বস্তুবাদ একেবারেই অমার্জনীয়।

অথচ সপ্তদশ শতক থেকে শুরু করে আধুনিক সমস্ত বস্তুবাদেরই আদি ভূমি হল ইংলণ্ড।

'বস্তুবাদ গ্রেট বৃটেনের আত্মজ সন্তান। বৃটিশ স্কলাস্টিক দুনস স্কোট** তো আগেই প্রশ্ন তুলেছিলেন, "বস্তুর পক্ষে ভাবনা কি অসম্ভব?"

'এই অঘটন-ঘটনের জন্য তিনি আশ্রয় নেন ঈশ্বরের সর্বশক্তিমত্তায় অর্থাৎ তিনি ধর্মতত্ত্বকে লাগান বস্তুবাদের প্রচারে। তদুপরি তিনি ছিলেন নামবাদী। নামবাদ***, বস্তুবাদের প্রাথমিক এই রূপ প্রধানত দেখা যায় ইংরেজ স্কলাস্টিকদের মধ্যে।

'ইংরাজি বস্তুবাদের আসল প্রবর্তক হলেন বেকন। তাঁর কাছে প্রাকৃতিক দর্শনই হল একমাত্র সত্য দর্শন এবং ইন্দ্রিয়ের অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করা পদার্থবিদ্যা হল প্রাকৃতিক দর্শনের প্রধান ভাগ। আনাক্সেইগরস এবং তাঁর homoiomeriae, ডিমোক্রিটস এবং তাঁর

* অজ্ঞেয়বাদ — (গ্রীক agnostos থেকে, অর্থ অজ্ঞেয়, অজ্ঞাত) — একটি দার্শনিক মতবাদ; আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতির বাইরে কিছু জানা সম্ভব নয়, এই দাবিতে অজ্ঞেয়বাদীবা হয় বিশ্বের অস্তিত্বই অস্বীকার করে (ইংরেজ দার্শনিক হিউম), নয়ত বাস্তব কোনো জিনিসকে জানতে পারার সম্ভাবনাই মানে না (জার্মান দার্শনিক ক্যাণ্ট)। — সম্পাঃ

** স্কলাস্টিজ্ম্ — মধ্য যুগে স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধীত ধর্মীয় ভাববাদী দর্শনের প্রধান ধারার সাধারণ নাম।

ধর্মতত্ত্ব সেবায় সমর্পিত এ দর্শন প্রকৃতি ও পরিপার্শ্বের বাস্তবতা নিয়ে কোন গবেষণা করত না, তার ভিত্তি ছিল কেবল খ্রীষ্টীয় গির্জার আপ্তবাক্য, তারই সাধারণ নীতিগুলি থেকে জল্পনামূলক পদ্ধতিতে প্রত্যক্ষ সিদ্ধান্ত টানা ও লোকের আচরণ বিধি নির্দেশের চেষ্টা করত। স্কলাস্টিক দর্শনের প্রধান প্রতিনিধি দুনস স্কোটের মতবাদের মধ্যেই তার পতনের সর্বকিছু উপাদান তখনই দেখা গিয়েছিল। দুনস স্কোট নামবাদের সমর্থক রূপে এগিয়ে আসেন — মার্কসের মতে এ নামবাদ ছিল বস্তুবাদের প্রথম অভিব্যক্তি। — সম্পাঃ

*** নামবাদ (nominalism) — ল্যাটিন nomen (নাম) থেকে উদ্ভব। মধ্যযুগীয় দর্শনের একটি ধারা, এই দার্শনিকেরা প্রচার করে চলতেন, জাতিগত (generic) প্রত্যয় হল আসলে সমধর্মী বস্তুসমূহের নামান্তর। — সম্পাঃ

পরমাণুর কথা তিনি প্রায়ই উদ্ধৃত করতেন তাঁর প্রামাণ্য হিসাবে। তাঁর বক্তব্য, ইন্দ্রিয় অভ্রান্ত ও সর্বজ্ঞানের মূলাধার। সমস্ত বিজ্ঞানের ভিত্তি অভিজ্ঞতা, ইন্দ্রিয়-দত্ত তথ্যকে যুক্তিসম্মত প্রণালীতে বিচার করাই হল বিজ্ঞানের কাজ। অনুমান, বিশ্লেষণ, তুলনা, পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা হল এই ধরনের যুক্তিসম্মত প্রণালীর প্রধান অঙ্গ। বস্তুর অন্তর্নিহিত গুণের মধ্যে প্রথম এবং প্রধান হল গতি, যান্ত্রিক ও গাণিতিক গতিই শুধু নয়, প্রধানত একটা উদ্বেগ (impulse), একটা সজীব প্রেরণা, একটা টান, অথবা ইয়াকব ব্যেমের কথা অনুসারে — বস্তুর একটা বেদনা (qual)*।

'বস্তুবাদের প্রথম স্রষ্টা বেকন, একটা সর্বাঙ্গীন বিকাশের বীজ তখনো তাঁর বস্তুবাদে অন্তর্নিহিত। একদিকে ইন্দ্রিয়গত কাব্যময় ঝলকে পরিবৃত বস্তু যেন মানবের সমগ্র সত্তাকে আকৃষ্ট করছিল মোহিনী হাসি হেসে। অন্যদিকে অ্যাফরিজম-প্রভাবে সূত্রবদ্ধ মতবাদ ধর্মতত্ত্বের অসঙ্গতিতে পল্লবিত হয়ে উঠছিল।

'পরবর্তী বিকাশে বস্তুবাদ হয়ে ওঠে একপেশে। বেকনীয় বস্তুবাদকে যিনি গুছিয়ে তোলেন তিনি হব্‌স। ইন্দ্রিয়ভিত্তিক জ্ঞান তার কাব্য মায়া হারিয়ে গাণিতিকের বিমূর্ত অভিজ্ঞতার করায়ত্ত হল; বিজ্ঞানের রাণী বলে ঘোষণা করা হল জ্যামিতিকে। বস্তুবাদ আশ্রয় নিল মানবদ্বেষে। প্রতিদ্বন্দ্বী মানবদ্বেষী দেহহীন অধ্যাত্মবাদকে যদি তারই স্বভূমিতে পরাস্ত করতে হয়, তাহলে বস্তুবাদকেও তার দেহ দমন করে যোগী হতে হয়। এই ভাবে ইন্দ্রিয়গত সত্তা থেকে তার পরিণতি হল বুদ্ধিক সত্তায়; কিন্তু এ ভাবেও, বুদ্ধির যা বৈশিষ্ট্য সেই অনুসারে, ফলাফলের হিসাব না করে সবকটি সঙ্গতিকেই তা বিকশিত করে তোলে।

'বেকনের অনুবর্তক হিসাবে হব্‌সের বক্তব্য এই: সমস্ত মানবিক জ্ঞান যদি পাই ইন্দ্রিয় থেকে তাহলে আমাদের ধারণা ও প্রত্যয়গুলি তাদের ইন্দ্রিয়গত রূপ থেকে, বাস্তব জগত থেকে বিচ্ছিন্ন ছায়ারূপ ছাড়া কিছু নয়। দর্শন শুধু কেবল তাদের নামকরণ করতে পারে। একই নাম প্রযুক্ত হতে পারে একাধিক ছায়ারূপে। নামেরও নাম থাকতে পারে। স্ববিরোধ দেখা দেবে যদি আমরা একদিকে বলি যে, সমস্ত ধারণার উদ্ভব ইন্দ্রিয়ের জগত থেকে এবং অন্যদিকে বলি, শব্দটা শব্দেরও অতিরিক্ত কিছু, ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে পরিজ্ঞাত যে সত্তাগুলি সকলেই এক একটি একক, সেগুলি ছাড়াও একক নয় সাধারণ চরিত্রের সত্তা বর্তমান। দেহহীন বস্তুর মতোই দেহহীন সত্তাও আজগুবি। দেহ, বস্তু, সত্তা হল একই

* Qual — দার্শনিক কথার খেলা। Qual কথার আক্ষরিক অর্থ যন্ত্রণা, একটা বেদনা যা থেকে কোনো একটা কর্মের প্রেরণা। এই জার্মান শব্দটির মধ্যে অতীন্দ্রিয়বাদী ব্যেমে ল্যাটিন qualitas-এর (গুণ) কিছুটা অর্থও আরোপ করেছেন। বাইরে থেকে দেওয়া যন্ত্রণার পরিবর্তে তাঁর qual হল বেদনার্ত বস্তু, সম্পর্ক বা ব্যক্তির স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ থেকে উদ্ভূত ও সঙ্গে সঙ্গে সেই বিকাশকে অগ্রসর করার মতো এক কারিকা। (ইংরাজি সংস্করণে এঙ্গেলসের টীকা।)

বাস্তবের বিভিন্ন নাম। **চিন্তক বস্তু থেকে চিন্তাকে বিচ্ছিন্ন করা অসম্ভব।*** জগতে যে পরিবর্তন চলেছে তা সবের অধঃস্তর হল এই বস্তু। অসীম কথাটা অর্থহীন যদি না বলা হয় যে, অবিরাম যোগ দিয়ে যাবার ক্ষমতা আমাদের মনের আছে। কেবল বস্তুময় জগত আমাদের বোধগম্য বলে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে কিছুই জানা আমাদের সম্ভব নয়। একমাত্র আমার নিজস্ব অস্তিত্বই নিশ্চিত। মানবিক প্রতিটি আবেগই হল একটা যান্ত্রিক সঞ্চলন যার একটা শুরু ও একটা শেষ আছে। যাকে আমরা কল্যাণ বলি তা হল চিত্তাবেগের (impulse) লক্ষ্য। প্রকৃতির মতো মানুষও একই নিয়মের অধীন। ক্ষমতা ও স্বাধীনতা একই কথা।

'হব্‌স বেকনকে গুছিয়ে তুলেছেন, কিন্তু ইন্দ্রিয়ের জগত থেকে সমস্ত মানবিক জ্ঞানের উদ্ভব, বেকনের এই মূলনীতির কোনো প্রমাণ দাখিল করেননি। সে প্রমাণ দেন লক তাঁর "মানবিক বোধ বিষয়ে নিবন্ধ"এ।

'বেকনীয় বস্তুবাদের আস্তিক্যবাদী** কুসংস্কার ছিন্ন করেছিলেন হব্‌স। লকের ইন্দ্রিয়বাদের মধ্যে যে ধর্মতত্ত্বের অবশেষ তখনো থেকে গিয়েছিল তাকে একই ভাবে ছিন্ন করেন কলিন্স, ডডওয়েল, কাউয়ার্ড, হার্টলি, প্রিস্টলি। ব্যবহারিক বস্তুবাদীদের পক্ষে ধর্ম থেকে অব্যাহতি পাবার সহজ পদ্ধতি হল শেষ পর্যন্ত Deism***।'****

আধুনিক বস্তুবাদের বৃটিশ উৎস বিষয়ে এই হল মার্কসের লেখা। ইংরেজদের পূর্বপুরুষদের মার্কস যে প্রশংসা করেছিলেন সেটা যদি আজকাল তাদের তেমন রুচিকর না লাগে তবে আক্ষেপেরই কথা। কিন্তু অস্বীকার করার জো নেই যে, বেকন, হব্‌স ও লকই হলেন ফরাসী বস্তুবাদীদের সেই চমৎকার ধারাটির জনক যার দরুন, ফরাসীদের ওপর ইংরেজ ও জার্মানরা স্থল ও নৌযুদ্ধে যত জয়লাভই করুক না কেন, অষ্টাদশ শতাব্দী পরিণত হয় প্রধানত এক ফরাসী শতাব্দীতে এবং তা হয় পরিণামের সেই ফরাসী বিপ্লবেরও আগে যার ফলশ্রুতি ইংলণ্ড ও জার্মানির আমরা, বাইরের লোকেরা, আজো পর্যন্ত আত্মস্থ করতে চেষ্টিত।

---

* বড় হরফ মার্কসের। — সম্পাঃ

** আস্তিক্যবাদী (theistic, theism বিষয়ক) — একটি ধর্মীয়-দার্শনিক মতবাদ, তাতে ব্যক্তিস্বরূপ এক ঈশ্বরের, বিশ্বস্রষ্টার অস্তিত্ব স্বীকৃত। — সম্পাঃ

*** Deism — ধর্মীয়-দার্শনিক মতবাদ; এতে ব্যক্তিস্বরূপ ঈশ্বরের ধারণা নেই, কিন্তু জগতের এক নির্ব্যক্তিক আদি কারণ রূপে ঈশ্বর-ব্রহ্মের অস্তিত্ব মানা হয়। — সম্পাঃ

**** Marks und Engels, *Die heilige Familie*, Frankfort a. M. 1845, S. 201-204. (এঙ্গেলসের টীকা।)

মার্কস ও এঙ্গেলসের এই বইটির পুরো নাম: *Die heilige Familie oder Kritik der kritischen Kritik. Gegen Bruno Bauer und Konsorten* (পবিত্র পরিবার বা বিচারমূলক সমালোচনার সমালোচনা। ব্রুনো বাউয়ের ও কোম্পানির বিরুদ্ধে)। — সম্পাঃ

এ কথা অনস্বীকার্য। এ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে বিদগ্ধ যে বিদেশীরা ইংলণ্ডে এসে বসবাস শুরু করেছেন তাঁদের প্রত্যেকেরই যে জিনিসটা চোখে পড়েছে সেটাকে তাঁরা 'ভদ্র' ইংরেজ মধ্য শ্রেণীর ধর্মীয় গোঁড়ামি ও নির্বুদ্ধিতা বলে গণ্য করতে বাধ্য। আমরা সে সময় সকলেই ছিলাম হয় বস্তুবাদী নয় অন্ততপক্ষে অতি র‍্যাডিক্যাল স্বাধীন-চিন্তক, এবং ইংলণ্ডের প্রায় সমস্ত শিক্ষিত লোকেই যে যতোরকম অসম্ভাব্য অলৌকিকত্বে বিশ্বাস করবেন, বাকল্যাণ্ড ও মানটেলের মতো ভূতাত্ত্বিকরাও বিজ্ঞানের তথ্যকে বিকৃত করে বিশ্বসৃষ্টির পুরান-কাহিনীর সঙ্গে খুব বেশি সংঘর্ষের মধ্যে যেতে চাইবেন না, তা আমাদের কাছে অকল্পনীয় লেগেছিল। অন্যপক্ষে, ধর্মীয় প্রসঙ্গে যাঁরা স্বীয় বুদ্ধিবৃত্তি প্রয়োগে সাহসী এমন লোকের সন্ধান পেতে হলে যেতে হত অবিদ্বানদের মধ্যে, তখন যাঁদের বলা হত 'অধৌত জনগণ' সেই তাঁদের মধ্যে, শ্রমিকদের মধ্যে, বিশেষ করে ওয়েনপন্থী সমাজতন্ত্রীদের মধ্যে।

কিন্তু অতঃপর ইংলণ্ড 'সুসভ্য' হয়েছে। ১৮৫১ সালের প্রদর্শনী থেকে আত্মপর ইংরাজি বিচ্ছিন্নতার অবসান ঘটে। ধীরে ধীরে ইংলণ্ডের আন্তর্জাতীয়করণ হয়েছে খাদ্যে, আচার-আচরণে, ভাবনায়; এতটা পরিমাণে হয়েছে যে ইচ্ছে হয় বলি, কণ্টিনেণ্টের অন্যান্য অভ্যাস এখানে যেমন চালু হয়েছে তেমনি কিছু ইংরাজি আচার-ব্যবহার কণ্টিনেণ্টেও সমান চালু হোক। যাই হোক, স্যালাড-তেলের প্রবর্তন ও প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে (১৮৫১ সালের আগে তা কেবল অভিজাতদের কাছেই সুবিদিত ছিল) ধর্ম বিষয়ে কণ্টিনেণ্টসুলভ সন্দেহবাদেরও একটা মারাত্মক প্রসার ঘটেছে; এবং তা এতদূর গড়িয়েছে যে, চার্চ অব ইংলণ্ডের মতো ঠিক অতোটা 'এই-তো-চাই' বলে এখনো গণ্য না হলেও অজ্ঞেয়বাদ শালীনতার দিক থেকে প্রায় ব্যাপটিস্ট সম্প্রদায়ের সমতুল্য এবং নিশ্চিতই 'স্যালভেশন আর্মি'র'* চেয়ে উচ্চে। না ভেবে পারি না যে, এই অবস্থায় অধর্মের এ প্রসারে যাঁরা আন্তরিকভাবেই ক্ষুব্ধ ও তার নিন্দা করেন, তাঁরা এই জেনে সান্ত্বনা পেতে পারেন যে, এই সব 'নয়া হালফিল ধারণাগুলো' বিদেশী বস্তু নয়, দৈনন্দিন ব্যবহারের বহু সামগ্রীর মতো Made in Germany বস্তু নয়, বরং নিঃসন্দেহেই তা সাবেকি বিলাতী, এবং উত্তরপুরুষেরা এখন যতটা সাহস করে না দুশ বছর আগে তার চেয়েও অনেক দূর এগিয়েছিলেন তাঁদের বৃটিশ আদিপুরুষেরা।

বস্তুতপক্ষে, 'সসঙ্কোচ' বস্তুবাদ ছাড়া অজ্ঞেয়বাদ আর কী? প্রকৃতি সম্পর্কে অজ্ঞেয়বাদীর ধারণা আগাগোড়া বস্তুবাদী। সমগ্র প্রাকৃতিক জগত নিয়ম-চালিত, বাইরে থেকে তার ক্রিয়ায় কোনো হস্তক্ষেপের কথা একেবারে ওঠে না। কিন্তু, অজ্ঞেয়বাদী যোগ

* স্যালভেশন আর্মি — ধর্মীয় জনহিতৈষী সংগঠন, ১৮৬৫ সালে ইংলণ্ডে এটির প্রতিষ্ঠা করেন উইলিয়ম বুটস্। — সম্পাঃ

করে, জ্ঞাত বিশ্বের অতিরিক্ত কোনো পরম সত্তার অস্তিত্ব নিরূপণের অথবা খণ্ডনের কোনো উপায় আমাদের নেই। এ কথা হয়ত বা খাটত সেকালে যখন সেই মহান জ্যোতির্বিজ্ঞানীর *Mécanique céleste** গ্রন্থে স্রষ্টার উল্লেখ নেই কেন, নেপোলিয়নের এই প্রশ্নে লাপ্লাস সগর্বে জবাব দেন, "Je n'avais pas besoin de cette hypothèse"**। কিন্তু আজকাল, বিশ্বের বিবর্তনী ধারণায় স্রষ্টা বা নিয়ন্তার কোনো স্থানই নেই; সমগ্র বর্তমান বিশ্ব থেকে পরিবিচ্ছিন্ন এক পরম সত্তার কথা বলা স্ববিরোধসূচক, এবং আমার মনে হয়, ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের প্রতি একটা অকারণ অপমান।

অপিচ, আমাদের অজ্ঞেয়বাদী মানেন যে, জ্ঞানের ভিত্তি হল ইন্দ্রিয়দত্ত সংবাদ। কিন্তু অজ্ঞেয়বাদী যোগ করেন, ইন্দ্রিয়ের মারফত যে বস্তুর বোধ হচ্ছে তার সঠিক প্রতিচ্ছবিই যে ইন্দ্রিয় আমাদের দিয়েছে তা জানলাম কী করে? অতঃপর অজ্ঞেয়বাদী আমাদের জানিয়ে দেন, বস্তু বা তার গুণের কথা তিনি যখন বলেন তখন তিনি আসলে সেই সব বস্তু বা গুণেরই কথা বলছেন না, নিশ্চিত করে তার কিছু জানা সম্ভব নয়, স্বীয় ইন্দ্রিয়ের ওপর তারা যে ছাপ ফেলেছে শুধু তারই কথা বলছেন। এ ধরনের কথাকে কেবল যুক্তি বিস্তার করে হারান বোধ হয় সত্যিই শক্ত। কিন্তু যুক্তি বিস্তারের আগে হল ক্রিয়া। Im Anfang war die Tat।*** এবং মানবিক প্রতিভা কর্তৃক এ সমস্যা আবিষ্কারের আগেই মানবিক কর্ম দ্বারা তার সমাধান হয়ে গেছে। পুডিং-এর প্রমাণ তার ভক্ষণে। এই সব বস্তুর অনুভূত গুণাগুণ অনুসারে বস্তুটা আমাদের কাজে লাগালেই আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতিগুলির সঠিকতা বা বেঠিকতার একটা নির্ভুল যাচাই হয়ে যায়। আমাদের এই অনুভূতিগুলি যদি ভুল হত, তাহলে সে বস্তুর ব্যবহার-যোগ্যতা সম্পর্কে আমাদের হিসাবও ভুল হতে বাধ্য এবং সব চেষ্টা বিফল হত। কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য সফল করতে যদি আমরা সক্ষম হই, যদি দেখা যায় যে, বস্তুটা সম্পর্কে আমাদের যে ধারণা তার সঙ্গে সে বস্তু মিলছে, বস্তুটার কাছ থেকে যে কাজ আশা করছি তা হাসিল হচ্ছে, তাহলেই পরিষ্কার প্রমাণ হয়ে যায় যে, সে বস্তু এবং তার গুণাগুণ সম্পর্কে আমাদের অনুভূতি **ততটা পর্যন্ত** মিলে যাচ্ছে আমাদের বহিঃস্থিত বাস্তবের সঙ্গে। যদি বা বিফলতার সম্মুখীন হই, তাহলে সে বিফলতার কারণ বার করতে দেরি হয় না; দেখা যায়, যে অনুভূতির ভিত্তিতে আমরা কাজ করেছি সেটা হয় অসম্পূর্ণ ও ভাসাভাসা, নয় অন্যান্য অনুভূতির ফলাফলের সঙ্গে তাকে এমনভাবে যুক্ত করা হয়েছে যা অসঙ্গত — একে আমরা বলি যুক্তির ত্রুটি। ইন্দ্রিয়গুলিকে ঠিকমতো পরিশীলিত ও ব্যবহৃত

* P. S., Laplace *Traité de mécanique céleste.* Vol. I—V. Paris, 1799—1825. — সম্পাঃ

** 'এ প্রকল্পের কোনো আবশ্যক আমার ছিল না।' — সম্পাঃ

*** আদিতে ছিল কর্ম — গ্যেটের 'ফাউস্ট' থেকে। — সম্পাঃ

করতে, এবং সঠিকভাবে গৃহীত ও সঠিকভাবে ব্যবহৃত অনুভূতি দ্বারা নির্দিষ্ট আওতার মধ্যে কর্মকে সীমাবদ্ধ রাখতে যতক্ষণ আমরা সচেষ্ট, ততক্ষণ পর্যন্ত দেখা যাবে যে, আমাদের কর্মের ফলাফল থেকে অনুভূত বস্তুর কর্তা-নিরপেক্ষ (objective) প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের অনুভূতির মিল প্রমাণিত হচ্ছে। এযাবৎ একটি দৃষ্টান্তও পাওয়া যায়নি যাতে এই সিদ্ধান্তে আসতে হয় যে, বৈজ্ঞানিকভাবে নিয়ন্ত্রিত ইন্দ্রিয়ানুভূতিগুলি দ্বারা আমাদের মনে বহির্জগত সম্পর্কে যে ধারণা উপার্জিত হচ্ছে তা তৎপ্রকৃতিগতভাবেই বাস্তব থেকে বিভিন্ন, কিংবা বহির্জগত ও সে বিষয়ে আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতির মধ্যে একটা অনিবার্য গরমিল বর্তমান।

কিন্তু তখন আসেন নয়া-ক্যান্টপন্থী অজ্ঞেয়বাদীরা এবং বলেন: হাঁ, একটা বস্তুর গুণাগুণ বোধ আমাদের সঠিক হতে পারে, কিন্তু কোনো ইন্দ্রিয়গত বা মনোগত প্রকরণেই প্রকৃত-বস্তুটাকে (thing-in-itself) আমরা ধরতে পারি না। এই 'প্রকৃত-বস্তু' আমাদের জ্ঞান সীমার বাইরে। এবং উত্তরে হেগেল বহু পূর্বেই বলেছিলেন: একটা বস্তুর সমস্ত গুণই যদি জানা যায় তাহলে বস্তুটাকেও জানা হল; বাকি যা রইল সেটা এই সত্য ছাড়া কিছুই নয় যে, বস্তুটা আমাদের বাদ দিয়েই বর্তমান; এবং ইন্দ্রিয় মারফত এই সত্যটি শেখা হলেই প্রকৃত-বস্তুটির, ক্যান্টের বিখ্যাত অজ্ঞেয় Ding an sich-এর চূড়ান্ত অবশেষটিও জানা হয়ে যায়। এর সঙ্গে যোগ দেওয়া যেতে পারে যে, ক্যান্টের কালে প্রাকৃতিক বস্তু বিষয়ে আমাদের জ্ঞান ছিল এতই টুকরো টুকরো যে, প্রত্যেকটা বস্তুর যেটুকু আমরা জানতাম তার পরেও একটা রহস্যময় 'প্রকৃত-বস্তুর' সন্দেহ তাঁর স্বাভাবিক। কিন্তু একের পর এক এই সব অধরা বস্তুগুলোকে ধরা হয়েছে, বিশ্লেষণ করা হয়েছে, এবং আরো বড়ো কথা, **পুনঃসৃষ্টি করা হয়েছে** বিজ্ঞানের অতিকায় প্রগতির কল্যাণে; আর যেটাকে আমরা সৃষ্টি করতে পারি সেটাকে নিশ্চয় অজ্ঞেয় বলে গণ্য করা যায় না। এ শতকের প্রথমার্ধে জৈববস্তুগুলি ছিল রসায়নের কাছে এই ধরনের রহস্য-বস্তু; এখন জৈব ক্রিয়া ব্যতিরেকেই রাসায়নিক মৌলিক উপাদান থেকে একের পর এক তাদের বানাতে আমরা শিখেছি। আধুনিক রসায়নবিদরা ঘোষণা করেন, যে-বস্তুই হোক না কেন তার রাসায়নিক সংবিন্যাস জানতে পারলেই মৌলিক উপাদান থেকে তাকে তৈরি করা যায়। উচ্চ পর্যায়ের জৈববস্তুর, এ্যালবুমিন-বস্তুর সংবিন্যাস এখনো আমরা জানতে পারিনি; কিন্তু কয়েক শতাব্দীর পরেও তার জ্ঞান অর্জিত হবে না এবং তার সাহায্যে কৃত্রিম এ্যালবুমিন তৈরি করতে পারব না, এর কোন যুক্তি নেই। যদি তা পারি, তাহলে সেই সঙ্গে জৈব জীবনও আমরা সৃষ্টি করতে পারব, কেননা এ্যালবুমিন-বস্তুর অস্তিত্বের স্বাভাবিক ধরন হল জীবন — তার নিম্নতম থেকে উচ্চতম রূপ পর্যন্ত।

এই সব আনুষ্ঠানিক মানসিক আপত্তি পেশ করার পরেই কিন্তু আমাদের অজ্ঞেয়বাদীর কথা ও কাজ একেবারে এক ঝানু বস্তুবাদীর মতো, যা তাঁর আসল স্বরূপ।

অজ্ঞেয়বাদী হয়ত বলবেন, **আমরা** যতটা জেনেছি তাতে পদার্থ ও গতিকে, অথবা বর্তমানে তার যা নাম, তেজকে (energy) সৃষ্টিও করা যায় না, ধ্বংসও করা যায় না, কিন্তু কোনো না কোনো সময়ে যে তার সৃষ্টি হয়নি এমন প্রমাণ আমাদের নেই। কিন্তু কোনো একটা নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে তাঁর এই স্বীকৃতি তাঁর বিরুদ্ধে প্রয়োগ করতে গেলেই তিনি মামলা খারিজ করে দেবেন। In abstracto (বিমূর্ত ক্ষেত্রে) অধ্যাত্মবাদ মানলেও in concreto (প্রত্যক্ষ ক্ষেত্রে) তা তিনি মোটেই মানতে রাজী নন। বলবেন, যতদূর আমরা জানি ও জানতে পারি তাতে বিশ্বের কোনো স্রষ্টা বা নিয়ন্তা নেই; আমাদের সঙ্গে যতটা সম্পর্ক তাতে পদার্থ বা তেজ সৃষ্টিও করা যায় না, ধ্বংসও করা যায় না; আমাদের ক্ষেত্রে ভাবনা হল তেজের একটা ধরন, মস্তিষ্কের একটা ক্রিয়া; যা কিছু আমরা জানি তা এই যে, বাস্তব জগত অমোঘ নিয়ম দ্বারা শাসিত, ইত্যাদি। অর্থাৎ, যে ক্ষেত্রে তিনি **বৈজ্ঞানিক** মানুষ, যে ক্ষেত্রে তিনি কোনো কিছু **জানেন,** সে ক্ষেত্রে তিনি বস্তুবাদী; কিন্তু তাঁর বিজ্ঞানের বাইরে যে বিষয়ে তিনি কিছুই জানেন না, সে অজ্ঞতাকে তিনি গ্রীকে অনুবাদ করে বলেন agnosticism বা অজ্ঞেয়বাদ।

যাই হোক, একটা জিনিস মনে হয় পরিষ্কার: আমি যদি অজ্ঞেয়বাদী হতাম তাহলেও এই ছোট বইখানিতে ইতিহাসের যে ধারণা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে সেটাকে 'ঐতিহাসিক অজ্ঞেয়বাদ' বলে বর্ণনা করা যে যেত না তা স্পষ্ট। ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিরা হাসাহাসি করতেন, অজ্ঞেয়বাদীরা সরোষে প্রশ্ন করতেন, আমি কি তাদের নিয়ে তামাসা শুরু করেছি? তাই আশা করি বৃটিশ শালীনতাবোধও অতিমাত্রায় স্তম্ভিত হবে না যদি ইংরাজি তথা অপরাপর বহু ভাষায় 'ঐতিহাসিক বস্তুবাদ' কথাটি আমি ব্যবহার করি ইতিহাস ধারার এমন একটা ধারণা বোঝাবার জন্য, যাতে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনার মূল কারণ ও মহতী চালিকা-শক্তির সন্ধান করা হয় সমাজের অর্থনৈতিক বিকাশের মধ্যে, উৎপাদন ও বিনিময় পদ্ধতির পরিবর্তনের মধ্যে, বিভিন্ন শ্রেণীতে সমাজের তজ্জনিত বিভাগের মধ্যে এবং এই সব শ্রেণীর পারস্পরিক সংগ্রামের মধ্যে।

এ প্রশ্রয় বোধ হয় আরো পাওয়া সম্ভব যদি দেখান যায় যে, ঐতিহাসিক বস্তুবাদ বৃটিশ শালীনতার পক্ষেও সুবিধাজনক হতে পারে। আগেই উল্লেখ করেছি যে, চল্লিশ পঞ্চাশ বছর আগে ইংলণ্ডে বসবাস করতে গিয়ে বিদগ্ধ বিদেশীদের যেটা চোখে পড়ত সেটাকে তাঁরা ইংরেজ শালীন মধ্য শ্রেণীর ধর্মীয় গোঁড়ামি আর নির্বুদ্ধিতা বলে গণ্য করতে বাধ্য হতেন। আমি এবার প্রমাণ করতে চাই যে, বিদগ্ধ বিদেশীর কাছে সে সময় শালীন ইংরেজ মধ্য শ্রেণী ঠিক যতটা নির্বোধ বলে মনে হত ততটা নির্বোধ তারা ছিল না। তাদের ধর্মীয় প্রবণতার ব্যাখ্যা আছে।

ইউরোপ যখন মধ্য যুগ থেকে উত্থিত হয় তখন শহরের উদীয়মান মধ্য শ্রেণী ছিল তার বিপ্লবী অংশ। মধ্যযুগীয় সামন্ত সংগঠনের মধ্যে তারা একটা সর্বজনস্বীকৃত

প্রতিষ্ঠা অর্জন করে নিয়েছিল, কিন্তু সে প্রতিষ্ঠাও তার বর্ধমান ক্ষমতার তুলনায় অতি সংকীর্ণ হয়ে পড়ে; মধ্য শ্রেণীর, bourgeoisie-র বিকাশের সঙ্গে সামন্ত ব্যবস্থার সংরক্ষণ খাপ খাচ্ছিল না; সুতরাং সামন্ত ব্যবস্থার পতন হতে হল।

কিন্তু সামন্ততন্ত্রের বিরাট আন্তর্জাতিক কেন্দ্র ছিল রোমান ক্যাথলিক চার্চ। আভ্যন্তরীণ যুদ্ধাদি সত্ত্বেও তা সমগ্র সামন্ততান্ত্রিক প্রতীচ্য ইউরোপকে ঐক্যবদ্ধ করে এক বিরাট রাজনৈতিক ব্যবস্থায় এবং তা ছিল যেমন সুখিস্‌মাটিক গ্রীক দেশগুলির বিরুদ্ধে তেমনি মুসলিম দেশগুলির বিরুদ্ধে। সামন্ত প্রতিষ্ঠানগুলিকে এ চার্চ স্বর্গীয় আশীর্বাণীর জ্যোতিঃভূষিত করে। সামন্ত কায়দায় এ চার্চ নিজ যাজকতন্ত্রের সংগঠন করে এবং শেষত, এ চার্চ নিজেই ছিল এক প্রবলতম সামন্ত অধিপতি, ক্যাথলিক জগতের পুরো একতৃতীয়াংশ জমি ছিল এর দখলে। দেশে দেশে এবং সবিস্তারে অপবিত্র সামন্ততন্ত্রকে সফলভাবে আক্রমণ করার আগে তার এই পবিত্র কেন্দ্রীয় সংগঠনটিকে বিনষ্ট করার দরকার ছিল।

তাছাড়া মধ্য শ্রেণীর অভ্যুদয়ের সমান্তরালে শুরু হয় বিজ্ঞানের বিপুল পুনরুজ্জীবন; জ্যোতির্বিজ্ঞান, বলবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, শারীরস্থান, শারীরবৃত্তের চর্চা ফের শুরু হয়। শিল্পোৎপাদনের বিকাশের জন্য বুর্জোয়ার দরকার ছিল একটা বিজ্ঞানের যাতে প্রাকৃতিক বস্তুর দৈহিক গুণাগুণ এবং প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের ক্রিয়া-পদ্ধতি নিরূপিত করা যায়। এতদিন পর্যন্ত বিজ্ঞান হয়ে ছিল গির্জার বিনীত সেবাদাসী, খ্রীষ্ট বিশ্বাসের আরোপিত সীমা তাকে লঙ্ঘন করতে দেওয়া হত না, সেই কারণে তা আদৌ বিজ্ঞানই ছিল না। বিজ্ঞান বিদ্রোহ করল গির্জার বিরুদ্ধে; বিজ্ঞান ছাড়া বুর্জোয়ার চলছিল না, তাই সে বিদ্রোহে যোগ দিতে হল তাকে।

প্রতিষ্ঠিত ধর্মের সঙ্গে উদীয়মান মধ্য শ্রেণী যে কারণে সংঘাতে আসতে বাধ্য তার শুধু দুটি ক্ষেত্রের উল্লেখ করলেও এটা দেখানোর পক্ষে তা যথেষ্ট যে, প্রথমত, রোমান চার্চের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সবচেয়ে প্রত্যক্ষ স্বার্থ ছিল বুর্জোয়া শ্রেণীর; এবং দ্বিতীয়ত, সে সময় সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিটি সংগ্রামকেই নিতে হত ধর্মীয় ছদ্মবেশ, পরিচালিত করতে হত সর্বাগ্রে চার্চের বিরুদ্ধে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় শহরের ব্যবসায়ীরা কলরবের সূত্রপাত করলেও প্রবল সাড়া পাওয়া নিশ্চিত ছিল এবং পাওয়া যায় ব্যাপক গ্রামবাসীদের মধ্যে, চাষীদের মধ্যে — আধ্যাত্মিক ও ইহজাগতিক সামন্ত প্রভুদের বিরুদ্ধে যাদের সর্বত্র সংগ্রাম করতে হত নিতান্ত প্রাণধারণের জন্যেই।

সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে বুর্জোয়ার দীর্ঘ সংগ্রামের পরিণতি হয় তিনটি চূড়ান্ত মহাযুদ্ধে।

প্রথমটিকে বলা হয় জার্মানির প্রটেস্টাণ্ট রিফর্মেশন। চার্চের বিরুদ্ধে লুথার যে রণধ্বনি তোলেন তাতে সাড়া দেয় দুটি রাজনৈতিক চরিত্রের অভ্যুত্থান: প্রথমে ফ্রানৎস

ফন জিকিঙ্গেনের নেতৃত্বে নিম্ন অভিজাতদের অভ্যুত্থান (১৫২৩), পরে — ১৫২৫ সালে — মহান কৃষকযুদ্ধ। দুটিই পরাজিত হয় প্রধানত যে-দলগুলির সবচেয়ে বেশি স্বার্থ, শহরের সেই বার্গারদের অনিশ্চিতমতির ফলে, এ অনিশ্চিতমতির কারণ নিয়ে এখানে আলোচনা চলে না। সেই সময় থেকে স্থানীয় রাজন্যদের সঙ্গে কেন্দ্রীয় শক্তির লড়াইয়েতে সে সংগ্রামের অধঃপতন ঘটে এবং তার পরিণতি হয় ইউরোপের রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় জাতিগুলির ভেতর থেকে দু'শ' বছরের জন্য জার্মানিকে মুছে দেওয়া। লুথারীয় রিফর্মেশন থেকে সৃষ্টি হল এক নতুন ধর্মমত, স্বৈরশক্তি রাজতন্ত্রেরই উপযোগী একটা ধর্ম। উত্তর-পূর্ব জার্মানির কৃষকেরা লুথারবাদ গ্রহণ করতে না করতেই স্বাধীন লোক থেকে তারা পরিণত হল ভূমিদাসে।

কিন্তু লুথার যেখানে পরাজিত হলেন সেখানে জয়ী হলেন কালভাঁ। কালভাঁ-এর ধর্মমত ছিল তাঁর কালের সবচেয়ে সাহসী বুর্জোয়াদের উপযোগী। প্রতিযোগিতার বাণিজ্যিক জগতে সাফল্য অসাফল্য মানুষের কর্ম বা বুদ্ধির ওপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে তার সাধ্যাতীত পরিস্থিতির ওপর, এই ঘটনাটার এক ধর্মীয় প্রকাশ হল তাঁর ঐশ্বরিক নির্বন্ধ (predestination) মতবাদ। অভিপ্রায় সেটা আমার নয়, কর্ম সেটা আমার নয়, উচ্চতর অজানা অর্থনৈতিক শক্তির কৃপায়; এটা সবিশেষ সত্য ছিল অর্থনৈতিক বিপ্লবের সেই এক যুগে যখন সমস্ত পুরনো বাণিজ্য পথ ও কেন্দ্রের জায়গায় আসছে নতুন পথ, নতুন কেন্দ্র, যখন ভারত ও আমেরিকা উন্মুক্ত হয়েছে দুনিয়ার কাছে, এবং যখন বিশ্বাসের পবিত্রতম অর্থনৈতিক মানদণ্ড যথা সোনা রুপোর দামও টলতে শুরু করেছে, ভেঙে ভেঙে পড়ছে। কালভাঁ-এর গির্জা-গঠনতন্ত্র পুরোপুরি গণতান্ত্রিক ও প্রজাতান্ত্রিক। এবং ঈশ্বরের রাজত্ব যেখানে প্রজাতান্ত্রিক করে দেওয়া হয়েছে সেখানে ইহজগতের রাজত্ব কি থাকতে পারে রাজরাজড়া বিশপ আর সামন্তপ্রভুর অধীনে? জার্মান লুথারবাদ যে ক্ষেত্রে রাজন্যদের হাতের পাঁচ হয়ে রইল সে ক্ষেত্রে কালভাঁবাদ হল্যান্ডে প্রতিষ্ঠা করল একটি প্রজাতন্ত্রের এবং ইংলন্ডে সর্বোপরি স্কটল্যান্ডে সৃষ্টি করল সক্রিয় প্রজাতান্ত্রিক পার্টির।

কালভাঁবাদের মধ্যে দ্বিতীয় মহান বুর্জোয়া অভ্যুত্থান পেল তার তৈরি মতবাদ। এ অভ্যুত্থান ঘটে ইংলন্ডে। শহরের মধ্য শ্রেণী (বুর্জোয়া) তাকে শুরু করে আর গ্রামাঞ্চলের চাষীরা (yeomanry) তা লড়ে শেষ করে। মজার ব্যাপার এই যে মহান তিনটি বুর্জোয়া অভ্যুত্থানেই লড়াইয়ের সৈন্যবাহিনী জোগায় কৃষকসম্প্রদায়, অথচ জয়লাভ হবার পরেই সে জয়লাভের অর্থনৈতিক ফলাফলে অতিনিশ্চিত যারা ধ্বংস হতে বাধ্য তারা হল এই কৃষকেরাই। ক্রমওয়েলের একশ' বছর পরে ইংলন্ডের কৃষককুল প্রায় অদৃশ্য হয়। মোটের ওপর কৃষককুল ও শহরের প্লেবিয়ান অংশ না থাকলে একা বুর্জোয়ারা কখনোই চরম পরিণতি পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যেত না এবং ফাঁসির মঞ্চে কখনোই এনে দাঁড় করাত

না প্রথম চার্লসকে। বুর্জোয়ার যে সমস্ত প্রতিষ্ঠা তখন অর্জনযোগ্য হয়ে উঠেছে শুধু সেইগুলো লাভ করতে হলেও বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয় বহুদূর পর্যন্ত — ঠিক ১৭৯৩ সালের ফ্রান্স এবং ১৮৪৮ সালের জার্মানির মতো। বস্তুত এ যেন বুর্জোয়া সমাজের ক্রমবিকাশের একটা নিয়ম বলেই মনে হয়।

বিপ্লবী ক্রিয়াকলাপের এই আধিক্যের পর অবশ্যই আসে অনিবার্য প্রতিক্রিয়া এবং যে সীমা পর্যন্ত সে প্রতিক্রিয়ার থাকা সম্ভব ছিল তাও এবার তার ছাড়িয়ে যাবার পালা। একাদিক্রমে এদিক ওদিক দোলার পর অবশেষে পাওয়া যায় নতুন ভারকেন্দ্র এবং তা থেকে হয় একটা নতুন সূচনা। ইংলন্ডের ইতিহাসের যে সমারোহী যুগটা ভদ্রসম্প্রদায়ের কাছে 'বৃহৎ বিদ্রোহ' নামে পরিচিত সেই যুগ ও তার পরবর্তী সংগ্রামগুলির অবসান হয় অপেক্ষাকৃত তুচ্ছ এক ঘটনায়, উদারনৈতিক ঐতিহাসিকেরা যার নাম দিয়েছেন 'গৌরবোজ্জ্বল বিপ্লব'*।

নতুন সূচনাটি হল উদীয়মান মধ্য শ্রেণী ও ভূতপূর্ব সামন্ত জমিদারদের মধ্যে আপোস। এখনকার মতোই এ জমিদারদের অভিজাত বলা হলেও বহু আগে থেকেই তারা সেই পথ নিয়েছিল যাতে তারা হয়ে ওঠে বহু পরবর্তী যুগের ফ্রান্সের লুই ফিলিপের মতো 'রাজ্যের প্রথম বুর্জোয়া'। ইংলন্ডের পক্ষে সৌভাগ্যবশত গোলাপের যুদ্ধের** সময় প্রাচীন সামন্ত ব্যারনেরা পরস্পরকে নিধন করেছিল। তাদের উত্তরাধিকারীরা অধিকাংশই প্রাচীন বংশোদ্ভূত হলেও প্রত্যক্ষ বংশধারা থেকে এতই দূরে যে, তারা একটা নতুন সম্প্রদায় হয়ে ওঠে, তাদের যা অভ্যাস ও মনোবৃত্তি সেটা সামন্ততান্ত্রিক নয়, হয়ে ওঠে বহু পরিমাণে বুর্জোয়া। টাকার দাম তারা বেশ বুঝত এবং অবিলম্বেই শত শত ক্ষুদে চাষীকে উচ্ছেদ করে সে জায়গায় ভেড়া রেখে তারা খাজনা বেশি তুলতে শুরু করে। অষ্টম হেনরি গির্জার জমি অপব্যয় করে পাইকারি হারে নতুন নতুন বুর্জোয়া জমিদার সৃষ্টি করেন; অসংখ্য মহালের বাজেয়াপ্ত ও একেবারে ভুঁইফোড় বা আধা-ভুঁইফোড়দের

* ১৬৮৮—১৬৮৯ সালের রাষ্ট্রীয় কুদেতার পর ইংলন্ডে ভূমি অভিজাত ও ফিনান্স বুর্জোয়াদের মধ্যে আপোসের ভিত্তিতে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয়। এই রাষ্ট্রীয় বিপ্লব ইংরেজ ইতিহাসবিদ্যায় গৌরবোজ্জ্বল বিপ্লব আখ্যা পায়। — সম্পাঃ

** গোলাপের যুদ্ধ (১৪৫৫—১৪৮৫) — সিংহাসন লাভের জন্য দুই ইংরেজ সামন্ত বংশের প্রতিনিধিদের মধ্যে যুদ্ধ। এদের এক পক্ষ ইয়র্কগণ — তাদের প্রতীকে অংকিত ছিল শাদা গোলাপ, অপর পক্ষ লাঙেকস্টারগণ — এদের প্রতীকে ছিল রক্তিম গোলাপ। ইয়র্কদের পক্ষে জড়ো হয়েছিল অর্থনৈতিক দিক থেকে অধিকতর বিকশিত দক্ষিণের বৃহৎ সামন্তদের একাংশ, নাইট সম্প্রদায় ও নগরবাসীরা, লাঙেকস্টারদের সমর্থন করে উত্তরের কাউন্টিগুলোর সামন্ত অভিজাতরা। যুদ্ধে প্রাচীন সামন্ত বংশগুলি প্রায় সমূহ ধ্বংস পায় ও ইংলন্ডে স্বৈর শাসনের প্রতিষ্ঠাতা ট্যুডর বংশ ক্ষমতা লাভ করে। — সম্পাঃ

নিকট তা ফের বিলি, গোটা সপ্তদশ শতাব্দী ধরে যা চলে তাতেও একই ফল হয়। সুতরাং, সপ্তম হেনরির সময় থেকে ইংরেজ 'অভিজাতরা' শিল্প উৎপাদনের বিকাশে বাধা দেবার বদলে উল্টে তাই থেকেই মুনাফা তোলার চেষ্টা করেছে; এবং চিরকালই বড়ো বড়ো জমিদারদের এমন একটা অংশ ছিল যারা অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক কারণে মহাজনী ও শিল্পজীবী বুর্জোয়ার সঙ্গে সহযোগিতায় ইচ্ছুক। ১৬৮৯ সালের আপোস তাই সহজেই সাধিত হয়। 'অর্থ ও পদমর্যাদার' রাজনৈতিক বখরা রইল বড়ো বড়ো জমিদার বংশের জন্য এই সর্তে যে, মহাজনী কারখানাজীবী ও বাণিজ্যিক মধ্য শ্রেণীর অর্থনৈতিক স্বার্থ যথেষ্ট দেখা হবে। এবং সে সময় দেশের সাধারণ নীতি নির্দেশ করার মতো যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল এই সব অর্থনৈতিক স্বার্থ। খুঁটিনাটি ব্যাপারে ঝগড়া হয়ত হত, কিন্তু মোটের ওপর অভিজাত গোষ্ঠীতন্ত্র খুব ভালোই জানত যে, তার নিজস্ব অর্থনৈতিক উন্নতি অনিবার্যরূপে জড়িয়ে আছে শিল্পজীবী ও বাণিজ্যিক মধ্য শ্রেণীর উন্নতির সঙ্গে।

সেই সময় থেকে ইংলন্ডের শাসক শ্রেণীগুলির একটি বিনীত কিন্তু তথাপি স্বীকৃত অংশ হল বুর্জোয়ারা। অন্যান্য শাসক শ্রেণীর সঙ্গে এদেরও সমান স্বার্থ ছিল দেশের বিপুল মেহনতীজনকে বশে রাখা। বণিক বা কারখানা-মালিক (manufacturer) নিজেই হল তার কেরাণী, তার মজুর, তার বাড়ির চাকরবাকরদের কাছে প্রভু, বা কিছু আগে পর্যন্তও যা বলা হত 'স্বতঃই ঊর্ধ্বতন'। তাদের কাছ থেকে যথাসাধ্য বেশি ও যথাসাধ্য ভালো কাজ আদায় করাই তার স্বার্থ; সে উদ্দেশ্যে ঠিকমতো বাধ্যতার শিক্ষায় তাদের শিক্ষিত করতে হবে। নিজেও সে ধর্মভীরু; তার ধর্মের পতাকা নিয়েই সে রাজা ও ভূস্বামীদের সঙ্গে লড়েছে; স্বতঃই-অধস্তনদের মনের ওপর প্রভাব ফেলে, ঈশ্বরস্থাপিত প্রভুটির আদেশাধীন করে তোলার দিক থেকে এ ধর্ম যে সুবিধা দান করছে তা আবিষ্কার করতে তার দেরি হয়নি। সংক্ষেপে 'ছোট লোকদের', দেশের বিপুল উৎপাদক জনগণকে দাবিয়ে রাখার কাজে ইংরেজ বুর্জোয়াকে এবার একটা অংশ নিতে হচ্ছে এবং সে উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত অন্যতম একটা উপায় হল ধর্মের প্রভাব।

আর একটা ঘটনাও ছিল যাতে বুর্জোয়াদের ধর্মীয় প্রবণতা বেড়েছে। সেটা হল ইংলন্ডে বস্তুবাদের উত্থান। এই নতুন মতবাদ মধ্য শ্রেণীর ধর্মানুভূতিতেই শুধু ঘা দেয়নি; বুর্জোয়া সমেত বিপুল অশিক্ষিত জনগণের যাতে বেশ চলে যায় সেই ধর্মের বিপরীতে এ মতবাদ নিজেকে জাহির করল কেবল দর্শন বলে যা বিশ্বের পণ্ডিত ও বিদগ্ধ জনদেরই যোগ্য। হব্‌সের হাতে বস্তুবাদ মঞ্চে আসে রাজকীয় অধিকার ও ক্ষমতার সমর্থক হিসাবে। স্বৈরশক্তি রাজতন্ত্রকে তা আহ্বান করে সেই puer robustus sed malitiosus* অর্থাৎ জনগণকে দমন করতে। একই ভাবে হব্‌সের পরবর্তীদের —

* তাগড়াই কিন্তু হিংস্র ছোকরা। — সম্পাঃ

বলিংব্রক, শ্যাফ্‌ট্‌সর্বেরি ইত্যাদির কাছে বস্তুবাদের নতুন deistic ধারাটা থেকে যায় একটা অভিজাত, অধিকার-ভেদী (esoteric) মতবাদ হিসাবে এবং সেই হেতু মধ্য শ্রেণীর কাছে তা ঘৃণ্য হয়, তার ধর্মীয় অস্বীকৃতি ও বুর্জোয়া বিরোধী রাজনৈতিক যোগাযোগ উভয় কারণেই। এই ভাবে, অভিজাতদের deism ও বস্তুবাদের বিরুদ্ধে প্রগতিশীল মধ্য শ্রেণীর প্রধান শক্তি যোগাতে থাকল সেই সব প্রটেস্টাণ্ট সম্প্রদায়েরাই যারা রণপতাকা ও সংগ্রামী বাহিনী জুগিয়েছিল স্টুয়ার্টদের বিরুদ্ধে, 'মহান উদারনৈতিক পার্টির মেরুদণ্ড' আজো পর্যন্ত তারাই।

ইতিমধ্যে ইংলণ্ড থেকে বস্তুবাদ চলে যায় ফ্রান্সে, সেখানে আর একটি বস্তুবাদী দার্শনিক ধারার, কার্থেজিয়ানবাদের* একটি শাখার সংস্পর্শে সে আসে ও তার সঙ্গে মিশে যায়। ফ্রান্সেও প্রথম দিকে বস্তুবাদ থাকে একটা একান্তভাবে অভিজাত মতবাদ হিসাবে। কিন্তু অচিরেই তার বিপ্লবী চরিত্র আত্মপ্রকাশ করল। ফরাসী বস্তুবাদীরা শুধু ধর্মীয় বিশ্বাসের ক্ষেত্রেই সমালোচনা সীমাবদ্ধ রাখল না; তৎকালীন বৈজ্ঞানিক ঐতিহ্য ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান যা কিছু সামনে পড়ল সবেতেই প্রসারিত করল তাদের সমালোচনা; তাদের মতবাদের সার্বজনীন প্রয়োগ-যোগ্যতার দাবি প্রমাণের জন্য সংক্ষিপ্ততম পন্থা অবলম্বন করে সাহসের সঙ্গে তা জ্ঞানের সবকটি ক্ষেত্রে প্রয়োগ করল এক অতিকায় রচনা, Encyclopédie-য়, যা থেকে তাদের নাম। এই ভাবে খোলাখুলি বস্তুবাদ বা deism, এই দুই ধারার কোনো না কোনো একটা রূপে বস্তুবাদ হয়ে দাঁড়াল ফ্রান্সের সমগ্র সংস্কৃতিবান যুবসমাজের মতবাদ; এতটা পরিমাণে হল যে, মহান বিপ্লব যখন শুরু হয় তখন ইংরেজ রাজতন্ত্রীদের সৃষ্ট মতবাদটা থেকেই এল ফরাসী প্রজাতন্ত্রী ও সন্ত্রাসবাদীদের তাত্ত্বিক ধ্বজা, এবং 'মানবিক অধিকার ঘোষণাপত্রের'** বয়ান। মহান ফরাসী বিপ্লব হল বুর্জোয়াদের তৃতীয় অভ্যুত্থান, কিন্তু এই প্রথম বিপ্লব যা ধর্মের আলখাল্লাটা একেবারে ছুঁড়ে ফেলে এবং লড়াই চালায় অনাবরণ রাজনৈতিক ধারায়। এদিক থেকেও এটা প্রথম যে, প্রতিদ্বন্দ্বীদের একপক্ষের, অর্থাৎ অভিজাতদের বিনাশ এবং অন্য পক্ষের, বুর্জোয়ার পরিপূর্ণ জয়লাভ না হওয়া পর্যন্ত সত্যি করেই সে লড়াই চালিয়ে যাওয়া হয়। ইংলণ্ডে প্রাকবিপ্লব ও বিপ্লবোত্তর প্রতিষ্ঠানাদির ধারাবাহিকতা এবং জমিদার ও পুঁজিপতিদের মধ্যেকার আপোসের প্রকাশ

* কার্থেজীয় দর্শন — কার্থেজীয় বস্তুবাদ — ১৭শ শতকের ফরাসী দার্শনিক দেকার্ত (ল্যাটিনে — Cartesius)-এর দর্শন থেকে তাঁর যে অনুগামীরা বস্তুবাদী সিদ্ধান্ত টানতেন তাঁদের মতবাদ। — সম্পাঃ

** 'মানবিক ও নাগরিক অধিকার ঘোষণাপত্র' — ফরাসী বুর্জোয়া বিপ্লবের যুগে ১৭৮৯ সালের আগস্টে ফ্রান্সের সংবিধান সভায় গৃহীত ঘোষণাপত্র। এতে মানুষের স্বাধীনতা ও সাম্যের অধিকার, নিপীড়নের প্রতিরোধের অধিকার ইত্যাদি ঘোষিত হয়। — সম্পাঃ

হয় আদালতী নজিরের ধারাবাহিকতায় এবং আইনের সামন্ততান্ত্রিক রূপগুলির পবিত্র সংরক্ষণে। ফ্রান্সে অতীত ঐতিহ্যের সঙ্গে একটা পূর্ণ বিচ্ছেদ ঘটায় বিপ্লব; সামন্ততন্ত্রের শেষ জেরটুকুও তা সাফ করে Code Civil-এর মাধ্যমে আধুনিক পুঁজিবাদী পরিস্থিতির উপযোগী করে চমৎকার খাপ খাইয়ে নেয় প্রাচীন রোমক আইনকে — মার্কস যাকে বলেছিলেন পণ্যোৎপাদন, সেই অর্থনৈতিক পর্যায়ের অনুসারী আইনী সম্পর্কের একটি প্রায় নিখুঁত প্রকাশ ছিল তাতে, — এমন চমৎকার খাপ খাইয়ে নেয় যে, এই ফরাসী বিপ্লবী বিধি-সংহিতাটি আজো পর্যন্ত অন্য সব দেশের সম্পত্তি-আইন সংস্কারের আদর্শস্বরূপ, ইংলন্ডও বাদ নয়। অবশ্য, ইংরাজি আইন যদিও পুঁজিবাদী সমাজের অর্থনৈতিক সম্পর্ক প্রকাশ করেই চলেছে সেই এক বর্বর সামন্ততান্ত্রিক ভাষায় যার সঙ্গে প্রকাশিত বস্তুর ততটাই সাদৃশ্য যতটা সাদৃশ্য ইংরাজি বানানের সঙ্গে ইংরাজি উচ্চারণের — vous écrivez Londres et vous prononcez Constantinople* বলেছিলেন জনৈক ফরাসী — তবু এ কথা ভোলা ঠিক নয় যে, সেই একই ইংরাজি আইনই একমাত্র আইন যা প্রাচীন জার্মান ব্যক্তি স্বাধীনতা, স্থানীয় স্বশাসন এবং আদালত ছাড়া অন্য সমস্ত হস্তক্ষেপ থেকে মুক্তির সেরা অংশটিকে যুগে যুগে রক্ষা করে এসেছে এবং প্রেরণ করেছে আমেরিকা ও উপনিবেশে — স্বৈরশক্তি রাজতন্ত্রের যুগে কণ্টিনেণ্ট থেকে এ জিনিসটা লোপ পায় এবং এখনো পর্যন্ত কোথাও তার পূর্ণ প্রতিষ্ঠা হয়নি।

আমাদের বৃটিশ বুর্জোয়ার কথায় ফেরা যাক। ফরাসী বিপ্লবের ফলে তার একটা চমৎকার সুযোগ হল কণ্টিনেণ্টের রাজতন্ত্রগুলির সাহায্যে ফরাসী নৌবাণিজ্য ধ্বংস, ফরাসী উপনিবেশ অধিকার এবং জলপথে ফরাসী প্রতিদ্বন্দ্বিতার শেষ দাবিটাকেও চূর্ণ করার। ফরাসী বিপ্লবের বিরুদ্ধে বৃটিশ বুর্জোয়া যে লড়েছিল তার একটা কারণ এই। আর একটা কারণ, এ বিপ্লবের ধরণ-ধারণটা তার অভিরুচিকে বড়ো বেশি ছাড়িয়ে যায় — 'জঘন্য' সন্ত্রাস শুধু নয়, বুর্জোয়া শাসনকে চরমে নিয়ে যাবার চেষ্টাটাই। যে অভিজাতরা বৃটিশ বুর্জোয়াকে আদব-কায়দা শিখিয়ে তুলেছে (ঠিক নিজেরই মতো), ফ্যাশন উদ্ভাবন করে দিয়েছে তার জন্য, যারা অফিসার জুগিয়েছে সেই সৈন্যবাহিনীতে, যা শৃঙ্খলা রক্ষা করেছে স্বদেশে, এবং সেই নৌবাহিনীতে, যা জয় করে দিয়েছে ঔপনিবেশিক সম্পত্তি এবং বিদেশের নতুন নতুন বাজার — তাদের বাদ দিয়ে বৃটিশ বুর্জোয়ার চলে কী করে? বুর্জোয়াদের একটা প্রগতিশীল সংখ্যালঘু অবশ্য ছিল, আপোসের ফলে এ সংখ্যালঘুর স্বার্থ তত বেশি দেখা হচ্ছিল না। অপেক্ষাকৃত কম সম্পন্ন মধ্য শ্রেণী দিয়ে প্রধানত তৈরি এই অংশটার সহানুভূতি ছিল বিপ্লবের প্রতি, কিন্তু পার্লামেণ্টে তার ক্ষমতা ছিল না।

* লেখেন লন্ডন কিন্তু উচ্চারণ করেন কনস্টান্টিনোপল। — সম্পাঃ

এ ভাবে বস্তুবাদ যতই হয়ে ওঠে ফরাসী বিপ্লবের মতবাদ ততই ধর্মভীরু ইংরেজ বুর্জোয়া আরো বেশি আঁকড়ে ধরে ধর্ম। জনগণের ধর্মচেতনা লোপ পেলে তার ফল কী দাঁড়ায় তা কি প্যারিস সন্ত্রাসের কালে প্রমাণ হয়নি? বস্তুবাদ যতই ফ্রান্স থেকে আশেপাশের দেশে ছড়িয়ে শক্তি সঞ্চয় করছিল অনুরূপ মতধারা থেকে, বিশেষ করে জার্মান দর্শন থেকে, সাধারণভাবে স্বাধীন চিন্তা ও বস্তুবাদ যতই কণ্টিনেণ্টে বস্তুতপক্ষে বিদগ্ধ ব্যক্তির অনিবার্য গুণস্বরূপ হয়ে দাঁড়াচ্ছিল, ততই গোঁ ধরে ইংরেজ মধ্য শ্রেণী আঁকড়ে রইল তার বহুবিধ ধর্মবিশ্বাসকে। এ সব ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে পারস্পরিক তফাৎ যতই থাকুক তাদের সবকটিই হল পরিষ্কার রকমের ধর্মীয়, খৃষ্টীয় বিশ্বাস।

বিপ্লব যখন ফ্রান্সে বুর্জোয়ার রাজনৈতিক বিজয় নিশ্চিত করছিল, সেই সময় ইংলণ্ডে ওয়াট, আর্করাইট, কার্টরাইট প্রভৃতিরা সূচিত করে এক শিল্প বিপ্লবের, অর্থনৈতিক ক্ষমতার ভারকেন্দ্র তাতে পুরোপুরি সরে যায়। ভূমিজীবী অভিজাতদের চেয়ে বুর্জোয়ার সম্পদ বেড়ে উঠতে লাগল অতি দ্রুতগতিতে। খাস বুর্জোয়ার মধ্যেই মহাজনী অভিজাত, বাঙ্কার প্রভৃতিদের ক্রমেই পেছনে ঠেলে এগিয়ে এল কারখানা-মালিকেরা। ১৬৮৯ সালের আপোস এযাবৎ ক্রমশ বুর্জোয়ার অনুকূলে পরিবর্তিত হয়ে এলেও সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির পারস্পরিক অবস্থানের সঙ্গে তা আর খাপ খাচ্ছিল না। পক্ষগুলির চরিত্রেও বদল হয়েছে; ১৮৩০ সালের বুর্জোয়ারা আগের শতকের বুর্জোয়ার চেয়ে ভয়ানক পৃথক। অভিজাতদের হাতে যে রাজনৈতিক ক্ষমতা থেকে গিয়েছিল এবং নতুন শিল্পজীবী বুর্জোয়ার দাবি-দাওয়া প্রতিরোধে যা ব্যবহৃত হচ্ছিল তা নতুন অর্থনৈতিক স্বার্থের সঙ্গে সঙ্গতিহীন হয়ে দাঁড়ায়। অভিজাতদের সঙ্গে একটা নতুন লড়াইয়ের প্রয়োজন পড়ল; তার পরিণতি হতে পারত কেবলমাত্র নতুন অর্থনৈতিক শক্তির জয়লাভে। প্রথমে, ১৮৩০ সালের ফরাসী বিপ্লবের প্রভাবে, সমস্ত প্রতিরোধ সত্ত্বেও সংস্কার আইন (Reform Act)* পাশ করিয়ে নেওয়া হয়। এতে পার্লামেণ্টে বুর্জোয়ারা পেল একটা শক্তিশালী ও সর্বজনস্বীকৃত প্রতিষ্ঠা। তারপর শস্য আইন বরবাদ**, এতে ভূমিজীবী অভিজাতদের

* ইংলণ্ডে প্রথম নির্বাচনী সংস্কারের খসড়া আইন পার্লামেণ্টে পেশ করা হয় ১৮৩১ সালের মার্চে ও গৃহীত হয় ১৮৩২ সালের জুন মাসে। এ সংস্কারে ভূমিপতি অভিজাত, ব্যাঙ্কার ও কুসীদজীবীদের রাজনৈতিক একচেটিয়ার অবসান হয়। সার্বজনীন নির্বাচনী অধিকারের জন্য গণ শ্রমিক আন্দোলনের সুযোগ নিয়ে বুর্জোয়া র‍্যাডিক্যালরা বিশ্বাসঘাতকতা করে ও ১৮৩২ সালের আইনে উঁচু হারে সম্পত্তি সর্ত আরাপ করা হয়, শহরে ১০ পাউণ্ড ও কাউণ্টিতে ৫০ পাউণ্ড, এবং পার্লামেণ্টের দরজা উন্মুক্ত হয় কেবল শিল্প বুর্জোয়াদের জন্য। প্রলেতারিয়েত ও পেটি বুর্জোয়ারা আগের মতোই রাজনৈতিক অধিকারে বঞ্চিত থাকে। — সম্পাঃ

** শস্য আইন নাকচের বিল গৃহীত হয় ১৮৪৬ সালের জুন মাসে। বিদেশ থেকে শস্য আমদানি সঙ্কুচিত বা নিষিদ্ধ করার এই তথাকথিত শস্য আইন ইংলণ্ডে চালু হয় বৃহৎ ভূস্বামী ল্যাণ্ডলর্ডদের

ওপর বুর্জোয়ার, বিশেষ করে তার সবচেয়ে সক্রিয় অংশ—কারখানা-মালিকদের প্রাধান্য চিরকালের মতো নির্দিষ্ট হয়ে গেল। বুর্জোয়ার এই সবচেয়ে বড়ো জয়; একান্ত নিজের স্বার্থে অর্জিত বিজয় হিসাবে এই আবার কিন্তু তার শেষ বিজয়। পরে যা কিছু সে জিতেছে তা ভাগ করে নিতে হয়েছে নতুন একটা সামাজিক শক্তির সঙ্গে, এ শক্তি ছিল প্রথমে তার সহায় কিন্তু অচিরেই হয়ে দাঁড়াল তার প্রতিদ্বন্দ্বী।

শিল্প বিপ্লবে বৃহৎ কারখানা-মালিক পুঁজিপতিদের একটা শ্রেণী সৃষ্টি হয়েছিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি হয়েছিল তাদের চেয়ে বহু বেশি সংখ্যায় কলজীবী শ্রমিকদের একটা শ্রেণী। যে অনুপাতে শিল্প বিপ্লব উৎপাদনের একটা শাখার পর আর একটা শাখা অধিকার করতে থাকে সেই অনুপাতে এ শ্রেণী ক্রমশ সংখ্যায় বেড়ে ওঠে এবং সেই অনুপাতেই হয়ে ওঠে শক্তিশালী। ১৮২৪ সালেই এ শক্তির প্রমাণ সে দেয় — শ্রমিকদের সমিতি গঠনের নিষেধ-আইন নাকচ করতে অনিচ্ছুক পার্লামেণ্টকে বাধ্য করে। সংস্কার আন্দোলনের সময় শ্রমিকেরা ছিল সংস্কার দলের (Reform party) র‍্যাডিক্যাল অংশ; ১৮৩২ সালের আইনে তাদের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করায় তারা জনগণের চার্টার বা সনদে নিজেদের দাবি-দাওয়া নির্দিষ্ট করে শস্য আইন-বিরোধী বৃহৎ বুর্জোয়া পার্টির বিরুদ্ধে নিজেদের সংগঠিত করে এক স্বাধীন চার্টিস্ট* পার্টিতে, আধুনিক কালে এই **প্রথম মজুর পার্টি**।

তারপর শুরু হয় ১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি ও মার্চে কণ্টিনেণ্টের বিপ্লবগুলি। এতে শ্রমিকজন অতি গুরুত্বপূর্ণ একটা ভূমিকা নেয় এবং, অন্তত প্যারিসে, তারা যেসব দাবি-দাওয়া উপস্থিত করে পুঁজিবাদী সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তা নিশ্চিতই অননুমোদনীয়। তারপর সাধারণ প্রতিক্রিয়া। প্রথমে, ১৮৪৮ সালের ১০ই এপ্রিল চার্টিস্টদের পরাজয়, তারপর সেই বছরেই জুনে প্যারিস শ্রমিকদের অভ্যুত্থান দমন, তারপর ইতালী, হাঙ্গেরী, দক্ষিণ জার্মানিতে ১৮৪৯ সালের বিপর্যয়, পরিশেষে ১৮৫১ সালের ২রা ডিসেম্বর প্যারিসের ওপর লুই বোনাপার্টের জয়।** অন্ততঃ কিছু

স্বার্থে। শস্য আইন নাকচের বিল গৃহীত হওয়ায় বাণিজ্যের স্বাধীনতা ধ্বনি নিয়ে যে শিল্প বুর্জোয়ারা শস্য আইনের বিরুদ্ধে লড়ছিল তাদের জয় সূচিত হয়। — সম্পাঃ

* চার্টিস্টবাদ — দুর্বিষহ অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ও অধিকারহীনতার ফলে উদ্ভূত ইংরেজ শ্রমিকদের গণ বিপ্লবী আন্দোলন। ১৯ শতকের তিরিশের দশকের শেষে বড়ো বড়ো জনসভা ও শোভাযাত্রা মারফত আন্দোলন শুরু হয়ে মাঝে মাঝে বিরতি সহ ৫০-এর দশকের গোড়া পর্যন্ত চলে।

চার্টিস্ট আন্দোলনের অসাফল্যের প্রধান কারণ সুসঙ্গত বিপ্লবী প্রলেতারীয় নেতৃত্ব ও পরিচ্ছন্ন কর্মসূচির অভাব। — সম্পাঃ

** ১৮৫১ সালের ২রা ডিসেম্বর লুই বোনাপার্ট কর্তৃক অনুষ্ঠিত যে রাষ্ট্রীয় কুদেতা'র ফলে দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের বোনাপার্টপন্থী আমল শুরু হয় তার কথা বলা হচ্ছে। — সম্পাঃ

কালের জন্য শ্রমিক দাবি-দাওয়ার জুজুটাকে দমন করা গেল, কিন্তু কী মূল্য দিয়ে! সাধারণ লোককে ধর্মভীরু করে রাখার প্রয়োজনীয়তা যদি বৃটিশ বুর্জোয়ারা আগেই বুঝে থাকে তবে এত সব অভিজ্ঞতার পর সে প্রয়োজনীয়তা তারা আরো কতো বেশিই না টের পাচ্ছে! কণ্টিনেণ্টী ভায়াদের বিদ্রূপের পরোয়া না করে তারা নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে বাইবেল প্রচারের জন্য হাজার হাজার টাকা খরচ করে চলেছে; নিজেদের স্বদেশী ধর্মযন্ত্রে তুষ্ট না হয়ে তারা আবেদন জানিয়েছে ধর্ম ব্যবসার বৃহত্তম সংগঠক জোনাথান ভাইয়ের* কাছে এবং আমেরিকা থেকে আমদানি করেছে রিভাইভ্যালিজ্‌ম্**, মুডি স্যাঙ্কি প্রভৃতিদের; এবং পরিশেষে 'স্যালভেশন আর্মির' বিপজ্জনক সাহায্যও গ্রহণ করেছে — এরা আদি খৃষ্ট ধর্মের প্রচার ফিরিয়ে আনছে, সেরা অংশ হিসেবে আবেদন করে গরিবদের কাছে, পুঁজিবাদের সঙ্গে লড়ে ধর্মের মধ্যে দিয়ে এবং এই ভাবে আদি খৃষ্টীয় শ্রেণী বৈরিতার একটা বীজ লালন করে তুলছে, যে সম্পন্ন লোকেরা আজ এর জন্য নগদ টাকা ধরে দিচ্ছে তাদের কাছে যা হয়ত একদিন মুশ্‌কিল বাধাবে।

মনে হয় এ যেন ঐতিহাসিক বিকাশের একটা নিয়ম যে, মধ্য যুগে সামন্ত অভিজাতরা যে-ভাবে একান্তরূপে নিজেদের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা ধরে রেখেছিল, কোনো ইউরোপীয় দেশেই বুর্জোয়ারা সে-ভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতা রাখতে পারবে না — অন্তত বেশ কিছু দিনের জন্য। এমনকি সামন্ততন্ত্র যেখানে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়েছে সেই ফ্রান্সেও বুর্জোয়ারা সমগ্রভাবে সরকারের পুরো দখল পেয়েছে কেবল অতি স্বল্প কতকগুলি সময়ের জন্য। ১৮৩০ — ১৮৪৮ সালে লুই ফিলিপের রাজত্বকালে বুর্জোয়াদের একটা ক্ষুদ্র অংশই রাজ্য চালায়; যোগ্যতার কড়া সর্তের ফলে তাদের বড়ো অংশটাই ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত থাকে। দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রের আমলে, ১৮৪৮ — ১৮৫১ সালের মধ্যে, সমগ্র বুর্জোয়াই শাসন চালায়, কিন্তু কেবল তিন বছরের জন্য; তাদের অক্ষমতায় এল দ্বিতীয় সাম্রাজ্য। মাত্র এখন, তৃতীয় প্রজাতন্ত্রেই বুর্জোয়ারা সমগ্রভাবে সরকারের কর্ণধার হয়ে আছে কুড়ি বছরেরও বেশি কাল, এবং ইতিমধ্যেই তাদের অবক্ষয়ের শুভলক্ষণ ফুটে উঠছে। বুর্জোয়াদের একটা স্থায়ী শাসন সম্ভব হয়েছে কেবল আমেরিকার মতো দেশে, যেখানে সামন্ততন্ত্র অজানা এবং সমাজ প্রথম থেকেই শুরু হয় বুর্জোয়া ভিত্তিতে। এবং এমনকি ফ্রান্স ও আমেরিকাতেও বুর্জোয়ার উত্তরাধিকারী শ্রমিক জনগণ ইতিমধ্যেই দ্বারে করাঘাত শুরু করেছে।

ইংলণ্ডে বুর্জোয়াদের কখনোই একক অধিকার ছিল না। ১৮৩২ সালের বিজয়েও

* জোনাথান ভাই — মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে আগে এই নামে অভিহিত করা হত, পরে যা দাঁড়িয়েছে **'সাম খুড়ো'**। — সম্পাঃ

** রিভাইভ্যালিজ্‌ম্ — গত শতকের এ আন্দোলন ধর্মের বিলীয়মান প্রভাব উদ্ধারের চেষ্টা করে। মুডি ও স্যাঙ্কি নামক দুই জন মার্কিন প্রচারক তার সংগঠক ছিলেন। — সম্পাঃ

ভূমিজীবী অভিজাতদের হাতে প্রধান প্রধান সরকারী পদের প্রায় পূর্ণ দখল ছিল। ধনী মধ্য শ্রেণী যে-রূপ বিনয়ে এটা মেনে নেয় তা আমার কাছে দুর্বোধ্য ছিল ততদিন পর্যন্ত যতদিন না উদারনীতিক বৃহৎ কলওয়ালা মিঃ ডবলিউ এ. ফর্স্টার প্রকাশ্য ভাষণে ব্র্যাডফোর্ডের যুবসম্প্রদায়কে জানান, দুনিয়ায় চলতে হলে ফরাসী শিখতে হবে, এবং নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে বলেন, ক্যাবিনেট মন্ত্রী হিসাবে তাঁকে যখন এমন একটা মহলে চলাফেরা করতে হত যেখানে ফরাসী ভাষা অন্তত ইংরাজি ভাষার মতোই জরুরী তখন তাঁকে কী আহাম্মকই না লাগত। আসলে তখনকার ইংরেজ মধ্য শ্রেণী ছিল সাধারণত একেবারে অশিক্ষিত ভুঁইফোঁড়, অভিজাতদের তারা উচ্চতর সেই সব সরকারী পদ না দিয়ে পারত না যেখানে ব্যবসায়ী চতুরতায় পোক্ত একটা নিতান্ত গণ্ডি সংকীর্ণতা ও গণ্ডি অহমিকা ছাড়াও অন্য যোগ্যতার প্রয়োজন ছিল।* এমনকি এখনো মধ্য শ্রেণীর শিক্ষা বিষয়ে সংবাদপত্রের অনবসান বিতর্ক থেকে দেখা যায়, ইংরেজ মধ্য শ্রেণী এখনো নিজেকে সেরা শিক্ষার যোগ্য বলে মনে করছে না, কিছু কম-সমের দিকেই তার চোখ। সুতরাং শস্য আইন বাতিল করার পরেও এ যেন স্বাভাবিক যে, কবডেন, ব্রাইট, ফর্স্টার প্রভৃতি যে লোকেরা জিতল তারা দেশের সরকারী শাসনের অংশ থেকে বঞ্চিত রইল পরবর্তী কুড়ি বছর পর্যন্ত যতদিন না নতুন একটা সংস্কার আইনে ক্যাবিনেটের দ্বার উন্মুক্ত হয় তাদের জন্য। ইংরেজ বুর্জোয়ারা আজো পর্যন্ত তাদের সামাজিক হীনতাবোধে এত বেশি আচ্ছন্ন যে, সমস্ত রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে তারা যোগ্যরূপে জাতির প্রতিনিধিত্বের জন্য স্বীয় খরচায় এবং জাতির খরচায় এক দল শোভাবর্ধক নিষ্কর্মার

* এমনকি ব্যবসার ক্ষেত্রেও উগ্রজাতিবাদের অহমিকা এক অতি কুপরামর্শদাতা। হাল আমল পর্যন্ত সাধারণ ইংরেজ কলওয়ালা মনে করত নিজ ভাষা ছাড়া অন্য ভাষায় কথা বলা ইংরেজের পক্ষে লজ্জার; 'বেচারা' বিদেশীরা ইংলণ্ডে বসতি স্থাপন করে তার হাত থেকেই মাল নিয়ে বিদেশে বিক্রি করার ঝামেলা নিচ্ছে, এতে তার আর কিছু নয় বরং গর্বই হত। এটা তার কখনো নজরে আসেনি যে, এই বিদেশীরা, প্রধানত জার্মানরা, এই ভাবে আমদানি রপ্তানির, বৃটিশ বৈদেশিক বাণিজ্যের একটা বড়ো অংশের ওপর দখল পাচ্ছে এবং ইংরেজদের প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বাণিজ্য ক্রমশ সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ছে প্রায় একমাত্র কেবল উপনিবেশে, চীনে, যুক্ত রাষ্ট্রে ও দক্ষিণ আমেরিকায়। এও সে খেয়াল করেনি যে, এই জার্মানদের সঙ্গে বিদেশে অন্যান্য জার্মানরা ব্যবসা করে ক্রমশ সারা দুনিয়ায় বাণিজ্যিক উপনিবেশের একটা পুরো জাল গড়ে তুলছে। কিন্তু জার্মানি যখন প্রায় চল্লিশ বছর আগে সত্যি করেই রপ্তানির জন্য মাল তৈরি করতে লাগল তখন শস্য-চালানী দেশ থেকে প্রথম শ্রেণীর কলওয়ালা দেশরূপে অত অল্প সময়ের মধ্যে তার রূপান্তরে এই বাণিজ্যিক জালটা তার চমৎকার কাজে লেগেছিল। তারপর, প্রায় দশ বছর আগে, বৃটিশ কলওয়ালারা ভয় পেয়ে তার রাষ্ট্রদূত ও কন্সালদের প্রশ্ন করে, কেন তাদের খরিদ্দাররা টিকছে না। সকলে একবাক্যে জবাব দেয়: ১) আপনারা খরিদ্দারদের ভাষা শেখেন না, ভাবেন তাদেরই উচিত আপনাদের ভাষায় কথা বলা; ২) খরিদ্দারদের চাহিদা অভ্যাস রুচি ইত্যাদির সঙ্গেও মানিয়ে চলতে চান না, আশা করেন আপনাদের ইংরাজি চাহিদা অভ্যাস রুচি অনুসারেই সে চলবে। (এঙ্গেলসের টীকা।)

প্রতিপালন করে চলেছে; এবং নিজেদের দ্বারাই তৈরি করা এই অধিকারী ও সুবিধাভোগী মহলে নিজেদের কেউ যখন প্রবেশাধিকারের যোগ্য বিবেচিত হয় তখন ভয়ানক সম্মানিত বোধ করে তারা।

সুতরাং শিল্পজীবী ও বাণিজ্যিক মধ্য শ্রেণী রাজনৈতিক ক্ষমতা থেকে ভূমিজীবী অভিজাতদের সম্পূর্ণভাবে বিতাড়িত করতে না করতে মঞ্চে আবির্ভাব হল আর একটি প্রতিদ্বন্দ্বী, শ্রমিক শ্রেণীর। চার্টিস্ট আন্দোলন ও কণ্টিনেণ্টের বিপ্লবগুলির পরেকার প্রতিক্রিয়া তথা ১৮৪৮—১৮৬৬ সালের বৃটিশ বাণিজ্যের অভূতপূর্ব উন্নতির ফলে (স্থূলভাবে বলা হয় একমাত্র স্বাধীন বাণিজ্যই তার কারণ, তার চেয়েও কিন্তু অনেক বড়ো কারণ রেলপথ সমুদ্র জাহাজ ও সাধারণভাবে যোগাযোগ ব্যবস্থার বিপুল বিস্তার) শ্রমিক শ্রেণীকে ফের উদারনীতিক দলের অধীনে যেতে হয় — প্রাক চার্টিস্ট যুগের মতো তারা হয় এ দলের র‍্যাডিক্যাল অংশ। তাদের ভোটাধিকারের দাবি কিন্তু ক্রমশই অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে; উদারনীতিকদের হুইগ নেতারা যে-ক্ষেত্রে 'ভয় পায়' সে-ক্ষেত্রে ডিজরেলি তাঁর উৎকর্ষের প্রমাণ দিয়ে টোরিদের পক্ষে অনুকূল মুহূর্তটিকে ব্যবহার করে আসনের পুনর্বণ্টন সহ প্রবর্তন করান 'বরো'-গুলিতে ঘর-পিছু ভোট (household suffrage in the boroughs)। অতঃপর প্রবর্তিত হয় ব্যালট; তারপর ১৮৮৪ সালে কাউণ্টিগুলিতেও ঘর-পিছু ভোটাধিকারের প্রসার এবং আসনের আর একটা নববণ্টন যাতে নির্বাচনী এলাকাগুলি কিছুটা সমান সমান হয়ে আসে। এই সব ব্যবস্থায় শ্রমিক শ্রেণীর নির্বাচনী ক্ষমতা এতটা বেড়ে যায় যে, অন্তত দেড় শ' থেকে দুই শ'টি নির্বাচনী এলাকায় এ শ্রেণীর লোকেরাই এবার হয় অধিকাংশ ভোটদাতা। কিন্তু ঐতিহ্যের প্রতি সম্মান শেখানর একটা খাসা ইস্কুল হল পার্লামেণ্টারি ব্যবস্থা; লর্ড জন ম্যানের্স ঠাট্টা করে যাদের বলেছিলেন 'আমাদের সাবেকি অভিজাত' তাদের দিকে মধ্য শ্রেণী যদি তাকায় সভয়সম্ভ্রমে তাহলে শ্রমিক শ্রেণীও শ্রদ্ধা সম্মান করে তাকাবে মধ্য শ্রেণীর দিকে যাদের অভিহিত করা হয়েছে তাদের 'শ্রেয়তর' বলে। বস্তুতপক্ষে, বছর পনের আগে বৃটিশ মজুর ছিল আদর্শ মজুর, মনিবের প্রতিষ্ঠার প্রতি তার সশ্রদ্ধ সম্মান এবং নিজের জন্য অধিকার দাবি করতে তার সংযমী বিনয় দেখে আমাদের **ক্যাথিডার-সোশ্যালিস্ট*** গোষ্ঠীর জার্মান অর্থনীতিবিদরা তাদের স্বদেশী মজুরদের দুরারোগ্য কমিউনিস্ট ও বিপ্লবী প্রবণতায় একটা সান্ত্বনা পেয়েছিল।

কিন্তু ইংরেজ মধ্য শ্রেণী ভালো ব্যবসায়ী বলে জার্মান অধ্যাপকদের চেয়ে দূরদর্শী।

* ক্যাথিডার-সোশ্যালিজ্‌ম্ — জার্মানিতে ১৯শ শতকের ৭০—৮০-র দশকে উত্থিত বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্রের একটি ধারা। এই ধারার প্রতিনিধিরা বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্চ থেকে সমাজতন্ত্রের নামে বুর্জোয়া উদারনীতিক সংস্কারবাদের প্রচার করত। — সম্পাঃ

শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে তারা ক্ষমতা ভাগ করে যে নিয়েছিল তা অনিচ্ছা সহকারে। চার্টিস্ট আন্দোলনের বছরগুলিতে তারা শিখেছে সেই puer robustus sed malitiosus, অর্থাৎ জনগণের ক্ষমতা কেমন। সেই সময় থেকে জনগণের চার্টারের সেরা ভাগটা তারা যুক্তরাজ্যের স্ট্যাটিউটে সন্নিবদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছে। এখনই সবচেয়ে বেশি করে জনগণকে শৃঙ্খলায় রাখতে হবে নৈতিক উপায়ে, এবং জনগণের ওপর প্রভাব বিস্তারের কার্যকরী সমস্ত নৈতিক উপায়ের মধ্যে প্রথম ও প্রধান উপায় ছিল এবং রয়েই গেল ধর্ম। এই কারণেই স্কুল বোর্ডগুলিতে পাদ্রীদের সংখ্যাধিক্য, এই কারণেই পুজার্চনা থেকে 'স্যালভেশন আর্মি' পর্যন্ত সর্ববিধ পুনরুদয়বাদের (revivalism) সমর্থনে বুর্জোয়াদের ক্রমবর্ধমান আত্ম-ট্যাক্স।

কণ্টিনেণ্টী বুর্জোয়ার স্বাধীন চিন্তা ও ধর্মীয় শিথিলতার ওপর এবার জিত হল বৃটিশ শালীনতার। ফ্রান্স ও জার্মানির শ্রমিকেরা বিদ্রোহভাবাপন্ন হয়ে উঠেছিল। সমাজতন্ত্রে তারা একেবারে সংক্রামিত এবং যে উপায়ে স্বীয় প্রাধান্য অর্জন করতে হবে, তার বৈধতা নিয়ে তারা, সঠিক কারণেই, বিশেষ ভাবিত নয়। এখানকার puer robustus দিন দিন বেশি malitiosus হয়ে উঠছে। বড়াই করে জ্বলন্ত চুরুটটা নিয়ে ডেকের ওপর আসার পর সমুদ্রপীড়ার প্রকোপে ছোকরা যাত্রী যেমন সেটিকে গোপনে ত্যাগ করে তেমনি ভাবে শেষ পন্থা হিসাবে ফরাসী ও জার্মান বুর্জোয়ার পক্ষে তাদের স্বাধীন চিন্তা নিঃশব্দে পরিত্যাগ করা ছাড়া আর কোনো গত্যন্তর রইল না; বাইরের ব্যবহারে একের পর এক ধার্মিক হয়ে উঠতে লাগল ঈশ্বরবিদ্বেষীরা, চার্চ এবং তার শাস্ত্রবচন ও অনুষ্ঠানাদির বিষয়ে কথা কইতে লাগল সম্মান করে, যেটুকু না করলে নয় সে সব মেনেও নিতে লাগল। ফরাসী বুর্জোয়ারা শুক্রবার শুক্রবার **হবিষ্যি** শুরু করল আর রবিবার রবিবার জার্মান বুর্জোয়ারা গির্জায় নির্দিষ্ট আসনটিতে বসে শুনতে লাগল দীর্ঘ প্রটেস্টাণ্ট সার্মন। বস্তুবাদ নিয়ে তারা বিপদে পড়েছে। "Die Religion muss dem Volk erhalten werden" — ধর্মকে জীইয়ে রাখতে হবে জনগণের জন্য — সমূহ সর্বনাশ থেকে সমাজের পরিত্রাণের এই হল একমাত্র ও সর্বশেষ উপায়। দুর্ভাগ্যবশত, চিরকালের মতো ধর্মকে চূর্ণ করার জন্য যথাসাধ্য করার আগে এটি তারা আবিষ্কার করতে পারেনি। এবার বিদ্রূপ করে বৃটিশ বুর্জোয়ার বলার পালা: 'আহাম্মকের দল, এ কথা তো দুশ বছর আগেই আমি তোমাদের বলতে পারতাম!'

আমার কিন্তু আশঙ্কা, বৃটিশদের ধর্মীয় নিরেটত্ব অথবা কণ্টিনেণ্টী বুর্জোয়াদের post festum* দীক্ষাগ্রহণ কিছুতেই বর্ধমান প্রলেতারীয় তরঙ্গকে ঠেকাতে পারবে

* পার্বণ পেরিয়ে যাবার পর। — সম্পাঃ

না। ঐতিহ্যের একটা মস্ত পিছু-টানের শক্তি আছে, ইতিহাসের সে vis inertiae*, কিন্তু নিতান্ত নিষ্ক্রিয় বলে তা ভেঙে পড়তে বাধ্য এবং এই কারণে পুঁজিবাদী সমাজের চিরস্থায়ী রক্ষাকবচ ধর্ম হবে না। আমাদের আইনী, দার্শনিক ও ধর্মীয় ধারণাগুলি যদি হয় একটা নির্দিষ্ট সমাজের অর্থনৈতিক সম্পর্কপাতের মোটামুটি সুদূর কতকগুলো শাখা তাহলে এই সম্পর্কের আমূল পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়া সহ্য করে এ সব শাখা টিকে থাকতে পারবে না। এবং অলৌকিক দৈব-প্রজ্ঞায় বিশ্বাস না করলে আমাদের মানতেই হবে যে, পতনোম্মুখ সমাজকে ঠেকা দিয়ে রাখার শক্তি কোনো ধর্মীয় প্রবচনের নেই।

বস্তুতপক্ষে ইংলণ্ডেও শ্রমিক শ্রেণী ফের সচল হয়ে উঠেছে। সন্দেহ নেই যে, তারা নানাবিধ ঐতিহ্যে শৃংখলিত। বুর্জোয়া ঐতিহ্য, যথা এই ব্যাপক-প্রচলিত বিশ্বাস যে, শুধু রক্ষণশীল ও উদারনীতিক, মাত্র এই দুটি পার্টিই থাকা সম্ভব এবং শ্রমিক শ্রেণীকে মুক্তি অর্জন করতে হবে মহান উদারনীতিক পার্টির সাহায্যে ও তারই মাধ্যমে। শ্রমিকদের ঐতিহ্য, যা স্বাধীন সংগ্রামের প্রথম খসড়া প্রচেষ্টা থেকে তারা পেয়েছে, যথা যারা একটা নিয়মিত শিক্ষানবিসীর মধ্য দিয়ে আসেনি এমন সমস্ত আবেদনকারীকে সাবেকি বহু ট্রেড ইউনিয়ন থেকে বাদ দিয়ে রাখা; তার অর্থ দাঁড়াবে এই সব ইউনিয়ন কর্তৃক নিজেদের হাতেই নিজেদের বেইমান বাহিনী গঠন করা। কিন্তু এ সব সত্ত্বেও ইংরেজ শ্রমিক শ্রেণী এগুচ্ছে, ভ্রাতৃপ্রতিম ক্যাথিডার-সোশ্যালিস্টদের কাছে এমনকি অধ্যাপক ব্রেনতানোকেও যা রিপোর্ট করতে হয়েছে সখেদে। এগুচ্ছে, ইংলণ্ডের সবকিছুর মতোই, ধীরে ধীরে পা মেপে মেপে, কোথাও দ্বিধা, কোথাও মোটের ওপর অসফল অনিশ্চিত প্রচেষ্টায়; এগুচ্ছে মাঝে মাঝে সমাজতন্ত্র এই নামটার প্রতি এক অতিসতর্ক অবিশ্বাস নিয়ে, সেই সঙ্গে ক্রমশই তার সারবস্তুটিকে আত্মসাৎ করছে সে; এবং এ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে শ্রমিকদের একটার পর একটা স্তরকে ধরে ফেলছে। লণ্ডন ইস্ট এণ্ডের অনিপুণ মজুরদের তন্দ্রা ঘুচিয়ে দিয়েছে এ আন্দোলন, এবং আমরা সকলেই জানি, প্রতিদানে এই নতুন শক্তিগুলি কী চমৎকার প্রেরণা জুগিয়েছে শ্রমিক শ্রেণীতে। আন্দোলনের গতি যদি কারো অধৈর্যের সমপর্যায়ে না উঠে থাকে তাহলে এ কথা যেন তাঁরা না ভোলেন যে, ইংরেজ চরিত্রের সেরা গুণগুলোকে বাঁচিয়ে রেখেছে শ্রমিকেরাই এবং একটা অগ্রসর পদক্ষেপ যদি ইংলণ্ডে একবার অর্জিত হয় তাহলে পরে তা প্রায় কখনো মোছে না। সাবেকি চার্টিস্টদের ছেলেরা যদি পূর্বকথিত কারণে ঠিক বাপকা বেটা হয়ে উঠতে না পেরে থাকে, তবে নাতিদের দেখে মনে হয় পূর্বপুরুষদের মান তারা রাখবে।

* জাড্যের শক্তি। — সম্পাঃ

কিন্তু ইউরোপীয় শ্রমিকদের বিজয় শুধু ইংলন্ডের ওপরেই নির্ভরশীল নয়। সে বিজয় অর্জিত হতে পারে অন্তত ইংলন্ড ফ্রান্স ও জার্মানির সহযোগে। শেষোক্ত দুটি দেশেই শ্রমিক আন্দোলন ইংলন্ডের চেয়ে বেশ এগিয়ে। জার্মানিতে এমনকি তার সাফল্যের দিন এখন হিসাবের মধ্যেও ধরা যায়। গত পঁচিশ বছরে সেখানে তার যে অগ্রগতি ঘটেছে সেটা অতুলনীয়। ক্রমবর্ধমান গতিতে সে এগুচ্ছে। জার্মান মধ্য শ্রেণী যদি রাজনৈতিক দক্ষতা, শৃঙ্খলা, সাহস, উদ্যোগ, অধ্যবসায়ে শোচনীয় অযোগ্যতা জাহির করে থাকে, তবে জার্মান শ্রমিক শ্রেণী এই সবকটি যোগ্যতারই প্রভূত প্রমাণ দিয়েছে। চারশ' বছর আগে ইউরোপীয় মধ্য শ্রেণীর প্রথম উৎসারের সূত্রপাত ঘটিয়েছিল জার্মানি; অবস্থা এখন যা, তাতে ইউরোপীয় প্রলেতারিয়েতের প্রথম মহান বিজয়ের মঞ্চও হবে জার্মানি, এ কি সম্ভাব্যতার বাইরে?

২০শে এপ্রিল, ১৮৯২ ফ্র. এঙ্গেলস

এঙ্গেলসের 'ইউটোপীয় ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র' পুস্তকের ইংরাজি সংস্করণে প্রথম প্রকাশিত; এ বই লন্ডনে প্রকাশিত হয় ১৮৯২ সালে
একই সঙ্গে ১৮৯২—১৮৯৩ সালের *Neue Zeit* পত্রিকায় জার্মান ভাষায় প্রকাশিত হয়

ইংরাজিতে লিখিত। ১৮৯২ সালেব ইংরেজি সংস্করণের পাঠ থেকে বাংলা অনুবাদ

ইউটোপীয় ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র

১

একদিকে আজকের সমাজের ভেতরে মালিক ও অ-মালিক, পুঁজিপতি ও মজুরি-শ্রমিকদের মধ্যে শ্রেণী-বৈর, এবং অন্যদিকে উৎপাদনের মধ্যেকার নৈরাজ্য — মূলত এরই স্বীকৃতির প্রত্যক্ষ পরিণতি হল আধুনিক সমাজতন্ত্র। কিন্তু তত্ত্বগত আকারে আধুনিক সমাজতন্ত্রের প্রকাশ্য উদয় অষ্টাদশ শতকের মহান ফরাসী দার্শনিকদের বর্ণিত নীতির অধিকতর যুক্তিনিষ্ঠ সম্প্রসারণরূপে। বাস্তব অর্থনৈতিক ঘটনার যতই গভীরে তার মূল নিহিত থাক না কেন, প্রতিটি নতুন তত্ত্বের মতো আধুনিক সমাজতন্ত্রকেও হাতে পাওয়া পূর্বপ্রস্তুত বুদ্ধিমার্গীয় মালমসলার সঙ্গে সংযুক্ত হতে হয়েছিল।

ফরাসী দেশে যে মহামানবেরা আসন্ন বিপ্লবের জন্য মানুষের মন তৈরি করে গেছেন তাঁরা নিজেরাও ছিলেন চরম বিপ্লবী। বাইরেকার কোনো প্রামাণিকতা তাঁরা স্বীকার করেননি। ধর্ম, প্রকৃতিবিজ্ঞান, সমাজ, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান — কঠোরতম সমালোচনার লক্ষ্য হয় সবকিছুই; যুক্তির বিচারবেদীর সম্মুখে সবকিছুকেই তার অস্তিত্বের ন্যায্যতা প্রমাণ করতে হবে নতুবা অন্তর্হিত হতে হবে। সবকিছুর একমাত্র মাপকাঠি হয় যুক্তি। হেগেল বলেন, সে সময় বিশ্ব দাঁড়িয়েছিল তার মাথার ওপর*;

---

* ফরাসী বিপ্লব সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদটি এই: 'অধিকারেব চিন্তা, অধিকারের ধাবণা অবিলম্বেই স্বীকৃতি আদায় কবে নিল, এব বিরুদ্ধে অন্যাযের পুবাতন কাঠামো দাঁড়াতে পাবল না। সুতরাং এই অধিকার বোধের ওপব এবার একটা সংবিধান প্রতিষ্ঠা হল, এখন থেকে সবকিছুরই ভিত্তি হবে তা। সূর্য যবে থেকে আকাশে এবং তাকে ঘিবে ঘুরছে গ্রহ, ততদিনেব মধ্যে এ দৃশ্য দেখা যায়নি যে, মানুষ দাঁড়াল তার মাথার ওপর অর্থাৎ ভাবনার ওপর এবং বাস্তবকে নির্মাণ করতে লাগল তার এই ভাবনা অনুযায়ী। আনাক্সেইগরস প্রথম বলেছিলেন, *Nous* অর্থাৎ যুক্তির শাসনাধীন দুনিয়া। কিন্তু এখন এই সর্বপ্রথম মানুষ স্বীকাব করতে পারল যে, মানসিক বাস্তবতার শাসিত হওয়া উচিত ভাবনার দ্বারা। এবং সে হল এক অপরূপ অরুণোদয়। সমস্ত চিন্তক প্রাণীই এই পবিত্র দিনটির উদ্‌যাপনে অংশ নেন। একটা অপূর্ব আবেগে তখন আন্দোলিত হয মানুষ, যুক্তির উদ্দীপনায় বিশ্ব ছেয়ে যায, এ যেন এল বিশ্বেব সঙ্গে স্বর্গীয় নীতির মিলনের দিন।' (হেগেল, 'ইতিহাসের দর্শন', ১৮৪০, ৫৩৫ পৃঃ)। লোকান্তরিত অধ্যাপক হেগেল কর্তৃক এরূপ অন্তর্ঘাতী ও সাধারণের পক্ষে বিপজ্জনক প্রচারের বিরুদ্ধে সোশ্যালিস্ট-বিরোধী আইনটা অবিলম্বে প্রযোজ্য নয় কি? (এঙ্গেলসের টীকা।)

প্রথমত এই অর্থে যে, মনুষ্য মস্তিষ্ক, মস্তিষ্কের চিন্তাপ্রসূত ধারণাগুলিই সর্ববিধ মানবিক কর্ম ও সামাজিক সম্পর্কের ভিত্তি বলে নিজেদের দাবি করে; কিন্তু ক্রমশ এই ব্যাপকতর অর্থেও যে, যে-বাস্তবের সঙ্গে এই নীতি মিলত না সে বাস্তবকে বস্তুতপক্ষে উল্টে দেওয়া হয়। তদানীন্তন সব ধরনের সমাজ ও সরকারকে, প্রতিটি প্রাচীন ঐতিহ্যগত ধারণাকে অযৌক্তিক বলে নিক্ষেপ করা হয় আস্তাকুঁড়ে। বিশ্ব এযাবৎ কেবল কুসংস্কার দ্বারা চালিত হয়ে এসেছে; যা কিছু অতীত তা সবকিছুই কেবল অনুকম্পা ও ঘৃণার যোগ্য। এখন এই প্রথম দেখা দিল দিনের আলো, যুক্তির রাজদণ্ড; এখন থেকে কুসংস্কার, অবিচার, বিশেষাধিকার, নিপীড়নের জায়গা নেবে শাশ্বত সত্য, শাশ্বত অধিকার, স্বয়ং প্রকৃতির নিয়মজাত সাম্য এবং মানবের অলঙ্ঘনীয় অধিকার।

এখন আমরা জানি, যুক্তির এই রাজত্বটা বুর্জোয়ার আদর্শায়িত রাজ্য ছাড়া বেশি কিছু নয়; জানি যে, এই শাশ্বত অধিকার রূপায়ণ লাভ করেছে বুর্জোয়া ন্যায়ে; সাম্য পরিণত হয়েছে আইনের চোখে বুর্জোয়া সমানাধিকারে; বুর্জোয়া সম্পত্তি ঘোষিত হয়েছে মানুষের একটি মৌলিক অধিকার হিসাবে; এবং যুক্তির শাসন, রুসোর* 'সামাজিক চুক্তি' বাস্তব হয়েছে এবং বাস্তব হওয়াই সম্ভব কেবল একটা গণতান্ত্রিক বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্র রূপে। অষ্টাদশ শতকের মহামনীষীদের পক্ষে তাদের পূর্বতনদের মতোই স্বীয় যুগের সীমা অতিক্রম করে যাওয়া সম্ভব ছিল না।

কিন্তু সামন্ত অভিজাত সম্প্রদায়ের সঙ্গে যে বার্গাররা (বুর্জোয়া) অবশিষ্ট সমাজের প্রতিনিধিত্ব দাবি করছিল তাদের বৈরিতার পাশাপাশি ছিল শোষক ও শোষিত, নিষ্কর্মা ধনী ও গরিব মজুরদের সাধারণ বৈরিতা। এই পরিস্থিতি ছিল বলেই বুর্জোয়াদের প্রতিনিধিরা শুধু একটা বিশেষ শ্রেণী নয়, সমগ্র নিপীড়িত মানবের প্রতিনিধিরূপে নিজেদের জাহির করতে সমর্থ হয়। অপিচ। জন্ম থেকেই বুর্জোয়া তার বিপরীত (antithesis) দ্বারা ভারাক্রান্ত: মজুরি-খাটা শ্রমিক ছাড়া পুঁজিপতির অস্তিত্ব অসম্ভব, এবং গিল্ডের মধ্যযুগীয় বার্গার যে পরিমাণে আধুনিক বুর্জোয়ারূপে বিকশিত হয় সে পরিমাণেই গিল্ডের কর্মী (journeymen) এবং গিল্ডের বাইরেকার দিন-মজুরেরা পরিণত হয় প্রলেতারিয়েতে। এবং অভিজাতদের সঙ্গে সংগ্রামে বুর্জোয়ারা যুগপৎ সে-কালের বিভিন্ন মেহনতী শ্রেণীর স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব মোটের ওপর দাবি করতে

* রুসোর তত্ত্ব অনুসারে গোড়াতে মানুষেরা স্বাভাবিক পরিবেশে বাস করত ও সকলেই ছিল সমান। ব্যক্তিগত মালিকানার উদ্ভব ও সম্পত্তির অসাম্য বৃদ্ধির কারণেই স্বাভাবিক পরিস্থিতি থেকে লোকেরা সরে আসে নাগরিক পরিস্থিতিতে এবং সামাজিক চুক্তির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। কিন্তু রাজনৈতিক অসাম্যের আরো বৃদ্ধির ফলে সামাজিক চুক্তির লঙ্ঘন ঘটে এবং নতুনতর একটা স্বাভাবিক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। এই শেষোক্ত পরিস্থিতির অবসান করাতে হবে এক সর্ববিবেচক রাষ্ট্রকে, যা নতুন সামাজিক চুক্তির ভিত্তিতে গঠিত। — সম্পাঃ

পারলেও বড়ো বড়ো প্রত্যেকটা বুর্জোয়া আন্দোলনেই স্বাধীন বিস্ফোরণ ঘটেছে সেই শ্রেণীটির যারা বর্তমান প্রলেতারিয়েতের কমবেশি পরিণত পুরোধা। দৃষ্টান্তস্বরূপ, জার্মান রিফর্মেশন ও কৃষক যুদ্ধের কালে আনাব্যাপটিস্টরা* ও টমাস ম্যুনৎসার, মহান ইংরেজ বিপ্লবে লেভেলাররা**, মহান ফরাসী বিপ্লবে বাব্যেফ।

তখনো অপরিণত একটা শ্রেণীর এই সব বিপ্লবী অভ্যুত্থানের প্রতিসঙ্গী তাত্ত্বিক প্রতিজ্ঞাও ছিল; ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে আদর্শ সামাজিক ব্যবস্থার ইউটোপীয় ছবি***; অষ্টাদশ শতকে সত্যিকার কমিউনিস্ট-সুলভ তত্ত্ব (মরেলি ও মাব্লি)। সাম্যের দাবিটা আর শুধু রাজনৈতিক অধিকারে সীমাবদ্ধ রইল না, তা প্রসারিত হয়ে গেল ব্যক্তির সামাজিক অবস্থার ক্ষেত্রেও। শুধু শ্রেণীগত বিশেষাধিকার উচ্ছেদের কথা নয়, শ্রেণীভেদেরই অবসান। জীবনের সবকিছু উপভোগ বর্জন করে যোগীসুলভ একধরনের স্পার্টান কমিউনিজম হল এই নতুন মতবাদের প্রথম রূপ। এর পর এলেন তিনজন মহান ইউটোপীয়: সাঁ-সিমোঁ, তাঁর কাছে প্রলেতারীয় আন্দোলনের পাশাপাশি মধ্য শ্রেণীর আন্দোলনেরও একটা তাৎপর্য ছিল; ফুরিয়ে এবং ওয়েন — ইনি সেই দেশের লোক যেখানে পুঁজিবাদী উৎপাদন সবচেয়ে বিকশিত, তদুদ্ভূত বৈরিতার প্রভাবে ইনি ফরাসী বস্তুবাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রেখে ধারাবাহিকভাবে শ্রেণীভেদ দূর করার জন্য তাঁর প্রস্তাব প্রণয়ন করেন।

একটা ব্যাপার তিনেতেই সমান। ঐতিহাসিক বিকাশ ইতিমধ্যে যে প্রলেতারিয়েতের সৃষ্টি করেছে সেই প্রলেতারিয়েতের স্বার্থের প্রতিনিধি হয়ে এঁরা কেউ দেখা দেননি। একটা বিশেষ শ্রেণীর মুক্তি দিয়ে শুরু না করে ফরাসী দার্শনিকদের মতো তাঁরা সমগ্র মানবেরই মুক্তি দাবি করেন। তাঁদের মতোই এঁদেরও অভিলাষ যুক্তি ও শাশ্বত ন্যায়ের রাজত্ব স্থাপন, কিন্তু তাঁদের রাজত্ব ফরাসী দার্শনিকদের থেকে ততটা দূরে যতটা সুদূর মর্ত্য থেকে স্বর্গ।

* আনাব্যাপটিস্ট (পুনর্দীক্ষিত) — ১৬ শতকে জার্মানি ও নেদার্ল্যান্ডেস্ উত্থিত এক ধর্মসম্প্রদায়ের অনুগামীরা। এই ধর্মসম্প্রদায়ের সভ্যদের আনাব্যাপটিস্ট বলা হত কারণ তারা সাবালক অবস্থায় দ্বিতীয়বার দীক্ষার দাবি তোলে। আনাব্যাপটিস্টদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল কৃষক হস্তশিল্পী ও ক্ষুদে দোকানী, ১৫২৪—১৫২৫ সালের কৃষক সমরে এরা টমাস ম্যুনৎসারের নেতৃত্বাধীন অধিকতর বিপ্লবী অংশটায় যোগ দেয়। — সম্পাঃ

** 'খাঁটি লেভেলার' বা 'খনক' বলে যাদের অভিহিত করা হত এঙ্গেলস এখানে তাদের কথা বলছেন। ১৭শ শতকে ইংলন্ডের বুর্জোয়া বিপ্লবে এরা শহুরে ও গাঁয়ের গরিবদের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে। — সম্পাঃ

*** এঙ্গেলস এখানে ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রী টমাস মোর (১৬শ শতাব্দী) ও তম্মাসো কাম্পানেল্লার (১৭শ শতাব্দী) রচনার কথা বলছেন। — সম্পাঃ

কেননা আমাদের এই তিন সংস্কারকদের কাছে, ফরাসী দার্শনিকদের নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত বুর্জোয়া জগতটাও সমান অযৌক্তিক ও অন্যায্য এবং সেই কারণে, সামন্ততন্ত্র তথা সমাজের পূর্বতন স্তরগুলির মতোই সত্বর আবর্জনাস্তূপে নিক্ষেপনীয়। বিশুদ্ধ যুক্তি ও ন্যায় যদি এযাবৎ দুনিয়াকে শাসন না করে থাকে, তবে তার একমাত্র কারণ, মানুষ তা সঠিকভাবে বুঝতে পারেনি। দরকার ছিল শুধু এক প্রতিভাধর ব্যক্তির — এবার তার অভ্যুদয় ঘটেছে, সত্য তার করায়ত্ত। এখন যে তার অভ্যুদয় ঘটল, সত্য যে এখনই পরিষ্কার করে বোঝা গেল, সেটা ঐতিহাসিক বিকাশের গ্রন্থি বেয়ে আসা এক অনিবার্য ব্যাপার নয়, নিতান্তই এক শুভ দৈবঘটনা। পাঁচশ' বছর আগেও তার এ অভ্যুদয় ঘটতে পারত এবং সেক্ষেত্রে মানব সমাজকে পাঁচশ' বছরের ভ্রান্তি, সংঘর্ষ ও ক্লেশ ভুগতে হত না।

আমরা দেখেছি, বিপ্লবের পুরোগামী, অষ্টাদশ শতকের ফরাসী দার্শনিকেরা বিদ্যমান সবকিছুরই একমাত্র বিচারক বলে হাজির করে যুক্তিকে। প্রতিষ্ঠা করতে হবে একটা যুক্তিসিদ্ধ সরকার, যুক্তিসিদ্ধ সমাজ; শাশ্বত যুক্তির যা কিছু পরিপন্থী তা সবকিছুকেই নির্মমভাবে বিলোপ করতে হবে। এও দেখেছি যে, আসলে যে অষ্টাদশ শতকের বার্গার ঠিক সেই সময়টায় বুর্জোয়া হয়ে উঠছিল তারই আদর্শায়িত বোধ ছাড়া এ শাশ্বত যুক্তি আর কিছুই নয়। ফরাসী বিপ্লবে এই যুক্তিসিদ্ধ সমাজ ও সরকার বাস্তব হয়।

কিন্তু নতুন ব্যবস্থা আগেকার অবস্থার তুলনায় যথেষ্ট যুক্তিনিষ্ঠ হলেও মোটেই পুরোপুরি যুক্তিসিদ্ধ হয়ে উঠল না। যুক্তিভিত্তিক রাষ্ট্রের পরিপূর্ণ পতন হল। রুসোর 'সামাজিক চুক্তি' বাস্তব রূপ পেল 'সন্ত্রাসের শাসনে' (Reign of Terror)। নিজস্ব রাজনৈতিক সামর্থ্যে বুর্জোয়ারা বিশ্বাস হারিয়ে বসেছিল, তারা এ থেকে নিস্তার খুঁজল প্রথমে ডিরেক্টরেটের দুর্নীতিপরায়ণতায় এবং শেষ পর্যন্ত নেপোলিয়নীয় স্বৈরাচারের পক্ষপুটে।* প্রতিশ্রুত শাশ্বত শান্তি পরিণত হল এক দিগ্বিজয়ের অবিরাম যুদ্ধে। যুক্তিভিত্তিক সমাজের হালও এ থেকে ভালো হল না। এক সাধারণ সম্পন্নতা

* সন্ত্রাসের কাল — জ্যাকোবিনদের বিপ্লবী-গণতান্ত্রিক একনায়কত্বের পর্ব (জুন ১৭৯৩— জুলাই, ১৭৯৪) যখন জিরন্ডপন্থী ও রাজপন্থীদের প্রতিবিপ্লবী সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে জ্যাকোবিনরা বিপ্লবী সন্ত্রাস প্রয়োগ করে।

ডিরেক্টরেট — (গঠিত হয় পাঁচ জন ডিরেক্টর নিয়ে, প্রতিবছরে এদের একজনকে পুনর্নির্বাচিত হতে হত) ১৭৯৪ সালে জ্যাকোবিনদের বিপ্লবী একনায়কত্বের পতনের পর ১৭৯৫ সালের সংবিধান অনুসারে প্রতিষ্ঠিত ফ্রান্সের কার্যনির্বাহক ক্ষমতার নেতৃসংস্থা; এটি টিকে থাকে ১৭৯৯ সালে বোনাপার্টের রাষ্ট্রীয় কুদেতা পর্যন্ত; গণতান্ত্রিক শক্তির বিরুদ্ধে সন্ত্রাসের রাজত্ব সমর্থন করে ডিরেক্টরেট এবং বৃহৎ বুর্জোয়াদের স্বার্থ রক্ষা করে। — সম্পাঃ

সৃষ্টি হয়ে ধনী দরিদ্রের বিরোধ মিটে যাবার বদলে তা তীব্রতর হয়ে উঠল গিল্ড প্রভৃতি সুবিধার অপসারণে — এগুলির ফলে এ বিরোধ খানিকটা চাপা ছিল, — এবং গির্জার দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলির বিলোপে। সামন্ততান্ত্রিক বাঁধন থেকে 'সম্পত্তির স্বাধীনতা' অধুনা সত্যই অর্জিত হল এবং ক্ষুদে পুঁজিপতি ও ক্ষুদে কৃষক মালিকদের পক্ষে তা হয়ে দাঁড়াল বৃহৎ পুঁজিপতি ও জমিদারদের বিপুল প্রতিযোগিতায় নিষ্পিষ্ট হয়ে এই সব মহা প্রভুদের নিকট নিজ নিজ ক্ষুদে সম্পত্তি বিক্রয়ের স্বাধীনতা এবং এই ভাবে, ক্ষুদে পুঁজিপতি ও কৃষক মালিকদের দিক থেকে, তা হল 'সম্পত্তি **থেকে** স্বাধীনতা'। পুঁজিবাদী ভিত্তিতে শিল্পের বিকাশের ফলে মেহনতী জনগণের দারিদ্র্য ও ক্লেশই হল সমাজের অস্তিত্বের সর্ত। নগদ টাকা ক্রমশই হয়ে দাঁড়াল, কার্লাইলের বক্তব্য অনুসারে, মানুষে মানুষে একমাত্র সম্পর্ক (sole nexus)। বছরে বছরে বেড়ে উঠল অপরাধের সংখ্যা। আগে সামন্ত পাপকর্মগুলো প্রকাশ্য দিবালোকে খোলাখুলিই হেঁটে বেড়াত, এখন তারা উৎপাটিত না হলেও অন্তত পক্ষে পেছনে সরে গিয়েছিল। তার জায়গায় এযাবৎ যা গোপনে অনুষ্ঠিত হয়ে এসেছে সেই বুর্জোয়া পাপ আরো সতেজে পল্লবিত হয়ে উঠতে লাগল। ব্যবসা ক্রমশই হয়ে দাঁড়াল প্রবঞ্চনা। বিপ্লবী সূত্রবাণীয় 'সৌভ্রাত্র্য'* বাস্তবে রূপায়িত হল প্রতিযোগিতা-সংগ্রামের বুজরুকি ও প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। জবরদস্তি করে নিপীড়নের জায়গায় এল দুর্নীতি, সমাজ চালাবার প্রথম কারিকা হিসাবে তরবারির জায়গা নিল সোনা। প্রথম রাত্রির অধিকার সামন্ত ভূস্বামীদের হাত থেকে গেল বুর্জোয়া কলওয়ালাদের কাছে। গণিকাবৃত্তির বৃদ্ধি ঘটল অভূতপূর্ব রকমের। বিবাহ ব্যাপারটাও আগের মতোই গণিকাচারের আইনসঙ্গত একটা রূপ, সরকারী একটা আবরণ হয়েই রইল এবং তদুপরি, তার সঙ্গে যুক্ত হল একটা অঢেল ব্যভিচারের স্রোত।

সংক্ষেপে, দার্শনিকদের চমৎকার সব প্রতিশ্রুতির সঙ্গে মেলালে 'যুক্তির বিজয়' থেকে উদ্ভূত সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি হল এক তীব্র নৈরাশ্যকর ব্যঙ্গস্বরূপ। অভাব ছিল শুধু সে নৈরাশ্যকে সূত্রবদ্ধ করার মতো মানুষের এবং তারা দেখা দিল শতাব্দীর পটপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে। ১৮০২ সালে দেখা দিল সাঁ-সিমোঁর 'জেনেভা পত্রাবলী', ১৮০৮ সালে প্রকাশিত হল ফুরিয়ের প্রথম রচনা যদিও তাঁর তত্ত্বের বনিয়াদ গড়ে ওঠে ১৭৯৯ সালেই; ১৮০০ সালের ১লা জানুয়ারি রবার্ট ওয়েন নিউ ল্যানার্কের পরিচালনা গ্রহণ করেন।

এ সময়ে কিন্তু উৎপাদনের পুঁজিবাদী ধরন এবং সেই সঙ্গে বুর্জোয়া প্রলেতারিয়েত

* ১৮শ শতকের শেষে ফরাসী বুর্জোয়া বিপ্লবের 'স্বাধীনতা, সাম্য, ভ্রাতৃত্ব' এই ধ্বনির কথা বলা হচ্ছে। — সম্পাঃ

বৈরিতা তখনো বেশ অপরিণত। আধুনিক শিল্প সদ্য ইংলণ্ডে শুরু হয়েছে, ফ্রান্সে তা তখনো অজানা। কিন্তু আধুনিক শিল্প একদিকে বাড়িয়ে তোলে এমন সব সংঘাত যাতে উৎপাদনের ধরনে একটা বিপ্লব, তার পুঁজিবাদী চরিত্রের বিলোপ অনিবার্য হয়ে পড়ে — আর এ সংঘাত কেবল তৎসৃষ্ট শ্রেণীগুলির মধ্যেই নয়, তৎসৃষ্ট উৎপাদন-শক্তি এবং বিনিময় রূপের মধ্যেও, — এবং অন্যদিকে, এই অতিকায় উৎপাদন-শক্তির অভ্যন্তরেই তা বিকশিত করে তোলে এ সংঘাতগুলির অবসানের উপায়। সুতরাং ১৮০০ সাল নাগাদ নতুন সমাজব্যবস্থা থেকে উদ্ভূত সংঘাতগুলি যদি সদ্য আকার নিতে শুরু করে থাকে, তাহলে সে সংঘাত অবসানের উপায়ের ক্ষেত্রে এ কথা আরো বেশি প্রযোজ্য। 'সন্ত্রাসের শাসন' কালে প্যারিসের সর্বহারা জনগণ মুহূর্তের জন্য প্রভুত্ব পেয়েছিল এবং তার ফলে বুর্জোয়ার **বিরুদ্ধেই** বুর্জোয়া বিপ্লবকে তারা বিজয়ী করে দেয়। কিন্তু তাই করতে গিয়ে তারা শুধু এই প্রমাণ করে যে, তদানীন্তন অবস্থায় তাদের আধিপত্য টিকে থাকা ছিল কী অসম্ভব। এই সর্বহারা জনগণ থেকে নতুন একটা শ্রেণীর কোষ-কেন্দ্র রূপে তখন সেই প্রথম যারা বিবর্তিত হয়ে উঠেছে সেই প্রলেতারিয়েত তখনো স্বাধীন রাজনৈতিক কর্মে অক্ষম, তারা দেখা দিয়েছে একটা নিপীড়িত দুঃখী সম্প্রদায় হিসাবে, আত্ম-সাহায্যে অক্ষম এই সম্প্রদায়কে যদি সাহায্য পেতে হয় তবে সে সাহায্য আসতে পারে বড়ো জোর বাইরে থেকে, নতুবা উপর থেকে।

এই ঐতিহাসিক পরিস্থিতির অধীনস্থ হন সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতারাও। পুঁজিবাদী উৎপাদনের অপরিণত অবস্থা ও অপরিণত শ্রেণী পরিস্থিতির প্রতিসঙ্গী হল অপরিণত তত্ত্ব। অবিকশিত অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যে যা তখনো সুপ্ত তেমন সব সামাজিক সমস্যার সমাধান ইউটোপীয়রা বার করতে চাইল মাথা থেকে। সমাজ ছেয়ে গেছে কেবল অন্যায়ে, তা দূরীকরণের দায় যুক্তির। সুতরাং দরকার হল একটা নতুন ও আরো নিখুঁত সমাজব্যবস্থা আবিষ্কার করে তা বাইরে থেকে প্রচারের জোরে এবং যে ক্ষেত্রে সম্ভব সে ক্ষেত্রে আদর্শ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেও সমাজের ওপর চাপিয়ে দেওয়া। এই নতুন সমাজব্যবস্থাগুলি ইউটোপীয় হতে বাধ্য; যতই সবিস্তারে তাদের পরিপূর্ণ করে রচনা করা হতে লাগল ততই বিশুদ্ধ উৎকল্পনায় ভেসে না গিয়ে তাদের উপায় রইল না।

এই কথাগুলো একবার প্রতিষ্ঠার পর প্রশ্নটার এই দিকটা নিয়ে আর কালক্ষেপের প্রয়োজন নেই — এ এখন সবই অতীতের বিষয়। সে কাজ আমরা ছেড়ে দিতে পারি ক্ষুদে সাহিত্যিকদের জন্য — এই যে সব উৎকল্পনায় আজ আমাদের মাত্র হাসি পায়, তার ওপর সগাম্ভীর্যে ঠোকর মেরে এরূপ 'পাগলামির' তুলনায় নিজেদের পাকাবুদ্ধির উৎকর্ষ নিয়ে এঁরা কাকলী করুন। আমাদের আনন্দ বরং সেই সব মহামহীয়ান ভাবনা ও ভাবনার বীজ নিয়ে যা তাঁদের উৎকল্পী খোলস থেকে সর্বত্রই ফেটে বেরিয়েছে এবং যার প্রতি এই কূপমণ্ডূকেরা অন্ধ।

সাঁ-সিমোঁ মহান ফরাসী বিপ্লবের সন্তান, এ বিপ্লব যখন শুরু হয় তখন তাঁর বয়স তিরিশও নয়। এ বিপ্লবে জয় হয় তৃতীয় সম্প্রদায়ের, অর্থাৎ সুবিধাভোগী **অলস** শ্রেণীগুলির ওপর উৎপাদন ও ব্যবসায় যারা **খাটছে** জাতির সেই বিপুল জনগণের জয়। কিন্তু তৃতীয় সম্প্রদায়ের বিজয় অচিরেই আত্মপ্রকাশ করল এই সম্প্রদায়ের একটি ক্ষুদ্র অংশের স্বীয় বিজয়রূপে, এ সম্প্রদায়ের সামাজিকভাবে সুবিধাভোগী অংশের অর্থাৎ সম্পত্তি-মালিক বুর্জোয়ার রাজনৈতিক ক্ষমতালাভরূপে। বিপ্লবের ভেতর বুর্জোয়ারা নিশ্চিতই দ্রুত বিকশিত উঠেছিল — অভিজাতদের ও গির্জার যে জমি বাজেয়াপ্ত করে পরে বিক্রির জন্য হাজির করা হয় তার ওপর ফাটকাবাজি করে খানিকটা, এবং খানিকটা যুদ্ধ ঠিকার মারফত জাতিকে ঠকিয়ে। এই জুয়াচোরদের আধিপত্যের ফলেই ডিরেক্টরেটের আমলে ফ্রান্স ধ্বংসের সীমায় এসে দাঁড়িয়েছিল এবং নেপোলিয়ন অজুহাত পান **কুদেতার**।

সুতরাং, সাঁ-সিমোঁর কাছে তৃতীয় সম্প্রদায় ও সুবিধাভোগী শ্রেণীর মধ্যেকার বৈরিতাটা 'কর্মী' ও 'নিষ্কর্মাদের' মধ্যস্থ একটা বৈরিতারূপে দেখা দেয়। শুধু সাবেকি সুবিধাভোগী শ্রেণী নয়, উৎপাদন ও বিতরণে অংশ না নিয়ে যারা তাদের আয়ের ওপর বসে খায় তারা সকলেই নিষ্কর্মা। কর্মীও শুধু মজুরি-খাটা শ্রমিক নয়, কলওয়ালা বণিক ব্যাংকার — সকলেই। নিষ্কর্মারা যে মনীষাগত নেতৃত্ব ও রাজনৈতিক প্রাধান্যের ক্ষমতা হারিয়েছে তা প্রমাণিত হয়ে গিয়েছিল এবং পাকাপাকি স্থির হয়ে যায় বিপ্লবে। সর্বহারা শ্রেণীগুলিরও যে সে-ক্ষমতা নেই সেটা সাঁ-সিমোঁর মনে হয়েছিল 'সন্ত্রাসের শাসনের' অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রমাণিত। তাহলে পরিচালনা করবে, নায়কত্ব করবে কে? সাঁ-সিমোঁর মতে তা করবে নতুন একটা ধর্মীয় বন্ধনে মিলিত বিজ্ঞান ও শিল্প, এ ধর্মবন্ধনের নির্বন্ধ হল ধর্মীয় ভাবনার সেই ঐক্য পুনরুদ্ধার করা যা রিফর্মেশনের সময় থেকে নষ্ট হয়ে গেছে,— অবশ্যই অতীন্দ্রিয়বাদী এবং কড়া রকমের যাজকতন্ত্রী 'নবখৃষ্টবাদ'। বিজ্ঞান অর্থে হল পণ্ডিতবর্গ, এবং শিল্প, সে হল সর্বাগ্রে সক্রিয় বুর্জোয়া, কলওয়ালা, বণিক, ব্যাংকার। সাঁ-সিমোঁর অভিপ্রায় ছিল, এ বুর্জোয়াদের অবশ্যই রূপান্তরিত হতে হবে এক ধরনের জনকর্মচারী, সামাজিক অছিদাররূপে; কিন্তু মজুরদের তুলনায় নেতৃত্বকারী ও অর্থনৈতিকভাবে সুবিধাপ্রাপ্ত একটা অবস্থান তাদের তখনো থাকবে। ব্যাংকারদের বিশেষ করে ডাক দেওয়া হবে ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে সমগ্র সামাজিক উৎপাদন পরিচালিত করতে। এ ধারণাটা ঠিক তেমন একটা সময়ের সঙ্গে খাপ খায় যখন ফ্রান্সে আধুনিক শিল্প এবং সেই সঙ্গে বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েতের মধ্যেকার গহ্বরটা সবে দেখা দিচ্ছে। কিন্তু সাঁ-সিমোঁ বিশেষ জোর যেখানে দেন সেটা এই: সর্বাগ্রে এবং সর্বোপরি তাঁর ভাবনা ছিল সেই শ্রেণীর

ভাগ্য নিয়ে যারা সবচেয়ে সংখ্যাধিক ও সবচেয়ে গরিব ('la classe la plus nombreuse et la plus pauvre')।

'জেনেভা পত্রাবলী'তেই সাঁ-সিমোঁ প্রস্তাব তুলেছিলেন, 'সমস্ত লোককেই কাজ করতে হবে।' ঐ রচনায় তিনি এ কথাও বলেন যে, সন্ত্রাসের শাসন ছিল সর্বহারা জনগণের শাসন। সর্বহারাদের তিনি বলেছেন, 'দ্যাখো, তোমাদের সাথীরা যখন ফ্রান্সে আধিপত্য করে তখন কী দাঁড়ায়: তারা একটা দুর্ভিক্ষ ঘটায়।' কিন্তু ফরাসী বিপ্লবকে শ্রেণী-যুদ্ধ হিসাবে, শুধু অভিজাত ও বুর্জোয়াদের মধ্যেকার একটা যুদ্ধ নয়, অভিজাত বুর্জোয়া ও সর্বহারাদের মধ্যেকার একটা যুদ্ধ হিসাবে দেখা ১৮০২ সালের পক্ষে একটা অতি অর্থগর্ভ আবিষ্কার। ১৮১৬ সালে তিনি ঘোষণা করেন, রাজনীতি হল উৎপাদনের বিজ্ঞান, এবং ভবিষ্যদ্বাণী করেন রাজনীতিকে সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করবে অর্থনীতি। অর্থনৈতিক অবস্থা যে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের বনিয়াদ, এ জ্ঞান এখানে মাত্র ভ্রূণাকারে দেখা দিয়েছে। তবু তখনই যা বেশ পরিষ্কার করে ফুটে উঠেছে সে হল এই ধারণা যে, ভবিষ্যতে মানুষের ওপরকার রাজনৈতিক শাসন পরিবর্তিত হবে বস্তুর ব্যবস্থাপনা ও উৎপাদন প্রক্রিয়ার পরিচালনায়, অর্থাৎ 'রাষ্ট্রের বিলোপে', যা নিয়ে ইদানীং এত সোরগোল চলেছে।

সমকালীনদের তুলনায় একই প্রকার শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় সাঁ-সিমোঁ দেন ১৮১৪ সালে, মিত্রশক্তিদের প্যারিস প্রবেশের ঠিক পরেই, এবং ফের ১৮১৫ সালে একশ দিনের* যুদ্ধের সময় যখন তিনি ঘোষণা করেন, ফ্রান্সের সঙ্গে ইংলন্ডের এবং পরে এই দুই দেশের সঙ্গে জার্মানির মৈত্রীই হল ইউরোপের সমৃদ্ধ বিকাশ ও শান্তির একমাত্র গ্যারান্টি। ওয়াটার্লু যুদ্ধের** বিজয়ীদের সঙ্গে মৈত্রীর কথা ১৮১৫ সালে ফরাসীদের কাছে প্রচার করতে হলে যেমন সাহস তেমনি ঐতিহাসিক দূরদৃষ্টির প্রয়োজন হত।

* ফরাসী বিরোধী ষষ্ঠ জোটের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির (রাশিয়া, অস্ট্রিয়া, ইংলন্ড, প্রাশিয়া প্রভৃতি) সম্মিলিত বাহিনী প্যারিস প্রবেশ করে ১৮১৪ সালের ৩১শে মার্চ। নেপোলিয়ন সাম্রাজ্যের পতন হয় এবং স্বয়ং নেপোলিয়ন সিংহাসন ত্যাগের পর এলবা দ্বীপে নির্বাসিত হতে বাধ্য হন। বুরবোঁ রাজতন্ত্রের প্রথম পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঘটে ফ্রান্সে।

একশ দিন — ১৮১৫ সালের ২০শে মার্চ এলবার নির্বাসন থেকে ফিরে প্যারিস প্রবেশের মুহূর্ত থেকে ওয়াটার্লুতে পরাজয়ের পর ঐ বছরেরই ২২শে জুন দ্বিতীয়বার সিংহাসন ত্যাগ পর্যন্ত নেপোলিয়নের স্বল্পস্থায়ী সাম্রাজ্য পুনঃস্থাপনের পর্ব। — সম্পাঃ

** ওয়াটার্লুতে (বেলজিয়ম) ১৮১৫ সালের ১৮ই জুন ওয়েলিংটনের নেতৃত্বাধীন ইঙ্গ-ওলন্দাজ সৈন্য এবং ব্লুখারের নেতৃত্বাধীন প্রুশীয় সৈন্যের নিকট নেপোলিয়নের সৈন্যদল বিধ্বস্ত হয়। ফরাসী বিরোধী সপ্তম জোটের (ইংলন্ড, রাশিয়া, অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া, সুইডেন, স্পেন প্রভৃতি) চূড়ান্ত জয়লাভ এবং নেপোলিয়নীয় সাম্রাজ্যের পতনে এ সংঘর্ষ নির্ধারক ভূমিকা নেয়। — সম্পাঃ

সাঁ-সিমোঁর মধ্যে যদি পাই একটা এমন পরিপূর্ণ ব্যাপক দৃষ্টি যাতে পরবর্তী সমাজতন্ত্রীদের যে সব ধারণা একান্তভাবে অর্থনৈতিক নয় তার প্রায় সবগুলিই তাঁর মধ্যে ভ্রূণাকারে বর্তমান, তাহলে ফুরিয়ের মধ্যে পাব তদানীন্তন সমাজব্যবস্থার একটা খাঁটি ফরাসী চালের ক্ষুরধার সরস সমালোচনা, কিন্তু তাই বলে মোটেই তা কম গভীর নয়। ফুরিয়ে বুর্জোয়াকে ধরেছেন, ধরেছেন তাদের বিপ্লবপূর্বের অনুপ্রেরিত পয়গম্বর আর বিপ্লবোত্তর স্বার্থান্বেষী চাটুকারদের স্বমুখনিসৃত উক্তিগুলিকেই। বুর্জোয়া জগতের বৈষয়িক ও নৈতিক দৈন্য তিনি উদ্ঘাটিত করেছেন নির্মমভাবে। একমাত্র যুক্তি-শাসিত একটা সমাজ, সার্বজনীন সুখের একটা সভ্যতা, মানুষের অসীম একটা পরিপূর্ণতার যে ঝলকিত প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন পূর্বতন দার্শনিকেরা এবং তাঁর কালের বুর্জোয়া প্রবক্তারা যে সব রঙীন বুলি আওড়াতেন তার মুখোমুখি তিনি দাঁড় করিয়ে দেন বুর্জোয়া জগতটাকে। দেখিয়ে দেন কী ভাবে প্রতিটি ক্ষেত্রে অতি উচ্চ বাগাড়ম্বরের তলে আছে অতি শোচনীয় বাস্তব এবং বাক্যের এই অপদার্থ প্রহসনকে তিনি দীর্ণ করেছেন জ্বালাময় ব্যঙ্গে।

ফুরিয়ে শুধু সমালোচক নন; তাঁর অনুত্তেজিত ধীর স্বভাব তাঁকে করে তুলেছে ব্যঙ্গবিদ, এবং নিঃসন্দেহে সর্বকালের সেরা ব্যঙ্গবিদদের অন্যতম। যেমন বলিষ্ঠ তেমনি সুন্দর করে তিনি বর্ণনা করেছেন বিপ্লবের পতনের পর যে জুয়াচুরি ফাটকাবাজির মহোৎসব শুরু হয়, সে সময়কার ফরাসী বাণিজ্যের মধ্যে এবং তারই বৈশিষ্ট্যসূচক যে দোকানদারি মনোবৃত্তি তখন প্রচলিত, তার কথা। এর চেয়েও তাঁর ওস্তাদি নরনারী সম্পর্কের বুর্জোয়া রূপ এবং বুর্জোয়া সমাজে নারীর যে স্থান তার সমালোচনায়। তিনিই প্রথম ঘোষণা করেন যে, কোনো একটা সমাজের সাধারণ মুক্তির স্বাভাবিক মাপকাঠি হল সে সমাজে নারী মুক্তির মান।

কিন্তু সমাজের ঐতিহাসিক ধারণার ক্ষেত্রেই ফুরিয়ে মহত্তম। সমাজের সমগ্র ধারাকে তিনি ভাগ করেছেন ক্রমবিকাশের চারটি পর্যায়ে — বন্যতা, বর্বরতা, পিতৃতন্ত্র, সভ্যতা। শেষেরটি হল আজকের তথাকথিত সভ্য বা বুর্জোয়া সমাজ অর্থাৎ ষোড়শ শতাব্দী থেকে যে সমাজের ব্যবস্থা শুরু হয়েছে। তিনি প্রমাণ করেন, 'বর্বরতার যুগে যে পাপের অনুষ্ঠান হত সরল ভাবে তাদের সবকটিকেই একটা জটিল দ্ব্যর্থক উভচারী শাঠ্যের অস্তিত্বে উন্নীত করা হয়েছে সভ্য যুগে'; সভ্যতার গতি একটা 'পাপ চক্রে'র মধ্য দিয়ে, বিরোধের মধ্য দিয়ে, যা সে ক্রমাগত সৃষ্টি করে চলেছে অথচ তার সমাধানে অক্ষম; সুতরাং যা তার অভিপ্রেত অথবা অভিপ্রেত বলে ভান করে ঠিক তার বিপরীতেই সে ক্রমাগত উপনীত হচ্ছে, ফলে দৃষ্টান্তস্বরূপ, 'সভ্যতার আমলে দারিদ্র্যের সৃষ্টি হচ্ছে অতি প্রাচুর্যের মধ্য থেকেই।'

দেখা যাচ্ছে, দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিকে ফুরিয়ে ঠিক তাঁর সমকালীন হেগেলের মতোই

নিপুণভাবে প্রয়োগ করেছেন। একই দ্বান্দ্বিকতার ব্যবহার করে তিনি সীমাহীন মানবিক পরিপূর্ণতার বিরুদ্ধে তর্ক তুলেছেন, বলেছেন, প্রত্যেকটা ঐতিহাসিক পর্যায়েরই যেমন উত্থান তেমনি অবতরণের যুগ বর্তমান, এবং এই সত্যকে প্রয়োগ করেছেন সমগ্র মানবজাতির ভবিষ্যতের ক্ষেত্রে। পৃথিবীর শেষ পরিণাম ধ্বংস, এই ধারণাটি ক্যাণ্ট যেমন আমদানি করেন প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে, ফুরিয়েও তেমনি ইতিহাস বিজ্ঞানে চালু করেন মনুষ্য জাতির শেষ ধ্বংসের ধারণা।

ফ্রান্সের মাটির ওপর দিয়ে যখন বিপ্লবের ঝড় বয়ে গিয়েছিল তখন ইংলণ্ডে চলছিল একটা শান্ততর বিপ্লব যদিও তাই বলে সেটা কম প্রচণ্ড নয়। বাষ্প এবং নতুন নতুন যন্ত্র-তৈরির সরঞ্জামে কারখানা (manufacture) পরিবর্তিত হচ্ছিল আধুনিক শিল্পে এবং এই ভাবে বিপ্লব ঘটাচ্ছিল বুর্জোয়া সমাজের সমগ্র ভিত্তিমূলেই। কারখানা-যুগের বিকাশের মন্থর গতি বদলে গেল উৎপাদনের একটা ঝটিকাবর্তের যুগরূপে। নিয়ত বর্ধমান ক্ষিপ্রতায় চলল বৃহৎ পুঁজিপতি ও নির্বৃত্ত প্রলেতারিয়েতে সমাজের ভাঙন। তাদের মাঝখানে, আগেকার স্থায়ী মধ্য শ্রেণীর বদলে কারুশিল্পী ও ক্ষুদে দোকানদারদের একটা অস্থায়ী জনসংঘ, জনসংখ্যার সবচেয়ে অস্থির একটা অংশ, কষ্টে অস্তিত্ব বজায় রেখে চলল।

উৎপাদনের নয়া পদ্ধতি তখন সবে তার উত্থান যুগের শুরুতে; তখনো পর্যন্ত সেটা উৎপাদনের স্বাভাবিক নিয়মিত একটা পদ্ধতিই বটে, তদানীন্তন অবস্থায় সম্ভবপর একমাত্র পদ্ধতি। তাহলেও, তখনই তা থেকে বিপুল সামাজিক অবিচারের সৃষ্টি হয়ে চলেছে — বড়ো বড়ো শহরের সবচেয়ে নিকৃষ্ট সব মহল্লায় গৃহহীন জনতার ভিড়, চিরাচরিত সবকিছু নৈতিক বাঁধন, পিতৃতান্ত্রিক বাধ্যতা, পারিবারিক সম্পর্কের শৈথিল্য; একটা ভয়ংকর মাত্রার অতি মেহনত, বিশেষ করে নারী ও শিশুদের বেলায়; গ্রাম থেকে শহর, কৃষি থেকে আধুনিক শিল্প, জীবন ধারণের স্থির অবস্থা থেকে দিন দিন পরিবর্তমান একটা অস্থির অবস্থা — একেবারে এই নতুন পরিস্থিতির মধ্যে সহসা নিক্ষিপ্ত হয়ে শ্রমিক শ্রেণীর ব্যাপক নীতিভ্রংশ।

এই সন্ধিক্ষণে এগিয়ে এলেন একজন সংস্কারক, ২৯ বছর বয়সের এক কারখানা-মালিক, প্রায় অনির্বচনীয় শিশুসুলভ একটা সারল্য তাঁর চরিত্রে, অথচ সেই সঙ্গেই যে মুষ্টিমেয়রা জন-নায়ক হয়েই জন্মায় তাদের একজন। রবার্ট ওয়েন বস্তুবাদী দার্শনিকদের শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন, অর্থাৎ, মানুষের চরিত্র হল একদিকে বংশগতি এবং অন্যদিকে মানুষের জীবন-কালের, বিশেষ করে তার বিকাশ-কালের পরিবেশের ফল। তাঁর শ্রেণীর অধিকাংশ লোকেই শিল্প বিপ্লবের মধ্যে দেখেছিল কেবল গোলমাল বিশৃঙ্খলা, আর দাঁও মেরে দ্রুত প্রভূত টাকা করার সুবিধা। রবার্ট ওয়েন দেখলেন তাঁর প্রিয় তত্ত্বকে কাজে লাগিয়ে বিশৃঙ্খলার মধ্যে থেকে শৃঙ্খলা সৃষ্টির সুযোগ। ম্যাঞ্চেস্টারের একটা

কারখানায় পাঁচ শতাধিক লোকের সুপারিনটেন্ডেন্ট হিসাবে এটা তিনি আগেই সাফল্যের সঙ্গে পরীক্ষা করে দেখেছিলেন। ১৮০০ থেকে ১৮২৯ সাল পর্যন্ত তিনি স্কটল্যান্ডের নিউ ল্যানার্কে পরিচালক অংশীদার হিসাবে একটি বৃহৎ সুতাকলের কাজ চালান সেই একই পদ্ধতিতে, কিন্তু অধিকতর স্বাধীনতা নিয়ে এবং এতটা সাফল্যের সঙ্গে যে ইউরোপে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। প্রথমে যারা ছিল অতি হরেক রকমের একটা দঙ্গল এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অতি নীতিভ্রষ্ট সব লোক, এবং ধীরে ধীরে যাদের সংখ্যা বেড়ে ওঠে ২,৫০০-এ, এমন একটা জনতাকে তিনি রূপান্তরিত করেন এক আদর্শ উপনিবেশে, যেখানে মাতলামি, পুলিস ম্যাজিস্ট্রেট, মোকদ্দমা, দীন আইন (poor laws), ভিক্ষাদান প্রভৃতি ছিল অজানা। এবং তা করেন মাত্র লোকগুলোর জন্য একটা মানুষের যোগ্য পরিস্থিতি রচনা করে এবং বিশেষ করে, উঠতি ছেলেমেয়েদের সযত্নে লালন করে। কিন্ডারগার্টেনের তিনিই প্রবর্তক, নিউ ল্যানার্কে তা তিনি চালু করেন। দু-বছর বয়স থেকে ছেলেরা আসত কিন্ডারগার্টেনে, সেখানে তারা এতই আনন্দে থাকত যে, বাড়ি ফিরিয়ে নেওয়া দায় হত। ওয়েনের প্রতিযোগীরা যে ক্ষেত্রে মজুর খাটাত দিন তের-চোদ্দ ঘণ্টা করে, সে ক্ষেত্রে নিউ ল্যানার্কে কাজের দিন ছিল মাত্র সাড়ে দশ ঘণ্টা। তুলার একটা সংকটে যখন চার মাসের জন্য কাজ বন্ধ থাকে, তখনো তাঁর মজুরেরা পুরো মজুরি পেয়ে এসেছে। এবং এ সব সত্ত্বেও কারবারের মূল্য দ্বিগুণ বাড়ে, শেষ পর্যন্ত তা মোটা মুনাফা জুগিয়েছে মালিকদের।

তা সত্ত্বেও ওয়েনের তৃপ্তি ছিল না। তাঁর মজুরদের জন্য তিনি জীবন ধারণের যে ব্যবস্থা করে দিয়েছেন সেটা তাঁর চোখে তখনো মানুষের যোগ্য নয়। 'লোকগুলো আমার করুণানির্ভর ক্রীতদাস।' অপেক্ষাকৃত অনুকূল যে পরিস্থিতিতে তাদের তিনি বসিয়েছেন তাতে চরিত্রের এবং বুদ্ধিবৃত্তির সর্বাঙ্গীন ও সঙ্গত বিকাশ তখনো হচ্ছিল না, তাদের যোগ্যতার অবাধ ব্যবহার হচ্ছিল তো আরো কম। 'অথচ এই আড়াই হাজার অধিবাসীর মেহনতী অংশটা সমাজের জন্য যে পরিমাণ বাস্তব সম্পদ সৃষ্টি করছে তা করতে প্রায় অর্ধশতক আগে দরকার হত ছয় লক্ষ অধিবাসীর মেহনতী অংশের। নিজেকে প্রশ্ন করলাম, ছয় লক্ষ লোক যে সম্পদ ভোগ করত, সে থেকে এই আড়াই হাজার লোক যা ভোগ করছে তা বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকা উচিত সেটা গেল কোথায়?'*

জবাবটা পরিষ্কার। তা গেছে তিন লক্ষ পাউন্ডের ছাঁকা মুনাফা ছাড়াও কারখানার স্বত্বাধিকারীদের লগ্নী মূলধনের ওপর ৫% পরিশোধ করতে। আর নিউ ল্যানার্কের

* 'মনে ও আচরণে বিপ্লব' শীর্ষক একটি স্মারকলিপি থেকে (২১ পৃষ্ঠা), এটি রচিত হয় 'ইউরোপের সমস্ত রেড রিপাবলিকান, কমিউনিস্ট ও সমাজতন্ত্রীদের' উদ্দেশ্যে এবং ১৮৪৮ সালের ফ্রান্সের অস্থায়ী সরকার এবং 'মহারাণী ভিক্টোরিয়া ও তাঁর দায়িত্বশীল উপদেষ্টাদের' নিকট প্রেরিত হয়। (এঙ্গেলসের টীকা।)

পক্ষে যেটা খাটে, তা আরো বেশি খাটে ইংলণ্ডের সমস্ত ফ্যাক্টরি সম্পর্কেই। 'অযথার্থরূপে প্রযুক্ত হলেও যন্ত্র কর্তৃক এই নতুন সম্পদ যদি না সৃষ্টি হত, তাহলে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে এবং সমাজের অভিজাত প্রথাকে সমর্থনের জন্য ইউরোপীয় যুদ্ধগুলি চালান যেত না। অথচ এই নতুন শক্তি হল শ্রমিক শ্রেণীরই সৃষ্টি।'* এ নতুন শক্তির ফল ভোগেব অধিকার সুতরাং তাদেরই। নবসৃষ্ট অতিকায় উৎপাদন-শক্তি এযাবৎ যা ব্যক্তিবিশেষকে ধনী করা ও জনগণকে গোলাম করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে তা থেকে ওয়েন পেলেন সমাজ পুনর্নির্মাণের ভিত্তি; সকলের সাধারণ সম্পত্তি হিসাবে এগুলির নির্বন্ধ হল সকলের সাধারণ মঙ্গলের জন্য চালিত হওয়া।

বলা যেতে পারে ব্যবসায়িক হিসাবের পরিণতিস্বরূপ এই বিশুদ্ধ ব্যবহারিক বনিয়াদের ওপরেই ওয়েনের কমিউনিজমের ভিত্তি। আগাগোড়া তাঁর এই ব্যবহারিক চরিত্র বজায় থেকেছে। এই ভাবে, ১৮২৩ সালে ওয়েন কমিউনিস্ট উপনিবেশ স্থাপন করে আয়র্ল্যাণ্ডের দুর্দশা ত্রাণের প্রস্তাব তোলেন এবং তা প্রতিষ্ঠার খরচা, বাৎসরিক ব্যয় ও সম্ভাব্য আয়ের পুরো হিসাব তৈরি করে দেন। ভবিষ্যতের জন্য স্থির নির্দিষ্ট তাঁর ছকে খুঁটিনাটি সমস্যার সমাধান করা হয়েছে এমন ব্যবহারিক জ্ঞানের সঙ্গে যে — ভিতের নকসা, সামনে থেকে দেখা, পাশ থেকে দেখা, উপর থেকে দেখা, সব সমেত — সমাজ সংস্কারের ওয়েন পদ্ধতি একবার গ্রহণ করলে তার প্রত্যক্ষ খুঁটিনাটি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আপত্তি করার প্রায় জো নেই।

কমিউনিজমের অভিমুখে পদক্ষেপ করায় জীবনের মোড় ফিরে গেল ওয়েনের। যতদিন তিনি মাত্র মানবহিতৈষী, ততদিন কেবল ধনসম্পদ, সাধুবাদ, সম্মান ও গৌরবের পুরস্কার মিলেছে তাঁর। তিনি ছিলেন ইউরোপের সর্বাধিক জনপ্রিয় ব্যক্তি। শুধু স্বশ্রেণীর লোকেরাই নয়, রাষ্ট্রনেতারা, এমনকি প্রিন্সরাও তাঁর কথা শুনত সপ্রশংসায়। কিন্তু যখন তিনি তাঁর কমিউনিস্ট তত্ত্ব নিয়ে এগিয়ে এলেন তখন সে তো আলাদা কথা। ওয়েনের মনে হয়েছিল সমাজ সংস্কারের পথ রোধ করে আছে তিনটি বৃহৎ প্রতিবন্ধক: ব্যক্তিগত সম্পত্তি, ধর্ম ও বর্তমানের বিবাহ প্রথা। জানতেন, এদের আক্রমণ করলে কী তাঁর ভাগ্যে আছে — অবৈধীকরণ, সরকারী সমাজ থেকে বহিষ্কার, সমস্ত সামাজিক প্রতিষ্ঠার অবসান। কিন্তু ফলাফলের তোয়াক্কা না রেখে সে আক্রমণ করতে কিছুতেই তিনি পিছপা হলেন না; এবং যা ভেবেছিলেন তাই ঘটল। সরকারী সমাজ থেকে নির্বাসন, সংবাদপত্রে তাঁর বিরুদ্ধে নীরবতার চক্রান্ত। আমেরিকায় তাঁর অসফল কমিউনিস্ট পরীক্ষায় নিজের সমস্ত সম্পদ ঢেলেছিলেন। সে সব খুইয়ে তিনি সরাসরি

* ঐ, পৃঃ ২২। (এঙ্গেলসের টীকা।)

ফিরলেন শ্রমিক শ্রেণীর দিকে, তাদের মধ্যেই কাজ করে যান তিরিশ বছর। ইংলন্ডের শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থে প্রত্যেকটা সামাজিক আন্দোলন, প্রত্যেকটি সত্যকার অগ্রগতির সঙ্গে রবার্ট ওয়েনের নাম জড়িত। পাঁচ বছর সংগ্রামের পর, ১৮১৯ সালে তিনি ফ্যাক্টরিতে নারী ও শিশুদের কাজের ঘণ্টা সীমাবদ্ধ করার আইন জোর করে পাশ করিয়ে নেন। ইংলন্ডের সমস্ত ট্রেড ইউনিয়ন যখন একটা বৃহৎ একক সমিতিতে ঐক্যবদ্ধ হয় তারই প্রথম কংগ্রেসে তিনি সভাপতিত্ব করেন। সমাজের পরিপূর্ণ কমিউনিস্ট সংগঠনের আগে উৎক্রমণ ব্যবস্থা হিসাবে তিনি একদিকে প্রবর্তন করেন খুচরা ব্যবসা ও উৎপাদনের জন্য সমবায় সমিতি। সেদিন থেকে অন্তত এই ব্যবহারিক প্রমাণ এগুলি দিয়ে এসেছে যে, সমাজের দিক থেকে বণিক ও কলওয়ালারা নিতান্ত অনাবশ্যক। অন্যদিকে তিনি প্রবর্তন করেন মেহনত-নোট মারফত মেহনতের ফল বিনিময়ের জন্য মেহনতী বাজার; এই মেহনত-নোটের একক ধরা হয় এক ঘণ্টার কাজ; প্রতিষ্ঠানগুলি নিষ্ফল হতে বাধ্য ছিল, কিন্তু অনেক পরবর্তী কালের প্রুধোঁর বিনিময় ব্যাঙ্কের প্রকল্পটা আগে থেকেই পুরোপুরি আচরিত হয়েছে এখানেই — শুধু এই তফাৎ যে একেই সমাজের সর্ব অকল্যাণের মহৌষধ বলে জাহির না করে বলা হয়েছে সমাজের অধিকতর একটা আমূল বিপ্লবের দিকে তা এক প্রথম পদক্ষেপ মাত্র।

ইউটোপীয় চিন্তাধারা ঊনিশ শতকের সমাজতন্ত্রী ভাবনাকে দীর্ঘকাল প্রভাবিত করে এসেছে এবং এখনো কিছু কিছু ভাবনাকে করছে। এই কিছুদিন আগেও ফরাসী ও ইংরেজ সমাজতন্ত্রীরা সকলেই তার প্রতি অর্ঘ্য নিবেদন করেছে। ভাইৎলিং-এর কমিউনিজম সমেত আগেকার জার্মান কমিউনিজমও ওই একই পন্থার পথিক। এদের সকলের কাছেই সমাজতন্ত্র হল পরম সত্য, যুক্তি ও ন্যায়ের প্রকাশ; আবিষ্কৃত হওয়া মাত্র তার শক্তিতেই তা বিশ্বজয় করবে। এবং পরম সত্য যেহেতু দেশ কাল ও মানুষের ঐতিহাসিক বিকাশ নিরপেক্ষ, তাই কখন কোথায় সেটা আবিষ্কৃত হবে সেটা দৈবের ঘটনা। তা সত্ত্বেও এক একটা গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতার কাছে পরম সত্য, যুক্তি ও ন্যায় এক একরকম। এবং প্রত্যেকের এই বিশেষ প্রকারের পরম সত্য, যুক্তি ও ন্যায় যেহেতু তার স্বীয় বোধ, জীবন ধারণের অবস্থা, জ্ঞানের বহর ও বুদ্ধিমার্গীয় অনুশীলন দ্বারা নির্ধারিত সেই হেতু পরম সত্যগুলির সংঘাতের শুধু এইটে ছাড়া অন্য পরিণাম অসম্ভব যে, সেগুলি হবে একান্তরূপে পরস্পর পৃথক। এ থেকে শুধু এক ধরনের পাঁচমিশালী গড়পড়তা সমাজতন্ত্র ছাড়া আর কিছুই বেরবে না এবং বস্তুতপক্ষে তাই আজও পর্যন্ত ফ্রান্স ও ইংলন্ডের অধিকাংশ সমাজতন্ত্রী-শ্রমিকদের মন আচ্ছন্ন করে আছে। অতএব সে হচ্ছে অতি বহুবিধ মতান্তরের এক জগাখিচুড়ি অনুমোদন, বিভিন্ন গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতাদের এমন সব সমালোচনী রচনা, অর্থনৈতিক তত্ত্ব ও ভবিষ্যৎ সমাজ চিত্রের জগাখিচুড়ি, যার বিরোধিতা হবে সবচেয়ে কম; বিতর্কের স্রোতে বিভিন্ন উপাদানের

সুনির্দিষ্ট তীক্ষ্ম ধারগুলো যতই নদীর গোল গোল নুড়ির মতো মসৃণ হয়ে উঠবে, সে জগাখিচুড়িও তৈরি হয়ে উঠবে ততই সহজে।

সমাজতন্ত্রকে বিজ্ঞানে পরিণত করতে হলে আগে তাকে স্থাপন করা দরকার বাস্তব ভিত্তির ওপর।

২

অষ্টাদশ শতকের ফরাসী দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে এবং তার পরে দেখা দেয় নতুন জার্মান দর্শন, যার পরিণতি হেগেলে। এ দর্শনের সবচেয়ে বড়ো গুণ হল যুক্তির উচ্চতম ধরন হিসাবে দ্বান্দ্বিকতার পুনর্প্রবর্তন। প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকেরা সকলেই ছিলেন স্বভাব-দ্বান্দ্বিক এবং এদের মধ্যেকার সবচেয়ে বিশ্বকোষিক প্রতিভা আরিস্টটল দ্বান্দ্বিক চিন্তার সবচেয়ে মৌলিক রূপগুলির বিশ্লেষণ আগেই করে গেছেন। অন্যপক্ষে, নবতর দর্শনের মধ্যে যদিও দ্বান্দ্বিকতার চমৎকার প্রবক্তারাও ছিলেন (যথা, দেকার্ত, স্পিনোজা) তবু বিশেষ করে ইংরেজদের প্রভাবে তা ক্রমেই তথাকথিত আধিবিদ্যক (মেটাফিজিক্যাল) যুক্তিপ্রকরণে স্থিতি লাভ করে, — অষ্টাদশ শতকের ফরাসীরাও তাদ্বারা প্রায় পুরোপুরি প্রভাবিত হয়, অন্তত পক্ষে তাদের যে রচনা বিশেষ করে দার্শনিক সেগুলির ক্ষেত্রে। সংকীর্ণ অর্থে যা দর্শন তার বাইরে ফরাসীরা কিন্তু দ্বান্দ্বিকতার সেরা কীর্তি রচনা করেছেন। দিদেরোর *Le Neveu de Rameau* ('রামোর ভাইপো') এবং রুসোর *Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes* ('মানুষের মধ্যে অসাম্যের উদ্ভব') স্মরণ করলেই যথেষ্ট। এ দুই চিন্তাধারার মূল বৈশিষ্ট্য এখানে সংক্ষেপে বর্ণনা করা যাক।

সাধারণ নিসর্গ বা মানুষের ইতিহাস কিংবা আমাদের নিজস্ব বুদ্ধিবৃত্তিক ক্রিয়াকলাপ যখন আমরা লক্ষ্য করি ও তাই নিয়ে ভাবি তখন সর্বপ্রথমে চোখে পড়ে একটা সম্পর্কপাত ও প্রতিক্রিয়ার, বিন্যাস (permutations) ও সমবায়ের (combinations) নিঃশেষ জড়াজড়ি, যেখানে কিছুই যা ছিল, যেখানে ছিল এবং যেমন ছিল তা থাকে না, সবকিছুই সরে যায়, বদলায়, উদ্ভূত হয় ও লোপ পায়। সুতরাং প্রথমে আমরা ছবিটা দেখি সমগ্রভাবে, তার আলাদা আলাদা অংশগুলো তখনো মোটের ওপর থাকে পশ্চাৎপটে; এগুচ্ছে, সমাহৃত হচ্ছে, সম্পর্কিত হচ্ছে যে বস্তুগুলো তাদের বদলে লক্ষ্য পড়ে বরং গতির ওপর, রূপান্তরের ওপর, সম্পর্কপাতের ওপর। বিশ্বের এই আদিম সরল কিন্তু মূলত সঠিক যে বোধ সেটা প্রাচীন গ্রীক দর্শনের বোধ এবং তা প্রথম পরিষ্কার করে নিরূপণ করেন হেরাক্লিটস: সবকিছুই আছে তবু নেই, কারণ সবকিছুই প্রবহমান, নিয়ত পরিবর্তমান, নিয়তই তার উদ্ভব ও বিলয়।

কিন্তু ঘটনাবলীর সামগ্রিক ছবির সাধারণ চরিত্র সঠিক প্রকাশ করলেও যে সব

খ‍ুঁটিনাটি অংশ দিয়ে এ ছবি তৈরি তার ব্যাখ্যার দিক থেকে এ বোধ অপ্রতুল এবং যতক্ষণ এই সব খ‍ুঁটিনাটি আমরা না ব‍ুঝছি ততক্ষণ গোটা ছবিটার পরিষ্কার ধারণা হতে পারে না। এই খ‍ুঁটিনাটিগ‍ুলো ব‍ুঝতে হলে প্রাকৃতিক বা ঐতিহাসিক সম্পর্ক থেকে ছিন্ন করে এনে তাদের প্রত্যেককে আলাদা আলাদা ভাবে বিচার করতে হবে, বিচার করতে হবে তার প্রকৃতি, বিশেষ কারণ, ফলাফল ইত্যাদি। ম‍ূলত এ কাজ প্রকৃতিবিজ্ঞানের ও ঐতিহাসিক গবেষণার; এগ‍ুলি বিজ্ঞানের এমন শাখা যা পৌরাণিক গ্রীকেরা স‍ুয‍ুক্তিতেই একটা গৌণ জায়গায় ঠেলে রেখেছিল, কারণ এ বিজ্ঞান যা নিয়ে কাজ করবে তার মালমশলা সংগ্রহ করতে হবে আগে। কিছ‍ু পরিমাণ প্রাকৃতিক ও ঐতিহাসিক মালমশলা সংগ্রহ করার আগে কোনো বিচারম‍ূলক বিশ্লেষণ, তুলনা, এবং শ্রেণী, ধারা ও প্রজাতিরূপে তার বিন্যাস হতে পারে না। যথাযথ প্রকৃতিবিজ্ঞানের (exact natural sciences) ভিত্তি তাই প্রথম রচিত হয় আলেকজেণ্ড্রীয় য‍ুগের* গ্রীকদের দ্বারা এবং পরে বিকশিত হয় মধ্য য‍ুগে আরবদের দ্বারা। সত্যকারের প্রকৃতিবিজ্ঞান শ‍ুর‍ু হয় পঞ্চদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে, এবং তদবধি ক্রমবর্ধমান দ্র‍ুততায় তা নিয়ত এগিয়ে গেছে। আলাদা আলাদা অংশে প্রকৃতির বিশ্লেষণ, বিভিন্ন বর্গে প্রাকৃতিক বিভিন্ন প্রক্রিয়া ও বস্তুর সন্নিবেশ, বহ‍ুবিধ র‍ূপের জৈব বস্তুর আভ্যন্তরীণ শারীরস্থান অধ্যয়ন — গত চারশ' বছরে আমাদের প্রকৃতিবিজ্ঞানের যে অতিকায় পদক্ষেপ হয়েছে তার ম‍ূল সর্ত ছিল এইগ‍ুলি। কিন্তু কাজের এ ধরনের ফলে প্রাকৃতিক বস্তু ও প্রক্রিয়াকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখা, বিপ‍ুল সমগ্রটা থেকে তাকে সম্পর্কচ্যুত করে দেখার একটা অভ্যাস আমরা ঐতিহ্য হিসাবে পেয়েছি; তাদের দেখা গতির মধ্যে নয় স্থিতির মধ্যে, ম‍ূলত পরিবর্তমান বস্তু হিসাবে নয়, নিয়ত স্থির বস্তু হিসাবে, জীবনের মধ্যে নয়, মরণের মধ্যে। বেকন ও লক কর্তৃক এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি যখন প্রকৃতিবিজ্ঞান থেকে দর্শনে আনীত হল, তখন তার মধ্যে দেখা দিল গত শতকের বৈশিষ্ট্যস‍ূচক সংকীর্ণ অধিবিদ্যক ধরনের চিন্তা।

যিনি অধিবিদ্যক (metaphysician) তাঁর কাছে বস্তু ও তার মানসিক প্রতিচ্ছবি, অর্থাৎ ভাবনাদি পরস্পর বিচ্ছিন্ন, তাদের বিচার করতে হবে একে একে, পরস্পর থেকে আলাদাভাবে, অন‍ুসন্ধান বস্তু হিসাবে এগ‍ুলি স্থির অনড় ও চিরকালের জন্য নির্দিষ্ট। অধিবিদ্যকের চিন্তা একান্তর‍ূপে দ‍ুরপনেয় প্রতিতত্ত্বের (antitheses) ধারায়, 'তাহার

* বিজ্ঞান বিকাশের আলেকজেণ্ড্রীয় য‍ুগ হল খ‍ৃঃ প‍ূঃ তৃতীয় শতক থেকে সপ্তম খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। মিশরের আলেকজেণ্ড্রিয়া শহর থেকে কথাটার উৎপত্তি। সেকালে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক আদানপ্রদানের একটি অতি গ‍ুর‍ুত্বপ‍ূর্ণ কেন্দ্র ছিল আলেকজেণ্ড্রিয়া। আলেকজেণ্ড্রীয় য‍ুগে গণিত (ইউক্লিড, আর্কিমীডীস), ভূগোল, জ্যোতির্বিদ্যা, শারীরস্থান, শারীরব‍ৃত্ত ইত্যাদির প্রভূত বিকাশ হয়। — সম্পাঃ

বাণী, "ইতি ইতি বা নেতি নেতি", কারণ ইহার অতিরিক্ত যাহা তাহা আসিতেছে শয়তানের নিকট হইতে।' তাঁর কাছে একটা বস্তু হয় আছে, নয় নেই। একটা বস্তু একই কালে সেই বস্তু ও অন্য বস্তু হতে পারে না। ইতির সঙ্গে নেতির কোনো সম্পর্ক নেই; কার্য ও কারণ অনড় প্রতিতত্ত্ব-যুক্ত।

প্রথম দৃষ্টিতে এ ধরনের চিন্তা আমাদের কাছে ভারি ভাস্বর লাগে, কারণ এ হল তথাকথিত পাকা সাধারণ বুদ্ধির কথা। কিন্তু নিজের চার দেয়ালের মধ্যেকার সংসারে পাকা সাধারণ বুদ্ধিটাকে বেশ ভদ্রস্থ দেখালেও যেই সে গবেষণার ব্যাপক দুনিয়ায় পা বাড়ায় অমনি অতি আশ্চর্য সব অভিজ্ঞতা হতে থাকে তার। অধিবিদ্যক ধরনের চিন্তা যদিও কতকগুলি ক্ষেত্রে সঙ্গত ও প্রয়োজনীয়, — নির্দিষ্ট বিচার্য বস্তুটির প্রকৃতি অনুসারে সে ক্ষেত্রের পরিমাণ বদলায়, — কিন্তু তাহলেও, কালক্রমেই এ চিন্তাধারা একটা সীমায় পেঁছিয়, তার বাইরে গেলেই তা একপেশে সীমাবদ্ধ বিমূর্ত হয়ে পড়ে, সমাধানহীন বিরোধের মধ্যে পথ হারায়। আলাদা আলাদা বস্তুর বিচারে তাদের মধ্যেকার সম্পর্কের কথা সে ভুলে যায়, বিদ্যমানতার বিচারে ভুলে যায় সে বিদ্যমানতার শুরু ও শেষের কথা; স্থিতির বিচারে ভোলে গতির কথা; গাছ দেখে, দেখে না অরণ্য।

দৈনন্দিন কাজের ক্ষেত্রে আমরা যেমন জানি ও বলতে পারি, একটা প্রাণী জীবিত কি মৃত। কিন্তু খুঁটিয়ে বিচারের পর দেখা যাবে যে, বহু ক্ষেত্রেই প্রশ্নটা অতি জটিল, আইনজ্ঞরা তা ভালোই জানেন। মাতৃগর্ভে কোন যুক্তিসিদ্ধ সীমার পর শিশুকে হত্যা করলে তাকে খুন বলা যাবে, তা আবিষ্কার করতে তাঁরা বৃথাই মাথা ঠুকেছেন। মৃত্যুর একটা চূড়ান্ত মুহূর্ত নির্ধারণ করাও সমান অসম্ভব কেননা, শারীরবৃত্তে প্রমাণিত হয়েছে যে, মৃত্যু একটা তাৎক্ষণিক, মুহূর্তের ঘটনা নয়, অতি দীর্ঘায়ত একটা প্রক্রিয়া।

একই ভাবে, প্রতিটি জৈব-সত্তাও প্রতিমুহূর্তেই সেই একই সত্তা এবং সেই সত্তা নয়ও; প্রতিমুহূর্তে তা বাইরে থেকে পদার্থ আত্মস্থ করছে এবং অন্য পদার্থ পরিত্যাগ করছে; প্রতি মুহূর্তে তার দেহের কোনো কোষের মৃত্যু হচ্ছে, কোনো কোষের জন্ম হচ্ছে; দীর্ঘ বা স্বল্প কালের মধ্যে তার দেহের পদার্থ সম্পূর্ণ নবায়িত হয়ে উঠছে, তার স্থান নিচ্ছে অন্য পরমাণু, ফলে প্রত্যেকটা জৈব সত্তাই সর্বদাই সেই বটে তবু সে নয়।

অপিচ, গভীরতর অনুসন্ধানে দেখা যায় যে প্রতিতত্ত্বের (antithesis) দুই মেরু অর্থাৎ সদর্থক ও নঞর্থক প্রান্তদুটি যে পরিমাণ পরস্পরবিরোধী সেই পরিমাণেই অবিচ্ছেদ্য, এবং যতকিছু বিরোধিতা সত্ত্বেও তারা পরস্পর অনুপ্রবিষ্ট। একই ভাবেই দেখা যায়, কার্য ও কারণ সম্পর্কে যে বোধ সেটা শুধু বিচ্ছিন্ন এক একটা ঘটনার ক্ষেত্রেই খাটে, কিন্তু এই আলাদা আলাদা ঘটনাগুলি যেই সামগ্রিক বিশ্বের সঙ্গে সাধারণ সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচিত হয় তখনই সে কার্যকারণ পরস্পর প্রতিধাবিত হয়

এবং কার্যকারণ যেখানে নিয়ত স্থান পরিবর্তন করে চলেছে, সেই বিশ্বজনীন ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার কথা যখন ভাবি তখন ও কার্যকারণ বোধ একেবারে গুলিয়ে যায়, ফলে একটা ক্ষেত্রে ও একটা মুহূর্তে যা কার্য অন্য ক্ষেত্রে ও অন্য মুহূর্তে সেটাই হয়ে দাঁড়ায় কারণ, তেমনি আবার কারণও হয়ে দাঁড়ায় কার্য।

অধিবিদ্যক যুক্তির কাঠামোর মধ্যে এই সব প্রক্রিয়া ও ভাবনা-ধারার কোনোটাই আঁটে না। পক্ষান্তরে, দ্বান্দ্বিকতায় মূল সম্পর্ক, গ্রন্থিপরম্পরা, গতি, উদ্ভব ও অবসানের মধ্যে বস্তু ও তার উপস্থাপন বা ভাবনা অনুধ্যেয়। উপরে যে সব প্রক্রিয়ার কথা বলা হল তা তার স্বীয় কর্মপদ্ধতিরই কতকগুলি সমর্থন।

দ্বান্দ্বিকতার প্রমাণ হল প্রকৃতি, এবং আধুনিক বিজ্ঞানের পক্ষ নিয়ে বলতেই হবে যে, দিন দিন বর্ধমান অতি মূল্যবান মালমশলা দিয়ে এ প্রমাণ সে দাখিল করে চলেছে এবং দেখিয়েছে যে, শেষ বিচারে, প্রকৃতির ক্রিয়া অধিবিদ্যামূলক নয়, দ্বন্দ্বমূলক; নিয়ত পৌনঃপুনিক একটা বৃত্তে চিরকালের জন্য একই ভাবে সে ঘোরে না, সত্যকার একটা ঐতিহাসিক বিবর্তনের মধ্যে দিয়েই তার যাত্রা। এ প্রসঙ্গে সর্বাগ্রে নাম করতে হয় ডারউইনের। প্রকৃতির অধিবিদ্যক বোধের বিরুদ্ধে তিনি গুরুতম আঘাত হানেন এইটে প্রমাণ করে যে, সমস্ত জৈব সত্তা, উদ্ভিদ, প্রাণী এবং স্বয়ং মানুষ কোটি কোটি বছরের এক বিবর্তন প্রক্রিয়ার ফল। কিন্তু দ্বান্দ্বিকভাবে চিন্তা করতে শিখেছেন এমন প্রকৃতিবিদের সংখ্যা খুবই কম; এবং তাত্ত্বিক প্রকৃতিবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অধুনা যে অশেষ বিভ্রান্তি বর্তমান, শিক্ষক ও শিক্ষার্থী, রচয়িতা ও পাঠক সকলের মধ্যেই যে সমান হতাশা দেখা যাচ্ছে, তার কারণ হল ভাবনার পূর্বাভ্যস্ত ধরনের সঙ্গে আবিষ্কৃত ফলাফলগুলির এই সংঘাত।

তাই বিশ্বের, তার বিবর্তনের, মানবজাতির বিকাশের এবং মনুষ্যমনে এ বিবর্তনের যে প্রতিফলন, তার সঠিক উপস্থাপন সম্ভব হতে পারে কেবল দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির মাধ্যমে, যাতে জীবন ও মৃত্যুর, অগ্রগামী ও পশ্চাদগামী পরিবর্তনের অসংখ্য ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার প্রতি অবিরাম লক্ষ্য রাখা হয়। নতুন জার্মান দর্শন এই প্রেরণাতেই এগিয়েছে। বিখ্যাত সেই প্রাথমিক অভিঘাত (impulse) একবার পাবার পর সৌরমন্ডলের অটলত্ব ও চিরন্তন স্থায়িত্বের নিউটনীয় ছককে ভেঙে দিয়ে ঘূর্ণ্যমান বাষ্পস্তূপ (nebulous mass) থেকে সূর্য ও গ্রহাদির সৃষ্টি, এই ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া দেখিয়ে ক্যান্ট শুরু করেন। তা থেকে তিনি সেই সঙ্গে সিদ্ধান্ত টানেন যে, সৌরমন্ডলের এই যদি উৎপত্তি হয় তাহলে তার ভবিষ্যৎ মৃত্যুও অনিবার্য। অর্ধ শতাব্দী পরে তাঁর তত্ত্ব গাণিতিকভাবে নিষ্পন্ন করেন লাপ্লাস, এবং তারও অর্ধ শতাব্দী পর বর্ণালী যন্ত্র (spectroscope) প্রমাণ করে যে, মহাশূন্যে ঘনীভবনের বিভিন্ন পর্যায়ে এই ধরনের ভাস্বর বাষ্পস্তূপ বর্তমান।

নতুন এই জার্মান দর্শন পরিণতি পেল হেগেলের তন্ত্রে। এ তন্ত্রে, — এবং এইটেই তার বড়ো গুণ — এই সর্বপ্রথম প্রাকৃতিক, ঐতিহাসিক, বুদ্ধিমার্গীয়, সমগ্র বিশ্বই উপস্থাপিত হল একটা প্রক্রিয়ারূপে অর্থাৎ, অবিরত গতি, পরিবর্তন, রূপান্তর ও বিকাশরূপে; এবং এই সমস্ত গতি ও বিকাশ যাতে একটা অখন্ড সমগ্র হয়ে উঠছে সেই অন্তর্নিহিত সম্পর্ক সন্ধানের চেষ্টা হল। কান্ডজ্ঞানহীন হিংসাকর্মের এক ঘূর্ণাবর্ত, পরিণত দার্শনিক বুদ্ধির কাছে যার প্রতিটি কর্মই সমান নিন্দার্হ এবং যতশীঘ্র ভোলা যায় ততই ভালো, এভাবে প্রতিভাত না হয়ে এ দৃষ্টিভঙ্গির কাছে মনুষ্য ইতিহাস প্রতিভাত হল মানুষেরই বিবর্তনের এক প্রক্রিয়ারূপে। বিচিত্র সব পন্থায় এ প্রক্রিয়ায় ক্রমপ্রগতি অনুসরণ করা ও বাহ্যত আকস্মিক সব ঘটনার মধ্যে অন্তর্প্রবাহিত নিয়মটিকে বার করার কাজ এবার বুদ্ধির।

যে সমস্যা উপস্থিত করা হল তার সমাধান যে হেগেলীয় তন্ত্র দেয়নি, সে এখানে অবান্তর। তার যুগান্তকারী কীর্তি হল এই যে সমস্যাটিকে তিনি উপস্থিত করেছেন। এ সমস্যা এমন যে, কোনো একক ব্যক্তির পক্ষে তার সমাধান দেওয়া অসম্ভব। সাঁ-সিমোঁর মতো হেগেলও যদিও তৎকালের এক অতি বিশ্ব-কোষিক মনীষা, তথাপি প্রথমত, তাঁর স্বীয় জ্ঞানের অনিবার্য সীমায় এবং তাঁর যুগের জ্ঞান ও বোধের সীমাবদ্ধ প্রসার ও গভীরতায় তিনি সীমিত। এই সীমাবদ্ধতার সঙ্গে তৃতীয় একটি সীমার কথাও যোগ করতে হবে। হেগেল ছিলেন ভাববাদী। তাঁর কাছে তাঁর মস্তিষ্কমধ্যস্থ ভাবনাগুলি সত্যকার বস্তু ও প্রক্রিয়ার ন্যূনাধিক বিমূর্ত চিত্র নয়, বরং উল্টো, বিশ্বেরও পূর্বে অনাদি কাল থেকে কোনো এক স্থানে বর্তমান এক 'ভাবের' (Idea) বাস্তবীভূত চিত্রই হল এই বস্তু ও তার বিকাশ। এ ধরনের চিন্তায় সবকিছুই একেবারে উল্টো করে দাঁড় করান হয় এবং বিশ্বের ভেতরকার বস্তুসমূহের আসল সম্পর্কটাকে আমূল বিকৃত করে দেওয়া হয়। আলাদা আলাদা বহু ঘটনাসমষ্টি সঠিকভাবে ও সপ্রতিভায় হেগেল হৃদয়ঙ্গম করলেও সদ্যবর্ণিত কারণে খুঁটিনাটিতে তাতে অনেক কিছুই রয়ে গেছে যা জোড়াতালি, কৃত্রিম, টেনেবুনে করা, অর্থাৎ ভুল। হেগেলীয় তন্ত্রটা একটা বিপুল গর্ভপাত, তবে এ জাতের গর্ভপাত এই শেষ। বস্তুতপক্ষে একটা অন্তর্নিহিত ও অনুপশম বিরোধিতায় তা পীড়িত। একদিকে তার মূল প্রতিজ্ঞা হল এই বোধ যে, মানবিক ইতিহাস হল একটা বিবর্তন প্রক্রিয়া, সুতরাং স্বভাবতই কোনো তথাকথিত পরম সত্য আবিষ্কারই তার বুদ্ধিমার্গীয় শেষ কথা হতে পারে না। অথচ অন্যদিকে এই পরম সত্যেরই মূলাধার বলে তার আত্মঘোষণা। প্রাকৃতিক ও ঐতিহাসিক জ্ঞানের এই প্রকরণ-ধারা যা সবকিছুকে আলিঙ্গন করছে ও চিরকালের মতো চূড়ান্ত হয়ে থাকছে, — এটা দ্বান্দ্বিক যুক্তির মূলনীতিরই বিরোধী। বহির্বিশ্বের সুশৃঙ্খল জ্ঞান যে যুগে যুগে বিপুলভাবে এগিয়ে যেতে পারে এ নীতি বস্তুতপক্ষে ঐ ধারণাটা থেকে মোটেই দূরীভূত নয় বরং অঙ্গীভূত।

জার্মান ভাববাদের এই মৌলিক স্বাবিরোধের বোধ থেকে স্বভাবতই প্রত্যাবর্তন ঘটল বস্তুবাদে কিন্তু, nota bene, নেহাৎ সেই অধিবিদ্যক, অষ্টাদশ শতকের একান্তরূপের যান্ত্রিক বস্তুবাদে নয়। সাবেকি বস্তুবাদের কাছে সমস্ত অতীত ইতিহাস ছিল অযৌক্তিকতা ও বলপ্রয়োগের এক কদাকার স্তূপ; আধুনিক বস্তুবাদ তাকে দেখে মানবসমাজের বিবর্তন প্রক্রিয়া রূপে এবং সে বিবর্তনের নিয়ম আবিষ্কারই তার লক্ষ্য। অষ্টাদশ শতকের ফরাসীদের কাছে, এমনকি হেগেলের কাছেও, সমগ্রভাবে প্রকৃতির যা বোধ সেটা এই যে, তা সংকীর্ণ চক্রে ঘূর্ণমান, চিরকালের মতো অপরিবর্তনীয়, গ্রহ তারা সব চিরন্তন — যা শিখিয়েছিলেন নিউটন, এবং তার জীব-প্রজাতির নড়চড় নেই — যা শিখিয়েছিলেন লিনিয়স। আধুনিক বস্তুবাদ ধারণ করে প্রকৃতিবিজ্ঞানের অধুনাতন আবিষ্কারগুলিকে, তাতে ধরা হয় যে প্রকৃতিরও একটা কালগত ইতিহাস আছে, গ্রহ তারাগুলিরও জন্মমৃত্যু হচ্ছে যেমন জন্মমৃত্যু হচ্ছে জৈব প্রজাতিগুলির, যারা অনুকূল পরিস্থিতিতে বাস নিয়েছে এই সব গ্রহ তারাতে। এবং সমগ্রভাবে প্রকৃতি যদি বা পৌনঃপুনিক চক্রেই আবর্তিত বলে এখনো পর্যন্ত ধরতে হয়, তাহলেও এ চক্রের আয়তন বেড়ে যাচ্ছে সীমাহীনরূপে। দুদিক থেকেই আধুনিক বস্তুবাদ মূলত দ্বন্দ্বমূলক; রাণীর মতো যা বিজ্ঞানের অবশিষ্ট প্রজাদের শাসনাধিকার দাবি করে আসছিল তেমন কোনো একটা দর্শনের প্রয়োজন তার আর নেই। বিশেষ বিশেষ প্রত্যেকটি বিজ্ঞানই যতই বস্তুর এবং আমাদের বস্তুবিষয়ক জ্ঞানের বিপুল সামগ্রিকতার মধ্যে নিজ নিজ অবস্থান পরিষ্কার করে নিতে বাধ্য ততই এ সামগ্রিকতার জন্য একটা বিশেষ বিজ্ঞান হয়ে দাঁড়ায় অবান্তর নতুবা অনাবশ্যক। পূর্বতন সমস্ত দর্শনের মধ্য থেকে যেটুকু টিকে থাকে তা হল চিন্তা ও তার নিয়মের বিজ্ঞান — যুক্তি প্রকরণ (formal logic) ও দ্বন্দ্বতত্ত্ব। বাকি সবকিছুই প্রকৃতি ও ইতিহাসের খাস বিজ্ঞানের মধ্যে লীন হয়ে যায়।

অবশ্য প্রকৃতি বিষয়ক বোধে বিপ্লব যদিও হওয়া সম্ভব তার পাল্টা গবেষণালব্ধ আসল মালমশলার অনুপাতে, তাহলেও বেশ আগেই এমন কতকগুলি ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটে যাতে ঐতিহাসিক বোধের ক্ষেত্রে একটা চূড়ান্ত পরিবর্তন আসে। ১৮৩১ সালে প্রথম শ্রমিক অভ্যুত্থান ঘটে লিয়োঁ-তে, ১৮৩৮—১৮৪২ সালের মধ্যে প্রথম জাতীয় শ্রমিক আন্দোলন, ইংরেজ চার্টিস্টদের আন্দোলন শীর্ষে আরোহণ করে। একদিকে আধুনিক শিল্প এবং অন্যদিকে বুর্জোয়ার নবার্জিত রাজনৈতিক প্রাধান্যের বিকাশের সমানুপাতে প্রলেতারিয়েত-বুর্জোয়া শ্রেণী-সংগ্রাম পুরোভাগে আসতে থাকে ইউরোপের অতি অগ্রসর দেশগুলির ইতিহাসে। পুঁজি ও মেহনতের সমস্বার্থ, অবাধ প্রতিযোগিতার ফলস্বরূপ সার্বজনীন সামঞ্জস্য ও সার্বজনীন সমৃদ্ধি — বুর্জোয়া অর্থনীতির এই সব শিক্ষাকে ক্রমেই সজোরে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে দিতে লাগল ঘটনা। এ সব ঘটনাকে আর উপেক্ষা করা চলে না, যেমন উপেক্ষা করা চলে না তাদের তাত্ত্বিক, যদিও অতি অপরিণত

প্রকাশ — ফরাসী ও ইংরেজ সমাজতন্ত্রকে। কিন্তু ইতিহাসের পুরনো ভাববাদী যে ধারণা তখনো অপসৃত হয়নি, তার মধ্যে অর্থনৈতিক স্বার্থের ভিত্তিতে শ্রেণী-সংগ্রামের কোনো জ্ঞান ছিল না, জ্ঞান ছিল না অর্থনৈতিক স্বার্থের, উৎপাদন তথা সর্ববিধ অর্থনৈতিক সম্পর্ক তার কাছে কেবল 'সভ্যতার ইতিহাসের' আনুষঙ্গিক গৌণ ঘটনা মাত্র।

নতুন তথ্যগুলির ফলে সমস্ত অতীত ইতিহাসের একটা নতুন বিচার আবশ্যিক হয়ে দাঁড়ায়। তখন দেখা গেল, আদিম পর্যায়গুলি বাদে **সমস্ত** অতীত ইতিহাসই হল শ্রেণী-সংগ্রামের ইতিহাস; সমাজের এই যুধ্যমান শ্রেণীগুলিও চিরকাল উৎপাদন ও বিনিময় পদ্ধতি অর্থাৎ তৎকালীন **অর্থনৈতিক** অবস্থার ফল; সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোটা থেকেই আসছে আসল বনিয়াদ, যা থেকে শুরু করে আমরা একটা নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক যুগের আইনী ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান তথা তার ধর্মীয়, দার্শনিক ও অন্যবিধ ভাবনার সমগ্র উপসৌধটার চূড়ান্ত ব্যাখ্যা বার করতে পারি। ইতিহাসকে হেগেল মুক্ত করেছিলেন অধিবিদ্যা থেকে, তাকে তিনি দ্বান্দ্বিক করে তোলেন; কিন্তু তাঁর ইতিহাস বোধ ছিল মূলত ভাববাদী। এবার কিন্তু ভাববাদ বিতাড়িত হল তার শেষ আশ্রয়, ইতিহাস দর্শন থেকে; এবার প্রবর্তিত হল ইতিহাসের একটা বস্তুবাদী ব্যাখ্যান; এযাবৎকাল যা হত সেভাবে মানুষের 'সত্তাকে' তার 'জ্ঞান' দিয়ে ব্যাখ্যা না করে 'জ্ঞানকে' তার 'সত্তা' দিয়ে ব্যাখ্যা করার একটা পদ্ধতি পাওয়া গেল।

সে সময় থেকে কোনো বিশেষ প্রবুদ্ধ মস্তিষ্কের আকস্মিক আবিষ্কার হয়ে সমাজতন্ত্র আর রইল না, তা হল প্রলেতারিয়েত ও বুর্জোয়া এই দুই ঐতিহাসিকভাবে বিকশিত শ্রেণীর ভেতরকার সংগ্রামের আবশ্যিক ফল। যথাসম্ভব নিখুঁত অটুট একটা সমাজব্যবস্থা বানানো আর নয়, তার কাজ হল সেই ঐতিহাসিক অর্থনৈতিক ঘটনা-পরম্পরা অনুধাবন করা যা থেকে এই শ্রেণীগুলো ও তাদের বৈরিতার অনিবার্য উদ্ভব এবং তৎসৃষ্ট অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যে সে সংঘাত দূরীকরণের উপায় বার করা। কিন্তু ইতিহাসের এই বস্তুবাদী ধারণার সঙ্গে আগের কালের সমাজতন্ত্রের ততটাই গরমিল যতটা গরমিল দ্বান্দ্বিকতা ও আধুনিক প্রকৃতিবিজ্ঞানের সঙ্গে ফরাসী বস্তুবাদীদের প্রকৃতিবিষয়ক বোধের। আগের কালের সমাজতন্ত্র অবশ্যই উৎপাদনের প্রচলিত পুঁজিবাদী পদ্ধতি ও তার ফলাফলের সমালোচনা করেছে। কিন্তু তার ব্যাখ্যা জানা ছিল না সুতরাং এর ওপর প্রাধান্য লাভ করা ছিল তার অসাধ্য। সম্ভব ছিল শুধু মন্দ বলে এগুলিকে বর্জন করা। পুঁজিবাদের আমলে যা অনিবার্য শ্রমিক শ্রেণীর সেই শোষণকে এই পূর্বতন সমাজতন্ত্র যতই সজোরে ধিক্কার দিতে থাকল ততই এ কথা পরিষ্কার করে বোঝাতে সে অক্ষম হয়ে উঠল, কীসে সেই শোষণ, কী ভাবে তার উদ্ভব। কিন্তু সে জন্য দরকার ছিল (১) পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতিকে তার ঐতিহাসিক সম্পর্ক এবং একটা বিশেষ ঐতিহাসিক যুগে তার অনিবার্যতার মধ্যে দেখানো এবং সেই হেতু তার অনিবার্য পতনের কথাও

উপস্থিত করা, এবং (২) তার মূল চরিত্র উদ্ঘাটন করা, তা তখনো সংগুপ্ত। এ কাজ নিষ্পন্ন হল **উদ্বৃত্ত মূল্যের** আবিষ্কারে। দেখানো হল যে, পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতি এবং তদধীনে শ্রমিক শোষণের ভিত্তি হল দাম-না-দেওয়া শ্রমের আত্মসাৎ; বাজার থেকে পণ্য হিসাবে পুঁজিপতি যদি শ্রমশক্তিকে পুরো দাম দিয়েই কেনে তাহলেও সে যে দাম দিচ্ছে তার চেয়ে অনেক বেশি মূল্য নিষ্কাশিত করে নেয়, এবং শেষ বিশ্লেষণে এই উদ্বৃত্ত মূল্য থেকেই সেই মূল্য সমষ্টির সৃষ্টি যা থেকে মালিক শ্রেণীগুলির হাতে ক্রমবর্ধমান পুঁজির স্তূপ জমা হচ্ছে। পুঁজিবাদী উৎপাদন এবং পুঁজির উৎপাদন উভয়েরই সৃষ্টি ব্যাখ্যা করা গেল।

ইতিহাসের বস্তুবাদী বোধ এবং উদ্বৃত্ত মূল্য দিয়ে পুঁজিবাদী উৎপাদনের রহস্য উদ্ঘাটন, এই দুই বিরাট আবিষ্কারের জন্য আমরা মার্কসের কাছে ঋণী। এই আবিষ্কারগুলির ফলে সমাজতন্ত্র হয়ে উঠল বিজ্ঞান। পরের কাজ হল তার সব কিছু খুঁটিনাটি ও সম্পর্কপাত বিস্তারিত করে তোলা।

৩

ইতিহাসের বস্তুবাদী বোধের শুরু এই প্রতিজ্ঞা থেকে যে মনুষ্যজীবনের ভরণ-পোষণের উপায়ের উৎপাদন এবং উৎপাদনের পর উৎপাদিত বস্তুর বিনিময় — এই হল সমস্ত সমাজ কাঠামোর ভিত্তি, এবং ইতিহাসে আবির্ভূত প্রতিটি সমাজের ধনবণ্টনের ধরন এবং শ্রেণী ও বর্গে সমাজের বিভাগ কী উৎপাদন হল, কী ভাবে উৎপাদিত হল এবং কী ভাবে উৎপন্নের বিনিময় হল, তার ওপর নির্ভরশীল। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সমস্ত সামাজিক পরিবর্তন ও রাজনৈতিক বিপ্লবের শেষ কারণের সন্ধান করতে হবে মানুষের মস্তিষ্কে নয়, চিরন্তন সত্য ও ন্যায় নির্ণয়ে কোনো ব্যক্তির উন্নততর অন্তর্দৃষ্টির মধ্যে নয়, উৎপাদন-পদ্ধতি ও বিনিময়ের ধরনের পরিবর্তনের মধ্যে। তার সন্ধান করতে হবে **দর্শনের** মধ্যে নয়, প্রতি যুগের **অর্থনীতির** মধ্যে। প্রচলিত সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি অযৌক্তিক ও অন্যায়, যুক্তি যে হয়ে দাঁড়িয়েছে অ-যুক্তি এবং ন্যায় অ-ন্যায়,* তা কেবল এই প্রমাণ করে যে, উৎপাদন-পদ্ধতিতে ও বিনিময়ের ধরনে অলক্ষ্যে এমন পরিবর্তন ঘটে গেছে যাতে পূর্বতন অর্থনৈতিক অবস্থার উপযোগী সমাজব্যবস্থাটা আর খাপ খাচ্ছে না। তা থেকে আরো দাঁড়ায় যে, উদ্ঘাটিত বৈষম্য থেকে ত্রাণের উপায়ও এই পরিবর্তিত উৎপাদন-পদ্ধতির মধ্যেই ন্যূনাধিক বিকশিত অবস্থায় থাকতে বাধ্য। মূল সব নীতি থেকে অবরোহ পদ্ধতিতে সে উপায়গুলো উদ্ভাবনীয় নয়, সেগুলো আবিষ্কার করতে হবে প্রচলিত উৎপাদন ব্যবস্থার কঠোর সত্যগুলির মধ্যে।

* গ্যেটের 'ফাউস্ট' পুস্তকের মেফিস্টোফিলিসের কথা। — সম্পাঃ

এ প্রসঙ্গে আধুনিক সমাজতন্ত্রের বক্তব্য তাহলে কী?

এ কথা এখন সকলেই বেশ মানেন, সমাজের বর্তমান ব্যবস্থা আজকের শাসক শ্রেণী বুর্জোয়ার সৃষ্টি। বুর্জোয়ার বৈশিষ্ট্যসূচক উৎপাদন-পদ্ধতি, মার্কসের সময় থেকে যা উৎপাদনের পুঁজিবাদী পদ্ধতি বলে পরিচিত তা ব্যক্তি, গোটাগুটি এক একটা সামাজিক বর্গ ও স্থানীয় কর্পোরেশনের প্রতি সুবিধাদায়ী সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে তথা সামন্ততন্ত্রের যা সামাজিক কাঠামো সেই বংশগত অধীনতা সম্পর্কের সঙ্গে খাপ খায় না। বুর্জোয়ারা সামন্ততন্ত্র ভেঙে ফেলে তার ধ্বংসের ওপর বানাল পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা, — অবাধ প্রতিযোগিতা, ব্যক্তি স্বাধীনতা, আইনের চোখে সমস্ত পণ্য-মালিকদের সমানাধিকার ইত্যাদি পুঁজিবাদী আশীর্বাদের রাজত্ব। তখন থেকে পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতি স্বাধীনভাবে বিকাশ পেতে পারল। বাষ্প, যন্ত্র এবং যন্ত্র তৈরির যন্ত্র যখন থেকে পুরনো কারখানাকে (manufacture) আধুনিক শিল্পে রূপান্তরিত করে তখন থেকে বুর্জোয়াদের পরিচালনায় উৎপাদন-শক্তি এমন দ্রুততায় ও এমন মাত্রায় বেড়েছে যা অশ্রুতপূর্ব। কিন্তু তার নিজের যুগে পুরনো কারখানা, এবং সে কারখানার প্রভাবে অধিকতর বিকশিত হস্তশিল্প যেমন গিল্ডের সামন্ত শৃঙ্খলের সঙ্গে সংঘাতে আসে, ঠিক তেমনি পরিপূর্ণতর বিকাশের আধুনিক শিল্প এবার সংঘাতে আসছে সেই সব বন্ধনের সঙ্গে যার মধ্যে পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতি তাকে সীমাবদ্ধ রাখছে। উৎপাদন-শক্তিকে ব্যবহার করার যে পুঁজিবাদী ধরন তাকে ইতিমধ্যেই ছাড়িয়ে গেছে নতুন উৎপাদন-শক্তি। এবং উৎপাদন-শক্তির সঙ্গে উৎপাদন-পদ্ধতির এই সংঘাতটা আদিম পাপ বনাম স্বর্গীয় ন্যায়ের মতো একটা সংঘাত নয়, যার উদ্ভব মানুষের মনে। সত্য ঘটনা হিসাবে, বাস্তবে, আমাদের বাইরে, এমনকি যে লোকগুলি এ সংঘাত সৃষ্টি করেছে তাদের অভিপ্রায় ও কর্মের অপেক্ষা না রেখেই এ সংঘাত বর্তমান। আধুনিক সমাজতন্ত্র আর কিছুই নয় — বাস্তব ক্ষেত্রের এই সংঘাতের প্রতিফলন ভাবনার ক্ষেত্রে, প্রত্যক্ষভাবে যে শ্রেণী তাতে পীড়িত সর্বাগ্রে সেই শ্রমিক শ্রেণীর মানসে সে সংঘাতের এক আদর্শ প্রতিচ্ছবি।

কীসে এই সংঘাত?

পুঁজিবাদী উৎপাদনের পূর্বে অর্থাৎ মধ্য যুগে উৎপাদনের উপায় মেহনতীদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি, এই ভিত্তিতে ক্ষুদে শিল্পের ব্যবস্থাই ছিল সাধারণভাবে প্রচলিত; গ্রামাঞ্চলে ভূমিদাস বা স্বাধীন ক্ষুদে চাষীর কৃষিব্যবস্থা, শহরে গিল্ডের হস্তশিল্প। শ্রমের সরঞ্জাম — ভূমি, কৃষি-যন্ত্র, কর্মশালা, হাতিয়ারপত্র ছিল এক একজনের একক শ্রমের সরঞ্জাম, শুধু একজন শ্রমিকের ব্যবহারেরই তা উপযোগী এবং সেই কারণে স্বভাবতই তা স্বল্প, ক্ষুদ্রায়তন ও সীমাবদ্ধ। কিন্তু ঠিক এই জন্যই সাধারণত উৎপাদকই ছিল তার মালিক। উৎপাদনের এই বিক্ষিপ্ত, স্বল্প উপায়গুলিকে পুঞ্জীভূত করা, পরিবর্ধিত করা, আজকালকার প্রবল উৎপাদন যন্ত্রে পরিণত করা — এইটেই ছিল

পংজিবাদী উৎপাদন ও তার প্রবক্তা বুর্জোয়াদের ঐতিহাসিক ভূমিকা। 'পংজি' গ্রন্থের চতুর্থ অংশে মার্কস বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন, কী ভাবে সরল সমবায়, কারখানা ও আধুনিক শিল্প, এই তিনটি স্তরের মধ্য দিয়ে তা ঐতিহাসিকভাবে রূপায়িত হয়ে এসেছে ১৫শ শতক থেকে। তাতে আরো দেখানো হয়েছে যে, উৎপাদনের এই সব ক্ষুদে ক্ষুদে উপায়গুলিকে যুগপৎ ব্যক্তির উৎপাদন-উপায় থেকে একমাত্র সমষ্টিগতভাবে পরিচালনীয় **সামাজিক** উৎপাদন-উপায়ে পরিণত না করে বুর্জোয়ারা সেগুলোকে শক্তিশালী উৎপাদন-শক্তিতে রূপান্তরিত করতে পারত না। চরকা, হস্ত-চালিত তাঁত, কামারের হাতুড়ির জায়গায় এল সুতা-কল, শক্তি-চালিত তাঁত, বাষ্প-চালিত হ্যামার; ব্যক্তিগত কর্মশালার জায়গায় এল ফ্যাক্টরি যাতে শত শত, হাজার হাজার মজুরের সহযোগ প্রয়োজন। একই ভাবে, উৎপাদন ব্যাপারটাই ব্যক্তিগত কর্মের একটা ধারা থেকে পরিবর্তিত হল সামাজিক কর্মের একটা ধারায়, এবং উৎপন্ন দ্রব্য পরিবর্তিত হল ব্যক্তিগত থেকে সামাজিক উৎপন্ন দ্রব্যে। ফ্যাক্টরি থেকে এবার যে সুতা, যে কাপড়, যে ধাতু দ্রব্যাদি বেরিয়ে আসতে লাগল তা হল বহু শ্রমিকের মিলিত উৎপাদন, যা পর পর বহু শ্রমিকের হাত ঘুরে এসে তবে তৈরি হয়েছে। কোনো একটা লোক এ কথা বলতে পারত না, 'এটা আমি তৈরি করেছি; এটা **আমার** মাল।'

কিন্তু নির্দিষ্ট কোনো একটা সমাজে যেখানে উৎপাদনের মূল ধরনটা হল শ্রমের এমন একটা স্বতঃস্ফূর্ত বিভাগ যা কোনো পূর্বপরিকল্পিত ছকের ওপর নয় এমনিই ধীরে ধীরে এসে পড়েছে, সেখানে উৎপন্নও **পণ্যের** রূপ নেয়, এ পণ্যের পারস্পরিক বিনিময়ে, বেচা-কেনায় উৎপাদক তার বহুবিধ চাহিদা মেটাতে পারে। এই ছিল মধ্য যুগের অবস্থা। যেমন, কৃষক কৃষিজাত দ্রব্য বিক্রয় করত কারুশিল্পীর কাছে এবং তার কাছ থেকে কিনত হস্তশিল্পজাত সামগ্রী। ব্যক্তিগত উৎপাদক, পণ্য উৎপাদকদের এই সমাজে চেপে বসল নতুন উৎপাদন-পদ্ধতি। স্বতঃস্ফূর্তভাবে, কোনো **নির্দিষ্ট পরিকল্পনা বিনাই** যা গড়ে উঠেছিল এবং সমগ্র সমাজ যার ওপর চলত সেই পুরনো শ্রম-বিভাগের ভেতর এবার এল একটা **নির্দিষ্ট পরিকল্পনার** ভিত্তিতে শ্রমবিভাগ, যেমন ফ্যাক্টরিতে; **ব্যক্তিগত** উৎপাদনের পাশাপাশি আবির্ভূত হল **সামাজিক** উৎপাদন। দু-ধরনের উৎপাদনই একই বাজারে বিক্রয় হত, সুতরাং নিশ্চয় প্রায় সমান সমান দামে। কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ত শ্রমবিভাগের চেয়ে নির্দিষ্ট পরিকল্পনার সংগঠন প্রবলতর। সমষ্টিবদ্ধ ব্যক্তির সংযুক্ত সামাজিক শক্তি নিয়ে চালু ফ্যাক্টরিগুলি ব্যক্তিগত ক্ষুদে উৎপাদকদের চেয়ে পণ্য-উৎপাদন করতে লাগল অনেক শস্তায়। শাখার পর শাখায় হার মানতে লাগল ব্যক্তিগত উৎপাদন। সমাজীকৃত উৎপাদন উৎপাদনের সমস্ত পুরনো পদ্ধতিতে বিপ্লব ঘটাল। কিন্তু সেই সঙ্গে তার বিপ্লবী চরিত্রটা এতই কম পরিজ্ঞাত থাকে যে, তা প্রবর্তিত হয় উল্টোভাবে পণ্য উৎপাদনের বৃদ্ধি ও বিকাশের উপায় হিসাবে। উদ্ভবের সময় তা পণ্য-উৎপাদন ও

বিনিময়ের কতকগুলি তৈরি ব্যবস্থা পেয়েছিল এবং তা ব্যাপকভাবে কাজে লাগায় যথা বণিক পুঁজি, হস্তশিল্প, মজুরি-শ্রম। সমাজীকৃত উৎপাদন এই ভাবে পণ্য-উৎপাদনের একটা নবরূপ হিসাবে প্রবর্তিত হওয়ায় অবধারিতভাবেই তার মধ্যে পুরনো ধরনের দখলদারি পুরো বজায় থাকে এবং তার উৎপন্নের ক্ষেত্রেও তা প্রযুক্ত হয়।

পণ্য-উৎপাদনের বিবর্তনের মধ্যযুগীয় স্তরে শ্রমোৎপন্ন বস্তুর মালিক কে, সে প্রশ্ন উঠতেও পারেনি। নিজেরই কাঁচামাল — সাধারণত তা তার নিজেরই তৈরি — তাই থেকে ব্যক্তিগত উৎপাদক নিজের হাতিয়ারপত্র দিয়ে, নিজের বা পরিবারের মেহনতে তা উৎপন্ন করত। উৎপন্ন বস্তুটা দখল করার কোনো প্রয়োজন উৎপাদকের ছিল না। অবধারিতভাবেই তা ছিল পুরোপুরি তারই জিনিস। সুতরাং, উৎপন্ন বস্তুর উপর তার মালিকানার ভিত্তি হল **তার নিজ শ্রম**। যে ক্ষেত্রে বাইরের সাহায্য ব্যবহৃত হত সেখানেও সাধারণত তার গুরুত্ব থাকত কম, এবং প্রায়শই মজুরি ছাড়া অন্য জিনিস দিয়ে তা পুষিয়ে দেওয়া হত। গিল্ডের শিক্ষানবিস ও কর্মীরা কাজ করত ভরণ-পোষণ ও মজুরির জন্য ততটা নয়, যতটা শিক্ষার জন্য, নিজেরাই যাতে তারা ওস্তাদ হয়ে উঠতে পারে সেই জন্য।

তারপর শুরু হল বড়ো বড়ো কর্মকেন্দ্র ও কারখানায় উৎপাদনের উপায় ও উৎপাদকদের পুঞ্জীভবন, প্রকৃতই সমাজীকৃত উৎপাদন-উপায় ও সমাজীকৃত উৎপাদকরূপে তাদের রূপান্তর। কিন্তু সমাজীকৃত উৎপাদক এবং উৎপাদন-উপায় ও তাদের উৎপন্ন দ্রব্য এ পরিবর্তনের পরেও ঠিক আগের মতোই বিবেচিত হতে লাগল অর্থাৎ ধরা হতে থাকল ব্যক্তিগত উৎপাদন-উপায় ও উৎপন্ন দ্রব্য রূপে। এযাবৎকাল মেহনতী সরঞ্জামের মালিকই উৎপন্ন দ্রব্যের দখল নিয়েছে কেননা সাধারণত ওটা তারই উৎপন্ন, অন্যের সাহায্যটা ব্যতিক্রম। এখনো মেহনতী সরঞ্জামের মালিকই উৎপন্ন দ্রব্য দখল করতে থাকল, যদিও এটা এখন **তার** উৎপন্ন নয়, একান্তরূপে **অন্যের মেহনত থেকে** উৎপন্ন। এই ভাবে, সামাজিকভাবে উৎপন্ন দ্রব্যের দখল পেল না তারা যারা আসলে উৎপাদনের উপায়কে চালু করেছে, যারা আসলে পণ্য-উৎপাদন করেছে, দখল পেল **পুঁজিপতিরা**। উৎপাদনের উপায় তথা উৎপাদনটাই মূলত সমাজীকৃত হয়ে গেছে। কিন্তু এমন একটা দখলদারি প্রথাব তা অধীন রইল যাতে এক এক জনের উৎপাদন ব্যক্তিগত বলে ধরে নেওয়া হত এবং সেই হেতু, প্রত্যেকেই ছিল তার নিজের উৎপন্ন দ্রব্যের মালিক এবং তা বাজারে আনত। এই রকমের দখলের অধীন হল উৎপাদন-পদ্ধতি, যদিও এ দখল যে সর্তের ওপর দাঁড়িয়েছিল তা এ উৎপাদন-পদ্ধতি অবসান করে দিয়েছে।*

* দখলের রূপ একই থাকলেও তার **চরিত্রে** উপরি-বর্ণিত কারণে উৎপাদনের মতোই সমান একটা বিপ্লব যে ঘটে যায় তা এ প্রসঙ্গে দেখানোর তেমন প্রয়োজন নেই। আমি আমার নিজের উৎপন্ন দখল করছি না অন্যের উৎপন্ন দখল করছি, তা অবশ্যই অতি পৃথক দুটো জিনিস। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ভ্রূণাকারে সমগ্র পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতি যার মধ্যে নিহিত সেই মজুরি-শ্রম অতিশয় প্রাচীন:

এই স্ববিরোধটাই নতুন উৎপাদন-পদ্ধতিকে পুঁজিবাদী চরিত্র দান করেছে এবং তার মধ্যেই **আজকের সমগ্র সামাজিক বৈরিতার বীজ নিহিত।** উৎপাদনের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে এবং সমস্ত উৎপাদনশীল দেশে এই নতুন উৎপাদন-পদ্ধতির আধিপত্য যতই বাড়ছে, যতই তা ব্যক্তিগত উৎপাদনকে এক নগণ্য হতাবশেষে পরিণত করছে, **ততই পরিষ্কার করে ফুটে উঠছে সমাজীকৃত উৎপাদনের সঙ্গে পুঁজিবাদী দখলের অসামঞ্জস্য।**

আগেই বলেছি, প্রথম পুঁজিপতিরা বাজারে অন্যান্য রূপের শ্রমের সাথে সাথে মজুরি-শ্রমও পায় তৈরি অবস্থায়। কিন্তু সে ছিল ব্যতিরেকমূলক, অনুপূরক, সহায়ক, অস্থায়ী মজুরি-শ্রম। কৃষি-মেহনতি কখনো কখনো বা দিন-মজুর হিসাবে খাটলেও কয়েক একর নিজস্ব জমি তার ছিল, যাই ঘটুক না কেন, তা থেকে দুমুঠো জোগাড় করতে পারত সে। গিল্ডগুলির সংগঠন ছিল এমন যে, আজ যে শিক্ষানবিস কাল সে হত ওস্তাদ। কিন্তু উৎপাদনের উপায় সমাজীকৃত ও পুঁজিপতিদের হাতে পুঞ্জীভূত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এ সবকিছু বদলে গেল। ব্যক্তিগত উৎপাদকের উৎপাদন-উপায় তথা উৎপন্ন দ্রব্য ক্রমেই হয়ে উঠল মূল্যহীন; পুঁজিপতির অধীনে মজুরি-শ্রমিক হয়ে যাওয়া ছাড়া তার আর কোনো উপায় রইল না। কিছু পূর্বে যা ছিল ব্যতিরেক ও সহায়ক সেই মজুরি-শ্রম হয়ে দাঁড়াল নিয়ম ও সমস্ত উৎপাদনের ভিত্তি; আগে যা ছিল পরিপূরক তাই হয়ে দাঁড়াল শ্রমিকের অবশিষ্ট একমাত্র কর্ম। যারা ছিল অস্থায়ী মজুরি-শ্রমিক তারা হয়ে দাঁড়াল স্থায়ী মজুরি-শ্রমিক। এই স্থায়ী মজুরি-শ্রমিকের সংখ্যা আরো প্রভূত পরিমাণ বেড়ে ওঠে সে সময় সংঘটিত সামন্ত ব্যবস্থার ভাঙন দ্বারা, সামন্ত প্রভুদের লোক-লস্কর বাহিনী ভেঙে দেওয়া, বাস্তুজমি থেকে কৃষক উচ্ছেদ প্রভৃতি দ্বারা। একদিকে পুঁজিপতিদের হাতে পুঞ্জীভূত উৎপাদনের উপায় এবং অন্যদিকে শ্রমশক্তি ছাড়া যাদের আর কিছুই নেই সেই উৎপাদকেরা, এ দুয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ হল। **সমাজীকৃত উৎপাদন ও পুঁজিবাদী দখলের মধ্যকার বিরোধ আত্মপ্রকাশ করল প্রলেতারিয়েত ও বুর্জোয়ার বৈরিতা রূপে।**

আমরা দেখেছি, পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতি চেপে বসল পণ্য উৎপাদক, ব্যক্তিগত উৎপাদকদের এমন একটা সমাজের ওপর, উৎপন্ন দ্রব্যের বিনিময়ই যাদের ছিল সামাজিক বন্ধন। কিন্তু পণ্য-উৎপাদনের ভিত্তিতে গড়া প্রত্যেকটি সমাজেরই এই একটা বৈশিষ্ট্য আছে: স্বকীয় সামাজিক অন্তঃসম্পর্কের ওপর নিয়ন্ত্রণ পণ্য উৎপাদকেরা হারায়। যা পাওয়া গেছে তেমনি ধারা উৎপাদনের উপায় দিয়ে এবং বাকি চাহিদা মেটাতে যা দরকার তার বিনিময়ার্থে প্রত্যেকেই উৎপাদন করে তার নিজের জন্য। কেউ জানে না, তার বিশেষ মালটা বাজারে আসবে কতোখানি, কী পরিমাণই বা তার চাহিদা হবে। কেউ জানে না,

বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত রূপে তা বহু শতাব্দী যাবৎ দাস শ্রমের পাশাপাশি বর্তমান। কিন্তু সে ভ্রূণ পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতিতে যথারীতি বিকশিত হতে পারল শুধু তখন, যখন প্রয়োজনীয় ঐতিহাসিক পূর্বসর্তগুলি জোগানো হল। (এঙ্গেলসের টীকা।)

তার স্বীয় উৎপন্ন দ্রব্যটার জন্য সত্যকার চাহিদা থাকবে কিনা, তার উৎপাদন-খরচ সে পুষিয়ে নিতে পারবে কিনা, এমনকি আদৌ তার পণ্যটা বিক্রি হবে কিনা। সমাজীকৃত উৎপাদনে রাজত্ব করে নৈরাজ্য।

কিন্তু অন্যান্য প্রতিটি ধরনের উৎপাদনের মতো পণ্যোৎপাদনেরও কতকগুলি বিশিষ্ট অন্তর্নিহিত অবিচ্ছেদ্য নিয়ম আছে; এবং নৈরাজ্য সত্ত্বেও, নৈরাজ্যের ভেতরে, নৈরাজ্যের মাধ্যমেই এসব নিয়ম কাজ করে যায়। সামাজিক অন্তঃসম্পর্কের একমাত্র অবিচল রূপ অর্থাৎ বিনিময়ের ক্ষেত্রে এ নিয়মগুলো আত্মপ্রকাশ করে এবং প্রতিযোগিতার অনিবার্য নিয়ম হিসাবে ব্যক্তিগত উৎপাদকদের প্রভাবিত করে। প্রথম দিকে এ নিয়ম তাদের জানা থাকে না, তা আবিষ্কার করতে হয় ক্রমে ক্রমে, অভিজ্ঞতার ফলে। এ নিয়ম তাই উৎপাদকদের অপেক্ষা না রেখে, তাদেরই বিরুদ্ধে, তাদের বিশেষ বিশেষ উৎপাদনের অমোঘ প্রাকৃতিক নিয়মরূপে কাজ করে যায়। উৎপন্ন শাসন করে উৎপাদকদের।

মধ্যযুগীয় সমাজে, বিশেষ করে আগেকার শতকগুলিতে উৎপাদনের মূল লক্ষ্য ছিল ব্যক্তির প্রয়োজন মেটানো। প্রধানত তা মেটাত উৎপাদক ও তার পরিবারের প্রয়োজন। ব্যক্তিগত অধীনতা সম্পর্ক যেখানে ছিল, যেমন গ্রামাঞ্চলে, সেখানে তা সামন্ত প্রভুর প্রয়োজনও মেটাতে সাহায্য করত। সুতরাং এটা বিনিময়ের ব্যাপার ছিল না, উৎপন্নও সেই কারণে পণ্যের রূপ নেয়নি। কৃষক পরিবারটির যা যা প্রয়োজন — কাপড়চোপড়, আসবাবপত্র তথা তার জীবিকা নির্বাহের উপায়, প্রায় সবই তারা উৎপন্ন করত। নিজের প্রয়োজন এবং সামন্ত প্রভুর নিকট সামগ্রী হিসাবে প্রদেয় খাজনার অতিরিক্ত যখন সে কিছু উৎপাদন করত কেবল তখনই সে উৎপাদন করত পণ্য। সামাজিক বিনিময়ের মধ্যে যা এসেছে এবং বিক্রয়ের জন্য যা ছাড়া হয়েছে সেই উদ্বৃত্তটা হয়ে দাঁড়াত পণ্য।

শহরের হস্তশিল্পীদের প্রথম থেকেই পণ্য-উৎপাদন করতে হত সত্য। কিন্তু তারাও তাদের নিজ নিজ প্রয়োজনের বেশির ভাগটাই নিজেরা মেটাত। বাগান, জমি ছিল তাদের। গবাদি পশুপাল তাদের চরত বারোয়ারী বনে, কাঠ আর জ্বালানিও তারা পেত সেখান থেকে। মেয়েরা শণ পশম বুনত ইত্যাদি। বিনিময়ের জন্য উৎপাদন, পণ্য-উৎপাদন তখনো মাত্র তার শৈশবে। সুতরাং, বিনিময় ছিল সংকুচিত, বাজার সংকীর্ণ, উৎপাদন-পদ্ধতি অনড়; বাইরের দিকে ছিল স্থানীয় বিচ্ছিন্নতা, ভিতর দিক থেকে ছিল স্থানীয় ঐক্য; গ্রামাঞ্চলে মার্ক*, শহরে গিল্ড।

কিন্তু পণ্যোৎপাদনের প্রসার, বিশেষ করে পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতির প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এযাবৎ যা ছিল সুপ্ত, পণ্যোৎপাদনের সেই নিয়মগুলি অধিকতর প্রকাশ্যে

* শেষের পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য (এঙ্গেলসের টীকা)। এঙ্গেলস এখানে তাঁর নিজের রচনা 'মার্ক' উদ্ধৃত করেন, যা এই সংস্করণে প্রকাশিত হয়নি। — সম্পাঃ

প্রবলতররূপে সক্রিয় হয়ে উঠল। পুরনো বন্ধন শিথিল হয়ে গেল, বিচ্ছিন্নতার সার্বেকি সীমা ভেঙে পড়ল, উৎপাদকেরা ক্রমেই বেশি বেশি পরিবর্তিত হল আলাদা আলাদা স্বাধীন পণ্যোৎপাদক রূপে। পরিষ্কার হয়ে উঠল যে, সমূহ সামাজিক উৎপাদন রয়েছে এক পরিকল্পনাহীনতা, আকস্মিকতা, নৈরাজ্যের শাসনে এবং এ নৈরাজ্য ক্রমেই বেড়ে উঠতে লাগল। কিন্তু সমাজীকৃত উৎপাদনের এই নৈরাজ্যকে পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতি প্রধান যে উপায়ে তীব্র করে তোলে সেটা নৈরাজ্যের ঠিক বিপরীত। সে উপায় হল প্রতিটি আলাদা উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানে একটা সামাজিক বনিয়াদের ওপর উৎপাদনের ক্রমবর্ধিত সংহতি। এর ফলে সার্বেকি শান্তিপূর্ণ অচলায়তনের অবসান হল। শিল্পের কোনো একটা শাখায় উৎপাদনের এই পদ্ধতির সংগঠন প্রবর্তিত হলেই তা আর অন্য কোনো উৎপাদন-পদ্ধতিকে সেখানে বরদাস্ত করে না। শ্রমক্ষেত্র হয়ে দাঁড়াল রণক্ষেত্র। বিপুল সব ভৌগোলিক আবিষ্কার* এবং তার পেছু পেছু উপনিবেশ স্থাপনের ফলে বাজার বর্ধিত হল বহুগুণ, কারখানা ব্যবস্থা হিসাবে হস্তশিল্পের রূপান্তর ত্বরান্বিত হল। একটা বিশেষ অঞ্চলের বিভিন্ন উৎপাদকদের মধ্যেই কেবল যুদ্ধ বাধল তা নয়। স্থানীয় সংগ্রাম থেকে আবার সৃষ্টি হল জাতীয় সংঘাত, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের বাণিজ্যিক যুদ্ধ।**

পরিশেষে, আধুনিক শিল্প ও বিশ্ববাজারের উন্মুক্তির ফলে এ সংগ্রাম হয়ে উঠল বিশ্বজনীন, এবং সেই সঙ্গে অভূতপূর্ব রকমের তীব্র। উৎপাদন-পরিস্থিতির স্বাভাবিক বা কৃত্রিম সুবিধা দ্বারাই এখন এক একজন পুঁজিপতির তথা গোটা শিল্প বা দেশের অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব নির্ধারিত হতে থাকল। যার হার হয় তাকে নির্মমভাবে ঠেলে ফেলা হয়। এ সেই ডারউইনী অস্তিত্বের সংগ্রাম প্রচণ্ড হয়ে স্থানান্তরিত হল প্রকৃতি থেকে সমাজে। পশুর পক্ষে যে জীবন ধারা স্বাভাবিক তাই যেন হয়ে দাঁড়ায় মানবিক বিকাশের শেষ কথা। সমাজীকৃত উৎপাদন ও পুঁজিবাদী দখলের বিরোধ এবার প্রকাশ পায় **এক একটা কারখানার উৎপাদন সংগঠনের সঙ্গে সাধারণভাবে সমাজের উৎপাদন-নৈরাজ্যের বৈরিতা রূপে।**

এই দুই ধরনের যে বৈরিতা তার জন্মগত, তার মধ্যেই পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতির

* তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ: ১৪৯২ সালে ক্রিস্টোফার কলম্বস কর্তৃক আমেরিকা এবং ১৪৯৮ সালে পোর্তুগীজ ভাস্কো ডা গামা কর্তৃক ভারতের সমুদ্র পথ আবিষ্কার। — সম্পাঃ

** ভারতবর্ষ ও আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্যের একচেটিয়া এবং উপনিবেশিক বাজার দখলের জন্য ১৭শ ও ১৮শ শতকে বৃহৎ বৃহৎ ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির মধ্যে যে উপর্যুপরি যুদ্ধ চলে তার কথা বলা হচ্ছে। প্রথম দিকে মূল প্রতিদ্বন্দ্বী দেশ ছিল ইংলন্ড ও হল্যান্ড (১৬৫২—১৬৫৪, ১৬৬৪—১৬৬৭ এবং ১৬৭২—১৬৭৪ সালের ইঙ্গ-ওলন্দাজ যুদ্ধগুলি ছিল টিপিক্যাল বাণিজ্য যুদ্ধ), পরে নির্ধারক সংগ্রাম জ্বলে ওঠে ইংলন্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে। এই সবকটি যুদ্ধ থেকে বিজয়ী হয়ে বেরিয়ে আসে ইংলন্ড, ১৮শ শতকের শেষাশেষি তার হাতে কেন্দ্রীভূত হয় প্রায় সমস্ত বিশ্ববাণিজ্য। — সম্পাঃ

গতি। ফুরিয়ে কর্তৃক পূর্বেই আবিষ্কৃত এ 'পাপ চক্র' থেকে তা কখনো বেরতে পারে না। তাঁর যুগে ফুরিয়ে যেটা লক্ষ্য করতে পারেননি সেটা হল এই যে, এ চক্র ক্রমেই সঙ্কীর্ণ হয়ে উঠছে; গতি হয়ে উঠছে ক্রমেই এক সর্পিলবৃত্ত, এবং গ্রহাদির গতির মতো কেন্দ্রের সংঘর্ষে তার অবসান অনিবার্য। সাধারণ সামাজিক উৎপাদনের মধ্যস্থ নৈরাজ্যের জবরদস্তি শক্তিতেই বিপুল সংখ্যক মানুষ পুরোপুরি প্রলেতারিয়েতে পরিণত হচ্ছে, এবং ব্যাপক প্রলেতারীয় জনগণই আবার উৎপাদন-নৈরাজ্যের চূড়ান্ত অবসান ঘটাবে। সামাজিক উৎপাদনে নৈরাজ্যের জবরদস্তি শক্তিতেই আধুনিক শিল্পে যন্ত্রের সীমাহীন উন্নয়ন পরিণত হচ্ছে এক আবশ্যিক নিয়মে, এর ফলে প্রত্যেকটি শিল্পজীবী পুঁজিপতিকেই তার যন্ত্রকে ক্রমাগত উন্নত করে তুলতে হবে নইলে ধ্বংস অনিবার্য।

কিন্তু যন্ত্রের উন্নয়ন অর্থ মানবিক শ্রমকে অবান্তর করে তোলা। যন্ত্রের প্রবর্তন ও সংখ্যাবৃদ্ধির অর্থ যদি হয়ে থাকে অল্পসংখ্যক যন্ত্র-কর্মী দিয়ে লক্ষ লক্ষ কায়িক শ্রমিকের স্থানচ্যুতি, তাহলে যন্ত্রের উন্নয়নের অর্থ এবার যন্ত্র-কর্মীদেরই ক্রমাগত অপসারণ। পরিণামে এর অর্থ পুঁজির গড়পড়তা প্রয়োজনের অতিরিক্ত একদল কর্মেচ্ছু মজুরি-শ্রমিকের সৃষ্টি, ১৮৪৫ সালে* যা বলেছিলাম, শিল্পের সেই একটা গোটাগুটি মজুদ বাহিনী গঠন, শিল্প যখন খুব চড়া তখন তাদের কাজে লাগানো হয়, অনিবার্য ধ্বস এলেই আবার যাদের ছাঁটাই করা হবে, পুঁজির সঙ্গে অস্তিত্বের সংগ্রামে যারা শ্রমিক শ্রেণীর স্কন্ধে এক নিরন্তর ভারস্বরূপ, পুঁজির স্বার্থানুযায়ী একটা নিচু মানে মজুরি নামিয়ে রাখার মতো এক নিয়ন্ত্রক। এই ভাবেই, মার্কসের কথায়, শ্রমিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে পুঁজির যে সংগ্রাম তাতে যন্ত্রই হয়ে দাঁড়ায় সবচেয়ে প্রবল অস্ত্র, শ্রমিকের হাত থেকে অনবরতই তার জীবিকার উপায় ছিনিয়ে নেয় শ্রমের যন্ত্র; শ্রমিকেরই যা সৃষ্টি তাই হয়ে দাঁড়ায় তাকে অধীনস্থ করার এক হাতিয়ার। এই ভাবেই শ্রম-যন্ত্রের ব্যয়সংকোচ সেই সঙ্গে গোড়া থেকেই হয়ে দাঁড়ায় শ্রমশক্তির অতি বেপরোয়া অপচয়, শ্রম-কর্মের সাধারণ পরিস্থিতির ভিত্তিতেই লুণ্ঠন; যন্ত্র, 'শ্রম-সময় সংক্ষেপের সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার, হয়ে দাঁড়ায় পুঁজির মূল্যবৃদ্ধির জন্য শ্রমিক ও তার পরিবারের প্রতিটি মুহূর্তকে পুঁজিপতির হাতে তুলে দেবার অতি মোক্ষম উপায়।' ('পুঁজি', ইংরাজি সংস্করণ, পৃঃ ৪০৬।) এই ভাবেই কারো কর্মহীনতার প্রাথমিক সর্ত হয় অন্য কারো অতি মেহনত এবং সারা বিশ্ব জুড়ে নতুন নতুন খরিদ্দার-সন্ধানী আধুনিক শিল্প স্বদেশীয় জনগণের ভোগসীমাকে নামিয়ে আনে অনশন মাত্রার ন্যূনতমে, তাই করতে গিয়ে স্বদেশের নিজ বাজারকেই তা ধ্বংস করে। 'পুঁজি সঞ্চয়ের জোর ও ব্যাপকতার সঙ্গে আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত জনতা, বা শিল্পের মজুদ বাহিনীর ভারসাম্য সর্বদাই রক্ষিত

* 'ইংলন্ডের শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা' (Sonnenschein & Co.), পৃঃ ৮৪। (এঙ্গেলসের টীকা।)

হয় যে নিয়মে, সে নিয়ম পুঁজির সঙ্গে মজুরকে যতটা কঠিন করে প্রোথিত করে রাখে তা প্রমেথিউসকে* পাহাড়ে প্রোথিত করার ভালকানী কীলকের চেয়েও জোরালো। পুঁজি সঞ্চয়ের সঙ্গে সঙ্গে তা সঞ্চয় করে তোলে দৈন্য। এক প্রান্তে ধনসঞ্চয় তাই যুগপৎ দৈন্য, শ্রম-ক্লেশ, দাসত্ব, অজ্ঞতা, পাশবিকতা, মানসিক অধঃপতনের সঞ্চয় ঠিক বিপরীত প্রান্তে, অর্থাৎ সেই শ্রেণীর ক্ষেত্রে যারা **তাদেরই স্বীয় উৎপাদনকে** উৎপন্ন করছে **পুঁজিরূপে**।' (মার্কসের 'পুঁজি' [Sonnenschein & Co.], পৃঃ ৬৬১।) উৎপাদনের পুঁজিবাদী পদ্ধতি থেকে এ ছাড়া অন্য কোনো উৎপন্ন-বণ্টন আশা করা আর এ আশা করা সমান কথা যে, ব্যাটারির ইলেক্ট্রোড যতক্ষণ ব্যাটারির সঙ্গে যুক্ত ততক্ষণ এ্যাসিড মেশা জলকে তা বিশ্লিষ্ট করবে না, তার ধনাত্মক মেরু থেকে অক্সিজেন ও ঋণাত্মক মেরু থেকে হাইড্রোজেন ছাড়তে থাকবে না।

আমরা দেখেছি, আধুনিক শিল্প-যন্ত্রের ক্রমবর্ধমান উন্নয়নশীলতা সামাজিক উৎপাদনের নৈরাজ্যের দ্বারা পরিণত হয়েছে এমন একটা আবশ্যিক নিয়মে যাতে আলাদা আলাদা শিল্পজীবী পুঁজিপতি সর্বদাই তার যন্ত্রকে উন্নত করতে, সর্বদাই সে যন্ত্রের উৎপাদনী ক্ষমতা বাড়িয়ে যেতে বাধ্য হয়। উৎপাদন ক্ষেত্র প্রসারের সম্ভাবনাটাও তার কাছে অনুরূপ একটা আবশ্যিক নিয়মে দাঁড়ায়। আধুনিক শিল্পের বিপুল সম্প্রসারণ-শক্তির কাছে গ্যাসের সম্প্রসারণ-শক্তিকে মনে হয় ছেলেখেলা, এ শক্তি এখন আমাদের কাছে প্রতিভাত হয় গুণগত ও পরিমাণগত সম্প্রসারণের এমন এক **আবশ্যিকতা** রূপে যা কোনো বাধারই পরোয়া করে না। এ বাধা আসে পণ্য-ভোগ থেকে, বিক্রয় থেকে, আধুনিক শিল্প মালের বাজার থেকে। কিন্তু বাজারের সম্প্রসারণ-ক্ষমতা ব্যাপকতায় ও তীব্রতায় শাসিত হয় প্রধানত অন্য কতকগুলি নিয়মে যার তেজ অনেক কম। উৎপাদনের প্রসারের সঙ্গে বাজারের সম্প্রসারণ তাল রাখতে পারে না। সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে, এবং উৎপাদনের পুঁজিবাদী পদ্ধতিকে চূর্ণবিচূর্ণ না করা পর্যন্ত যেহেতু এই সংঘাত থেকে কোনো সত্যকার সমাধান সম্ভব নয়, তাই সংঘাতগুলো আসতে থাকে পর্যায়ক্রমে। পুঁজিবাদী উৎপাদন জন্ম দিল আর একটি 'পাপ চক্রের'।

বস্তুতপক্ষে, ১৮২৫ সালে যখন প্রথম সাধারণ সংকট দেখা দেয় তখন থেকে সমগ্র শিল্প ও বাণিজ্য জগৎ, সমস্ত সভ্য জাতি ও তাদের মুখাপেক্ষী ন্যূনাধিক বর্বর জাতিদের উৎপাদন ও বিনিময় প্রতি দশ বছরে একবার করে ভেঙে পড়ে। বাণিজ্য অচল হয়ে যায়, বাজার জাম, মাল জমতে থাকে, যতই তা অবিক্রেয় ততই তা স্তূপাকার, নগদ টাকা

* প্রমেথিউস — গ্রীক পুরাকথার এক বীর। দেবগণের কাছ থেকে অগ্নি হরণ করে এনে তিনি মানুষদের দেন। শাস্তি হিসাবে জিউস তাঁকে শৈলে শৃঙ্খলিত করে রাখেন এবং ঈগল তাঁর যকৃত ভক্ষণ করে। — সম্পাঃ

অদৃশ্য হয়, ঋণ দান থেমে যায়, বন্ধ হয়ে যায় ফ্যাক্টরি আর শ্রমিক জনগণের জীবিকা যায়, কারণ অতিমাত্রায় জীবিকোপকরণ উৎপন্ন করেছে তারা; একের পর এক দেউলিয়া, একের পর এক ক্রোক। অচলাবস্থা চলে কয়েক বছর ধরে; উৎপাদন-শক্তি ও উৎপন্ন মালের অপচয় হতে থাকে, পাইকারীভাবে তার ধ্বংস চলতে থাকে যতদিন না সঞ্চিত পণ্যস্তূপের মোটের ওপর মূল্যহ্রাস হয়ে শেষ পর্যন্ত তা ঝরে যায়, যতদিন না উৎপাদন ও বিনিময় ধীরে ধীরে আবার চলতে শুরু করে। একটু একটু করে তার গতি বাড়ে। শুরু হয় দুলকি চলন। শিল্পের দুলকি চলন বেড়ে ওঠে ধাবনে এবং ধাবনও পরিণত হয় শিল্প, কারবারী ঋণ ও ফাটকার এক খাঁটি উদ্দাম কদমে ছোটায়, শেষ পর্যন্ত পড়ি-মড়ি লম্ফঝম্পের পর সেখানে এসেই থামে যেখানে শুরু অর্থাৎ সংকটের গহ্বরে। এই চলে ফিরে ফিরে। ১৮২৫ সাল থেকে আজ পর্যন্ত পাঁচবার এই ঘটেছে এবং বর্তমানে (১৮৭৭) ছয়বারের বার তা ঘটছে। এ সব সংকটের চরিত্র এতই পরিষ্কার যে ফুরিয়ে crise pléthorique বা রক্তাতিশয্যের সংকট বলে প্রথম সংকটটির যা বর্ণনা দিয়েছেন তাতেই সব সংকটের বর্ণনা হয়েছে।

এ সব সংকটে সমাজীকৃত উৎপাদন ও পুঁজিবাদী দখলের বিরোধ এক প্রবল বিস্ফোরণে ফেটে পড়ে। পণ্যসঞ্চালন কিছুকালের জন্য বন্ধ হয়। সঞ্চালনের যা মাধ্যম, সেই মুদ্রা হয়ে দাঁড়ায় সঞ্চালনের প্রতিবন্ধক। পণ্যোৎপাদন ও পণ্য সঞ্চালনের সমস্ত নিয়মই উল্টে যায়। অর্থনৈতিক সংঘাত তার শীর্ষ বিন্দুতে পৌঁছয়। **উৎপাদনের পদ্ধতি বিদ্রোহ করে বিনিময় ধরনের বিরুদ্ধে।**

ফ্যাক্টরির অভ্যন্তরে উৎপাদনের সমাজীকৃত সংগঠন এত দূর বিকশিত হয়েছে যে, সহবিদ্যমান ও প্রাধান্যকারী সামাজিক উৎপাদন-নৈরাজ্যের সঙ্গে তা আর খাপ খাচ্ছে না। এ ঘটনাটা খোদ পুঁজিপতিদের কাছেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে সংকট কালে পুঁজির প্রচণ্ড পুঞ্জীভবনের মাধ্যমে, বহু বৃহৎ এবং বহুতর ক্ষুদ্র পুঁজিপতির ধ্বংসে। উৎপাদনের পুঁজিবাদী পদ্ধতির সমগ্র ঠাট ভেঙে পড়ে উৎপাদন-শক্তির চাপে, তারই সৃষ্টির চাপে। এই সমস্ত উৎপাদন-উপায়কে তা আর পুঁজিতে পরিণত করতে সক্ষম হয় না। সেগুলো পড়ে থাকে বেকার হয়ে এবং সেই হেতু শিল্পের মজুদ বাহিনীও থাকে বেকার। উৎপাদনের উপায়, জীবিকা নির্বাহের উপকরণ, কর্মেচ্ছু শ্রমিক, উৎপাদনের ও সাধারণ সম্পদের সমস্ত উপকরণই রয়েছে অজস্র। কিন্তু 'অজস্রতা হয়ে দাঁড়ায় দৈন্য দুর্দশার উৎস' (ফুরিয়ে), কারণ উৎপাদন ও জীবিকার উপায়ের পুঁজিতে রূপান্তরের প্রতিবন্ধক হয় এই অজস্রতাই। কেননা, পুঁজিবাদী সমাজে উৎপাদনের উপায় সচল থাকতে পারে কেবল তখনই যখন তার প্রাথমিক রূপান্তর ঘটেছে পুঁজিতে, মনুষ্য শ্রমশক্তি শোষণের উপায়ে। উৎপাদন ও জীবিকা নির্বাহের উপায়কে পুঁজিতে রূপান্তরিত করার এই প্রয়োজন প্রেতের মতো শ্রমিক ও এই উপায়ের মধ্যে দণ্ডায়মান। কেবল মাত্র তার জন্যই

উৎপাদনের বৈষয়িক ও ব্যক্তিক কারিকার সম্মিলন ব্যাহত হয়; কেবল মাত্র তার জন্যই উৎপাদন-উপায়ের সচল থাকা, শ্রমিকের খেটে বেঁচে থাকা বারণ। তাই একদিকে, এই উৎপাদন-শক্তিকে আর পরিচালনা করার অক্ষমতায় পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতি নিজেই আত্ম-অভিযুক্ত; অন্যদিকে, এই সব উৎপাদন-শক্তি নিজেরাই ক্রমবর্ধমান তেজে এগিয়ে আসছে বর্তমান বিরোধের অবসানের দিকে, পুঁজি হিসাবে তাদের যে গুণ তা বিলোপের দিকে, **সামাজিক উৎপাদন-শক্তি হিসাবে তাদের যে চরিত্র তার ব্যবহারিক স্বীকৃতির দিকে।**

পুঁজি হিসাবে তাদের যে গুণ তার বিরুদ্ধেই ক্রমপ্রবল উৎপাদন-শক্তির এই বিদ্রোহ, তাদের সামাজিক চরিত্র স্বীকৃত হোক, এই ক্রমবর্ধমান দাবির ফলে খাস পুঁজিপতি শ্রেণীও বাধ্য হয় তাদের ক্রমেই বেশি বেশি করে সামাজিক উৎপাদন-শক্তি হিসাবে ধরতে, পুঁজিবাদী পরিস্থিতির মধ্যে তা যতটা সম্ভব সেই পরিমাণে। শিল্পের অতি চাপের পর্যায়ে ঋণ ব্যবস্থায় অসীম স্ফীতির মারফত যতটা, বড়ো বড়ো পুঁজিবাদী প্রতিষ্ঠানের ভাঙন মারফত ধ্বস দ্বারাও ততটাই বিপুল উৎপাদন-উপায়সমূহের সেই ধরনের একটা সমাজীকরণ ঘটাতে চায়, যা আমরা বিভিন্ন জয়েণ্ট-স্টক কোম্পানিতে প্রত্যক্ষ করছি। উৎপাদন ও বণ্টনের এই উপায়সমূহের অনেকগুলিই গোড়া থেকেই এতই বিরাট যে, রেলওয়ের মতোই তাতে অন্যবিধ পুঁজিবাদী শোষণের অবকাশ মেলে না। আরো বিকাশেব এক পর্যায়ে এই ধরনটাও অপ্রতুল হয়ে দাঁড়ায়। একটা বিশেষ দেশের একটা বিশেষ শিল্প-শাখার সমস্ত বড়ো বড়ো উৎপাদকেরা সংঘবদ্ধ হয় 'ট্রাস্টে', উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের জন্য একটা সমিতিতে। উৎপাদ্যের মোট পরিমাণ তারা স্থির করে, নিজেদের মধ্যে তা ভাগাভাগি করে নেয় এবং এই ভাবে আগে থেকেই বিক্রয় মূল্য নির্দিষ্ট করে ফেলে। কিন্তু কারবারে মন্দা পড়তেই এই ধরনের ট্রাস্টের সাধারণভাবে ভেঙে পড়ার সম্ভাবনা, সেই কারণেই আরো বেশি পরিমাণ সংঘবদ্ধতার প্রয়োজন তা জাগায়। এক একটা শিল্পের সবখানিই পরিণত হয় এক অতিকায় জয়েণ্ট-স্টক কোম্পানিতে; আভ্যন্তরীণ প্রতিযোগিতার স্থান নেয় এই একটি কোম্পানির আভ্যন্তরীণ একচেটিয়া কারবার। তা ঘটেছে ১৮৯০ সালে ইংলণ্ডের অ্যালক্যালি উৎপাদনের ক্ষেত্রে, সমস্ত ৪৮টি বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের একীকরণের পর তা এখন একটি কোম্পানির হাতে, ৬০ লক্ষ পাউন্ড মূলধন নিয়ে পরিচালিত হচ্ছে একটি একক পরিকল্পনার ভিত্তিতে।

ট্রাস্টগুলিতে প্রতিযোগিতার স্বাধীনতা পরিণত হয় ঠিক তার বিপরীতে — একচেটিয়া কারবারে; এবং পুঁজিবাদী-সমাজসুলভ বিনা-পরিকল্পনার উৎপাদন নতি-স্বীকার করে আসন্ন সমাজতান্ত্রিক-সমাজসুলভ নির্দিষ্ট পরিকল্পনার উৎপাদনের কাছে। অবশ্যই তাতে এখনো পর্যন্ত পুঁজিপতিদেরই সুবিধা ও উপকার। কিন্তু এ

ক্ষেত্রে শোষণটা এত জাজ্বল্যমান যে তা ভেঙে পড়তে বাধ্য। ট্রাস্টগুলির উৎপাদন পরিচালনা, ক্ষুদ্র একদল ডিভিডেণ্ট-লিপ্সু কর্তৃক সমাজকে এমন নির্লজ্জ শোষণ কোনো জাতিই সহ্য করবে না।

যাই হোক না কেন, ট্রাস্ট থাকুক বা না থাকুক, পুঁজিবাদী সমাজের সরকারী প্রতিনিধি রাষ্ট্রকে শেষ পর্যন্ত উৎপাদনের পরিচালনভার গ্রহণ করতে হবে* নিজের হাতে। রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিতে পরিবর্তনের এই প্রয়োজন সর্বাগ্রে দেখা দেয় যোগাযোগ ও আদানপ্রদানের বড়ো বড়ো প্রতিষ্ঠানগুলিতে — ডাকঘর, টেলিগ্রাফ, রেলে।

আধুনিক উৎপাদন-শক্তির পরিচালনায় বুর্জোয়ারা আর সক্ষম নয়, এই যদি প্রকাশ পায় সংকট থেকে তবে উৎপাদন ও বণ্টনের বড়ো বড়ো প্রতিষ্ঠানগুলির জয়েণ্ট-স্টক কোম্পানি, ট্রাস্ট, ও রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিরূপে রূপান্তরের মধ্যে দিয়ে প্রমাণ হয় সে কাজের জন্য বুর্জোয়ারা কী পরিমাণ অনাবশ্যক। পুঁজিপতির সামাজিক ক্রিয়ার সবকটিই নির্বাহ হয় বেতনভোগী কর্মচারী দ্বারা। ডিভিডেণ্ট পকেটস্থ করা, কুপন কাটা আর বিভিন্ন পুঁজিপতিরা যেখানে পরস্পরের পুঁজি হরণ করে সেই স্টক এক্সচেঞ্জে ফাটকা খেলা ছাড়া পুঁজিপতির আর কোনো সামাজিক কর্ম নেই। পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতি প্রথমে বিতাড়িত করে মজুরদের; এখন তা বিতাড়িত করছে পুঁজিপতিদের,

* বলছি 'করতে হবে' কেননা, উৎপাদন ও বণ্টনের উপায় যখন **সত্য করেই** জয়েণ্ট-স্টক কোম্পানিগুলি কর্তৃক পরিচালন ব্যবস্থাকে ছাপিয়ে যাবে, এবং সেই হেতু তাদের রাষ্ট্রায়ত্তকরণ যখন **অর্থনৈতিকভাবে** অনিবার্য হবে, কেবল তখনই একটা অর্থনৈতিক প্রগতি ঘটবে — যদি সে কাজ আজকের এই রাষ্ট্রই করে তাহলেও, — ঘটবে সমস্ত উৎপাদন-শক্তির সমাজীকরণের প্রাথমিক একটা পদক্ষেপ। কিন্তু ইদানীং, বিসমার্ক যখন থেকে শিল্প প্রতিষ্ঠানের রাষ্ট্রীয় মালিকানা চালু করতে লেগেছেন, তখন থেকে একধরনের মেকি সমাজতন্ত্রের উদ্ভব হয়েছে, যা থেকে থেকেই এক ধরনের স্বেচ্ছাকৃত পদলেহনে অধঃপতিত হচ্ছে, এমনকি বিসমার্কী ধরনের রাষ্ট্রীয় মালিকানা সমেত **যে কোনো** রাষ্ট্রীয় মালিকানাকেই তারা ঘোষণা করছে সমাজতন্ত্র বলে। তামাক শিল্প রাষ্ট্র দখল করলে যদি সমাজতন্ত্র হয়, তাহলে নিশ্চয়ই নেপোলিয়ন ও মেত্তেরনিখকে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে গণ্য করতে হবে। বেলজিয়ম রাষ্ট্র যদি নিতান্ত সাধারণ রাজনৈতিক ও আর্থিক কারণে তার প্রধান রেলপথ নিজেই নির্মাণ করে; কোনো অর্থনৈতিক বাধ্যতার ফলে নয়, নিতান্তই যুদ্ধের সময় অনায়াসে হাতে রাখা যাবে বলে, সরকারের পক্ষে ভোটদায়ী গড্ডলিকারূপে রেলকর্মচারীদের গড়ে তোলার জন্য, এবং বিশেষ করে পার্লামেণ্টারী ভোটের তোয়াক্কা না রেখে নিজের জন্য একটা নতুন আয়ের উৎস তৈরির উদ্দেশ্যে যদি বিসমার্ক প্রধান প্রধান প্রুশীয় রেলপথ রাষ্ট্রায়ত্ত করেন, তাহলে কোনো অর্থেই, প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে, সচেতনভাবে বা অচেতনভাবে তা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা হয় না। নইলে, রাজকীয় নৌ কোম্পানি, রাজকীয় চীনামাটি কারখানা, তথা সৈন্যবাহিনীর দর্জি-পোষাক প্রতিষ্ঠানকেও বলতে হয় সমাজতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান, এমনকি তৃতীয় ফ্রিদরিখ-ভিলহেলমের রাজত্বকালে এক ধূর্ত যা গুরুত্বসহকারে প্রস্তাব করেছিল, রাষ্ট্র কর্তৃক বেশ্যালয়গুলি গ্রহণের সে ব্যাপারটা পর্যন্ত হয় সমাজতান্ত্রিক। (এঙ্গেলসের টীকা।)

মজুরদের মতোই তাদেরও ঠেলে দিচ্ছে উদ্বৃত্ত জনসংখ্যার স্তরে, যদিও শিল্পের মজুদ বাহিনীতে অবিলম্বেই নয়।

কিন্তু জয়েণ্ট-স্টক কোম্পানি বা ট্রাস্টে অথবা রাষ্ট্রীয় মালিকানায় রূপান্তর, এর কোনোটাতেই উৎপাদন-শক্তির পুঁজিবাদী চরিত্রের অবসান হয় না। জয়েণ্ট-স্টক কোম্পানি ও ট্রাস্টে তা স্বতঃই স্পষ্ট। আধুনিক রাষ্ট্রও কিন্তু শ্রমিক তথা ব্যক্তিবিশেষ পুঁজিপতির হামলার বিরুদ্ধে পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতির বাহ্য পরিস্থিতিকে রক্ষা করার জন্য বুর্জোয়া সমাজ কর্তৃক পরিগৃহীত একটা সংগঠন মাত্র। রূপ যাই হোক না কেন, আধুনিক রাষ্ট্র হল মূলত একটি পুঁজিবাদী যন্ত্র, পুঁজিপতিদের একটি রাষ্ট্র, সামগ্রিক জাতীয় পুঁজির একটি আদর্শ রূপমূর্তি। উৎপাদন-শক্তিকে যতই সে হাতে নিতে চায়, ততই সে সত্য করেই হয়ে ওঠে জাতীয় পুঁজিপতি, তত বেশি অধিবাসীকে তা শোষণ করতে থাকে। শ্রমিকেরা মজুরি-শ্রমিক অর্থাৎ প্রলেতারীয় রূপেই থেকে যায়। পুঁজিবাদী সম্পর্কের অবসান হয় না বরং তাকে চূড়ান্ত শীর্ষে তোলা হয়। কিন্তু চূড়ান্ত শীর্ষে ওঠাতেই তা উল্টে পড়ে। উৎপাদন-শক্তির রাষ্ট্র মালিকানা সংঘাতের সমাধান করে না, কিন্তু সে সমাধানের যা উপকরণ সেই টেকনিকাল সর্ত তার মধ্যেই লুক্কায়িত।

এ সমাধান সম্ভব কেবল আধুনিক উৎপাদন-শক্তির সামাজিক চরিত্রের বাস্তব স্বীকৃতিতে, এবং সেই হেতু, উৎপাদন-উপায়ের সমাজীকৃত চরিত্রের সঙ্গে উৎপাদন, দখল ও বিনিময় পদ্ধতির সামঞ্জস্য বিধানে। সামগ্রিকভাবে সমাজের নিয়ন্ত্রণ ছাড়া অন্য সমস্ত নিয়ন্ত্রণকে যা ছাপিয়ে উঠেছে সেই উৎপাদন-শক্তির ওপর প্রকাশ্যে ও প্রত্যক্ষভাবে সমাজের দখল স্থাপন করেই কেবল তা সম্ভব। উৎপাদন-উপায় ও উৎপন্ন দ্রব্যের সামাজিক চরিত্রটা আজ উৎপাদকের বিরুদ্ধে সক্রিয়, সমস্ত উৎপাদন ও বিনিময়কে তা থেকে থেকেই বানচাল করে দেয়, অন্ধ বলাৎকারী বিধ্বংসী এক প্রাকৃতিক নিয়মের মতোই শুধু তার ক্রিয়া। কিন্তু সমাজ কর্তৃক উৎপাদন-শক্তিগুলিকে গ্রহণের পর উৎপাদন-উপায় ও উৎপন্ন দ্রব্যের সামাজিক চরিত্রের ব্যবহার উৎপাদকেরা করবে তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য পুরোপুরি বুঝে, বিঘ্ন ও পর্যায়িক ধ্বসের উৎস না হয়ে তা হবে উৎপাদনেরই প্রবলতম এক কারিকা।

সক্রিয় সামাজিক শক্তিগুলির ক্রিয়া ঠিক প্রাকৃতিক শক্তিগুলির মতোই: যতক্ষণ তাদের না বুঝছি, হিসাবে না মেলাচ্ছি ততক্ষণ অন্ধ, বলাৎকারী ও বিধ্বংসী। কিন্তু একবার তাদের যদি বোঝা যায়, একবার যদি তাদের ক্রিয়া, গতিমুখ ও ফলাফল ধরা যায়, তাহলে ক্রমাগত আমাদের আজ্ঞাবহ তাদের করে তুলব কিনা, তাদের সাহায্যেই আমাদের লক্ষ্যসাধন করব কিনা সেটা আমাদেরই ইচ্ছাধীন। আজকের পরাক্রান্ত উৎপাদন-শক্তিগুলির ক্ষেত্রে এ কথা বিশেষ করেই খাটে। এই সব সক্রিয় সামাজিক

উপায়গুলির প্রকৃতি ও চরিত্র বুঝতে আমরা যতক্ষণ গোঁয়ারের মতো অনিচ্ছুক — এ বোধ পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতি ও তার সমর্থকী প্রবণতার বিরুদ্ধেই — ততক্ষণ এ শক্তিগুলি কাজ করে যাবে আমাদের অপেক্ষা না রেখেই, আমাদের বিরুদ্ধে, ততক্ষণ তারা আধিপত্য করে যাবে আমাদের ওপর, পূর্বে যা আমরা বিশদে দেখিয়েছি।

কিন্তু একবার যদি তাদের প্রকৃতি বোঝা যায়, তাহলে একত্রে-মেহনতী উৎপাদকদের হাতে তাদের পরিণত করা যায় দানবপ্রভু থেকে আজ্ঞাবহ ভৃত্যে। তফাৎটা হল ঝটিকা বজ্রস্থ বিদ্যুতের ধ্বংসশক্তির সঙ্গে টেলিগ্রাফ ও ভল্টেইক আর্কের বশীভূত বিদ্যুতের তফাৎ, দাবাগ্নির সঙ্গে মানুষের কাজে লাগানো আগুনের তফাৎ। শেষপর্যন্ত আজকের উৎপাদনী শক্তিগুলির আসল চরিত্রের এই স্বীকৃতির ফলে উৎপাদনের সামাজিক নৈরাজ্যের স্থান নেয় গোষ্ঠী ও প্রতিটি ব্যক্তির প্রয়োজনানুযায়ী নির্দিষ্ট পরিকল্পনায় উৎপাদনের সামাজিক নিয়ন্ত্রণ। উৎপন্ন দ্রব্য যেখানে প্রথমে উৎপাদককে ও পরে দখলকারীকে দাসত্ববন্ধনে বাঁধে, দখলের সেই পুঁজিবাদী পদ্ধতির জায়গায় তখন আসে দখলের এমন এক পদ্ধতি, আধুনিক উৎপাদন-উপায়ের চরিত্র যার ভিত্তি: একদিকে উৎপাদন সচল ও সম্প্রসারণের উপায়স্বরূপ প্রত্যক্ষ সামাজিক দখল, এবং অন্যদিকে জীবিকা নির্বাহ ও উপভোগের উপায়স্বরূপ প্রত্যক্ষ ব্যক্তিগত দখল।

পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতি জনসংখ্যার বিপুল অধিকাংশকে ক্রমেই পরিপূর্ণ প্রলেতারিয়েতে পরিণত করার সঙ্গে সঙ্গে সেই শক্তির সৃষ্টি করে যা এ বিপ্লব সাধন করতে বাধ্য হয়, অন্যথায় তার ধ্বংস অনিবার্য। ইতিমধ্যেই যা সমাজীকৃত হয়ে উঠেছে, সেই বিপুল উৎপাদন-উপায়কে ক্রমাগত বেশি করে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিতে পরিণত করতে বাধ্য করার সঙ্গে সঙ্গে তা নিজেই এ বিপ্লব সাধনের পথ দেখায়। **প্রলেতারিয়েত রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে উৎপাদনের উপায়কে পরিণত করে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিতে।**

কিন্তু তা করতে গিয়ে প্রলেতারিয়েত হিসাবে তার আত্মাবসান ঘটে, লুপ্ত হয় সমস্ত শ্রেণী-বৈশিষ্ট্য ও শ্রেণী বৈরিতা, রাষ্ট্রের রাষ্ট্র হিসাবে যে অস্তিত্ব তা বিলুপ্ত হয়। শ্রেণী বৈরিতার ওপর প্রতিষ্ঠিত সমাজের এযাবৎ প্রয়োজন ছিল রাষ্ট্রের, অর্থাৎ pro tempore যা শোষক শ্রেণী তেমন একটা বিশেষ শ্রেণীর এক সংগঠনের, প্রচলিত উৎপাদন পরিস্থিতিতে বহিরাগত বিঘ্ন নিরোধের উদ্দেশ্যে, এবং সুতরাং, বিশেষ করে নির্দিষ্ট উৎপাদন-পদ্ধতির (ক্রীতদাসত্ব, ভূমিদাসত্ব, মজুরি-শ্রম) সহগ পীড়ন ব্যবস্থার মধ্যে শোষিত শ্রেণীগুলিকে সবলে দাবিয়ে রাখার উদ্দেশ্যেই এক সংগঠনের। রাষ্ট্র ছিল সামগ্রিকভাবে সমাজের সরকারী প্রতিনিধি, সমাজকে জুড়ে রাখা একটা দৃষ্টিগোচর প্রতিভূ। কিন্তু তা শুধু এই অর্থে সত্য যে, তা হল তেমন একটা শ্রেণীর রাষ্ট্র যা তৎকালে সমগ্র সমাজের প্রতিনিধিত্ব করছে: প্রাচীন কালে ক্রীতদাসমালিক নাগরিকদের রাষ্ট্র; মধ্য যুগে সামন্ত প্রভুদের; আমাদের কালে বুর্জোয়াদের। রাষ্ট্র যখন অবশেষে

সমগ্র সমাজের সত্যকার প্রতিনিধি হয়ে দাঁড়ায় তখন তা নিজেকে করে তোলে অনাবশ্যক। অধীনে রাখার মতো কোনো সামাজিক শ্রেণী যেই আর থাকে না, যেই শ্রেণী-শাসন এবং আমাদের উৎপাদন-নৈরাজ্যের ভিত্তিতে দাঁড়ানো ব্যক্তিগত অস্তিত্বের সংগ্রাম ও তদ্‌ভূত সংঘর্ষ ও অনাচারের অবসান হয়, অমনি দমন করার মতো কিছুও আর বাকি থাকে না, এবং একটা বিশেষ পীড়ন-শক্তির, একটা রাষ্ট্রের আর প্রয়োজন হয় না। প্রথম যে কাজটার ফলে রাষ্ট্র সত্য করেই নিজেকে সমগ্র সমাজের প্রতিনিধি করে তোলে -- সমাজের নামে উৎপাদন-উপায়গুলিকে দখল করা — সেইটাই হল একই কালে রাষ্ট্র হিসাবে তার শেষ স্বাধীন কাজ। সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ ক্ষেত্রের পর ক্ষেত্রে অনাবশ্যক হয়ে উঠতে থাকে এবং তারপর সে নিজে থেকেই মরে যায়: লোক শাসন করার স্থানে আসে বস্তুর ব্যবস্থাপনা এবং উৎপাদন প্রক্রিয়ার পরিচালনা। রাষ্ট্রকে 'উচ্ছেদ' করতে হয় না, তা **মরে যায়**। 'মুক্ত রাষ্ট্র' কথাটিকে আন্দোলকেরা যে মধ্যে মধ্যে ন্যায্যতই ব্যবহার করে থাকেন সেদিক থেকে এবং তার চূড়ান্ত বৈজ্ঞানিক অপূর্ণতা, উভয় দিক থেকেই কথাটার মূল্যায়ন পাওয়া যাচ্ছে এ থেকে, অবিলম্বে রাষ্ট্র উচ্ছেদের জন্য তথাকথিত নৈরাজ্যবাদীদের দাবিটারও।

পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতির ঐতিহাসিক আবির্ভাবকাল থেকেই বিভিন্ন ব্যক্তি তথা বিভিন্ন সম্প্রদায় সমস্ত উৎপাদন-উপায়ের ওপর সামাজিক দখলের স্বপ্ন দেখে এসেছেন ন্যূনাধিক অস্পষ্টভাবে ভবিষ্যতের আদর্শ হিসাবে। কিন্তু তা সম্ভব হতে পারে, ঐতিহাসিক রূপে আবশ্যিক হয়ে উঠতে পারে শুধু তখনই যখন তার বাস্তবায়নের প্রত্যক্ষ অবস্থা বর্তমান। অপরাপর প্রতিটি সামাজিক প্রগতির মতোই তা সম্ভবপর হয় এই জন্য নয় যে, লোকে বুঝতে পারছে, শ্রেণীর অস্তিত্ব ন্যায়, সমানাধিকার ইত্যাদির পরিপন্থী, এ শ্রেণী-বিলোপের ইচ্ছা দ্বারাই কেবল নয়, সম্ভবপর হয় কতকগুলি নতুন অর্থনৈতিক অবস্থার ফলে। শোষক ও শোষিত শ্রেণী, শাসক ও নিপীড়িত শ্রেণীতে সমাজের বিভাগ ছিল পূর্বতন কালের উৎপাদনের অপরিণত সীমাবদ্ধ বিকাশের অপরিহার্য পরিণাম। সকলের অস্তিত্বের জন্য কোনো ক্রমে যেটুকু দরকার তার চেয়ে কেবল অতি অল্পপরিমাণ উদ্বৃত্ত যতদিন উৎপন্ন হচ্ছে সমগ্র সামাজিক মেহনত দ্বারা, সেই হেতু সমাজ-সদস্যদের বিপুল অধিকাংশের সমস্ত বা প্রায় সমস্ত সময় যতদিন খেয়ে যাচ্ছে মেহনতের পিছনে, ততদিন অনিবার্যভাবেই এ সমাজ বিভক্ত থাকছে শ্রেণীতে। পুরোপুরি মেহনতের যারা বাঁধা গোলাম, সেই বিপুল অধিকাংশের পাশাপাশি উদিত হয় প্রত্যক্ষ উৎপাদনী শ্রম থেকে মুক্ত একটা শ্রেণী, যারা সমাজের সাধারণ বিষয়গুলির দেখাশোনা করে, যেমন শ্রম পরিচালনা, রাষ্ট্রীয় কর্ম, আইন, বিজ্ঞান, শিল্প ইত্যাদি। সুতরাং শ্রম-বিভাগের নিয়মটাই আছে শ্রেণী-বিভাগের মূলে। কিন্তু তাতে করে বলাৎকার ও লুণ্ঠন, বুজরুকি ও জুয়াচুরির দ্বারা এই শ্রেণী-বিভাগ সম্পাদন আটকায়

না। শাসক শ্রেণী একবার আধিপত্য পাবার পর শ্রমিক শ্রেণীর বিনিময়ে তার ক্ষমতা সংহত করা, সামাজিক নেতৃত্বটাকে জনগণের তীব্রতর শোষনে পরিণত করা, এ সব তার আটকায় না।

কিন্তু এ স্বীকৃতি অনুসারে শ্রেণী-বিভাগের যদি একটা বিশেষ ঐতিহাসিক ন্যায্যতা থেকে থাকে, তবে তা শুধু একটা বিশেষ যুগের জন্য, কেবল একটা নির্দিষ্ট সামাজিক পরিস্থিতির আমলে। তার ভিত্তি ছিল উৎপাদনের অপ্রতুলতা। আধুনিক উৎপাদন-শক্তির পূর্ণ বিকাশের ফলে তা ভেসে যাবে। এবং বস্তুত, সমাজের শ্রেণী বিলোপে ঐতিহাসিক বিকাশের এমন একটা মাত্রা ধরে নেওয়া হয় যেখানে অমুক অমুক বিশেষ শাসক শ্রেণী কেবল নয়, যে কোনো রকম শাসক শ্রেণীরই এবং সেই হেতু, শ্রেণী-ভেদের অস্তিত্বই হয়ে উঠেছে এক অপ্রচলিত কাল-ব্যতিক্রম। সুতরাং, তা ধরে নেয় উৎপাদনের এমন একটা পর্যায়ে বিকাশ, যেখানে সমাজের একটা বিশেষ শ্রেণী কর্তৃক উৎপাদনের উপায় ও উৎপন্ন দ্রব্যের দখল এবং সেই সঙ্গে রাজনৈতিক আধিপত্য, সংস্কৃতি ও বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্বের একচেটিয়া অধিকার শুধু যে অপ্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে তাই নয়, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক ভাবে হয়ে দাঁড়াচ্ছে বিকাশের প্রতিবন্ধক।

এ সীমায় এখন আমরা পৌঁছেছি। বুর্জোয়াদের রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক দেউলিয়াপনা স্বয়ং বুর্জোয়াদের কাছেও আর গোপন নয়। তাদের অর্থনৈতিক দেউলিয়াপনার আবির্ভাব ঘটছে নিয়মিতভাবে প্রতি দশ বছর অন্তর। প্রতিটি সংকটেই সমাজ শ্বাসরুদ্ধ হয়ে উঠছে তারই উৎপাদন-শক্তি ও উৎপন্নের চাপে — তাকে সে আর ব্যবহার করতে পারছে না, অসহায়ের মতো সে এই অদ্ভুত স্ববিরোধের সম্মুখীন যে, উৎপাদকদের ভোগ্য কিছুই নেই কেননা খরিদ্দার নেই। পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতি যে নিগড় চাপিয়েছিল তা ফেটে বেরচ্ছে উৎপাদন-উপায়ের সম্প্রসারণী শক্তি। উৎপাদন-শক্তির অবিচ্ছিন্ন নিয়ত ত্বরান্বিত বিকাশ এবং সেই সঙ্গে উৎপাদনের প্রায় সীমাহীন বৃদ্ধির একমাত্র পূর্বসর্ত হল এই সব নিগড় থেকে উৎপাদন-উপায়ের মুক্তি। শুধু তাই নয়। উৎপাদন-উপায়ের ওপর সামাজিক দখলের ফলে শুধু যে উৎপাদনের বর্তমান কৃত্রিম বাধাগুলি দূর হয়ে যায় তাই নয়, দূর হয় উৎপাদন-শক্তি ও উৎপন্নের সেই প্রত্যক্ষ অপচয় ও সর্বনাশ, যা বর্তমানে উৎপাদনের একটা অপরিহার্য অঙ্গ এবং সংকটকালে যা সর্বোচ্চে ওঠে। অধিকন্তু, আজকের শাসক শ্রেণী ও তাদের রাজনৈতিক প্রতিনিধিদের কাণ্ডজ্ঞানহীন অমিতাচারের অবসান করে তা উৎপাদন-উপায় ও উৎপন্নের একটা বড়ো অংশকে উন্মুক্ত করে দেয় সাধারণ সমাজের জন্য। সমাজীকৃত উৎপাদন দ্বারা সমাজের প্রতিটি সদস্যের জন্য বৈষয়িকভাবে পর্যাপ্ত এবং দিন দিন পরিপূর্ণতর একটা অস্তিত্বই শুধু নয়, সকলের কায়িক ও মানসিক বৃত্তির অবাধ বিকাশ ও প্রয়োগের

নিশ্চিতি-দেওয়া একটা অস্তিত্ব অর্জনের যে সম্ভাবনা, সে সম্ভাবনা এই প্রথম এলেও এসে গেছে।*

সমাজ কর্তৃক উৎপাদনের উপায় দখলের পর অবসান হয় পণ্য-উৎপাদনের এবং যুগপৎ উৎপাদকের ওপর উৎপন্নের আধিপত্যের। সামাজিক উৎপাদনে নৈরাজ্যের বদলে আসে ধারাবাহিক নির্দিষ্ট সংগঠন। ব্যক্তিগত অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম অন্তর্হিত হয়। একটা বিশেষ অর্থে তখনই সেই প্রথম মানুষ অবশিষ্ট প্রাণীজগৎ থেকে চূড়ান্তভাবে তফাত হয়ে অস্তিত্বের নিতান্ত পাশবিক পরিস্থিতি থেকে উত্তীর্ণ হয় সত্যকার মানবিক পরিস্থিতিতে। জীবনধারণের যে ক্ষেত্রটা মানুষকে ঘিরে আছে এবং এযাবৎ তার ওপর আধিপত্য করেছে সেই সমগ্র ক্ষেত্রটা এখন মানুষের আধিপত্য ও নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আসে — এই প্রথম মানুষ হয়ে ওঠে প্রকৃতির সত্যকার সচেতন প্রভু এই কারণে যে স্বীয় সমাজ-সংগঠনের প্রভু সে হতে পারল। তারই নিজ সামাজিক ক্রিয়ার যে নিয়ম এতদিন প্রাকৃতিক নিয়মের মতো অজ্ঞাতসারে তার সম্মুখীন হয়েছে, তার ওপর আধিপত্য করেছে, তা এখন ব্যবহৃত হবে পরিপূর্ণ বোধের সঙ্গে, এবং সেই হেতু তার ওপর প্রভুত্ব করবে মানুষ। মানুষেরই নিজ যে সামাজিক সংগঠন এতদিন প্রকৃতি ও ইতিহাস থেকে চাপানো এক আবশ্যিকতা রূপে তার সম্মুখীন হয়েছে, সে সংগঠন এখন হয়ে দাঁড়ায় তারই স্বাধীন কর্মের ফল। যে বহির্ভূত বাস্তব শক্তিগুলি এতদিন ইতিহাসকে শাসন করেছে তা চলে আসে মানুষেরই নিয়ন্ত্রণের অধীনে। শুধু সেই সময় থেকেই ক্রমসচেতনভাবে মানুষই রচনা করবে তার স্বীয় ইতিহাস, কেবল সেই সময় থেকেই মানুষ যে সামাজিক কারণগুলিকে গতিদান করবে সেগুলি প্রধানত এবং ক্রমবর্ধমান পরিমাণে তারই বাঞ্ছিত ফলপ্রসব করবে। এ হল আবশ্যিকতার রাজ্য থেকে স্বাধীনতার রাজ্যে মানুষের উত্তরণ।

আমাদের ঐতিহাসিক বিবর্তনের সংক্ষেপ রূপরেখার সারসংকলন করা যাক।

১। মধ্যযুগীয় সমাজ — ক্ষুদ্রাকার ব্যক্তিগত উৎপাদন। উৎপাদনের উপায়

* পুঁজিবাদী চাপের তলেও আধুনিক উৎপাদন-উপায়ের বিপুল সম্প্রসারণী শক্তির একটা মোটামুটি ধারণা পাওয়া যাবে গোটাকতক সংখ্যা থেকে। মিঃ গিফেনের মতে, গ্রেট ব্রটেন ও আয়র্ল্যাণ্ডের মোট সম্পদের পরিমাণ পূর্ণসংখ্যায়:

১৮১৪ সাল — ২২০,০০,০০,০০০ পাউণ্ড,

১৮৬৫ সাল — ৬১০,০০,০০,০০০ পাউণ্ড,

১৮৭৫ সাল — ৮৫০,০০,০০,০০০ পাউণ্ড।

সংকটকালে উৎপাদন-উপায় ও উৎপন্নের অপচয়ের দৃষ্টান্তস্বরূপ, ১৮৭৩—১৮৭৮ সালের সংকটে কেবল জার্মান লৌহ শিল্পেরই মোট ক্ষতির পরিমাণ ২,২৭,৫০,০০০ পাউণ্ড বলে দ্বিতীয় জার্মান শিল্প-কংগ্রেসে (বার্লিন, ২১শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৮) উল্লিখিত হয়। (এঙ্গেলসের টীকা।)

ব্যক্তিগত ব্যবহারের উপযোগী; সেই হেতু আদিম, অশোভন, নগণ্য, ক্রিয়া তাদের খর্বিত। হয় স্বয়ং উৎপাদক নয় তার সামন্ত প্রভুর আশ্ম ভোগের জন্য উৎপাদন। এই ভোগের ওপর যদি কখনো একটা উদ্বৃত্তি ঘটে কেবল তখনই সে উদ্বৃত্তিটা বিক্রয়ের জন্য ছাড়া হয়, বিনিময়ের মধ্যে আসে। সুতরাং পণ্যের উৎপাদন নিতান্ত তার শৈশবে। তবু তখনই তার মধ্যে ভ্রূণাবস্থায় নিহিত **সামাজিক উৎপাদনের নৈরাজ্য।**

২। **পুঁজিবাদী বিপ্লব** — প্রথমে সরল সমবায় ও কারখানার সাহায্যে শিল্পের রূপান্তর। এযাবৎ বিচ্ছিন্ন উৎপাদন-উপায়গুলির বড়ো বড়ো কারখানার মধ্যে কেন্দ্রীভবন। ফলস্বরূপ, ব্যক্তিগত থেকে সামাজিক উৎপাদন-উপায়ে তাদের রূপান্তর — এ রূপান্তরে বিনিময়ের ধরন মোটের ওপর অপ্রভাবিত। দখলের পূর্বতন ধরনগুলিই বহাল। পুঁজিপতির উদয়। উৎপাদন-উপায়ের মালিক হিসাবে সে উৎপন্নকেও দখল করে এবং তাকে রূপান্তরিত করে পণ্যে। উৎপাদন হয়ে দাঁড়ায় একটা **সামাজিক** কাজ। বিনিময় ও দখল থেকেই যায় **ব্যক্তিগত** কাজ, এক একটা ব্যক্তির ব্যাপার। **সামাজিক উৎপন্ন দখল করে ব্যক্তি পুঁজিপতি।** মৌলিক বিরোধ, তা থেকে অন্য সবকিছু বিরোধের উদয়, যার মধ্যে দিয়ে চলেছে আমাদের সমাজ এবং আধুনিক শিল্প যা উদ্ঘাটিত করছে।

ক। উৎপাদনের উপায় থেকে উৎপাদকের বিচ্ছেদ। শ্রমিকদের জন্য আজীবন মজুরি-শ্রমের ব্যবস্থা। **প্রলেতারিয়েত ও বুর্জোয়ার মধ্যে বৈরিতা।**

খ। পণ্য-উৎপাদন যে নিয়মগুলির অধীন সেগুলির বর্ধমান আধিপত্য ও ক্রমাধিক কার্যকারিতা। বেপরোয়া প্রতিযোগিতা। **এক একটা ফ্যাক্টরিতে সমাজীকৃত সংগঠন এবং সামগ্রিক উৎপাদনের সামাজিক নৈরাজ্যের মধ্যে বিরোধ।**

গ। একদিকে, প্রতিযোগিতার ফলে প্রতিটি ব্যক্তিগত কলওয়ালার পক্ষে যা বাধ্যতামূলক, যন্ত্রের সেই ক্রমোন্নতি এবং তার অনুপূরক হিসাবে শ্রমিকদের নিয়ত বর্ধমান কর্মচ্যুতি। **শিল্পের মজুত বাহিনী।** অন্যদিকে, — এটাও প্রতিযোগিতার ফলে প্রতিটি কলওয়ালার পক্ষে বাধ্যতামূলক উৎপাদনের সীমাহীন প্রসার। দুদিকেই উৎপাদন-শক্তির অশ্রুতপূর্ব বিকাশ, চাহিদার তুলনায় জোগানের আধিক্য, অতি-উৎপাদন, বাজার জাম, প্রতি দশ বছর অন্তর সংকট, পাপ চক্র: এদিকে উৎপাদন-উপায় ও উৎপন্নের আধিক্য — ওদিকে কর্মহীন ও জীবিকাহীন শ্রমিকদের আধিক্য। কিন্তু উৎপাদন ও সামাজিক সমৃদ্ধির এই দুটি কারিকা একত্রে সক্রিয় হতে অক্ষম কারণ উৎপাদনের পুঁজিবাদী পদ্ধতি উৎপাদন-শক্তিকে আটকে রাখে কাজ থেকে এবং উৎপন্নকে আটকে রাখে সঞ্চালন থেকে — যদি না তারা প্রথমে পরিণত হয় পুঁজিতে, কিন্তু এই অতি আধিক্যেই তা অসম্ভব। এ বিরোধ বেড়ে ওঠে এক অদ্ভুত স্তরে। **বিনিময় ধরনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে উৎপাদন-পদ্ধতি।** নিজেদেরই সামাজিক উৎপাদন-শক্তিকে আর পরিচালনা করতে অসামর্থ্যের দ্বারা বুর্জোয়ারা অভিযুক্ত।

ঘ। উৎপাদন-শক্তির সামাজিক চরিত্রের আংশিক স্বীকৃতি দিতে পুঁজিপতিরা নিজেরাই বাধ্য হয়। উৎপাদন ও যোগাযোগের বড়ো বড়ো প্রতিষ্ঠানগুলিকে হাতে নেয় প্রথমে জয়েণ্ট-স্টক কোম্পানি, পরে ট্রাস্ট, অতঃপর রাষ্ট্র। অনাবশ্যক শ্রেণী রূপে প্রমাণিত হয় বুর্জোয়ারা। তাদের সামাজিক ক্রিয়ার সবই এখন চলে বেতনভোগী কর্মচারী দ্বারা।

৩। **প্রলেতারীয় বিপ্লব** — বিরোধসমূহের সমাধান। সামাজিক ক্ষমতা দখল করে প্রলেতারিয়েত তার দ্বারা বুর্জোয়ার হাত থেকে স্খলিত সমাজীকৃত উৎপাদন-উপায়গুলিকে পরিণত করে সাধারণ সম্পত্তিতে। এ কাজের ফলে উৎপাদনের উপায়গুলি এতদিন যে পুঁজিরূপ চরিত্র ধারণ করেছিল তা থেকে প্রলেতারিয়েত তাদের মুক্ত করে তাদের সমাজীকৃত চরিত্রটার পরিপূর্ণ কাজ করে যাবার স্বাধীনতা এনে দেয়। পূর্বনির্দিষ্ট একটা পরিকল্পনায় সমাজীকৃত উৎপাদন এখন থেকে সম্ভব হয়। উৎপাদনের বিকাশের ফলে তখন থেকে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর অস্তিত্ব কাল-ব্যতিক্রম হয়ে দাঁড়ায়। সামাজিক উৎপাদন থেকে যে পরিমাণে নৈরাজ্য অন্তর্ধান করতে থাকে সেই পরিমাণে মরে যেতে থাকে রাষ্ট্রের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব। মানুষ অবশেষে নিজেরই সমাজ-সংগঠনের প্রভু হবার সঙ্গে সঙ্গে যুগপৎ হয়ে দাঁড়ায় প্রকৃতির প্রভু, নিজের প্রভু — মুক্ত।

সার্বজনীন মুক্তির এই কর্মই হল আধুনিক প্রলেতারিয়েতের ঐতিহাসিক ব্রত। ঐতিহাসিক অবস্থাটিকে পুরোপুরি বোঝা, এবং সে কারণে এই কর্মের চরিত্র প্রণিধান করা, যে স্মরণীয় কীর্তি প্রলেতারিয়েতের সাধন করার কথা তার অবস্থা ও তাৎপর্যের পরিপূর্ণ জ্ঞানদান করা আজকের নিপীড়িত প্রলেতারীয় শ্রেণীকে, এই হল প্রলেতারীয় আন্দোলনের তাত্ত্বিক যে প্রকাশ সেই বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের কর্তব্য।

এঙ্গেলস কর্তৃক লিখিত ১৮৭৭ সালে
প্যারিসে ফরাসী ভাষায় পৃথক পুস্তিকাকারে
প্রকাশিত ১৮৮০ সালে,
জার্মান ভাষায় জুরিখে ১৮৮৩ সালে,
বার্লিনে ১৮৯১ সালে এবং ইংরেজি ভাষায়
লণ্ডনে ১৮৯২ সালে

১৮৯২ সালের প্রামাণ্য ইংরেজি সংস্করণের পাঠ
থেকে বাংলা অনুবাদ

ফ্রেডারিক এঙ্গেলস

কার্ল মার্ক্স

কার্ল মার্কসই সর্বপ্রথম সমাজতন্ত্রের এবং তার ফলে আমাদের যুগের সমগ্র শ্রমিক আন্দোলনের বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তি দিয়ে যান। মার্কসের জন্ম হয় ১৮১৮ সালে ট্রিভস শহরে। তিনি বন এবং বার্লিনে পড়াশোনা করেন। গোড়ায় তিনি আইন পড়তে শুরু করেছিলেন, কিন্তু শীঘ্রই ইতিহাস ও দর্শন চর্চায় পুরোপুরিভাবে আত্মনিয়োগ করলেন। ১৮৪২ সালে তিনি যখন দর্শনের সহকারী অধ্যাপকরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করছেন এমন সময়ে তৃতীয় ফ্রিদরিখ-ভিলহেল্‌মের মৃত্যুকাল থেকে যে রাজনৈতিক আন্দোলন শুরু হয় তা তাঁর জীবনের গতি সম্পূর্ণ বদলে দিল। মার্কসের সহযোগিতায় কাম্পহাউজেন, হানজেমান প্রভৃতি রাইন উদারপন্থী বুর্জোয়া শ্রেণীর নেতারা কলোন শহরে *Rheinische Zeitung* প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১৮৪২ সালের শরৎকালে মার্কসকে এই পত্রিকার সম্পাদকের পদে আমন্ত্রণ করা হয় — রেনিশ প্রাদেশিক সভার কার্যাবলী সম্পর্কে তাঁর সমালোচনা ইতিমধ্যে বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। অবশ্য *Rheinische Zeitung* সেন্সরাধীন অবস্থায় প্রকাশিত হত, কিন্তু সেন্সর এ পত্রিকাকে সামলে উঠতে পারত না।* প্রায় সবক্ষেত্রেই *Rheinische Zeitung* প্রয়োজনীয় প্রবন্ধগুলি বের করে দিত; প্রথমদিকে সেন্সরকে আজেবাজে সব মালমশলা যোগানো হত বাতিল করার জন্য। শেষ পর্যন্ত সে নিজের থেকেই ছেড়ে দিত অথবা পরদিন কাগজ বেরোবে না এই হুমকিতে ছেড়ে দিতে বাধ্য হত। *Rheinische Zeitung*-এর মতো সাহসসম্পন্ন আর দশটা কাগজ থাকলে আর তার প্রকাশকরা টাইপ কম্পোজ বাবদ কয়েক শ' টেলার বাড়তি খরচ মঞ্জুর করলে ১৮৪৩ সালের মধ্যেই জার্মানিতে সেন্সর ব্যবস্থা অচল হয়ে পড়ত। কিন্তু জার্মানির সংবাদপত্রের মালিকেরা ছিল ক্ষুদ্রমনা, ভীরু

* *Rheinische Zeitung*-এর প্রথম সেন্সর ছিলেন পুলিশ কাউন্সিলার দোলেশাল। এই লোকটিই *Kölnische Zeitung*-এ দান্তের 'ডিভাইন কমেডির' ফিলালেথেস কৃত (পরে সাকসনির রাজা জন) অনুবাদের বিজ্ঞাপন কেটে দিয়ে লিখেছিলেন, 'দৈব ব্যাপার নিয়ে প্রহসন (comedy) করা উচিত নয়'। (এঙ্গেলসের টীকা।)

ফিলিস্তাইন, তাই *Rheinische Zeitung* একাই সংগ্রাম চালাল। তার হাতে একের পর এক সেন্সর কাবু হয়ে পড়ার পর শেষ পর্যন্ত দ্বৈত সেন্সরের ব্যবস্থা হল। প্রথম সেন্সরের পর Regierungspräsident* আরেকবার শেষ বারের মতো ও কাগজকে সেন্সর করত। কিন্তু তাতেও কোনো লাভ হল না। ১৮৪৩ সালের গোড়ায় সরকার ঘোষণা করল যে, এ কাগজকে সামলে রাখা অসম্ভব এবং আর কোনো বাক্যব্যয় না করে সোজাসুজি কাগজ বন্ধ করে দিল।

এর মধ্যে মার্কস পরবর্তী প্রতিক্রিয়ার মন্ত্রী ফন ভেস্তফালেনের বোনকে বিয়ে করেছেন। এবার তিনি প্যারিসে চলে এসে এ. রুগের সহায়তায় সেখানে 'জার্মান-ফরাসী বার্ষিকী' প্রকাশ করতে লাগলেন। এই কাগজে তাঁর সমাজতান্ত্রিক রচনার ধারা শুরু হয় 'আইন সম্পর্কে হেগেলীয় দর্শনের সমালোচনা' দিয়ে। তারপর সে কালের জার্মানির দার্শনিক ভাববাদ যেসব নতুন রূপ গ্রহণ করেছিল তারই একটা আধুনিক রূপকে ব্যঙ্গাত্মক সমালোচনা করে এঙ্গেলসের সঙ্গে একত্রে লিখলেন 'পবিত্র পরিবার। ব্রুনো বাউয়ের কোম্পানির বিরুদ্ধে'।

অর্থশাস্ত্র এবং মহান ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস নিয়ে চর্চা করেও মার্কস মধ্যে মধ্যে প্রুশীয় সরকারের উপর আক্রমণ চালানোর মতো বেশ সময় পেতেন। ১৮৪৫ সালের বসন্তকালে গিজো মন্ত্রিসভাকে দিয়ে ফ্রান্স থেকে মার্কসের নির্বাসনের আদেশ মঞ্জুর করিয়ে নিয়ে প্রুশীয় সরকার তার প্রতিশোধ নিল — শোনা যায় যে আলেক্সান্দর ফন হুমবল্দের এ ব্যাপারে মাধ্যম হিসাবে কাজ করেছিলেন। মার্কস এলেন ব্রাসেলসে এবং সেখানে ১৮৪৭ সালে প্রুধোঁর 'দারিদ্র্যের দর্শনের' সমালোচনা করে ফরাসী ভাষায় প্রকাশ করলেন 'দর্শনের দারিদ্র্য', আর ১৮৪৮ সালে 'অবাধ বাণিজ্য সম্পর্কে বক্তৃতা'। এরই সঙ্গে সঙ্গে ব্রাসেলসে জার্মান শ্রমিকদের একটি সমিতি গড়ার সুযোগ কাজে লাগিয়ে মার্কস ব্যবহারিক আন্দোলন শুরু করে দিলেন। ১৮৪৭ সালে যখন মার্কস এবং তাঁর রাজনৈতিক বন্ধুরা গুপ্ত 'কমিউনিস্ট লীগে' ঢুকলেন তখন তাঁর কাছে এই আন্দোলন চালানোর গুরুত্ব আরো বেড়ে গেল। 'কমিউনিস্ট লীগ' কয়েক বছর আগে থেকেই বর্তমান ছিল। এবার তার পুরো গঠন ব্যবস্থায় মৌলিক পরিবর্তন এল। এই সমিতিটি এতদিন ছিল মোটামুটিভাবে ষড়যন্ত্রমূলক সংগঠন, এবার তাকে বদলে দাঁড় করানো হল কমিউনিস্ট প্রচারের সাধারণ সংগঠনে, জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির প্রথম সংগঠন। সেটা যে গুপ্ত সংগঠন হিসাবেই রইল তা নিতান্ত প্রয়োজনের তাগিদে। যেখানেই জার্মান শ্রমিকদের ইউনিয়নের খোঁজ মিলত সেখানেই 'লীগ' ছিল। ইংলন্ড,

* *Regierungspräsident* — প্রাশিয়ায় কেন্দ্রীয় শাসন বিভাগের আঞ্চলিক প্রতিনিধি। — সম্পাঃ

বেলজিয়ম, ফ্রান্স এবং সুইজারল্যান্ডের প্রায় সব ইউনিয়নের এবং জার্মানির বহু ইউনিয়নের নেতৃস্থানীয় সদস্যরা 'লীগের' সদস্য ছিলেন এবং উদীয়মান জার্মান শ্রমিক আন্দোলনে 'লীগের' ভূমিকা ছিল বেশ গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া, আমাদের 'লীগই' প্রথম সমগ্র শ্রমিক আন্দোলনের আন্তর্জাতিক চরিত্রের উপর জোর দেয় আর তা কাজে রূপায়িত করে, — এ 'লীগে' ইংরেজ, বেলজিয়ান, হাঙ্গেরীয়, পোলীয় প্রভৃতি নানা দেশের সদস্য ছিল আর এ 'লীগ', বিশেষত লন্ডনে, নানা আন্তর্জাতিক শ্রমিক সভার আয়োজন করত।

১৮৪৭ সালে আহূত দুটি সম্মেলনে 'লীগের' রূপান্তর সাধিত হয়। এই সম্মেলনের দ্বিতীয়টিতে স্থির হয় যে পার্টি কর্মসূচির মূলনীতি সংরচিত ও প্রকাশিত হবে ইশতেহার রূপে। মার্কস ও এঙ্গেলস তা রচনা করবেন। এইভাবেই 'কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহারের' সৃষ্টি হল। ১৮৪৮ সালে, ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের অল্প কিছুদিন আগে এই 'ইশতেহার' প্রথম প্রকাশিত হয় আর তারপর থেকে ইউরোপের প্রায় সব ভাষায় এটি অনূদিত হয়েছে।

*Deutsche Brüsseler Zeitung** ক্ষমাহীনভাবে পিতৃভূমির পুলিশী শাসন-ব্যবস্থার সুফলের স্বরূপ খুলে ধরত। মার্কসও এই কাগজে লিখতেন। এর ফলে প্রুশীয় সরকার আরেকবার মার্কসকে নির্বাসিত করার দাবী করল, কিন্তু এবার সফল হল না। কিন্তু ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের ফলে যখন ব্রাসেলসেও গণ-আন্দোলন দেখা দিল এবং বেলজিয়মে এক আমূল পরিবর্তন আসন্ন বলে মনে হল তখন বেলজিয়ান সরকার বিনা বাক্যব্যয়ে মার্কসকে গ্রেপ্তার করে দেশ থেকে নির্বাসিত করে। ইতিমধ্যে ফ্লাকোর মাধ্যমে ফরাসী অস্থায়ী সরকার তাঁকে প্যারিসে ফিরে যাবার আমন্ত্রণ জানিয়েছিল, মার্কস সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করল্লেন।

বিপ্লব ও প্রজাতন্ত্রকে জার্মানির মধ্যে নিয়ে যাবার উদ্দেশ্যে ফ্রান্সে জার্মান শ্রমিকদের সশস্ত্র বাহিনী গড়তে চাওয়ার যে ধাপ্পাটা তখন সেখানকার জার্মানদের মধ্যে বহু প্রচলিত ছিল, প্যারিসে মার্কস বিশেষ করে তার বিরুদ্ধতা করলেন। প্রথমত, জার্মানিতে বিপ্লব জার্মানিকে নিজেই ঘটাতে হবে। দ্বিতীয়ত, ফ্রান্সে যত বিপ্লবী বিদেশী বাহিনী গড়া হয়েছিল তার সবগুলিকেই অস্থায়ী সরকারের লামার্তিন গোষ্ঠীরা বিশ্বাসঘাতকতা করে যে সরকারকে উচ্ছেদ করার কথা তারই কাছে ধরিয়ে দিত। বেলজিয়মে ও বাদেনে তাই ঘটেছিল।

* *Deutsche Brüsseler Zeitung* (জার্মান ব্রাসেলস গেজেট) — ব্রাসেলসে জার্মান রাজনৈতিক দেশান্তরীদের মুখপত্র। ১৮৪৭ সাল থেকে ১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত প্রকাশিত হয়। ১৮৪৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মার্কস ও এঙ্গেলস এটির নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। — সম্পাঃ

মার্চ বিপ্লবের পর মার্কস কলোন শহরে গিয়ে সেখানে *Neue Rheinische Zeitung* প্রতিষ্ঠা করলেন। ১৮৪৮ সালের ১লা জুন থেকে ১৮৪৯ সালের ১৯শে মে পর্যন্ত এই কাগজটি প্রকাশিত হয়। একমাত্র এই কাগজই সে যুগের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্যে প্রলেতারিয়েতের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিনিধিত্ব করত। ১৮৪৮ সালের জুন মাসের প্যারিস বিদ্রোহীদের অকুণ্ঠ সমর্থনেই তা দেখা যায়। এর ফলে কাগজের প্রায় সব অংশীদারই কাগজ ছেড়ে দিল। আট হাজার সৈন্যসম্বলিত এক প্রুশীয় দুর্গে বসেই *Neue Rheinische Zeitung* চিম্বোরাজো* ঔদ্ধত্য নিয়ে রাজ্যের রাজা ও ভাইস রিজেণ্ট থেকে শুরু করে নিম্নতম সশস্ত্র পুলিশ পর্যন্ত যা কিছু পবিত্র সব কিছুর বিরুদ্ধে যে আক্রমণ চালাত তার দিকে *Kreuzzeitung*** বৃথাই দৃষ্টি আকর্ষণ করত। হঠাৎ প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে ওঠা রেনিশ উদারপন্থী ফিলিস্তিনরা বৃথাই ফুঁসত। ১৮৪৮ সালের শরৎকালে কলোনের সামরিক আইনে বৃথাই এ কাগজকে দীর্ঘদিন বন্ধ করে রাখা হল। মামলা দায়ের দাবিতে ফ্রাংকফুর্তের রাইখ মন্ত্রিসভার বিচারমন্ত্রিদপ্তর বৃথাই এর প্রবন্ধের পর প্রবন্ধকে অভিযুক্ত করে পাঠাতে থাকল কলোনের সরকারী অভিশংসকের কাছে। পুলিশের চোখের সামনেই শান্তভাবে কাগজটি সম্পাদিত ও মুদ্রিত হতে থাকল। আর সরকার ও বুর্জোয়া শ্রেণীর ওপর এর আক্রমণের তীব্রতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই কাগজের প্রচার আর নামও বাড়তে থাকল। ১৮৪৮ সালের নভেম্বর মাসে প্রুশীয় কুদেতার পর *Neue Rheinische Zeitung* প্রতি সংখ্যার শিরোনামায় জনসাধারণকে আহ্বান জানাল তারা যেন কর না দেয় আর বলপ্রয়োগেই যেন জবাব দেয় বলপ্রয়োগের। এর জন্য এবং আরেকটি প্রবন্ধের জন্য ১৮৪৯ সালের বসন্তকালে কাগজের কর্তৃপক্ষকে জুরীর সামনে হাজির করা হয়। কিন্তু দু দফায়ই তাঁরা নিরাপরাধ বলে প্রমাণিত হন। শেষ পর্যন্ত দ্রেজদেন ও রাইন প্রদেশে ১৮৪৯ সালের মে অভ্যুত্থান যখন দমিত হল এবং বহুসংখ্যক সৈন্য সমাবেশ ও কেন্দ্রীভূত করে বাদেন-পালাতিনেত অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে প্রুশীয় অভিযানের উদ্বোধন হল তখন সরকার মনে করল যে জোর করে *Neue Rheinische Zeitung* বন্ধ করে দেওয়ার মতো শক্তি তাদের আছে। লাল কালিতে ছাপা কাগজটির শেষ সংখ্যা বেরোয় ১৯শে মে।

মার্কস আবার প্যারিসে গেলেন। কিন্তু ১৮৪৯ সালের ১৩ই জুনের মিছিলের মাত্র কয়েক সপ্তাহ পরেই ফরাসী সরকার তাঁকে জানাল যে হয় তাঁকে ব্রিট্যানিতে গিয়ে

* চিম্বোরাজো — দক্ষিণ আমেরিকার আন্দিজ পর্বতমালার উচ্চতম একটি শিখর। — সম্পাঃ

** *Kreuzzeitung* (ক্রুশের গেজেট) — প্রতিক্রিয়াশীল রাজতন্ত্রী দৈনিক *Neue Preussische Zeitung* (নতুন প্রুশীয় পত্রিকা) সাধারণত এই নামে পরিচিত ছিল। ১৮৪৮ সাল থেকে বার্লিনে এটি প্রকাশিত হয়। এর শিরোনামায় একটি ক্রুশ আঁকা থাকত। — সম্পাঃ

বসবাস করতে হবে নয় তো ফ্রান্স ছাড়তে হবে। মার্কস দ্বিতীয় পথটাই বেছে নিয়ে লন্ডনে চলে এলেন। তারপর থেকে তিনি একটানাভাবে সেখানেই থেকেছেন।

প্রতিক্রিয়ার হিংস্রতা অনবরত বাড়তে থাকায় সমালোচনা পত্রের আকারে *Neue Rheinische Zeitung* প্রকাশ করে যাওয়ার চেষ্টাটা (হামবুর্গে, ১৮৫০ সালে) কিছুদিন পরে ছেড়ে দিতে হয়। ১৮৫১ সালের ডিসেম্বর মাসে ফ্রান্সে কুদেতার ঠিক পরই মার্কস 'লুই বোনাপার্টের আঠারোই ব্রুমেয়ার' প্রকাশ করলেন (বস্টন, ১৮৫২; দ্বিতীয় সংস্করণ — হামবুর্গ, ১৮৬৯, যুদ্ধের অল্পদিন আগে)। ১৮৫৩ সালে তিনি লিখলেন 'কলোনে কমিউনিস্টদের বিচারের স্বরূপ প্রকাশ' (এটি প্রথমে বাজলে, তারপর বস্টনে এবং সম্প্রতি ফের লাইপজিগে প্রকাশিত হয়েছে)।

কলোনে 'কমিউনিস্ট লীগের' সদস্যদের শাস্তি হয়ে যাওয়ার পর মার্কস রাজনৈতিক প্রচার কার্য থেকে সরে এলেন। প্রথমত, দশ বছর ধরে তিনি আত্মনিয়োগ করে রইলেন অর্থশাস্ত্রের ক্ষেত্রে যেসব অমূল্য সম্পদ ব্রিটিশ মিউজিয়মের গ্রন্থাগারে ছিল সেগুলি অধ্যয়ন করার জন্য আর দ্বিতীয়ত, *New York Daily Tribune*-এ* লেখার কাজে, আমেরিকান গৃহযুদ্ধ শুরু হওয়া পর্যন্ত এ কাগজে তাঁর স্বাক্ষরিত বহু লেখা বেরোয় তাই নয়, ইউরোপ ও এশিয়ার অবস্থা সম্পর্কে তাঁর লেখা বহু সম্পাদকীয় প্রবন্ধও বেরোয়। ব্রিটিশ সরকারী নথিপত্র পুংখানুপুংখ অধ্যয়নের ভিত্তিতে তিনি লর্ড পামারস্টোনের যেসব তীব্র সমালোচনা করেন সেগুলি লন্ডনে পুস্তিকা আকারে পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল।

তাঁর বহুবৎসরব্যাপী অর্থনীতি চর্চার প্রথম ফল হিসেবে ১৮৫৯ সালে বেরোল 'অর্থশাস্ত্রের সমালোচনা প্রসঙ্গে' প্রথম অংশ (বার্লিন, ডাঙ্কের)। এ রচনায় থাকে মুদ্রাতত্ত্ব সহ মূল্যের মার্কসীয় তত্ত্বের প্রথম সুসঙ্গত বিবরণ। ইতালীয় যুদ্ধের সময়ে *Das Volk*** নামে লন্ডনে প্রকাশিত এক জার্মান পত্রিকায় মার্কস বোনাপার্টপন্থা ও সে যুগের প্রুশীয় নীতির বিরুদ্ধে আক্রমণ চালান। তখন বোনাপার্টপন্থীরা উদারনৈতিকতার ভান করত আর নিপীড়িত জাতিগুলির মুক্তিদাতা হিসাবে নিজেদের জাহির করত। আর প্রুশীয় নীতির তখন উদ্দেশ্য ছিল নিরপেক্ষতার আড়ালে ঘোলা জলে মাছ ধরা। এই সূত্রে কার্ল ফগ্‌তকে আক্রমণ করাও প্রয়োজন

* *New York Daily Tribune* — গণতান্ত্রিক দৈনিক পত্রিকা। ১৮৪১ সাল থেকে ১৯২৪ সাল পর্যন্ত নিউ ইয়র্কে এ কাগজটি বেরোয়। মার্কস এ কাগজে লিখতেন ১৮৫১ সাল থেকে ১৮৬২ সাল পর্যন্ত। — সম্পাঃ

** *Das Volk* (জনগণ) — এই জার্মান পত্রিকাটি ১৮৫৯ সালের মে মাস থেকে আগস্ট মাস পর্যন্ত লন্ডনে প্রকাশিত হয়। এর ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন মার্কস। — সম্পাঃ

হল। প্রিন্স নেপোলিয়নের (প্লন-প্লন) নির্দেশে এবং লুই নেপোলিয়নের টাকায় ফগ্‌ত তখন জার্মানির নিরপেক্ষতা, এমনকি সহানুভূতির জন্য প্রচার চালাচ্ছেন। মার্কসের সম্বন্ধে ফগ্‌ত অতি জঘন্য ও উদ্দেশ্য-প্রণোদিত সব মিথ্যা কুৎসা রটনা করায় মার্কস তার জবাবে লিখলেন 'হের ফগ্‌তে' (লন্ডন, ১৮৬০)। এতে ফগ্‌তের আর বোনাপার্টপন্থী ও মেকি-গণতান্ত্রিক দলের অন্যান্য সব ভদ্রমহোদয়দের স্বরূপ উদ্ঘাটন করে দেওয়া হয় এবং আভ্যন্তরীণ ও বিদেশীয় সাক্ষ্যের ভিত্তিতে ডিসেম্বর সাম্রাজ্যের কাছ থেকে ঘুষ নেবার অভিযোগে অভিযুক্ত হন স্বয়ং ফগ্‌ত। ঠিক দশ বছর বাদে এ অভিযোগ প্রমাণিত হয়। ১৮৭০ সালে টুইলেরিসে বোনাপার্টের ভাড়াটে পেটোয়াদের একটি তালিকা পাওয়া যায়। সেপ্টেম্বর সরকার সেটি প্রকাশ করে দেয়। সেই তালিকায় 'ফ' অক্ষরটির নীচে হিসেব টোকা 'ফগ্‌ত — ১৮৫৯ সালের আগস্টে প্রেরিত... ৪০,০০০ ফ্রাঁ।'

শেষ পর্যন্ত ১৮৬৭ সালে হামবুর্গে বেরোল মার্কসের প্রধান রচনা 'পুঁজি। অর্থশাস্ত্রের সমালোচনা', প্রথম খন্ড। এতে মার্কসের অর্থনৈতিক ও সমাজতান্ত্রিক ধারণার ভিত্তি ব্যাখ্যা করা হয় এবং তদানীন্তন সমাজ, পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতি ও তার ফলাফল সম্পর্কে তাঁর সমালোচনার মূলকথা প্রকাশিত হয়। এই যুগান্তকারী রচনার দ্বিতীয় সংস্করণ বেরোল ১৮৭২ সালে। এখন গ্রন্থকার এই বইটির দ্বিতীয় খণ্ডের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত।

ইতিমধ্যে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে শ্রমিক আন্দোলন এতখানি শক্তি পুনরর্জন করেছে যে, মার্কসের পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠল তাঁর দীর্ঘবাঞ্ছিত একটি আকাঙ্ক্ষা পূরণের কথা ভাবা: ইউরোপ ও আমেরিকার সবচেয়ে অগ্রসর দেশগুলিকে নিয়ে এমন একটি শ্রমিক সমিতি গড়া যেটি শ্রমিকদের নিজেদের কাছে ও বুর্জোয়া শ্রেণী ও সরকার উভয়ের কাছেই সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের আন্তর্জাতিক চরিত্রটি বলা যেতে পারে মূর্তকায়ায় তুলে ধরবে — যাতে প্রলেতারিয়েতের উৎসাহ ও শক্তি বাড়ে, তার শত্রুদের প্রাণে ভীতি সঞ্চার হয়। ১৮৬৪ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর লন্ডনের সেণ্ট মার্টিন হলে পোল্যান্ডের সমর্থনে এক জনসভা হল — ঠিক তখন রাশিয়া আবার পোল্যান্ডকে দলন করেছে। এই সভায় কথাটা তোলার সুযোগ পাওয়া যায় ও তার সোৎসাহ সমর্থন মেলে। **শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতি** প্রতিষ্ঠিত হল। এই সভায় একটি অস্থায়ী সাধারণ পরিষদ নির্বাচিত হয় যার কার্যালয় থাকবে লন্ডনে। এই পরিষদের, এবং হেগ কংগ্রেস পর্যন্ত পরবর্তী সমস্ত পরিষদের প্রাণ ছিলেন মার্কস। ১৮৬৪ সালে উদ্বোধনী ভাষণ থেকে শুরু করে ১৮৭১ সালে ফ্রান্সের গৃহযুদ্ধ সম্পর্কে ভাষণ পর্যন্ত আন্তর্জাতিকের সাধারণ পরিষদ যত দলিল প্রচার করে তার প্রায় সবকটিই লেখেন মার্কস। আন্তর্জাতিকে মার্কসের কার্যকলাপ

বর্ণনা করার মানে এই সমিতির ইতিহাস লেখা এবং সেটা অন্তত এখনও ইউরোপের শ্রমিকদের মনে আছে।

প্যারিস কমিউনের পতনের ফলে আন্তর্জাতিক এক অসম্ভব অবস্থার মধ্যে পড়ল। সফলভাবে ব্যবহারিক কাজ চালানোর সম্ভাবনা থেকে যখন সে সর্বত্রই বঞ্চিত ঠিক সেই সময়ে তাকে ঠেলে দেওয়া হল ইউরোপীয় ইতিহাসের পুরোভাগে। যেসব ঘটনাবলীর ফলে তা উন্নীত হল সপ্তম বৃহৎ শক্তির পদে, ঠিক তাই আবার যুগপৎ নিজের সংগ্রামী বাহিনী সমাবেশ করা ও সেই বাহিনী সংগ্রামে নামানো নিষিদ্ধ করে তুলল, অন্যথায় অবশ্যম্ভাবী পরাজয় ও কয়েক দশকের জন্য শ্রমিক আন্দোলনের পিছুহটা মেনে নিতে হয়। তার ওপর নানাদিক থেকে তখন এমন সব লোক এগিয়ে আসছে যারা 'সমিতির' হঠাৎ বেড়ে ওঠা খ্যাতির সুযোগ নিয়ে ব্যক্তিগত অহমিকা বা ব্যক্তিগত উচ্চাশা চরিতার্থ করতে চাইছে, আন্তর্জাতিকের আসল অবস্থান তারা বোঝেও না আর সে সম্পর্কে তাদের কোনো মাথা ব্যথাও ছিল না। বীরোচিত এক সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। আবার মার্কসই সেই সিদ্ধান্ত নিলেন এবং হেগ কংগ্রেসে সেটি গৃহীত করালেন। এইসব অবিবেচক ও জঘন্য লোকগুলির কেন্দ্র ছিল বাকুনিনপন্থীরা, এক গাম্ভীর্যপূর্ণ ঘোষণায় আন্তর্জাতিক তাদের কার্যকলাপের সব দায়িত্ব অস্বীকার করল। তারপর, আন্তর্জাতিকের ওপর যেসব বর্ধিত দাবী চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছিল, সাধারণ প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সেগুলি পূরণ করা এবং নিজের পূর্ণ কার্যকারিতা বজায় রাখার অসম্ভাবিতার কথা ভেবে, — তা করা যেত কেবল পর পর অনেকগুলি ত্যাগ স্বীকার করে যাতে শ্রমিক আন্দোলনের প্রাণশক্তিই শুকিয়ে যেত — এই পরিস্থিতির কথা ভেবে সাধারণ পরিষদকে আমেরিকায় স্থানান্তরিত করে আন্তর্জাতিক তখনকার মত রঙ্গভূমি থেকে সরে এল। সেই সময়ে এবং পরে এই যে সিদ্ধান্তের বহু নিন্দা করা হয়েছে তা যে কতটা নির্ভুল ছিল তা পরবর্তী ঘটনাবলী থেকেই প্রমাণ হয়ে গেছে। এই সিদ্ধান্তের ফলে, একদিকে আন্তর্জাতিকের নামে ক্ষমতা জবরদখলের নিষ্ফল প্রচেষ্টা সেই থেকে বন্ধ হয়ে গেল, অন্যদিকে, বিভিন্ন দেশের সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক পার্টির মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বজায় রইল তার থেকেই প্রমাণ হল যে, সব দেশের প্রলেতারিয়েতের স্বার্থের একাত্মতা ও সংহতি সম্পর্কে যে সচেতনতা আন্তর্জাতিক জাগিয়ে তুলেছে তা বাহ্যিক আন্তর্জাতিক সমিতির বন্ধন ছাড়াও অভিব্যক্ত হতে পারে। তখনকার মত এ বন্ধন শৃংখল হয়ে উঠেছিল।

শেষ পর্যন্ত হেগ কংগ্রেসের পরে মার্কস আবার তাঁর তাত্ত্বিক কাজ ফিরে শুরু করার মত শান্তি ও অবসর খুঁজে পেয়েছেন। আশা করা যায় যে, কিছু দিনের মধ্যেই তিনি 'পুঁজির' দ্বিতীয় খন্ড ছাপাখানায় পাঠাতে পারবেন।

মার্কস যেসব গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারের মাধ্যমে বিজ্ঞানের ইতিহাসে নিজের নাম উৎকীর্ণ করেছেন তার মাত্র দুটি নিয়ে আমরা এখানে আলোচনা করতে পারি।

প্রথম হল বিশ্বের ইতিহাসের সমগ্র ধারণায় তিনি যে বিপ্লব এনেছেন সেটি। আগে ইতিহাসের উপর সমগ্র দৃষ্টিভঙ্গিরই ভিত্তি ছিল এই ধারণা যে, মানুষের পরিবর্তনশীল চিন্তাধারার মধ্যেই সব ঐতিহাসিক পরিবর্তনের মূল কারণ খুঁজতে হবে, এবং সব ঐতিহাসিক পরিবর্তনের মধ্যে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ হল রাজনৈতিক পরিবর্তন, সমগ্র ইতিহাসের উপর তারই প্রাধান্য। কিন্তু মানুষের মনে ধারণা আসে কোথা থেকে এবং রাজনৈতিক পরিবর্তনের চালক-হেতু যে কী সে প্রশ্ন তোলা হয়নি। শুধুমাত্র ফরাসী আর আংশিকভাবে ইংরেজ ঐতিহাসিকের নতুন গোষ্ঠীই এ প্রত্যয়ে বাধ্য হয়েছিল যে, অন্ততঃপক্ষে মধ্যযুগ থেকে ইউরোপের ইতিহাসের চালিকা-শক্তি ছিল সামাজিক ও রাজনৈতিক আধিপত্যের জন্য সামন্ততান্ত্রিক অভিজাততন্ত্রের সাথে বিকাশমান বুর্জোয়া শ্রেণীর সংগ্রাম। এখন মার্কস প্রমাণ করে দিয়েছেন যে. বিগত সব ইতিহাস হল শ্রেণী-সংগ্রামের ইতিহাস, বহুবিধ ও জটিল সব রাজনৈতিক সংগ্রামের একমাত্র প্রশ্ন ছিল সামাজিক শ্রেণীগুলির সামাজিক ও রাজনৈতিক শাসনের প্রশ্ন, পুরোনো শ্রেণীগুলির ক্ষমতা বজায় রাখা ও উদীয়মান নতুন শ্রেণীগুলির ক্ষমতা জয়ের প্রশ্ন। কিন্তু এই শ্রেণীগুলির সৃষ্টি এবং ক্রমাগত অস্তিত্বের হেতু কী? কোনো বিশেষ যুগে যে নির্দিষ্ট বৈষয়িক এবং বস্তুগতভাবে বোধগম্য অবস্থার মধ্যে সমাজের প্রাণধারণের উপকরণ উৎপাদন ও বিনিময় করা হয়, সেইটাই তার হেতু। মধ্যযুগের সামন্ততান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার ভিত্তি ছিল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষক গোষ্ঠীগুলির স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনীতি, এরা তাদের প্রয়োজনের প্রায় সবটাই নিজেরাই উৎপন্ন করত, প্রায় কোনোরকম বিনিময় ব্যবস্থাই তাদের ছিল না আর অস্ত্রধারী অভিজাত শ্রেণীর কাছ থেকে এরা পেত বহিরাক্রমণ থেকে রক্ষা, এবং জাতীয়, অথবা অন্ততঃপক্ষে রাজনৈতিক সংহতি। যখন শহর গড়ে উঠল এবং তার সঙ্গে সঙ্গে গড়ে উঠল স্বতন্ত্র হস্তশিল্প আর প্রথমে আভ্যন্তরীণ ও পরে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক আদানপ্রদান, তখন শহুরে বুর্জোয়া শ্রেণীও বিকাশলাভ করল এবং মধ্যযুগেই অভিজাত শ্রেণীর সঙ্গে সংগ্রামে এই বুর্জোয়া শ্রেণী সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে বিশেষ সুবিধাভোগী সম্প্রদায় হিসেবে নিজেরও জায়গা করে নিল। কিন্তু ইউরোপের বাইরের জগৎ আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে এই বুর্জোয়া শ্রেণীর বাণিজ্যের এলাকা অনেকখানি বেড়ে গেল আর সেই সাথে তাদের শিল্প বিকাশে এল এক নতুন প্রেরণা। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সব শাখায় হস্তশিল্পের জায়গায় এবার এল কারখানা ধরনের শিল্প এবং তারও জায়গা নিল বৃহদায়তন শিল্প, গত শতাব্দীর বিভিন্ন আবিষ্কারের ফলে, বিশেষত বাষ্পচালিত ইঞ্জিন আবিষ্কারের ফলে

এটা সম্ভব হয়ে উঠল। আবার বৃহদায়তন শিল্পেরও প্রভাব পড়ল বাণিজ্যের ওপর: অনুন্নত দেশগুলি থেকে পুরানো কায়িক পরিশ্রম বিতাড়িত করল তা আর অধিকতর বিকশিত দেশগুলিতে গড়ে তুলল আজকের দিনের নতুন যোগাযোগ ব্যবস্থা: বাষ্পচালিত ইঞ্জিন, রেলপথ ও বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফ। এইভাবে, যে রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিল অভিজাত শ্রেণীর আর তাদের সমর্থিত রাজতন্ত্রের হাতে তা থেকে আরো বহুদিন বঞ্চিত হয়ে থাকলেও, বুর্জোয়া শ্রেণী ক্রমেই বেশি করে সামাজিক সম্পদ ও সামাজিক ক্ষমতা নিজের হাতে জমাতে থাকল। কিন্তু বিশেষ এক পর্যায়ে — ফ্রান্সে, মহান বিপ্লবের পরে — বুর্জোয়া শ্রেণী রাজনৈতিক ক্ষমতাও জয় করে নিল, আর এবার তারাই প্রলেতারিয়েত ও ক্ষুদ্র কৃষকদের ওপর শাসক শ্রেণী হয়ে বসল। সমাজের নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে যে জ্ঞান অবশ্য আমাদের পেশাদার ঐতিহাসিকদের মধ্যে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত, তা যথেষ্ট থাকলে এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সব ঐতিহাসিক ঘটনাই সবচেয়ে সহজ উপায়ে ব্যাখ্যা করা যায়। এবং একইভাবে প্রতিটি ঐতিহাসিক পর্বের ধ্যান-ধারণা খুব সহজে ব্যাখ্যা করা যায় জীবনযাত্রার অর্থনৈতিক অবস্থা দিয়ে এবং তদ্দ্বারা নির্ধারিত সেই পর্বের সামাজিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক দিয়ে। এই প্রথম ইতিহাস তার সত্যিকারের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হল। আধিপত্যের জন্য লড়বার আগে, রাজনীতি, ধর্ম, দর্শন ইত্যাদি চর্চা করার আগে মানুষের সর্বাগ্রে চাই খাদ্য পানীয়, চাই আশ্রয় ও পরিচ্ছদ, সুতরাং তাকে **কাজ করতে** হবে, এই যে জলজ্যান্ত সত্যটি এতদিন পুরোপুরি উপেক্ষা করা হয়েছে, এই সত্য অবশেষে তার ঐতিহাসিক অধিকারে প্রতিষ্ঠিত হল।

সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির পক্ষে ইতিহাসের এই নতুন বোধের তাৎপর্য খুবই বেশী। এতে দেখিয়ে দিল যে, আগেকার সব ইতিহাস শ্রেণী-বিরোধ ও শ্রেণী-সংগ্রামের মাধ্যমে এগিয়েছে, চিরকালই শাসক ও শাসিত শ্রেণী, শোষক ও শোষিত শ্রেণী থেকেছে আর বরাবরই মানবসমাজের বিপুল অধিকাংশই দণ্ডিত থেকেছে হাড়ভাঙ্গা মেহনত ও নগণ্য উপভোগের নির্বন্ধে। এর কারণ কী? কারণ নিতান্তই এই যে, মানবজাতির বিকাশের আগেকার সব স্তরে উৎপাদন এতই অনুন্নত ছিল যে একমাত্র এই বিরোধব্যঞ্জক রূপেই ঐতিহাসিক বিকাশ চলতে পারত, আর সামগ্রিকভাবে ঐতিহাসিক প্রগতির ভার থাকত এক ক্ষুদ্র সুবিধাভোগী সংখ্যালঘুর ক্রিয়াকলাপের ওপর আর বিপুল জনগণের নির্বন্ধ ছিল স্বীয় মেহনতে নিজেদের দীনহীন জীবনোপকরণের সঙ্গে সঙ্গে সুবিধাভোগীদের ক্রমসমৃদ্ধ ঐশ্বর্য্য উৎপন্ন করা। পূর্বতন যে সব শ্রেণী-শাসনের ব্যাখ্যা অন্যথায় কেবল মানুষের অসাধুতা দিয়েই করতে হয় এইভাবে তার স্বাভাবিক ও যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা পাওয়া ছাড়াও ইতিহাসের এই অনুসন্ধানের ফলে স্পষ্ট হয়ে উঠল যে, এ যুগের

উৎপাদন-শক্তিসমূহ এত বিপুলভাবে বেড়ে উঠেছে যে, অন্ততঃপক্ষে সবচেয়ে উন্নত দেশগুলিতে, মানবসমাজকে শাসক ও শাসিত হিসেবে, শোষক ও শোষিত হিসেবে বিভক্ত করে রাখার শেষ অজুহাতটিও আর থাকে না, স্পষ্ট হয়ে উঠল যে, শাসক বৃহৎ বুর্জোয়া শ্রেণী তার ঐতিহাসিক কর্তব্য পূরণ করেছে, সমাজের নেতৃত্বের ক্ষমতা তার আর নেই, উৎপাদনের বিকাশের পথে সে বরং বাধাই হয়ে দাঁড়িয়েছে, বাণিজ্য সংকট, বিশেষত গত বিরাট বিপর্যয়* এবং সবদেশে শিল্পের মন্দা সে কথা প্রমাণ করে দিয়েছে। স্পষ্ট হয়েছে যে, ঐতিহাসিক নেতৃত্ব চলে এসেছে প্রলেতারিয়েতের হাতে, সমাজে এ শ্রেণীর সামগ্রিক অবস্থার দরুন এ শ্রেণী নিজেকে মুক্ত করতে পারে কেবল সব শ্রেণী-শাসন, সব দাসত্ব ও সব শোষণ পুরোপুরি শেষ করে দিয়ে, এবং সামাজিক উৎপাদন-শক্তিসমূহ বুর্জোয়া শ্রেণীর নিয়ন্ত্রণ ছাপিয়ে উঠে এখন শুধু সমিতিবদ্ধ প্রলেতারিয়েতের দখলে যাবার জন্যই অপেক্ষা করে আছে এই উদ্দেশ্যে যাতে এমন পরিস্থিতি ঘটানো যাবে যেখানে সমাজের প্রতি সদস্য শুধু সামাজিক সম্পদ উৎপাদনের কাজেই নয়, সে সম্পদ বণ্টন ও পরিচালনার কাজেও অংশ নিতে পারবে। তাতে করে পুরো উৎপাদন-ব্যবস্থার পরিকল্পিত পরিচালনার ফলে সামাজিক উৎপাদন-শক্তিগুলি ও তার উৎপাদন এত বেড়ে যাবে যে, প্রত্যেকের জন্যই সমস্ত যুক্তিসঙ্গত প্রয়োজন ক্রমবর্ধমান মাত্রায় মেটাবার নিশ্চিতি থাকবে।

মার্কসের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার হল পুঁজি ও শ্রমের সম্পর্কের চূড়ান্ত ব্যাখ্যা, অর্থাৎ বর্তমান সমাজে, উৎপাদনের বর্তমান পুঁজিবাদী পদ্ধতিতে পুঁজিবাদী কী ভাবে শ্রমিককে শোষণ করে তা দেখিয়ে দেওয়া। অর্থশাস্ত্র যখনই এই প্রতিপাদ্য দিয়েছে যে, শ্রমই হল সব সম্পদ ও সব মূল্যের উৎস, তখন থেকেই এ প্রশ্নটা অনিবার্য হয়ে উঠেছে: তাহলে মজুরি-খাটা শ্রমিক যে নিজের শ্রমে উৎপন্ন মূল্যের সবটুকু পায় না, সে মূল্যের এক অংশ তাকে পুঁজিপতির কাছে সমর্পণ করে দিতে হয়, এ তথ্যের সঙ্গে তা মেলে কী করে? বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদরা ও সমাজতন্ত্রীরা উভয়েই এ প্রশ্নের বিজ্ঞানসম্মত উত্তর দেবার বৃথা চেষ্টা করেছেন। শেষ পর্যন্ত মার্কস এগিয়ে এলেন তার সমাধান নিয়ে। সে সমাধান নিম্নরূপ। বর্তমান পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতির পূর্বশর্ত হল দুটি সামাজিক শ্রেণীর অস্তিত্ব — একদিকে পুঁজিপতি শ্রেণী, তারাই উৎপাদনের উপায় আর প্রাণধারণের উপকরণগুলির মালিক, আর অন্যদিকে থাকবে প্রলেতারীয় শ্রেণী, ঐ মালিকানা থেকে বঞ্চিত হওয়ায় তাদের হাতে বেচবার মত থাকে শুধু একটা

* ১৮৭৩ সালের যে অর্থনৈতিক সংকট অস্ট্রিয়া, জার্মানি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, হল্যাণ্ড, বেলজিয়ম, ইতালি, রাশিয়া ও অন্যান্য দেশ গ্রাস করে তার কথা বলা হচ্ছে। প্রচণ্ডতা ও গভীরতায় এ সংকট বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। — সম্পাঃ

পণ্যই, তাদের শ্রমশক্তি। তাই প্রাণধারণের উপকরণ অর্জন করার জন্য তাদের এই শ্রমশক্তি বেচতে হয়। কিন্তু কোনো পণ্যের উৎপাদনে, এবং সুতরাং তার পুনরুৎপাদনেও সামাজিকভাবে আবশ্যক শ্রম কী পরিমাণ লাগে তাই দিয়েই সে পণ্যের মূল্য নির্ধারিত হয়। সুতরাং একজন সাধারণ লোকের একদিন, এক মাস বা এক বছরের শ্রমশক্তির মূল্য নির্ধারিত হচ্ছে একদিন, মাস বা বছরে ঐ শ্রমশক্তি রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রাণধারণের উপকরণের মধ্যে কতখানি শ্রম নিহিত রয়েছে তাই দিয়ে। ধরে নেওয়া যাক যে, একজন শ্রমিকের একদিনের প্রাণধারণের উপকরণ উৎপাদনে ছয় ঘণ্টা শ্রম লাগে অর্থাৎ কিনা তাতে নিহিত শ্রমের পরিমাণ হল ছয় ঘণ্টা পরিমাণ শ্রম। তাহলে একদিনের শ্রমশক্তির মূল্য প্রকাশ করা যাবে টাকার এমন এক অঙ্ক দিয়ে যার মধ্যে ছয় ঘণ্টা শ্রম রয়েছে। ধরে নেওয়া যাক, যে পুঁজিপতি আমাদের শ্রমিকটিকে নিয়োগ করেছে সে শ্রমিককে ঐ টাকাটা দিল, সুতরাং শ্রমিকের শ্রমশক্তির পূর্ণ মূল্য সে দিল। শ্রমিক যদি এখন পুঁজিপতির জন্য দিনের ছয় ঘণ্টা কাজ করে দেয় তাহলে সে পুঁজিবাদীর লগ্নিটা পুরোপুরি পুষিয়ে দেবে — ছয় ঘণ্টা শ্রমের বিনিময়ে ছয় ঘণ্টা শ্রম। কিন্তু তাহলে পুঁজিবাদীর আর কিছু থাকে না। তাই সে ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অন্যভাবে দেখে। সে বলে, 'আমি এই শ্রমিকের শ্রমশক্তি কিনেছি শুধু ছয় ঘণ্টার জন্য নয়, পুরো দিনের জন্য।' তাই সে অবস্থা অনুযায়ী শ্রমিককে ৮, ১০, ১২, ১৪ বা আরো বেশী ঘণ্টা খাটায়। ফলে সপ্তম, অষ্টম ও তার পরের ঘণ্টাগুলির উৎপন্ন দ্রব্য হল অবৈতনিক শ্রমের উৎপন্ন আর তা গোড়ায় চলে যায় পুঁজিবাদীর পকেটে। তাই পুঁজিপতি কর্তৃক নিযুক্ত শ্রমিক যেটুকুর দাম পেয়েছে কেবল সেই শ্রমশক্তির মূল্যই পুনরুৎপাদন করে না, উপরন্তু **উদ্বৃত্ত মূল্যও** উৎপাদন করে যেটা প্রথমে পুঁজিপতি আত্মসাৎ করে আর তারপরে নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক নিয়ম অনুযায়ী সমগ্র পুঁজিবাদী শ্রেণীর মধ্যে ভাগ হয়ে যায় ও সেই মূল তহবিলটি গড়ে তোলে যা থেকে আসে ভূমি-খাজনা, মুনাফা, পুঁজি সঞ্চয়, সংক্ষেপে অমেহনতী শ্রেণীগুলি যা ভোগ বা সঞ্চয় করে তেমন সমস্ত সম্পদ। কিন্তু এ থেকে প্রমাণ হয় যে, আজকের দিনের পুঁজিপতিদের ধনসংগ্রহের পথ হল ঠিক দাসমালিকদের অথবা ভূমিদাস-শোষক সামন্ত প্রভুদের মতোই অন্যের অবৈতনিক শ্রম আত্মসাৎ করা এবং শোষণের এইসব বিভিন্ন রূপের পার্থক্য হল কেবল অবৈতনিক শ্রম আত্মসাৎ করার পদ্ধতি ও ধরনে। বর্তমান সামাজিক ব্যবস্থায় অধিকার ও ন্যায়, অধিকার ও কর্তব্যের সাম্য এবং স্বার্থের সাধারণ সামঞ্জস্য বর্তমান, মালিক শ্রেণীগুলির এইসব ভণ্ড বুলির শেষ যুক্তিও কিন্তু এতে দূর হয়ে গেল এবং আগের সব সমাজের মতো বর্তমানের বুর্জোয়া সমাজও এক ক্ষুদ্র, ক্রমহ্রাসমান সংখ্যালঘু অংশ দিয়ে জনসাধারণের বিরাট সংখ্যাগুরু অংশকে শোষণ করার একটা বিপুল প্রতিষ্ঠান রূপেই উদ্ঘাটিত হল।

আধুনিক বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। 'পুঁজির' দ্বিতীয় খণ্ডে এইগুলি এবং পুঁজিবাদী সমাজ-ব্যবস্থা নিয়ে সমান গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকে আরো বিকশিত করে তোলা হবে, এবং তাতে করে প্রথম খণ্ডে অর্থশাস্ত্রের যেসব দিক আলোচিত হয়নি সেগুলিরও বৈপ্লবিক রূপান্তর সাধন করা হবে। কামনা করি মার্কস যেন শীঘ্রই বইটি ছাপার জন্য তৈরি করে তুলতে পারেন।

এঙ্গেলস কর্তৃক ১৮৭৭ সালের জুন মাসে লিখিত, ১৮৭৮ সালে ব্রান্সউইকে প্রকাশিত *Volkskalender* বর্ষপঞ্জীতে মুদ্রিত

বর্ষপঞ্জীর লেখা অনুযায়ী মুদ্রিত
জার্মান থেকে ইংরেজি অনুবাদের ভাষান্তর

ফ্রেডারিক এঙ্গেলস

কার্ল মার্ক্সের সমাধিপার্শ্বে বক্তৃতা

১৪ই মার্চ, বেলা পৌনে তিনটেয় পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক চিন্তা থেকে বিরত হয়েছেন। মাত্র মিনিট দুয়েকের জন্য তাঁকে একা রেখে যাওয়া হয়েছিল। আমরা ফিরে এসে দেখলাম যে তিনি তাঁর আরামকেদারায় শান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছেন — কিন্তু ঘুমিয়েছেন চিরকালের জন্য।

এই মানুষটির মৃত্যুতে ইউরোপ ও আমেরিকার জঙ্গী প্রলেতারিয়েত এবং ইতিহাস বিজ্ঞান উভয়েরই অপূরণীয় ক্ষতি হল। এই মহান প্রাণের তিরোভাবে যে শূন্যতার সৃষ্টি হল তা অচিরেই অনুভূত হবে।

ডারউইন যেমন জৈব প্রকৃতির বিকাশের নিয়ম আবিষ্কার করেছিলেন তেমনি মার্ক্স আবিষ্কার করেছেন মানুষের ইতিহাসের বিকাশের নিয়ম, মতাদর্শের অতি নিচে এতদিন লুকিয়ে রাখা এই সহজ সত্য যে, রাজনীতি, বিজ্ঞান, কলা, ধর্ম ইত্যাদি চর্চা করতে পারার আগে মানুষের প্রথম চাই খাদ্য, পানীয়, আশ্রয়, পরিচ্ছদ, সুতরাং প্রাণধারণের আশু বাস্তব উপকরণের উৎপাদন এবং সেইহেতু কোনো নির্দিষ্ট জাতির বা নির্দিষ্ট যুগের অর্থনৈতিক বিকাশের মাত্রাই হল সেই ভিত্তি যার ওপর গড়ে ওঠে সংশ্লিষ্ট জাতিটির রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান, আইনের ধ্যান-ধারণা, শিল্পকলা, এমনকি তাদের ধর্মীয় ভাবধারা পর্যন্ত এবং সেই দিক থেকেই এগুলির ব্যাখ্যা করতে হবে, এতদিন যা করা হয়েছে সেভাবে উল্টো দিক থেকে নয়।

কিন্তু শুধু এই নয়। বর্তমান পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতির এবং এই পদ্ধতি যে বুর্জোয়া সমাজ সৃষ্টি করেছে তার গতির বিশেষ নিয়মটিও মার্ক্স আবিষ্কার করেন। যে সমস্যার সমাধান খুঁজতে গিয়ে এতদিন পর্যন্ত সব বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ ও সমাজতন্ত্রী সমালোচক উভয়েরই অনুসন্ধান অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াচ্ছিল, তার ওপর সহসা আলোকপাত হল উদ্বৃত্ত মূল্য আবিষ্কারের ফলে।

একজনের জীবদ্দশার পক্ষে এরকম দুটো আবিষ্কারই যথেষ্ট। এমনকি এরকম একটা আবিষ্কার করতে পারার সৌভাগ্য যাঁর হয়েছে তিনিও ধন্য। কিন্তু মার্ক্সের চর্চার

প্রতিটি ক্ষেত্রে — এবং তিনি চর্চা করেছিলেন বহু বিষয় নিয়ে এবং কোনোটাই ওপর ওপর নয় — তার প্রতিটি ক্ষেত্রেই, এমনকি গণিতশাস্ত্রেও তিনি স্বাধীন আবিষ্কার করে গেছেন।

এই হল বিজ্ঞানী মানুষটির রূপ। কিন্তু এটা তাঁর ব্যক্তিত্বের অর্ধেকও নয়। মার্কসের কাছে বিজ্ঞান ছিল এক ঐতিহাসিকভাবে গতিষ্ণু বিপ্লবী শক্তি। কোনো একটা তাত্ত্বিক বিজ্ঞানের নতুন যে আবিষ্কার কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগের কল্পনা করাও হয়তো তখনো পর্যন্ত অসম্ভব, তেমন আবিষ্কারকে মার্কস যত আনন্দেই স্বাগত জানান না কেন, তিনি সম্পূর্ণ অন্য ধরনের আনন্দ পেতেন যখন কোনো আবিষ্কার শিল্পে এবং সাধারণভাবে ঐতিহাসিক বিকাশে একটা আশু বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত করছে। উদাহরণস্বরূপ, বিদ্যুৎশক্তির ক্ষেত্রে যেসব আবিষ্কার হয়েছে তার বিকাশ এবং সম্প্রতি মার্সেল দেপ্রের আবিষ্কারগুলি তিনি খুব মন দিয়ে লক্ষ্য করতেন।

কারণ মার্কস সবার আগে ছিলেন বিপ্লববাদী। তাঁর জীবনের আসল ব্রত ছিল পুঁজিবাদী সমাজ এবং এই সমাজ যেসব রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করেছে তার উচ্ছেদে কোনো না কোনো উপায়ে অংশ নেওয়া, আধুনিক প্রলেতারিয়েতের মুক্তিসাধনের কাজে অংশ নেওয়া, একে তিনিই প্রথম তার নিজের অবস্থা ও প্রয়োজন সম্বন্ধে, তার মুক্তির শর্তাবলী সম্বন্ধে সচেতন করে তুলেছিলেন। তাঁর ধাতটাই ছিল সংগ্রামের। এবং যে আবেগ, যে অধ্যবসায় ও যতখানি সাফল্যের সঙ্গে তিনি সংগ্রাম করতেন তার তুলনা মেলা ভার। প্রথম *Rheinische Zeitung* (১৮৪২), প্যারিসের *Vorwärts** (১৮৪৪) পত্রিকা, *Deutsche Brüsseler Zeitung* (১৮৪৭), *Neue Rheinische Zeitung* (১৮৪৮-৪৯), *New York Tribune* (১৮৫২-৬১) পত্রিকা এবং এছাড়া একরাশ সংগ্রামী পুস্তিকা, প্যারিস, ব্রাসেল্‌স্‌ এবং লণ্ডনের সংগঠনে তাঁর কাজ এবং শেষে, সর্বোপরি মহান শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতি গঠন — এটা এমন এক কীর্তি যে আর কোনো কিছু না করলেও শুধু এইটুকুর জন্যই এর প্রতিষ্ঠাতা খুবই গর্ববোধ করতে পারতেন।

এবং তাই, তাঁর কালের লোকেদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আক্রোশ ও কুৎসার পাত্র হয়েছেন মার্কস। স্বেচ্ছাতন্ত্রী এবং প্রজাতন্ত্রী — দুধরনের সরকারই নিজ নিজ এলাকা থেকে তাঁকে নির্বাসিত করেছে। রক্ষণশীলই বা উগ্র-গণতান্ত্রিক সব বুর্জোয়ারাই পাল্লা দিয়ে তাঁর দুর্নাম রটনা করেছে। এসব কিছুই তিনি ঠিক মাকড়শার ঝুলের মতোই ঝেঁটিয়ে সরিয়ে দিয়েছেন, উপেক্ষা করেছেন এবং যখন একান্ত প্রয়োজনবশে

* *Vorwärts* (আগুয়ান) — দেশান্তরী জার্মান সোশ্যালিস্টদের র‍্যাডিকাল পত্রিকা। মার্কসও লিখতেন এতে। ১৮৪৪ সালে প্যারিসে জার্মান ভাষায় এ পত্রিকাটি বেরোয়। — সম্পাঃ

বাধ্য হয়েছেন একমাত্র তখনই এর জবাব দিয়েছেন। আর আজ সাইবেরিয়ার খনি থেকে কালিফোর্নিয়া পর্যন্ত, ইউরোপ ও আমেরিকার সব অংশে লক্ষ লক্ষ বিপ্লবী সহকর্মীদের প্রীতির মধ্যে, শ্রদ্ধার মধ্যে, শোকের মধ্যে তাঁর মৃত্যু। আমি সাহস করে বলতে পারি যে মার্কসের বহু বিরোধী থাকতে পারে, কিন্তু ব্যক্তিগত শত্রু তাঁর মেলা ভার।

যুগে যুগে অক্ষয় হয়ে থাকবে তাঁর নাম, অক্ষয় থাকবে তাঁর কাজ।

১৮৮৩ সালের ১৭ই মার্চ লন্ডনের হাইগেট সমাধিক্ষেত্রে এঙ্গেলসের ইংরেজীতে প্রদত্ত বক্তৃতা
১৮৮৩ সালের ২২শে মার্চ *Sozialdemokrat* পত্রিকায় জার্মান ভাষায় প্রকাশিত

পত্রিকার পাঠ অনুযায়ী মুদ্রিত
জার্মান থেকে ইংরেজি অনুবাদের ভাষান্তর

ফ্রেডারিক এঙ্গেলস

পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি

মর্গানের গবেষণা প্রসঙ্গে

১৮৮৪ সালের প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

একদিক থেকে বলা যায় যে নিচের পরিচ্ছেদগুলিতে একটি উত্তরদায়িত্ব পূরণ করা হয়েছে। স্বয়ং কার্ল মার্কস পরিকল্পনা করেন যে, তিনি ইতিহাস নিয়ে তাঁর নিজের — সীমাবদ্ধভাবে বলা যায় যে আমাদের দুজনের — বস্তুবাদী অনুসন্ধান থেকে যে সিদ্ধান্তে পেঁাছেছিলেন, সেই প্রসঙ্গেই মর্গানের গবেষণার ফলগুলিও উপস্থিত করবেন এবং শুধু এইভাবে তাদের সমগ্র তাৎপর্য ফুটিয়ে তুলবেন। কারণ মর্গান তাঁর নিজের ধরনে আমেরিকায় ইতিহাসের সেই একই বস্তুবাদী ধারণা পুনরাবিষ্কার করেন যা মার্কস ৪০ বছর আগেই আবিষ্কার করেছিলেন, এবং বর্বরতা ও সভ্যতার তুলনামূলক বিচারে ঐ ধারণা থেকে তিনি প্রধান প্রধান বিষয়ে মার্কসের মতো একই সিদ্ধান্তে পেঁাছান। এবং ঠিক যেমন জার্মানির সরকারী অর্থনীতিজ্ঞরা বহু বছর ধরে 'পুঁজি' গ্রন্থ থেকে সাগ্রহে চুরি করেছে অথচ কেবলই তা চেপে গিয়েছে, ইংলণ্ডের প্রাগৈতিহাসিক বিজ্ঞানের প্রবক্তরা মর্গানের রচিত 'প্রাচীন সমাজ'* সম্পর্কেও তাই করেছেন। আমার পরলোকগত বন্ধু যে কাজ সম্পন্ন করে যেতে পারেননি, আমার রচনায় তার স্থানপূরণ নগণ্যই হবে। তবে মর্গান থেকে মার্কসের বিস্তৃত উদ্ধৃতিগুলির মধ্যে** তাঁর সমালোচনামূলক মন্তব্যগুলি আমার হাতে আছে এবং যেখানেই সম্ভব সেখানে আমি এগুলি পুনরুদ্ধৃত করেছি।

বস্তুবাদী ধারণা অনুযায়ী শেষ বিচারে ইতিহাসের নির্ধারক করণিকা হচ্ছে প্রত্যক্ষ

* 'প্রাচীন সমাজ', অথবা *Ancient Society, or Researches in the Lines of Human Progress from Savagery through Barbarism to Civilization.* By Lewis H. Morgan. London, Macmillan and Co., 1877. বইটি আমেরিকায় মুদ্রিত হয় এবং লন্ডনে পাওয়া আশ্চর্য দুষ্কর। লেখক কয়েক বছর আগে মারা গেছেন। (এঙ্গেলসের টীকা।)

** এখানে কার্ল মার্কস কৃত মর্গানের 'প্রাচীন সমাজ' বইয়ের সারসংকলন সম্পর্কে বলা হয়েছে। — সম্পাঃ

জীবনের উৎপাদন এবং পুনরুৎপাদন। কিন্তু এই ব্যাপারটির দ্বিবিধ প্রকৃতি। একদিকে জীবনযাত্রার উপকরণ — খাদ্য, পরিধেয় ও আশ্রয় এবং সেইজন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির উৎপাদন; অপরদিকে মানবজাতির জৈবিক উৎপাদন, বংশবৃদ্ধি। একটি বিশেষ ঐতিহাসিক যুগে একটি বিশেষ দেশে মানুষ যে সমস্ত সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বাস করে, সেগুলি এই দ্বিবিধ উৎপাদনের দ্বারা নির্ধারিত হয়: একদিকে শ্রমের বিকাশের, অপরদিকে পরিবারের বিকাশের স্তর দিয়ে। শ্রমের বিকাশ যত কম হয় এবং উৎপন্নের পরিমাণ এবং সেইহেতু সমাজের সম্পদ যত সীমাবদ্ধ হয়, তত বেশী সমাজব্যবস্থা কৌলিক সম্পর্ক দিয়ে পরিচালিত মনে হয়। কিন্তু কৌলিক বন্ধনের ভিত্তিতে গঠিত এই সমাজকাঠামোর মধ্যে শ্রমের উৎপাদিকা ক্রমশ বাড়তে থাকে; সঙ্গে সঙ্গে বিকাশ পায় ব্যক্তিগত মালিকানা ও বিনিময়, ধনের অসাম্য, অপরের শ্রমশক্তি ব্যবহারের সম্ভাবনা এবং তার ফলে শ্রেণী-বিরোধের ভিত্তি: নবজাত সামাজিক উপাদানগুলি কয়েক পুরুষ ধরে পুরাতন সামাজিক সংগঠনকে নতুন অবস্থাগুলির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার চেষ্টা করে, অবশেষে উভয়ের এই গরমিল থেকে আসে পরিপূর্ণ বিপ্লব। কৌলিক বন্ধনের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা পুরাতন সমাজ নবজাত সামাজিক শ্রেণীগুলির সংঘাতে চুরমার হয়ে যায়; তার জায়গায় দেখা দেয় রাষ্ট্র হিসাবে সংগঠিত একটি নতুন সমাজ — এখানে নিম্নতন ইউনিটগুলি আর কৌলিক গোষ্ঠী নয় — আঞ্চলিক গোষ্ঠী; এরূপ সমাজে পারিবারিক প্রথা পুরোপুরি মালিকানা প্রথার অধীন এবং যে শ্রেণী-বিরোধ ও শ্রেণী-সংগ্রাম এযাবৎকার সমগ্র লিখিত ইতিহাসের মর্মবস্তু, সেটা তার মধ্যে অবাধে বিকাশ পেতে থাকে।

মর্গানের মহৎ কৃতিত্ব হচ্ছে এই যে, তিনি আমাদের লিখিত ইতিহাসের এই প্রাগৈতিহাসিক ভিত্তির মূল বৈশিষ্ট্যগুলি আবিষ্কার ও পুনরুদ্ধার করেন, এবং উত্তর আমেরিকার ইণ্ডিয়ানদের কৌলিক গোষ্ঠীর মধ্যে গ্রীক, রোমক ও জার্মান ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং এতদিন পর্যন্ত দুর্বোধ্য ধাঁধার চাবিকাঠি খুঁজে পান। তাঁর বই একদিনের রচনা নয়। প্রায় চল্লিশ বছর ধরে তিনি তাঁর মালমশলার সঙ্গে যুঝে শেষ পর্যন্ত সেগুলিকে সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করেন। এইজন্যই তাঁর রচনা হচ্ছে আমাদের কালের যুগান্তকারী অল্প কয়েকটি রচনার অন্যতম।

বর্তমান রচনায় পাঠক মোটের উপর সহজেই ধরতে পারবেন কোন জিনিসগুলি মর্গান থেকে নেওয়া এবং আমি কী যোগ করেছি। গ্রীস ও রোম সম্পর্কীয় ঐতিহাসিক অংশে আমি মর্গানের তথ্যের মধ্যে আবদ্ধ থাকিনি, পরন্তু আমার জানা তথ্যও যোগ করেছি। কেল্টিক ও জার্মানদের সম্পর্কিত অংশগুলি বহুলত আমার নিজের; এইক্ষেত্রে মর্গানের অবলম্বন ছিল প্রায় একান্তই পরের হাত-ফেরতা উৎস এবং জার্মানির অবস্থা সম্পর্কে ট্যাসিটাসের রচনা বাদ দিলে তিনি শুধুমাত্র মিঃ ফ্রিম্যানের

অপদার্থ উদারনৈতিক অপব্যাখ্যার উপর নির্ভর করেছিলেন। অর্থনৈতিক যেসব যুক্তি মর্গানের উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে যথেষ্ট ছিল কিন্তু আমার পক্ষে যা একেবারে অনুপোযোগী, সে সমস্ত আমি নতুন করে হাজির করেছি। এবং সর্বশেষে বলা বাহুল্য যেখানে মর্গানকে প্রত্যক্ষভাবে উদ্ধৃত করা হয়নি সেইসব সিদ্ধান্তের জন্য আমিই দায়ী।

১৮৯১ সালের চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকা

এই রচনার পূর্ববর্তী বৃহৎ সংস্করণগুলি প্রায় ছ-মাস হল নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে এবং কিছুকাল ধরে প্রকাশক আমাকে একটি নতুন সংস্করণ তৈরী করবার ইচ্ছা জানিয়েছেন। অধিকতর জরুরী কাজের জন্য এতাবৎকাল আমি এ কাজ করতে পারিনি। প্রথম সংস্করণ প্রকাশের পর সাত বছর কেটে গিয়েছে এবং এই সময়ের মধ্যে পরিবারের আদি রূপগুলি সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হয়েছে। অতএব খুব পরিশ্রমের সঙ্গে রচনার সংশোধন ও পরিবর্ধন দরকার ছিল। বিশেষত এইজন্য যে বর্তমান রচনাটি স্টিরিও করার যে প্রস্তাব হয়েছে তাতে আরো কিছু পরিবর্তন করা আমার পক্ষে বেশ কিছুকালের মতো সম্ভব হবে না।

এইজন্য আমি সমস্ত রচনাটি সযত্নে পরীক্ষা করেছি এবং কতকগুলি সংযোজন করেছি, — এবং তাতে বিজ্ঞানের বর্তমান অবস্থার দিকে যোগ্য মনোযোগ দেওয়া হয়েছে বলেই আমার ধারণা। উপরন্তু বর্তমান ভূমিকায় আমি বাখোফেন থেকে মর্গান পর্যন্ত পরিবারের ইতিহাসের ক্রম পরিণতির এক সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা দিয়েছি, মূলত এইজন্য যে, ইংরেজী প্রাগৈতিহাসিক পণ্ডিতসমাজ হচ্ছেন উগ্রজাতিবাদে আক্রান্ত এবং তাঁরা নীরব থেকে মর্গানের আবিষ্কারগুলি আদিম সমাজের ইতিহাস সম্পর্কে ধারণায় যে বিপ্লব এনেছে তাকে বধ করবার যথাসাধ্য চেষ্টা করে চলেছেন, যদিও তাঁরা এই আবিষ্কারের ফলগুলি আত্মসাৎ করতে একটুও দ্বিধা করেন না। অপরাপর দেশেও এই ইংরেজী দৃষ্টান্ত প্রায়ই খুব অধ্যবসায়ের সঙ্গে অনুসৃত হচ্ছে।

আমার রচনাটি বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। প্রথমত ইতালীয় ভাষায়: *L'origine della famiglia, della proprieta privata e dello stato, versione riveduta dall'autore, di Pasquale Martignetti,* Benevento, ১৮৮৫। তারপর রুমানীয় ভাষায়: *Origina familei, proprietatei private si a statului, traducere de Joan Nadejde,* ইয়াসির *Contemporanul* পত্রিকায়, সেপ্টেম্বর, ১৮৮৫ থেকে মে, ১৮৮৬। অতঃপর ডেনিশ ভাষায়: *Familjens, Privatejendommens og Statens Oprindelse, Dansk, af Forfatteren gennemgaaet Udgave, besörget af Gerson Trier,* Kö-

benhavn, ১৮৮৮। বর্তমান জার্মান সংস্করণ থেকে আঁরি রাভে কর্তৃক একটি ফরাসী অনুবাদও যন্ত্রস্থ আছে।

* * *

সপ্তম দশকের আগে পর্যন্ত পরিবারের ইতিহাস বলে কোন জিনিস ছিল না। এই ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক বিজ্ঞান তখনও সম্পূর্ণভাবে মোজেসের পঞ্চ পুস্তকের প্রভাবাধীন ছিল। পরিবারের পিতৃপ্রধান রূপ যা এখানে সবচেয়ে বিশদভাবে বিবৃত হয়েছিল, তাকেই শুধু যে বিনা বাক্যব্যয়ে পরিবারের প্রাচীনতম রূপ বলে মেনে নেওয়া হয়েছিল তাই নয়, বহুপত্নীত্বটুকু বাদ দিয়ে একেই বর্তমান কালের বুর্জোয়া পরিবারের সমার্থবাচক ধরা হয়েছিল,—যেন পরিবারের ক্ষেত্রে আদৌ কোন ঐতিহাসিক বিকাশ ঘটেনি। বড়জোর এইটুকু স্বীকার করা হত যে, আদিকালে নির্বিচার যৌন সম্পর্কের একটি যুগ থেকেও থাকতে পারে। একথা নিশ্চয়ই যে, একবিবাহ ছাড়াও প্রাচ্যের বহুপত্নী প্রথা এবং ইন্দো-তিব্বতীয় বহুস্বামী প্রথাও জানা ছিল, কিন্তু এই তিনটি রূপকে কোনো ঐতিহাসিক পরম্পরা অনুযায়ী সাজান যায়নি এবং তারা পাশাপাশি পরস্পর বিচ্ছিন্নভাবেই দেখা দিল। প্রাচীন কালের কোনো কোনো জনসমষ্টির মধ্যে এবং এখনও বর্তমান কোনো কোনো বন্য জাতির মধ্যে বংশের হিসাব ধরা হয় পিতা থেকে নয় মাতা থেকে এবং সেইজন্য মায়ের ধারাটাই একমাত্র বৈধ বলে মনে করা হয়, বর্তমানের অনেক জাতির অভ্যন্তরস্থ কয়েকটি বৃহৎ বিভাগের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ (এই ঘটনাটি তখনও ভাল করে পরীক্ষা করে দেখা হয়নি) এবং এই প্রথা পৃথিবীর সর্বত্রই দেখা যায় — এইসব ঘটনাগুলি অবশ্য জানা ছিল এবং প্রতিদিন নূতন নূতন দৃষ্টান্ত প্রকাশ পাচ্ছিল। কিন্তু ঐগুলিকে নিয়ে কী যে করতে হবে তা কেউ জানত না এবং এমনকি এডওয়ার্ড টাইলর 'মানবসমাজের আদি ইতিহাস এবং সভ্যতার বিকাশ বিষয়ে গবেষণা' (১৮৬৫)* রচনায় কোনো কোনো বন্য জাতির মধ্যে জ্বলন্ত কাঠকে লোহার হাতিয়ার দিয়ে ছোঁয়া সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা এবং অনুরূপ সব ধর্মীয় ছাইপাঁশের সঙ্গে একত্রে নিতান্ত এক 'অদ্ভুত প্রথা' হিসাবে বিবেচিত হয়েছে এগুলি।

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে বাখোফেনের 'মাতৃ-অধিকার' প্রকাশিত হবার পর থেকে পরিবারের ইতিহাস সম্পর্কে চর্চার শুরু। গ্রন্থকার এই রচনায় নিম্নলিখিত প্রতিপাদ্য হাজির করেছেন: ১) শুরুতে মানবসমাজ নির্বিচার যৌন সম্পর্কের অবস্থায় বাস করত, গ্রন্থকর্তা তার অসন্তোষজনক নামকরণ করেছেন 'হেটায়ারিজম';

* E. B. Tylor, *Researches into the Early History of Mankind and the Development of Civilization*, London, 1865. — সম্পাঃ

২) এই নির্বিচার যৌন সম্পর্কের জন্য পিতৃত্বের সম্পর্কে কোনো নিশ্চয়তা ছিল না, কাজেকাজেই বংশধারা স্থির করা যেত কেবল নারীর দিক থেকে — মাতৃ-অধিকার অনুযায়ী এবং আদিতে প্রাচীন কালের সমস্ত জাতির মধ্যেই এই ছিল অবস্থা; ৩) সুতরাং মাতা রূপে পরবর্তী পুরুষের একমাত্র স্থির ধার্য জন্মদাত্রী নারীদের প্রতি উচ্চ মাত্রার বিবেচনা ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হত এবং বাখোফেনের ধারণা অনুযায়ী এটি বেড়ে ওঠে নারীদের পূর্ণ আধিপত্যে (গাইনোওক্রেসী); ৪) নারী যখন নিছক একটি পুরুষেরই উপভোগ্যা সেই একবিবাহ প্রথায় উত্তরণের অর্থ একটি আদিম ধর্মীয় নির্দেশ লংঘন করা (অর্থাৎ বাস্তবক্ষেত্রে ঐ একই স্ত্রীলোকের উপর অন্যান্য পুরুষের চিরাচরিত প্রাচীন অধিকার লংঘন), এই লংঘনের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করতে হত অথবা এই লংঘনের স্বীকৃতি আদায় করা হত সীমাবদ্ধ সময়ের জন্য নারীটিকে অপরের কাছে সমর্পণের মূল্যে।

বাখোফেন এই প্রতিপাদ্যের সমর্থন পেয়েছেন প্রাচীন চিরায়ত সাহিত্য থেকে অপরিসীম পরিশ্রম করে আহৃত অসংখ্য অনুচ্ছেদ থেকে। তাঁর মতে 'হেটায়ারিজম' থেকে একপতিপত্নী প্রথায় পরিণতি এবং মাতৃ-অধিকার থেকে পিতৃ-অধিকারে পরিণতি ঘটেছে, বিশেষতঃ গ্রীকদের মধ্যে, ধর্মীয় ধারণাগুলির বিবর্তনের ফলে, যথা, পুরাতন দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিনিধি প্রাচীন দেবতামণ্ডলীর মধ্যে নতুন ধারণার প্রতিনিধি নতুন দেবতাদের প্রবেশ, যার ফলে প্রাচীনরা নবীনদের দ্বারা ক্রমে পিছনে হটে গিয়েছে। অর্থাৎ বাখোফেনের মতে মানুষ যে বাস্তব অবস্থার মধ্যে বসবাস করে তার বিকাশ নয়, পরন্তু মানুষের মনে জীবনের এই পরিস্থিতির ধর্মীয় প্রতিফলন স্ত্রী ও পুরুষের পারস্পরিক সামাজিক অবস্থানের ঐতিহাসিক পরিবর্তনগুলি ঘটিয়েছে। এইজন্যই বাখোফেন এস্কাইলাস্ রচিত 'আরস্টেইয়ার' উল্লেখ করে বলেছেন যে, এটি হচ্ছে বীর যুগের ক্ষয়িষ্ণু মাতৃ-অধিকার এবং উদীয়মান ও বিজয়ী পিতৃ-অধিকারের মধ্যে সংগ্রামের নাট্যরূপ। ক্লাইটেমনেস্ত্রা তাঁর প্রেমিক এগিস্থাসের জন্য ট্রয় যুদ্ধ থেকে সদ্য প্রত্যাগত স্বামী আগামেম্‌নস্‌কে হত্যা করলেন; কিন্তু আগামেম্‌নসের ঔরসে তাঁর পুত্র অরেস্টেস মাকে হত্যা করে পিতৃ-হত্যার প্রতিশোধ নিল। এইজন্য মাতৃ-অধিকারের রক্ষক এরিনিয়েরা* তার পশ্চাদ্ধাবন করল, কারণ মাতৃ-অধিকার অনুযায়ী মাতৃ-হত্যাই হচ্ছে সবচেয়ে ঘৃণ্য পাপ যার কোন প্রায়শ্চিত্ত নেই। কিন্তু অ্যাপোলো যিনি দৈববাণী মারফত অরেস্টেসকে এই কাজে প্রবৃত্ত করেছিলেন এবং এথেনা, যাকে মধ্যস্থ মানা হল, এ দুজন দেবতা এখানে পিতৃ-অধিকারের উপর প্রতিষ্ঠিত নতুন ব্যবস্থার প্রতিনিধি — এঁরাই অরেস্টেসকে রক্ষা

* এরিনিয়ে — গ্রীক পুরাকথার প্রতিহিংসার প্রেতিনী, নারী রূপে কল্পিত, চুলের বদলে মাথায় তাদের সাপের জটা। — সম্পাঃ

করলেন। এথেনা উভয়পক্ষের বক্তব্য শ্নলেন। অরেস্টেস ও এরিনিয়েদের মধ্যে তখন যে বিতর্ক হয়, তার মধ্যেই সংক্ষেপে সংহত হয়েছে সমস্ত তর্কবিষয়। অরেস্টেস ঘোষণা করে যে, ক্লাইটেমনেস্ত্রা দ্বিবিধ পাপে পাপী; কারণ তিনি একদিকে **নিজের** স্বামীকে হত্যা করেছেন এবং সেইসঙ্গেই **তার** পিতাকে হত্যা করেছেন। অতএব কেন এরিনিয়েরা অধিকতর অপরাধী ক্লাইটেমনেস্ত্রার বদলে তাকে নিপীড়িত করছে? এর উত্তরটি চমকপ্রদ:

'যারে সে করেছে হত্যা তার সাথে **ছিল নাক রক্তের সম্পর্ক**।'

রক্ত সম্পর্ক নেই এমন কোন প্রুষ যদি হত্যাকারিণীর স্বামীও হয় তাহলেও সে অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত আছে এবং সেটি এরিনিয়েদের দেখবার বিষয় নয়। তাদের কাজ হচ্ছে শ্ধ্ রক্ত সম্পর্কের মধ্যে হত্যার প্রতিশোধ নেওয়া এবং এই ধরনের হত্যার মধ্যে, মাতৃ-অধিকার অন্যায়ী সবচেয়ে ঘৃণ্য হচ্ছে মাতৃ-হত্যা, তার কোনো প্রায়শ্চিত্ত নেই। অ্যাপোলো অরেস্টেসের পক্ষ নিয়ে হস্তক্ষেপ করলেন। এথেনা এরিওপেগোইটিসদের অথবা এথেনীয় জ্রীদের এই প্রশ্নে ভোট দিতে বললেন। ম্ক্তি ও শাস্তির পক্ষে ভোট সমান সমান হল। তখন এথেনা বিচারের সভানেত্রী হিসাবে অরেস্টেসের পক্ষে তাঁর ভোট দিয়ে তাকে ম্ক্ত করলেন। মাতৃ-অধিকারকে হারিয়ে পিতৃ-অধিকার জিতল। এরিনিয়েরা যাদের আখ্যা দিয়েছিলেন 'ছোট-তরফের দেবতা' — তাঁরাই এরিনিয়েদের হারিয়ে দিলেন এবং শেষোক্তরা শেষ পর্যন্ত নববিধানের অধীনে ন্তনতর পদ গ্রহণে রাজী হলেন।

'আরস্টেইয়ার' এই নতুন কিন্তু একেবারে নির্ভুল ব্যাখ্যাটি হচ্ছে সমগ্র রচনার মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ এবং অত্যন্ত স্ন্দর অংশ, কিন্তু সেই সঙ্গে তা থেকে দেখা যায় যে, এস্কাইলাস্ অন্তত তাঁর য্গে এরিনিয়ে, অ্যাপোলো ও এথেনাকে যতটা বিশ্বাস করতেন, বাখোফেন নিজেও অন্তত তার চেয়ে কম করেন না; বস্তুত তিনি বিশ্বাস করেন যে, গ্রীসের বীর য্গে এঁরাই মাতৃ-অধিকারকে অপসারিত করে পিতৃ-অধিকার প্রতিষ্ঠার আশ্চর্য ঘটনাটি ঘটিয়েছিলেন। স্পষ্টত এর্প একটি যে ধারণায় ধর্মকেই বিশ্ব ইতিহাসে পরিবর্তনের চ্ড়ান্ত কারিকা মনে করা হয়, তা নিছক রহস্যবাদে পরিণত হতে বাধ্য। এইজন্যই বাখোফেনের স্থ্লকায় গ্রন্থটি পড়ে যাওয়া অত্যন্ত কষ্টসাধ্য এবং সবক্ষেত্রেই লাভজনক নয়। কিন্তু এতে অগ্রগামী হিসাবে তাঁর কৃতিত্ব একটুও কমে না, কারণ তিনিই সর্বপ্রথম নির্বিচার যৌন সম্পর্কের একটা অজানা আদিম অবস্থা সম্বন্ধে ফাঁকা ব্লির জায়গায় প্রমাণ দেন যে, প্রাচীন চিরায়ত সাহিত্যে অনেক চিহ্ন ছড়িয়ে রয়েছে যে, গ্রীক ও এশিয়াবাসীদের মধ্যে একবিবাহের আগে সত্যসত্যই সের্প একটি অবস্থা ছিল, যখন প্রতিষ্ঠিত কোন প্রথা লংঘন না করেও শ্ধ্ যে একটি প্রুষ বহ্ স্ত্রীলোকের সঙ্গে যৌন সম্পর্ক রাখত তাই নয়, পরন্তু একজন স্ত্রীলোকও বহ্ প্রুষের

সঙ্গে যৌন সম্পর্ক রাখতে পারত; একবিবাহের অধিকার নারীরা যে সীমাবদ্ধ সময়ের জন্য আত্মসমর্পণ মারফত ক্রয় করতে বাধ্য হয়েছিল তার মধ্যে নিজের চিহ্ন না রেখে এ প্রথা লুপ্ত হয়নি; তাই প্রথমে শুধুমাত্র স্ত্রীলোক থেকে, মাতা অনুযায়ী বংশপরম্পরার হিসাব করা হত; এবং এইভাবে নারীবংশ পরম্পরার বৈধতা একবিবাহের যুগেও বেশ কিছুকাল বজায় ছিল যখন পিতৃত্ব সুনিশ্চিত অথবা অন্ততঃ সর্ববাদীসম্মত; এবং সন্তানসন্ততিদের একমাত্র সুনিশ্চিত জন্মদাতা হিসাবে মায়ের এই আদি প্রতিষ্ঠার ফলে মা এবং সাধারণভাবে স্ত্রীলোকদের জন্য এমন একটা উচ্চতর সামাজিক মর্যাদা নিশ্চিত ছিল যা পরবর্তী যুগে তাঁরা আর পাননি। বাখোফেন অবশ্য এই প্রতিপাদ্যগুলি এতটা পরিষ্কার করে ব্যক্ত করেননি — তাঁর রহস্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গি তাঁকে ব্যাহত করেছে; কিন্তু তিনি প্রমাণ করলেন যে, এই প্রতিপাদ্যগুলি নির্ভুল এবং ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে এর তাৎপর্য সম্পূর্ণ বৈপ্লবিক।

বাখোফেনের বিরাট গ্রন্থ জার্মান ভাষায় লিখিত হয়েছিল, অর্থাৎ এমন একটি জাতির ভাষায় যারা বর্তমান পরিবারের প্রাগৈতিহাসিক বৃত্তান্ত সম্বন্ধে সে সময় অন্যান্য জাতির চেয়ে অনেক কম আগ্রহসম্পন্ন ছিল। তাই তিনি অজ্ঞাতেই থেকে গেলেন। এই ক্ষেত্রে তাঁর আশু উত্তরসূরী ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে আত্মপ্রকাশ করলেন, তিনি কখনও বাখোফেনের নাম পর্যন্ত শোনেননি।

এই উত্তরসূরী হলেন জন ফেরগুসন ম্যাক-লেনান। তিনি তাঁর পূর্বগামীর সম্পূর্ণ বিপরীত। প্রতিভাশালী রহস্যবাদীর জায়গায় আমরা দেখি একটি কাটখোট্টা উকিল; উচ্ছল কাব্য কল্পনার জায়গায় আমরা দেখি যে, একজন আইনজীবী তাঁর মামলার পক্ষে গ্রহণযোগ্য যুক্তি সাজাচ্ছেন। প্রাচীন ও আধুনিক যুগের বহু বন্য, বর্বর, এমনকি সভ্য জাতির মধ্যে ম্যাক-লেনান বিবাহের একটি প্রথার সন্ধান পান যাতে পাত্র, একাকী অথবা বন্ধুবান্ধব সঙ্গে নিয়ে পাত্রীকে তার আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে বলপূর্বক ছিনিয়ে নেবার ভাণ করে। এই প্রথাটি নিশ্চয়ই কোন পূর্ববর্তী একটি প্রথার লুপ্তাবশেষ যাতে এক উপজাতির লোকেরা অন্য উপজাতি থেকে সত্যসত্যই বলপূর্বক হরণ করে স্ত্রী সংগ্রহ করত। কেমন করে এই 'হরণ করে বিবাহের' প্রথা এল? যতদিন পুরুষেরা নিজেদের উপজাতির মধ্যে যথেষ্ট সংখ্যক স্ত্রীলোক পেত, ততদিন এর কোন প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু প্রায়ই আমরা দেখতে পাই যে, অনুন্নত জাতিগুলির মধ্যে কিছু কিছু গ্রুপ আছে (১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে এই গোষ্ঠীগুলিকে প্রায়ই উপজাতির সঙ্গে এক করে দেখা হত) যাদের নিজেদের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ, তার ফলে পুরুষেরা তাদের স্ত্রী এবং স্ত্রীলোকেরা তাদের স্বামী এই গ্রুপের বাইরে থেকে সংগ্রহ করতে বাধ্য হত; আবার কোথাও কোথাও এমন প্রথা প্রচলিত যাতে একটি বিশেষ গ্রুপের পুরুষেরা কেবলমাত্র নিজেদের মধ্যে থেকেই স্ত্রী সংগ্রহ করতে বাধ্য ছিল। ম্যাক-লেনান প্রথম ধরনের গ্রুপকে বহির্বিবাহিক

(exogamous) এবং দ্বিতীয়টিকে অন্তর্বিবাহিক (endogamous) আখ্যা দেন এবং কোন দ্বিধা না করে তিনি বহির্বিবাহিক ও অন্তর্বিবাহিক 'উপজাতিদের' মধ্যে একটা অনড় বৈপরীত্য কায়েম করে দেন। এবং যদিও বহির্বিবাহ নিয়ে তাঁর নিজের গবেষণার ফলে এই সত্যটি তাঁর চোখের সামনেই ফুটে ওঠে যে, সর্বক্ষেত্রে যদি নাও হয় তাহলেও অনেক ক্ষেত্রে এই বৈপরীত্যের অস্তিত্ব শুধু তার কল্পনাতে, তবুও তিনি একেই ভিত্তি করে তাঁর সমগ্র মতবাদ গড়ে তোলেন। সেই হিসাবে বহির্বিবাহিক উপজাতিরা কেবলমাত্র অন্যান্য উপজাতি থেকেই তাদের স্ত্রী সংগ্রহ করতে পারে; এবং উপজাতিগুলির মধ্যে চিরস্থায়ী যুদ্ধের যে যুগ ছিল বন্য অবস্থার একটি বৈশিষ্ট্য, তখন এই কাজ কেবল বলপূর্বক হরণ করেই করা সম্ভব বলে তাঁর ধারণা।

ম্যাক-লেনান তারপর প্রশ্ন করছেন: কোথা থেকে এই বহির্বিবাহ প্রথা এল ? রক্ত সম্পর্ক এবং অগম্যাগমনের ধারণাগুলির সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই, কারণ এইগুলি অনেক পরেই দেখা দিয়েছে। কিন্তু যে প্রথাটি বন্যদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত, অর্থাৎ জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই মেয়েদের মেরে ফেলা — তার সঙ্গে কোনো যোগাযোগ থাকতে পারে। এই প্রথার ফলে প্রত্যেকটি উপজাতিতে পুরুষের সংখ্যাধিক্য ঘটল, যার অবশ্যম্ভাবী ও অব্যবহিত ফল হচ্ছে এক নারীর উপর একাধিক পুরুষের দখল — বহুস্বামী প্রথা। এর ফলে আবার একটি শিশুর মা কে তা জানা যেত, কিন্তু বাবা নয়, তাই কুলের হিসাব হত পুরুষ বাদ দিয়ে স্ত্রীলোক অনুযায়ী। এই হল মাতৃ-অধিকার। এবং একটি উপজাতির মধ্যে স্ত্রীলোক কম হওয়ার অন্য একটি ফলই হচ্ছে (বহুস্বামী প্রথা দিয়ে এই অভাব উপশম হয়, দূর হয় না) অন্যান্য উপজাতির থেকে নিয়মিতভাবে বলপূর্বক স্ত্রীলোক অপহরণের ঠিক এই প্রথাটি। 'যেহেতু বহির্বিবাহ প্রথা ও বহুস্বামী প্রথা উভয়েরই কারণ একটি — স্ত্রী পুরুষের সংখ্যায় অসামঞ্জস্য — তাই **সমস্ত বহির্বিবাহিক জাতিগুলিকে আদিতে বহুপতিক** বলে গণ্য করতে আমরা বাধ্য... অতএব কোনো তর্কের অবকাশ না রেখেই আমরা বলতে পারি যে, বহির্বিবাহিক জাতিগুলির মধ্যে প্রথম কুল ব্যবস্থা ছিল সেইটে, যাতে শুধুমাত্র মায়ের মারফৎ রক্ত সম্পর্ককে স্বীকার করত।' (ম্যাক-লেনান, 'প্রাচীন ইতিহাসের গবেষণা', ১৮৮৬। আদিম বিবাহ*, পৃঃ ১২৪।)

ম্যাক-লেনানের কৃতিত্ব হচ্ছে এই যে, তিনি যাকে বহির্বিবাহ বলছেন, সেই প্রথার ব্যাপক প্রচলন ও প্রভূত গুরুত্ব সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। বহির্বিবাহ গ্রুপের অস্তিত্বটা মোটেই তাঁর **আবিষ্কার** নয়, আর তাকে বুঝেছেন আরো কম। অনেক

---

* J. F. Mac-Lennan, *Studies in Ancient History*, comprising a reprint of *Primitive Marriage*. London, 1886. — সম্পাঃ

পরিদর্শকের পূর্বতন বিচ্ছিন্ন যেসব মন্তব্য থেকে ম্যাক-লেনান তথ্য সংগ্রহ করেছেন তাদের কথা বাদ দিলেও লেথাম ('বিবরণমূলক নরকুলতত্ত্ব', ১৮৫৯*) যথাযথ ও নির্ভুলভাবে ভারতবর্ষের মাগরদের মধ্যে এই প্রথার বিবরণ দেন এবং ঘোষণা করেন যে, এটি সাধারণভাবে প্রচলিত ও পৃথিবীর সব মহাদেশে দেখা যায় — এই অংশটুকু ম্যাক-লেনান নিজেও উদ্ধৃত করেছেন। এমনকি আমাদের মর্গানও ১৮৪৭ সালেই (*American Review* পত্রিকায় প্রকাশিত) ইরকোয়াসদের সম্পর্কিত পত্রাবলীতে এবং ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে লেখা 'ইরকোয়াসদের লীগে'** প্রমাণ করেন যে, এই উপজাতির মধ্যেও এই প্রথা ছিল এবং নির্ভুলভাবে এর বিবরণ দেন, অথচ পরে দেখতে পাব, ম্যাক-লেনানের উকিলসুলভ মনোবৃত্তি এই বিষয়টিকে যতটা তালগোল পাকিয়েছিল মাতৃ-অধিকারের ক্ষেত্রে বাখোফেনের রহস্যবাদী কল্পনাও ততটা পারেনি। এটিও ম্যাক-লেনানের কৃতিত্ব যে, তিনি মায়ের অধিকার অনুযায়ী বংশগণনাকেই আদি বলে মেনেছিলেন যদিও তিনি পরে নিজেই স্বীকার করেন যে, এই ব্যাপারটি বাখোফেন তাঁর আগেই ধরেছিলেন। কিন্তু এখানেও তিনি মোটেই স্পষ্ট নন; তিনি বারবার বলেছেন 'শুধু স্ত্রীলোক ধারা অনুযায়ী আত্মীয়তা' (kinship through females only), এবং আগের পর্যায়ে নির্ভুল এই আখ্যাটিকে বিকাশের পরবর্তী স্তরেও বরাবর প্রয়োগ করেছেন যখন বংশপরম্পরা ও উত্তরাধিকার পূর্ণমাত্রায় নারী ধারা দিয়ে হিসাব হলেও পুরুষ ধারা থেকেও আত্মীয়তা স্বীকৃত ও ব্যক্ত হত। এই হচ্ছে আইনজীবীর গণ্ডীবদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি, যিনি নিজের মনে একটি অনড় আইনী সংজ্ঞা দাঁড় করিয়েছেন এবং যে পরিস্থিতিতে তা ইতিমধ্যে অচল হয়ে গেছে সেই পরিস্থিতিতেও তার বদল না করে ক্রমাগত প্রয়োগ করে চলেছেন।

যুক্তিযুক্ত বলে শোনালেও স্পষ্টতই ম্যাক-লেনানের তত্ত্ব তাঁর নিজের কাছেও খুব যুক্তিসিদ্ধ বলে মনে হয়নি। অন্ততপক্ষে তিনি নিজে এই ঘটনায় আশ্চর্য হয়েছেন যে 'লক্ষ্য করা গেছে যে, (নকল) হরণের রীতি এখন সর্বাধিক লক্ষিত ও জমকালো শুধু সেইসব জাতির মধ্যে যাদের আত্মীয়তা **পুরুষ** দিয়ে স্থির হয় (অর্থাৎ পুরুষ মারফৎ বংশপরম্পরা)' (পৃঃ ১৪০)। পুনরপি: 'এটি খুব বিচিত্র ঘটনা যে, যতদূর জানা গিয়েছে যেখানে বহির্বিবাহ প্রথা এবং আত্মীয়তার আদি রূপ পাশাপাশি বর্তমান সেরকম কোথাও আর শিশু হত্যার রীতি নেই' (পৃঃ ১৪৬)। এই দুটি ঘটনা প্রত্যক্ষভাবে তাঁর ব্যাখ্যাকে ভুল প্রমাণ করে এবং তা কাটাবার জন্যে নতুন নতুন আরও বেশী জটিল সব প্রকল্প দাঁড় করাতে হয় তাঁকে।

* R. G. Latham, *Descriptive Ethnology*. Vol. I-II. London, 1859. — সম্পাঃ

** L. H. Morgan, *League of the Ho-dé-no-sau-nee or Iroquois*, Rochester, 1851. — সম্পাঃ

তাহলেও ইংলণ্ডে তাঁর তত্ত্ব খুব প্রশংসা পায় ও সাড়া জাগায়; সাধারণভাবে ম্যাক-লেনানকেই ও দেশে পরিবারের ইতিহাসের প্রতিষ্ঠাতা এবং ঐ ক্ষেত্রে সবচেয়ে প্রামাণ্য বলে মেনে নেওয়া হল। বহির্বিবাহিক ও অন্তর্বিবাহিক 'উপজাতির' বৈপরীত্য সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য কিছু কিছু ব্যতিক্রম ও অদলবদল সত্ত্বেও প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গির সাধারণত স্বীকৃত ভিত্তি রয়ে গেল এবং এইটাই চোখে ঠুলির মতো অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে স্বাধীন পর্যালোচনা ও তার ফলে সুস্পষ্ট অগ্রগতি অসম্ভব করে তুলল। ম্যাক-লেনানকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করা যা ইংলণ্ডে এবং ইংরেজী ফ্যাশানের অনুকরণে অন্যত্রও রেওয়াজ হয়ে উঠেছিল, তার প্রতিতুলনায় উল্লেখ করা কর্তব্য যে, পুরোপুরি ভ্রান্ত ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত বহির্বিবাহিক ও অন্তর্বিবাহিক 'উপজাতিগুলির' বৈপরীত্যের মতবাদ দ্বারা তিনি যে ক্ষতি করেছেন তা তাঁর গবেষণার সমগ্র সুফল ছাড়িয়ে গিয়েছে।

ইতিমধ্যে অচিরেই আরও অনেক তথ্য জানা গেল যাকে এই মতবাদের পরিপাটী কাঠামোর মধ্যে আর মোটেই খাপ খাওয়ান যায় না। ম্যাক-লেনান বিবাহের তিনটি মাত্র রূপ জানতেন — বহুপত্নী প্রথা, বহুস্বামী প্রথা ও একপতিপত্নী প্রথা। কিন্তু একবার এইদিকে দৃষ্টি আকর্ষিত হবার পর এই তথ্যের সমর্থনে ক্রমেই বেশি করে প্রমাণ আবিষ্কৃত হতে থাকল যে, অনুন্নত জাতিগুলির মধ্যে বিবাহের এমন পদ্ধতি ছিল যাতে একদল পুরুষ সমষ্টিগতভাবে একদল স্ত্রীলোকের স্বামিত্ব করত, এবং **লাবক** (তাঁর রচিত 'সভ্যতার উৎপত্তি', ১৮৭০*) এই সমষ্টিগত বিবাহকে (communal marriage) একটি ঐতিহাসিক সত্য বলে স্বীকার করলেন।

এর অব্যবহিত পরেই ১৮৭১ সালে **মর্গান** তাঁর নতুন এবং অনেক বিষয়ে প্রামাণ্য তথ্য নিয়ে হাজির হলেন। তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় হয় যে, ইরকোয়াসদের মধ্যে প্রচলিত বিশেষ ধরনের আত্মীয়তাবিধি যুক্তরাষ্ট্রের সমস্ত আদিম অধিবাসীদের সম্পর্কে প্রযোজ্য এবং সুতবাং তা একটি গোটা মহাদেশে পরিব্যাপ্ত, যদিও তাদের প্রচলিত দাম্পত্য সম্পর্ক থেকে উদ্ভূত বিভিন্ন স্তরের আত্মীয়তার সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ বিরোধ আছে। তিনি তারপর আমেরিকার ফেডারেল সরকারকে তাঁর রচিত প্রশ্নাবলী ও কয়েকটি ছকের সাহায্যে অন্যান্য জাতিগুলির মধ্যে প্রচলিত আত্মীয়তাবিধি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে রাজী করান, এবং জবাবগুলি থেকে তিনি আবিষ্কার করেন যে: ১) আমেরিকার ইণ্ডিয়ানদের আত্মীয়তাবিধি এশিয়ার বহু উপজাতির মধ্যে এবং কিছুটা পরিবর্তিত রূপে আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়াতেও প্রচলিত; ২) এর সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা পাওয়া যায় হাওয়াই এবং অন্যান্য অস্ট্রেলিয়ান দ্বীপগুলিতে বর্তমানে যা বিলোপের পথে চলেছে সেই

* J. Lubbock, *The Origin of Civilization and the Primitive Condition of Man. Mental and Social Condition of Savages.* London, 1870. — সম্পাঃ

ধরনের এক সমষ্টিবিবাহ থেকে; এবং ৩) এই বিবাহের পাশাপাশি এইসব দ্বীপে যে আত্মীয়তাবিধি প্রচলিত রয়েছে তার কিন্তু ব্যাখ্যা পাওয়া যায় কেবল আরও প্রাচীন কিন্তু অধুনা বিলুপ্ত এক ধরনের সমষ্টিবিবাহ দিয়ে। সংগৃহীত তথ্য ও তাঁর সিদ্ধান্তগুলি একত্র করে তিনি ১৮৭১ সালে 'রক্ত সম্পর্ক ও আত্মীয়তার বিভিন্ন প্রথা'* বইটা প্রকাশ করেন এবং তাতে করে আলোচনাকে নিয়ে আসেন এক অসীম ব্যাপক ক্ষেত্রে। আত্মীয়তার প্রথাগুলি থেকে শুরু করে তিনি প্রত্যেকটির সহযোগ্য পরিবারের রূপ খাড়া করেন এবং এইভাবে অনুসন্ধানের এক নতুন ধারা ও মানবজাতির প্রাক-ইতিহাসে অনেক দূরপ্রসারী এক পশ্চাৎ-প্রেক্ষিত উন্মুক্ত করেন। এই পদ্ধতিকে সঠিক বলে মেনে নিলে ম্যাক-লেনানের পরিপাটি ছকটি হাওয়ায় মিলিয়ে যায়।

ম্যাক-লেনান তাঁর 'আদি বিবাহ' ('প্রাচীন ইতিহাসের গবেষণা', ১৮৭৬) নামক রচনার একটি নতুন সংস্করণে নিজের মতবাদের সমর্থন করেন। তিনি নিজেই নিছক প্রকল্পের উপরই কৃত্রিমভাবে পরিবারের ইতিহাস গড়ে তুললেও লাবক ও মর্গানের কাছ থেকে তিনি তাঁদের প্রত্যেকটি বক্তব্যের প্রমাণ চাইলেন শুধু নয়, এমন অবিসংবাদী প্রমাণ যা কেবল স্কটল্যাণ্ডের আদালতে গ্রহণযোগ্য হবে। এবং তা চাইলেন এমন একটি ব্যক্তি যিনি জার্মানদের মধ্যে প্রচলিত মায়ের ভাই এবং বোনের ছেলের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থেকে (ট্যাসিটাস রচিত 'জার্মানিয়া', ২০ পরিচ্ছেদ), সিজারের যে রিপোর্টে বলা হয়েছে দশবার জন বৃটন দল বেঁধে সাধারণ একদল স্ত্রী রাখত, তা থেকে এবং বর্বর জাতিগুলির মধ্যে মেয়েদের যৌথ-স্বামী প্রথা সম্পর্কে প্রাচীন লেখকদের অন্যান্য বক্তব্য থেকে একটুও দ্বিধা না করে সিদ্ধান্ত করে বসলেন যে, বহুস্বামী প্রথা এই সমস্ত জাতির মধ্যেই প্রচলিত ছিল! এ যেন মনে হয় আমরা একটি অভিশংসকের সওয়াল শুনছি নিজের মামলার পক্ষে সবরকম স্বাধীনতা নিতে যাঁর বাধে না, অথচ আসামী পক্ষের উকিলের প্রতিটি কথার পিছনে যিনি অতি আনুষ্ঠানিক ও আইনত বৈধ প্রমাণই কেবল দাবী করেন।

তিনি বলে বসলেন যে, সমষ্টি-বিবাহ হচ্ছে একটি নিছক কল্পনা এবং এইভাবে বাখোফেন থেকেও অনেক পিছিয়ে গেলেন। মর্গানের আত্মীয়তাবিধি সম্পর্কে তিনি বললেন যে, ঐগুলি সামাজিক ভদ্রতা ছাড়া আর কিছু বেশী নয় এবং তা এই ঘটনায় প্রমাণিত যে, ইণ্ডিয়ানরা ভিন্ন জাতি, এমনকি শ্বেতজাতি লোকদেরও 'ভ্রাতা' ও 'পিতা' বলে সম্ভাষণ করে। একথা বলার অর্থ পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী — এগুলি মাত্র সম্ভাষণের ফাঁকা রূপ, কারণ ক্যাথলিক ধর্মের পুরোহিত এবং প্রধানা সন্ন্যাসিনীদেরও

---

* L. H. Morgan, *Systems of Consanguinity and Affinity of the Human Family*. Washington, 1871. — সম্পাঃ

পিতা এবং মাতা বলে সম্ভাষণ করা হয় এবং সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনী এমনকি ফ্রিম্যাসন্ ও ইংলন্ডের কারুজীবী ইউনিয়নের সভ্যরাও নিজেদের সভার সুগম্ভীর অধিবেশনে ভ্রাতা এবং ভগিনী বলে সম্ভাষিত হয়। সংক্ষেপে বলা যায় যে ম্যাক-লেনানের আত্মপক্ষ সমর্থন শোচনীয় রকমের দুর্বল।

একটি বিষয় কিন্তু বাকি ছিল যেখানে ম্যাক-লেনান সম্পর্কে প্রশ্ন ওঠেনি। তাঁর সমস্ত পদ্ধতিটি বহির্বিবাহিক ও অন্তর্বিবাহিক উপজাতিদের যে বৈপরীত্যের উপর দাঁড়িয়েছিল সেটি এখনও অক্ষুণ্ণ ছিল তাই নয়, এমনকি এটিকে সাধারণভাবে পরিবারের সমগ্র ইতিহাসের খুঁটি বলেই গ্রহণ করা হয়েছিল। এ কথা স্বীকার করা হত যে, এই বৈপরীত্যকে ব্যাখ্যা করার জন্যে ম্যাক-লেনানের প্রচেষ্টা যথোপযুক্ত নয় এবং তাঁর নিজের বর্ণিত তথ্যেরই তা বিরোধী; কিন্তু এই বৈপরীত্যের ব্যাপারটা, পরস্পরের একেবারে বিপরীত দুই ধরনের স্বাধীন ও স্বতন্ত্র উপজাতির এই অস্তিত্ব, যাদের একটি পত্নী সংগ্রহ করত নিজেদের মধ্যে থেকে অথচ অপরটির কাছে তা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল, — এটা একেবারে তর্কাতীত বেদবাক্য বলে চলত। দৃষ্টান্তস্বরূপ, জিরো-তেলোঁর 'পরিবারের উৎপত্তি' (১৮৭৪)* এবং এমনকি লাবকের 'সভ্যতার উৎপত্তি' (৪র্থ সংস্করণ ১৮৮২) মেলিয়ে দেখতে পারেন।

এইখানেই আসে মর্গানের মূল রচনা, 'প্রাচীন সমাজের' (১৮৭৭) কথা, যার ওপর ভিত্তি করে বর্তমান পুস্তকটি লেখা হয়েছে। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে মর্গান যে জিনিসটি অস্পষ্টভাবে অনুমান করেছিলেন এখানে তা পরিপূর্ণ স্পষ্টতায় বিকশিত করা হয়েছে। বহির্বিবাহ আর অন্তর্বিবাহের মধ্যে আর কোনো বৈপরীত্য নেই; আজ পর্যন্ত কোথাও কোন বহির্বিবাহিক 'উপজাতি' আবিষ্কার হয়নি। কিন্তু যে সময়ে সমষ্টি-বিবাহ প্রচলিত ছিল — এবং খুব সম্ভবত সর্বত্রই কোন না কোন সময় এটি ছিল, — তখন উপজাতি গড়ে উঠত মায়ের দিক দিয়ে রক্ত সম্পর্কিত কয়েকটি গ্রুপ বা গোত্র (gentes) নিয়ে যাদের অভ্যন্তরে বিবাহ একেবারে নিষিদ্ধ ছিল, ফলে যদিও গোত্রের লোকেরা নিজেদের উপজাতির মধ্যে থেকেই পত্নী সংগ্রহ করতে পারত ও সাধারণত তাই করত, কিন্তু তা করতে হত নিজেদের গোত্রের বাইরে থেকে। তাই গোত্রগুলি কঠোরভাবে বহির্বিবাহিক হলেও সমস্ত গোত্র একত্রে নিয়ে যে উপজাতি সেটি ছিল কঠোরভাবেই অন্তর্বিবাহিক। এইবার ম্যাক-লেনানের কৃত্রিম কাঠামোর শেষ অবশেষ ভেঙ্গে পড়ল।

মর্গান অবশ্য এতেই তৃপ্ত থাকেননি। আমেরিকার ইন্ডিয়ানদের গোত্র থেকে শুরু করে তিনি অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে আরও এক পা এগিয়ে যেতে পারলেন। তিনি আবিষ্কার করলেন যে, মাতৃ-অধিকারের ভিত্তিতে সংগঠিত এই গোত্র হচ্ছে আদিরূপ

* A. Giraud-Teulon, *Les origines de la famille*, Genève, Paris, 1874. — সম্পাঃ

যার থেকে পিতৃ-অধিকার অনুযায়ী সংগঠিত পরবর্তী গোত্রের উৎপত্তি হয়েছে, যা আমরা প্রাচীন কালের সভ্য জাতিগুলির মধ্যে দেখতে পাই। গ্রীক ও রোমান গোত্র যা সমস্ত পূর্ববর্তী ঐতিহাসিকদের কাছে ছিল ধাঁধা, এখন তার ব্যাখ্যা হল ইন্ডিয়ান গোত্র দিয়ে এবং এইভাবে আদি সমাজের সমগ্র ইতিহাসের একটি নতুন ভিত্তি পাওয়া গেল।

সমস্ত সভ্য জাতির মধ্যে পিতৃ-অধিকার নিয়ে যে গোত্র দেখা যায় তার পূর্ববর্তী স্তরে আদি মাতৃ-অধিকারভিত্তিক গোত্রের আবিষ্কারটি হচ্ছে আদিম সমাজের ইতিহাস সম্পর্কে ঠিক ততখানি অর্থপূর্ণ যতখানি জৈব বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ডারউইনের বিবর্তন-বাদ অথবা অর্থনীতির ক্ষেত্রে মার্কসের উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব। এর সাহায্যে মর্গান এই প্রথম পরিবারের ইতিহাসের একটি রূপরেখা দিতে পারলেন যাতে বিবর্তনের অন্তত চিরায়ত পর্যায়গুলি, বর্তমানে লভ্য তথ্যের ভিত্তিতে যতটা সম্ভব, খসড়াকারে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হল। স্পষ্টতই এতে আদিম সমাজের ইতিহাস পর্যালোচনার নতুন যুগ শুরু হল। মাতৃ-অধিকারভিত্তিক গোত্রই হয়ে দাঁড়াল সেই খুঁটি যার ওপর এ বিজ্ঞানের ভর; এই আবিষ্কারের পর আমরা বুঝতে পারি কোন পথে গবেষণা চালাতে হবে, কোন কোন অনুসন্ধান করতে হবে এবং কেমন করে অনুসন্ধানের ফলগুলি সাজাতে হবে। ফলে মর্গানের রচনা প্রকাশিত হবার পর এইক্ষেত্রে অগ্রগতি আগেকার চেয়ে অনেক বেশী দ্রুত ও ভিন্নরূপ।

বর্তমানে মর্গানের আবিষ্কারগুলি ইংলন্ডের প্রাক-ইতিহাসবিদরাও সাধারণভাবে মেনে নিয়েছেন অথবা সঠিক বলতে গেলে আত্মসাৎ করেছেন। কিন্তু তাঁদের মধ্যে প্রায় কেউই প্রকাশ্যে স্বীকার করেন না যে, দৃষ্টিভঙ্গির এই বিপ্লবের জন্য আমরা মর্গানের কাছে ঋণী। ইংলন্ডে যতদূর সম্ভব তাঁর পুস্তকের সম্বন্ধে নীরব থাকা হয় এবং মর্গানের **পূর্ববর্তী** রচনাকে মুরুব্বিয়ানা চালে প্রশংসা করেই তাঁকে বিদায় করা হয়; তাঁর পরিব্যাখ্যানের খুঁটিনাটি সাগ্রহে চেপে ধরা হয় সমালোচনার জন্য অথচ তাঁর সত্যসত্যই মহৎ আবিষ্কারগুলি সম্পর্কে একগুঁয়ে নীরবতা বজায় রাখা হয়। 'প্রাচীন সমাজের' আদি সংস্করণটি বাজারে নেই; আমেরিকায় এই ধরনের পুস্তকের লাভজনক বাজার নেই; ইংলন্ডে মনে হয় যে বইখানিকে নিয়মিতভাবে চেপে রাখা হয়েছে এবং এই যুগান্তকারী রচনার যে সংস্করণটি এখনও বাজারে পাওয়া যায় সেটি হচ্ছে একটি জার্মান ভাষায় অনুবাদ।

কেন এই কুণ্ঠা, যাকে নীরবতার চক্রান্ত বলে না ভাবা দুষ্কর, বিশেষতঃ আমাদের মান্যগণ্য প্রাগৈতিহাসিক পন্ডিতদের রচনাগুলি যখন নিছক ভদ্রতার জন্য উদ্ধৃতি অথবা দোস্তির অন্যান্য সাক্ষ্যে ভরপুর। সে কি এই জন্য যে মর্গান আমেরিকান এবং ইংরেজ প্রাগৈতিহাসিক পন্ডিতদের তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রশংসনীয় পরিশ্রম

সত্ত্বেও, সে তথ্যের বিন্যাস ও বর্গভেদের সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গির জন্য, সংক্ষেপে ধারণার জন্য দুজন প্রতিভাশালী বিদেশী — বাখোফেন ও মর্গানের ওপর নির্ভর করতে বাধ্য হওয়া তাঁদের পক্ষে ভারি কষ্টকর? একজন জার্মানকে বরং সহ্য করা যায়, কিন্তু একজন আমেরিকান? প্রত্যেক ইংরেজ আমেরিকানকে দেখলে কীরকম দেশপ্রেমিক হয়ে ওঠেন তার অনেক হাস্যকর দৃষ্টান্ত আমি যুক্তরাষ্ট্রে থাকবার সময় দেখেছি। এরসঙ্গে যোগ করে যায় যে, ম্যাক-লেনান ছিলেন ইংলণ্ডের প্রাগৈতিহাসিক বিদ্যার বলা যেতে পারে সরকারীভাবে বিঘোষিত প্রতিষ্ঠাতা ও নেতা; শিশুহত্যা থেকে শুরু করে বহুস্বামী প্রথা ও হরণ করে বিবাহ করার মারফৎ মাতৃ-অধিকারসমন্বিত পরিবার প্রথা পর্যন্ত তাঁর এই কৃত্রিম ঐতিহাসিক মতবাদের অতি সশ্রদ্ধ উল্লেখই ছিল প্রাগৈতিহাসিক পণ্ডিতদের কাছে একধরনের শালীনতাস্বরূপ; পরস্পরের একেবারে বিরোধী বহির্বিবাহিক ও অন্তর্বিবাহিক উপজাতির অস্তিত্ব সম্পর্কে একটুও সন্দেহ-প্রকাশ ছিল চরম ধৃষ্টোক্তি; অতএব মর্গান এই সমস্ত পবিত্র গুরুবাক্য উড়িয়ে দেওয়ায় এক ধরনের মহাপাপী হয়ে উঠলেন। উপরন্তু মর্গান এগুলি উড়িয়ে দিলেন এমন যুক্তি ব্যবহার করে যে বক্তব্য উপস্থিত করা মাত্রই সেটি সঙ্গে সঙ্গে সকলের কাছেই প্রতীয়মান হয়ে উঠল এবং ম্যাক-লেনানের ভক্তরা, যাঁরা এতকাল বহির্বিবাহ ও অন্তর্বিবাহের মধ্যে হোঁচট খেয়ে ঘুরছিলেন তাঁদের প্রায় কপাল চাপড়ে বলতে হত: কী বোকামি যে, এ সব জিনিস আমরা নিজেরাই অনেক আগেই বার করতে পারিনি!

তাছাড়া সরকারী গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে একমাত্র শীতল উপেক্ষা পাবার মতো অপরাধ যেন এতেও হয়নি, তাই সে অপরাধের পাত্র তিনি পূর্ণ করে তুললেন সভ্যতাকে, পণ্যোৎপাদনের সমাজকে, আমাদের আধুনিক সমাজের বনিয়াদী রূপটাকে এমন সমালোচনা করে যা মনে পড়িয়ে দেয় ফুরিয়ের কথা এবং শুধু তাই নয়, এই সমাজের ভবিষ্যৎ রূপান্তরের কথাও তিনি বললেন এমন ভাষায় যা কার্ল মার্কসও ব্যবহার করতে পারতেন। তাই এর প্রতিফল তিনি পেলেন যখন ম্যাক-লেনান ক্রুদ্ধভাবে অভিযোগ আনলেন যে, 'তাঁর মধ্যে ঐতিহাসিক পদ্ধতি সম্পর্কে গভীর বিরাগ রয়েছে' এবং যখন এমনকি ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দেও জেনেভার অধ্যাপক জিরো-তেলোঁ সে অভিমত সমর্থন করলেন। অথচ ইনি সেই একই জিরো-তেলোঁ যিনি ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে ('পরিবারের উৎপত্তি') ম্যাক-লেনানের বহির্বিবাহিক গোলকধাঁধায় অসহায় হয়ে ঘুরে মরছিলেন এবং সে অবস্থা থেকে কেবল মর্গানই তাঁকে উদ্ধার করেন!

আদিম সমাজের ইতিহাস আর কোন কোন অগ্রগতির জন্য মর্গানের কাছে ঋণী তা এক্ষেত্রে আর আলোচনা করা দরকার করে না; যা দরকার তার উল্লেখ পাওয়া যাবে বর্তমান পুস্তকের মধ্যে। মর্গানের মূল রচনা প্রকাশের পরে যে চোদ্দ বছর কেটে

গিয়েছে তার মধ্যে আদিম মানবসমাজের ইতিহাস সম্পর্কে আমাদের তথ্যের ভাণ্ডার অনেক বেশী পুষ্ট হয়েছে। নৃতত্ত্ববিদ, পর্যটক এবং পেশাদার প্রাগৈতিহাসিক পণ্ডিত ছাড়াও তুলনামূলক আইনবিধির প্রতিনিধিরা এইক্ষেত্রে এসেছেন এবং নতুন নতুন তথ্য ও নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এসেছেন। ফলে মর্গানের কোন কোন প্রকল্প বিচলিত এমনকি খণ্ডিতও হয়ে গেছে। কিন্তু কোথাও নতুন সংগৃহীত তথ্য তাঁর মূল প্রভূতগুরুত্বসম্পন্ন ধারণাগুলিকে হঠিয়ে দেয়নি। আদিম সমাজের ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে তিনি যে ধরনের শৃঙ্খলার প্রবর্তন করেছিলেন তার মূলকথা আজও প্রতিষ্ঠিত। এমনকি এই কথাই বলতে পারি, যে-হারে এই বিরাট অগ্রগতির উদ্ভাবকের নাম গোপন করা হচ্ছে সেই-হারেই তা ক্রমবর্ধমান সাধারণ স্বীকৃতি লাভ করছে।*

লণ্ডন, ১৬ই জুন, ১৮৯১

ফ্রেডারিক এঙ্গেলস

* ১৮৮৮ সালে নিউ ইয়র্ক থেকে আমার ফেরার পথে রচেস্টারের একজন ভূতপূর্ব কংগ্রেসীর সঙ্গে আমার দেখা হয়, তিনি লুইস মর্গানকে চিনতেন। দুর্ভাগ্যবশত তাঁর সম্বন্ধে খুব অল্পই তিনি আমায় বলতে পারেন। তিনি বলেন, রচেস্টারে মর্গান একজন সাধারণ নাগরিক হিসাবে বাস করতেন, নিজের অধ্যয়ন নিয়েই থাকতেন। তাঁর ভাই ছিল সৈন্যবাহিনীর একজন কর্ণেল, ওয়াশিংটনে সমর বিভাগের এক পদাধিকারী। এই ভাইয়ের মুরুব্বিতে তিনি তাঁর গবেষণায় সরকারকে আগ্রহী করতে ও সরকারী খরচে তাঁর কতকগুলি রচনা প্রকাশিত করতে সক্ষম হন। ভূতপূর্ব কংগ্রেসীটি বলেন যে, কংগ্রেসে থাকার সময় তিনি নিজেও এ ব্যাপারে বার কয়েক তাঁকে সাহায্য করেন। (এঙ্গেলসের টীকা।)

পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি

১

সংস্কৃতির প্রাগৈতিহাসিক স্তর

বিশেষজ্ঞের জ্ঞান নিয়ে মর্গানই প্রথম ব্যক্তি যিনি মানুষের প্রাগৈতিহাসিক অবস্থা সম্পর্কে পর্যালোচনায় একটি সুস্পষ্ট শৃঙ্খলা আনতে চেয়েছিলেন; যতদিন পর্যন্ত না নতুনতর গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের ফলে কোনো অদলবদল জরুরী হয়ে উঠছে, ততদিন পর্যন্ত তাঁর যুগবিভাগই প্রচলিত থাকবে বলে আশা করা যায়।

বন্যাবস্থা, বর্বরতা এবং সভ্যতা এই তিনটি মূল যুগের মধ্যে তিনি স্বভাবতই প্রথম দুটি যুগ এবং তৃতীয় যুগে উৎক্রমণ নিয়েই ভাবিত। প্রথম দুটি যুগকে তিনি জীবনোপকরণ উৎপাদনের অগ্রগতি অনুযায়ী নিম্নতন, মধ্যবর্তী এবং উচ্চতন এই তিনটি স্তরে ভাগ করেছেন, কারণ তাঁর কথামতো, 'এই বিষয়ে দক্ষতা অর্জনের ওপরই পৃথিবীতে মানুষের আধিপত্যের সমগ্র প্রশ্নটি নির্ভর করে। জীবজগতে একমাত্র মানুষই খাদ্য উৎপাদনের ওপর প্রায় অপরিসীম আধিপত্য লাভ করেছে। মানবিক অগ্রগতির সমস্ত মহা যুগগুলি কমবেশী পরিমাণে সরাসরিভাবে জীবনযাত্রার উপকরণের উৎসের পরিবর্ধনের সঙ্গেই মিলে যায়।' পরিবার-প্রথার ক্রমপরিবর্তন একইসঙ্গেই চলেছে, কিন্তু তাতে যুগবিভাগের এমন সুস্পষ্ট মাপকাঠি পাওয়া যায় না।

ক। বন্যাবস্থা

১। **নিম্নতন স্তর**। মানবজাতির শৈশব। মানুষ তখনও তার আদি বাসভূমি গ্রীষ্ম অথবা উপগ্রীষ্মমণ্ডলী অঞ্চলের বনভূমিতে থাকত। অন্তত: আংশিকভাবে গাছের ওপর বাস করত, এছাড়া বৃহদাকার হিংস্র জন্তুদের মুখে তার টিকে থাকার ব্যাখ্যা করা যায় না। ফল-মূলই ছিল তার খাদ্য; এই পর্বের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হচ্ছে পৃথকোচ্চারিত ভাষার উৎপত্তি। ঐতিহাসিক যুগে যে সমস্ত জন-সমাজের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় তাদের মধ্যে কোথাও এই আদিম স্তরের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। যদিও এই পর্ব সম্ভবত হাজার হাজার বছর ধরে চলেছে, তবু এর অস্তিত্বের কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই; কিন্তু যখনই আমরা পশুজগৎ থেকে মানুষের উৎপত্তি মেনে নিই তখনই এমন একটি উৎক্রমণ স্তর মেনে নেওয়া অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

২। **মধ্যবর্তী স্তর।** খাদ্য হিসাবে মাছের ব্যবহার (মাছের মধ্যে কাঁকড়া, শামুক ও অন্যান্য জলজ জীবকে ধরা হচ্ছে) এবং আগুনের প্রয়োগ থেকে এই স্তরের শুরু। মাছ ও আগুন এই দুটি হচ্ছে পরস্পর পরিপূরক, কারণ কেবলমাত্র আগুনের সাহায্যেই মাছ পূর্ণমাত্রায় খাদ্য হিসেবে ব্যবহারযোগ্য হয়। এই নতুন খাদ্য কিন্তু মানুষকে জলবায়ু ও স্থানীয় গণ্ডি থেকে মুক্ত করল। নদীর গতিপথ এবং সমুদ্রের উপকূল ধরে মানুষ বন্য যুগেই ভূপৃষ্ঠের বেশীর ভাগ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়তে পারে। আদি প্রস্তরযুগের, তথাকথিত পুরাপ্রস্তর যুগের যে স্থূল, অমার্জিত পাথরের হাতিয়ারগুলি সম্পূর্ণভাবে অথবা প্রধানত এই সময়েরই বৈশিষ্ট্য তা সমস্ত মহাদেশেই ছড়িয়ে আছে ও এই পদযাত্রার সাক্ষ্য। বসবাসের নতুন অঞ্চলগুলির কারণে এবং পাথর ঘষে আগুন তৈরির বিদ্যা আয়ত্ত করার সঙ্গে জড়িত নতুন নতুন আবিষ্কারের অবিরাম সক্রিয় তাগিদে নতুন সব খাদ্যসামগ্রী পাওয়া গেল, যেমন তপ্ত ভস্মে ঝলসান অথবা গর্ত করে (ভূমি চুল্লি) সেঁকা শর্করাপ্রধান মূল ও কন্দ এবং শিকারলব্ধ জন্তু, যেগুলিকে লগুড় ও বর্শা এই দুটি আদিম অস্ত্র আবিষ্কারের পরে খাদ্যের তালিকাভুক্ত করা গিয়েছিল। কেতাবে যা লেখা হয় তেমন নিছক শিকারী জাতি অর্থাৎ **শুধু** শিকার করেই যারা খাদ্য সংগ্রহ করে, এমন জাতি কোনোদিনই ছিল না, কারণ শিকার করে কিছু পাওয়া এত অনিশ্চিত যে সেটা সম্ভবপর নয়। খাদ্যসামগ্রী উৎসের ক্রমাগত অনিশ্চয়তার জন্য এই সময়ে নরমাংস ভোজনের উদ্ভব হয়েছে বলে মনে হয় এবং বহুদিন ধরে চলতে থাকে। অস্ট্রেলীয় ও অনেক পলিনেশীয় আজ পর্যন্ত বন্যাবস্থার এই মধ্যবর্তী স্তরে রয়েছে।

৩। **উচ্চতন স্তর।** এই স্তর শুরু হয় তীর-ধনুক আবিষ্কার দিয়ে যার ফলে বন্য জীবজন্তু নিয়মিত খাদ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং শিকার করা একটা স্বাভাবিক পেশা হয়ে ওঠে। ধনুক, ছিলা ও তীর তিনটি মিলিয়ে একটি জটিল হাতিয়ার, এর আবিষ্কারের পেছনে অনেক দিনের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা এবং মানসিক শক্তির উৎকর্ষ ধরে নিতে হয়, সুতরাং যুগপৎ আরও বহু আবিষ্কারের সঙ্গে পরিচয়ও ধরতে হয়। তীর-ধনুকের সহিত পরিচিত হলেও তখনো পর্যন্ত মৃৎশিল্পের সহিত পরিচিত নয় (মর্গান মৃৎশিল্প থেকেই বর্বরতায় উৎক্রমণের যুগ ধরেছেন) এমন বিভিন্ন উপজাতির যদি তুলনা করি তাহলে দেখতে পাব এই আদি পর্যায়েও গ্রামে বসবাসের সূচনা হচ্ছে, জীবনোপকরণ উৎপাদনের ওপর কতকটা আধিপত্য জন্মেছে, দেখতে পাব কাঠের পাত্র ও বাসনকোসন, (তাঁত ছাড়াই) হাতে করে গাছের বাকল থেকে বস্ত্র বয়ন, গাছের ছাল বা শরজাতীয় জিনিস দিয়ে বোনা ঝুড়ি-চুপড়ি, এবং মার্জিত পাথরের হাতিয়ার (নিওলিথিক যুগ)। বহু ক্ষেত্রে দেখা যায় আগুন ও পাথরের কুঠার দিয়ে ইতিমধ্যেই গাছের গুঁড়ি থেকে কুঁদে তোলা ডোঙ্গা পাওয়া গেছে এবং কোথাও কোথাও কাঠ ও তক্তা দিয়ে গৃহনির্মাণ

হচ্ছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, উত্তর-পশ্চিম আমেরিকার ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে এই সব অগ্রগতি দেখা যায়, তারা তীর-ধনুকের সঙ্গে পরিচিত হলেও মৃৎশিল্প সম্পর্কে কিছুই জানে না। বর্বরতার যুগে যেমন লোহার তরোয়াল এবং সভ্যতার যুগে আগ্নেয়াস্ত্র তেমনই বন্যাবস্থায় তীর-ধনুকই ছিল নির্ধারক অস্ত্র।

খ। বর্বরতা

১। নিম্নতন স্তর। মৃৎশিল্প থেকেই এর সূচনা। বহু ক্ষেত্রেই এ কথা প্রমাণিত এবং সম্ভবত সর্বক্ষেত্রেই, আগুন থেকে বাঁচানোর জন্য প্রথমে কাঠের পাত্র অথবা ঝুড়ি-চুপ্‌ড়িগুলিতে মাটির প্রলেপ থেকে এর উদ্ভব; এ থেকেই শীগগির আবিষ্কার হল যে, কাদাকে ছাঁচে ঢাললে ভেতরের আধার ছাড়াই উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়।

এই পর্যন্ত বিবর্তনের ধারা অঞ্চল নির্বিশেষে একটি বিশেষ যুগের সকল জাতির সম্পর্কে সাধারণভাবে সত্য বলে ধরতে পারি। বর্বরতার সূচনার সঙ্গে কিন্তু আমরা এমন একটা স্তরে এসে পড়ি যখন দুটি মহাদেশের মধ্যে প্রাকৃতিক অবস্থার পার্থক্য প্রভাব ফেলতে শুরু করেছে। বর্বরতার যুগের মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পশু পালন ও প্রজনন এবং চাষবাস। পূর্ব মহাদেশ, তথাকথিত প্রাচীন গোলার্ধে গৃহপালনের উপযোগী প্রায় সব জন্তু এবং একটি ছাড়া প্রায় সমস্ত চাষযোগ্য খাদ্যশস্য ছিল; কিন্তু পশ্চিম গোলার্ধে বা আমেরিকায় ছিল একটিমাত্র পালনযোগ্য স্তন্যপায়ী জন্তু — লামা — এবং তাও কেবল দক্ষিণের একটি অংশে, এবং চাষের উপযোগী একটিমাত্র খাদ্যশস্য — সমস্ত খাদ্যশস্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ — ভুট্টা পাওয়া যেত। প্রাকৃতিক অবস্থার এই বিভিন্নতার ফলে এখন থেকে প্রতিটি গোলার্ধের জনগণ নিজের নিজের বিশিষ্ট পথে এগুতে লাগল এবং বিভিন্ন পর্যায়ের সীমান্তচিহ্নগুলি উভয় ক্ষেত্রে বিভিন্ন হয়েছে।

২। মধ্যবর্তী স্তর। পূর্ব মহাদেশে পশুপালনের সঙ্গেই এই স্তরের সূচনা হয়; পশ্চিমে সেচের সাহায্যে খাদ্য চাষ করে এবং গৃহনির্মাণের জন্য আডব (রৌদ্রে শুকানো মাটির ইট) এবং পাথর ব্যবহারের সঙ্গে এই স্তর আরম্ভ হয়েছে।

আমরা প্রথমে পশ্চিম অঞ্চল নিয়ে আলোচনা শুরু করব কারণ ইউরোপীয়দের কর্তৃক বিজিত হবার আগে পর্যন্ত এখানে কোথাও এই মধ্যবর্তী স্তর অতিক্রান্ত হয়নি।

বর্বরতার নিম্নতন স্তরে অবস্থিত ইণ্ডিয়ানদের যখন সন্ধান মেলে (মিসিসিপির পূর্ব দিকে যারা বাস করত তারা সবই এই স্তরের লোক) তখন তারা কতকাংশে ভুট্টার ঘরোয়া চাষ করত এবং হয়ত কিছু কিছু লাউ, ফুটি প্রভৃতি অন্যান্য সব্জী চাষও করত এবং এর থেকেই তাদের খাদ্যের একটা মোটা অংশ আসত। তারা কাঠের বেড়া দিয়ে ঘেরা গ্রামে কাঠের তৈরী বাড়িতে বাস করত। উত্তর পশ্চিমের জাতিগুলি বিশেষত যারা

কলুম্বিয়া নদীর এলাকায় বসবাস করত, তারা তখনও বন্যাবস্থার উচ্চতন স্তরে ছিল এবং মৃৎশিল্প ব্যবহার অথবা চাষবাস সম্পর্কে কিছুই জানত না। অপরদিকে নিউ মেক্সিকোর পুয়েব্লো* ইন্ডিয়ানরা, মেক্সিকানরা, মধ্য আমেরিকার বাসিন্দারা এবং পেরুর অধিবাসীরা বিজিত হবার সময় বর্বরতার মধ্যবর্তী স্তরে ছিল। তারা পাথর অথবা আডব দিয়ে তৈরী দুর্গের মতো বাড়িতে বসবাস করত; তারা জলবায়ু ও আঞ্চলিক অবস্থা বিচার করে কৃত্রিম সেচ-ব্যবস্থায় বাগানে ভুট্টা ও অন্যান্য খাদ্যশস্যের চাষ করত — এইটাই ছিল তাদের খাদ্যসংগ্রহের প্রধান উপায়, এবং তারা কয়েকটি পশুপাখিও পুষত, যেমন মেক্সিকানরা টার্কি ও অন্যান্য পাখি এবং পেরুর অধিবাসীরা ল্লামা পুষত। তাছাড়া, তারা ধাতুর ব্যবহারও জানত, অবশ্য লোহা ছাড়া, সেজন্য তারা এখনও পাথরের হাতিয়ার ও পাথরের অস্ত্রের ব্যবহার কাটিয়ে উঠতে পারেনি। স্পেন কর্তৃক বিজিত হবার পর এদের স্বাধীন বিকাশ একেবারে ছিন্ন হয়ে গেল।

পূর্ব গোলার্ধে দুধ ও মাংসদায়ী পশুপালনের সঙ্গেই বর্বরতার মধ্যবর্তী স্তর শুরু হয় এবং এই পর্বের অনেক কাল পর্যন্ত চাষবাস অজ্ঞাত ছিল বলে মনে হয়। গবাদি পশুর পালন ও প্রজনন এবং বড় বড় পশুযূথের সৃষ্টি, এইটাই মনে হয় বাকি বর্বর জাতিগুলি থেকে আর্য ও সেমিটিক জাতিগুলির পার্থক্যের কারণ। ইউরোপ ও এশিয়ার আর্যদের মধ্যে গবাদি-পশুর নাম এখনো একইরকমের, কিন্তু আবাদযোগ্য উদ্ভিদের নাম প্রায় মেলে না।

উপযুক্ত স্থানে পশুযূথের সৃষ্টি থেকে এল রাখালিয়া জীবনধারা, ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রীস নদীর ধারে ঘাসে ভরা সমতলভূমিতে সেমিটিক জাতিগুলির মধ্যে, এবং ভারতের, অক্সাস ও জাক্সার্তেসের** এবং দন ও নীপারের তৃণভূমিতে আর্য জাতিগুলির মধ্যে। এইরকম পশুচারণ-ক্ষেত্রের সীমান্তে কোথাও সম্ভবত আগেই বন্য পশুকে পোষমানান হয়েছিল। এইজন্যই উত্তরপুরুষদের কাছে প্রতীয়মান হয়েছে যে, পশুপালক জাতিগুলির উৎপত্তি এমন সব অঞ্চলেই হয়েছে, যা মানবজাতির উৎপত্তি দূরের কথা, পরন্তু তাদের বন্য যুগের পূর্বপুরুষদের পক্ষে, এমনকি বর্বরতার নিম্নতন স্তরের লোকেদের পক্ষেও বসবাসের প্রায় অযোগ্য। অপরপক্ষে মধ্যবর্তী স্তরের

* পুয়েব্লো — উত্তর আমেরিকার এক ইন্ডিয়ান উপজাতি গোষ্ঠীর নাম; বসবাস করত নিউ মেক্সিকোর এলাকায় (বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পশ্চিম ও মেক্সিকোর উত্তরাংশ) এবং একই ইতিহাস ও সংস্কৃতির বন্ধনে মিলিত ছিল। তাদের গ্রামগুলির বিশেষ চরিত্র দেখে, স্পেনীয় শব্দ Pueblo (জন, বসত, গোষ্ঠী) থেকে আসা এই নামটা তাদের দেয় বিজয়ী স্পেনীয়রা। এই সব গ্রামগুলি ছিল পাঁচ ছয় তলার বড়ো বড়ো সাধারণ গৃহকেল্লার মতো, তাতে বাস করত হাজার খানেক লোক; এই সব উপজাতিদের বসত সম্বন্ধেও কথাটা প্রযুক্ত হত। — সম্পাঃ

** অক্সাস — বর্তমান আমু-দরিয়া, জাক্সার্তেস — বর্তমান শির-দরিয়া। — সম্পাঃ

বর্বর জাতিগুলি একবার পশুপালকের জীবনযাত্রা গ্রহণের পর আর কখনোই স্বেচ্ছায় এইসব ঘাসে ভরা জলধৌত সমতলভূমি ছেড়ে পূর্বপুরুষদের বাসভূমি বনাঞ্চলে ফিরে যাবার কথা ভাববে না। এমনকি যখন আর্য ও সেমিটিক জাতিগুলি উত্তর ও পশ্চিমে যেতে বাধ্য হয় তখনও তারা পশ্চিম এশিয়া ও ইউরোপের বনাঞ্চলে ততদিন পর্যন্ত বসবাস করতেই পারেনি যতদিন না পর্যন্ত খাদ্যশস্যের চাষাবাদ করে অপেক্ষাকৃত কম অনুকূল এই অঞ্চলেও তারা পশুদের খাদ্য যোগাতে পেরেছে এবং বিশেষ করে শীতকালও কাটাতে সমর্থ হয়েছে। এই কথা খুবই সম্ভবপর যে, প্রধানত গবাদিপশুর খাদ্যের প্রয়োজন মেটাবার জন্য খাদ্যশস্যের চাষাবাদ শুরু হয় এবং পরবর্তীকালেই ঐগুলি মানুষের পুষ্টির পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

আর্য ও সেমিটিক জাতিগুলির খাদ্যের তালিকায় মাংস ও দুধের প্রাচুর্য এবং বিশেষতঃ শিশুদের গঠনে এইসব খাদ্যের উপকারিতা দিয়েই এই দুটি জাতির উন্নত বিকাশের ব্যাখ্যা করা যায়। বস্তুত, নিউ মেক্সিকোর পুয়েব্লো ইণ্ডিয়ানরা, যাদের প্রায় নিছক নিরামিষভোজী হতে হয়েছিল, তাদের মস্তিষ্ক বর্বরতার নিম্নতন স্তরে অবস্থিত অপেক্ষাকৃত মাংস ও মৎস্যভোজী ইণ্ডিয়ানদের থেকে ছোট ছিল। যাই হোক এই স্তরে নরমাংসভোজন আস্তে আস্তে উঠে যেতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত মাত্র ধর্মীয় আচার হিসেবে অথবা এক্ষেত্রে যা একই, যাদুবিদ্যার অঙ্গ হিসেবে এটি টিকে থাকে।

৩। **উচ্চতন স্তর**। লৌহআকরিক গলিয়ে লোহা তৈরি থেকে এর সূচনা হয় এবং সভ্যতার যুগে উৎক্রান্ত হয় বর্ণমালা লিপির আবিষ্কার এবং লিখিত বিবরণের জন্য তা ব্যবহারের মারফত। আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি যে, এই যে স্তর শুধুমাত্র পূর্ব গোলার্ধের জাতিগুলি স্বাধীনভাবে অতিক্রম করে সে স্তরে উৎপাদনে যে প্রগতি হয় তা আগের সব স্তরগুলি একত্র করেও ছাড়িয়ে যায়। এই স্তরের মধ্যে পড়ে বীর (হিরোয়িক) যুগের গ্রীকরা, রোম প্রতিষ্ঠার ঠিক আগে ইতালির উপজাতিগুলি, ট্যাসিটাসের সময়ের জার্মানরা এবং ভাইকিংদের সময়ের নর্মানগণ।

সর্বোপরি এইসময়েই সর্বপ্রথম আমরা গবাদিপশু চালিত লোহার ফলাওয়ালা লাঙ্গল দেখতে পাই যাতে ব্যাপকভাবে ভূমিচাষ বা **কর্ষণ** সম্ভবপর করে এবং তখনকার অবস্থায় জীবনোপকরণের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয় কার্যত অফুরন্ত করে; এইসঙ্গেই আমরা দেখতে পাই যে, বনজঙ্গল সাফ করে কৃষি ও গোচারণের জমিতে পরিণত করা হচ্ছে এবং এই কাজও লোহার কুঠার ও কোদাল না হলে ব্যাপকভাবে করা অসম্ভব হত। কিন্তু এইসবের সঙ্গেই জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি ঘটতে থাকে এবং ছোট ছোট এলাকায় ঘনবসতি দেখা দেয়। ভূমিকর্ষণের আগে নিতান্ত ব্যতিক্রম হিসাবেই কেবল লাখ পাঁচেক লোক একটা কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে একত্র হতে পেরেছে, খুব সম্ভব কখনই এ ব্যাপার ঘটেনি।

হোমারের কাব্যে, বিশেষ করে-'ইলিয়ড্'এ আমরা বর্বরতার উচ্চতন স্তরের শীর্ষাবস্থা

দেখতে পাই। উন্নত লোহার যন্ত্রপাতি, হাপর, যাঁতা, কুমারের চাক, তেল ও মদের নিষ্কাশন, বিকশিত ধাতুর কাজের শিল্পকলায় পরিণতি, মালের গাড়ি ও যুদ্ধের রথ, তক্তা ও কড়ির সাহায্যে জাহাজ নির্মাণ, শিল্প হিসাবে স্থাপত্যের সূচনা, মিনার ও দেওয়াল সমন্বিত প্রাচীরবেষ্টিত নগর, হোমারের মহাকাব্য এবং সমগ্র পুরাণ — বর্বরতা থেকে সভ্যতায় পেঁছাবার সময় গ্রীকরা এইসব মূল উত্তরাধিকার পেয়েছিল। যদি আমরা এর সঙ্গে সিজার বর্ণিত, এমনকি ট্যাসিটাস বর্ণিত জার্মানদের* তুলনা করি যারা তখন সংস্কৃতির সেই স্তরের চৌকাটে পা বাড়িয়েছে যে স্তর থেকে হোমারের যুগের গ্রীকরা উচ্চতন স্তরে উত্তীর্ণ হতে যাচ্ছিল, তাহলে আমরা দেখতে পাব যে, বর্বরতার উচ্চতন স্তরে উৎপাদনের বিকাশ কত সমৃদ্ধিশালী হয়েছিল।

বন্যাবস্থা ও বর্বরতার মধ্যে দিয়ে সভ্যতার সূচনা পর্যন্ত মানবসমাজের বিবর্তনের এই যে ছবিটি মর্গানের রচনা থেকে এখানে দিয়েছি তা ইতিমধ্যেই বহু নতুন বৈশিষ্ট্য এবং আরো বড়ো কথা তর্কাতীত বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ, তর্কাতীত এজন্য যে, এগুলি সরাসরি উৎপাদনের ক্ষেত্র থেকে আহরণ করা হয়েছে। তবু আমাদের যাত্রার শেষে যে পূর্ণ ছবিটি প্রকাশ পাবে তার তুলনায় এ ছবিটি অস্পষ্ট ও অকিঞ্চিৎকর মনে হবে। তখনই কেবল বর্বরতা থেকে সভ্যতায় উৎক্রমণের পূর্ণ আলেখ্য দেওয়া সম্ভব হবে এবং এ দুটির মধ্যে জাজ্বল্যমান পার্থক্য ফুটে উঠবে। আপাতত আমরা মর্গানের পর্ববিভাগকে সাধারণভাবে এরূপে ব্যক্ত করতে পারি: বন্যাবস্থা — এ পর্বে অবিলম্বেই ব্যবহার্য প্রাকৃতিক সম্পদগুলির আহরণই প্রাধান্য ছিল, মানুষের তৈরি জিনিস বলতে মূলত ছিল সে আহরণে সাহায্য করার মতো হাতিয়ার। বর্বরতা — এ পর্বে গো-পালন ও কৃষির প্রচলন হয় এবং মানুষের ক্রিয়া দ্বারা প্রকৃতির উৎপাদন ক্ষমতা বাড়াবার পদ্ধতিগুলি আয়ত্তে আসে। সভ্যতা — এই পর্বে প্রাকৃতিক সম্পদ নিয়ে আরো উন্নততর প্রক্রিয়া এবং যথার্থ শ্রমশিল্প ও কলার জ্ঞান অর্জিত হয়েছে।

২

পরিবার

মর্গান তাঁর জীবনের বেশীর ভাগ সময় ইরকোয়াসদের মধ্যে কাটিয়েছেন যারা আজ পর্যন্ত নিউ ইয়র্ক রাষ্ট্রে বসবাস করে এবং এদের একটি উপজাতি (সেনেকা) তাঁকে স্বজাতিভুক্ত করে নেয়। তিনি এদের মধ্যে এমন একটি আত্মীয়তাবিধি দেখলেন যেটি এদের বাস্তব পারিবারিক সম্পর্কের বিরোধী। এদের মধ্যে নিয়ম হিসেবে প্রচলিত ছিল

* এঙ্গেলস এখানে গাই জুলিয়াস সিজারের 'গল যুদ্ধের বিবরণ' এবং পুবলিয়স কর্নেলিয়স ট্যাসিটাসের 'জার্মানিয়া' নামক রচনার কথা বলছেন। — সম্পাঃ

এক জোড়ার মধ্যে বিবাহ, উভয় দিক থেকেই বিবাহবিচ্ছেদও খুব সহজ ছিল এবং এই প্রথাকে মর্গান নাম দিয়েছিলেন 'জোড়বাঁধা পরিবার'। এই বিবাহিত দম্পতির সন্তানকে সকলেই জানত ও মানত এবং পিতা, মাতা, পুত্র, কন্যা, ভ্রাতা, ভগিনী কে তা নিয়ে কোনো সন্দেহ থাকার কথা নয়। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে এইসব কথাগুলি বিপরীত অর্থে ব্যবহার হত। ইরকোয়াস শুধু নিজের সন্তানদেরই পুত্র কন্যা বলে সম্ভাষণ করত না। উপরন্তু ভাইয়েদের সন্তানদেরও তাই বলত এবং এই শেষোক্তরা তাকে পিতা সম্ভাষণ করত। অপরপক্ষে সে তার বোনের সন্তানদের ভাগনে-ভাগনী ডাকত এবং তারা তাকে মামা বলত। বিপরীতভাবে ইরকোয়াস নারীরা নিজের সন্তান ছাড়াও বোনেদের সন্তানদেরও পুত্র, কন্যা বলে সম্ভাষণ করত এবং তারাও তাকে মা বলত। অথচ সে তার ভাইয়েদের সন্তানদের ভাইপো-ভাইঝি বলত এবং তারা তাকে পিসী বলে ডাকত। একইভাবে ভাইয়েদের সন্তানেরা পরস্পরকে ভাইবোন সম্ভাষণ করত। বোনেদের সন্তানেরাও পরস্পরকে ভাইবোন বলত। উল্টোদিকে একজন স্ত্রীলোকের সন্তান এবং তার ভাইয়ের সন্তানেরা পরস্পরকে মামাতো পিসতুতো ভাইবোন (cousin) বলে ডাকত। এবং এগুলি শুধুমাত্র ফাঁকা কথা ছিল না, পরন্তু এগুলি রক্ত সম্পর্কের সন্নিকটতা ও সমান্তরতা, সমতা ও অসমতা সম্বন্ধে বাস্তবক্ষেত্রে প্রচলিত ধারণারই অভিব্যক্তি; এবং এই ধারণাগুলিই ছিল আত্মীয়তার একটা পূর্ণ বিকশিত বিধির ভিত্তি যার মধ্যে দিয়ে একটি ব্যক্তির একশ' রকমের পৃথক সম্পর্ক প্রকাশ করা সম্ভব হত। অধিকন্তু এই প্রথা আমেরিকার সমস্ত ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে পুরাদমে বলবৎ (এখনো পর্যন্ত কোনো ব্যতিক্রম আবিষ্কৃত হয়নি) শুধু তাই নয়, এমনকি ভারতের আদিম অধিবাসীদের মধ্যে, দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড় উপজাতিগুলি এবং হিন্দুস্থানের গৌরা উপজাতিগুলির মধ্যে এই রীতির প্রায় অবিকৃত প্রচলন রয়েছে। দক্ষিণ ভারতের তামিলদের মধ্যে এবং নিউ ইয়র্ক রাষ্ট্রের সেনেকা ইরকোয়াসদের মধ্যে দুই শতাধিক বিভিন্ন ধরনের সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রচলিত আত্মীয়তার অভিব্যক্তিগুলি আজো পর্যন্ত অভিন্ন। এবং যেমন আমেরিকার ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে তেমনি ভারতের এই উপজাতিগুলির মধ্যেও পরিবারের প্রচলিত রূপ থেকে উদ্ভূত সম্পর্কগুলি আত্মীয়তাবিধির বিরোধী।

এর ব্যাখ্যা কী? বন্যাবস্থা ও বর্বরতার যুগে সমস্ত জাতির সমাজ-বিধিতে আত্মীয়তার যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল তা খেয়াল রাখলে এইরকম একটি ব্যাপক প্রচলিত ব্যবস্থার তাৎপর্য শুধু কথার মারপ্যাঁচ দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এমন একটি প্রথা যা আমেরিকার সর্বত্র সাধারণভাবে প্রচলিত, যা এশিয়ায় সম্পূর্ণ বিভিন্ন জনধারার (race) জাতিগুলির মধ্যে একইভাবে প্রচলিত এবং রূপের কিছু রদবদল করে যে প্রথাটি আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়ার সর্বত্র প্রচলিত তার ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা দিতে

হবে, দৃষ্টান্তস্বরূপ, ম্যাক-লেনান যেভাবে চেষ্টা করেছিলেন সেভাবে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। পিতা, পুত্র, ভাই ও বোন এগুলি মাত্র শ্রদ্ধাজ্ঞাপক উপাধি নয়, পরন্তু এগুলির সঙ্গে একেবারে নির্দিষ্ট এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পারস্পরিক দায়দায়িত্ব জড়িয়ে আছে, যে দায়দায়িত্বগুলি সমগ্রভাবে এইসব জাতিগুলির সমাজ-পদ্ধতির একটা মূল অঙ্গ। আর সে ব্যাখ্যাও পাওয়া গেল। স্যান্ডউইচ্ (হাওয়াই) দ্বীপপুঞ্জে এই শতাব্দীর প্রথমার্ধেও পরিবারের এমন একটি রূপ ছিল যাতে আমেরিকা ও প্রাচীন ভারতীয় আত্মীয়তাবিধি অনুযায়ী যা হওয়া উচিত ঠিক তেমনই ধরনের পিতা ও মাতা, ভাই ও বোন, পুত্র ও কন্যা, মামা ও পিসী, ভাগনে ও ভাগনী পাওয়া যেত। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে এই যে, তখনকার দিনে হাওয়াইয়ে প্রচলিত আত্মীয়তাবিধির সঙ্গে আবার আসলে বর্তমান পরিবারের বিরোধিতা ছিল। সেখানে ভাইবোনেদের সমস্ত সন্তানদের বিনা ব্যতিক্রমে ভাই এবং বোন মনে করা হত এবং শুধুমাত্র মা ও মায়ের বোনেদের নয় অথবা শুধুমাত্র বাপ ও বাপের ভাইয়েদের নয়, পরন্তু বিনা ব্যতিক্রমে বাপমায়ের সমস্ত ভাইবোনেদেরই সাধারণ সন্তান বলে তাদের গণ্য করা হত। অতএব আমেরিকার আত্মীয়তাবিধি থেকে যদি পরিবারের আরও আদি এমন একটা রূপের পূর্বানুমান করতে হয় যা খাস আমেরিকাতে আর নেই, কিন্তু এখনও পর্যন্ত যা হাওয়াইয়ে দেখা যায়, তাহলে অপরদিকে হাওয়াইয়ের আত্মীয়তাবিধি আরও আদিম এমন একটি পারিবারিক রূপের সন্ধান দেয় যা অদ্যাপি কোথাও প্রচলিত থাকা সম্ভবপর না হলেও একদিন **নিশ্চয়ই** ছিল, কারণ তাছাড়া তার উপযোগী আত্মীয়তাবিধি জন্মাতে পারত না। মর্গান লিখছেন, 'পরিবার হল একটি সক্রিয় ব্যাপার। এটি কখনও অচল নয়, সমাজ যেমন নিম্নতর থেকে উচ্চতর অবস্থায় যায় তেমনই পরিবারও নিম্নতর থেকে উচ্চতর রূপে পেঁছায়। অপরদিকে আত্মীয়তাবিধি হচ্ছে নিষ্ক্রিয়, পরিবারের অগ্রগতি তাতে লিপিবদ্ধ হয় বহুদীর্ঘ ব্যবধান পরপর এবং তার আমূল পরিবর্তন ঘটে শুধুমাত্র পারিবারের আমূল পরিবর্তন হবার পরে।' মার্কস এর সঙ্গে যোগ করেছেন, 'এই একই কথা রাজনীতি, আইন, ধর্ম ও দর্শন বিষয়ক পদ্ধতি সম্পর্কেও সাধারণভাবে প্রযোজ্য।' পরিবার যখন সজীব হয়ে চলছে আত্মীয়তাবিধি কিন্তু তখন শিলীভূত হয়ে পড়ছে এবং যখন আত্মীয়তাবিধি অভ্যস্ত রূপে রয়ে যাচ্ছে তখন পরিবার তাকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ক্যুভিয়ে যেমন প্যারিসের কাছে একটি জন্তুর কঙ্কালের কিছু হাড় থেকে নিশ্চয়তার সঙ্গে বলতে পেরেছেন যে, এটি একটি কাঙ্গারু জাতীয় জন্তুর অস্থি এবং অধুনা বিলুপ্ত হলেও একদিন ওখানে এরা বসবাস করত, তেমনই ঐতিহাসিকভাবে পরিবাহিত একটি আত্মীয়তাবিধি থেকে ততখানি নিশ্চয়তার সঙ্গেই আমরা বলতে পারি যে, সেই বিধির উপযোগী একটি বিলুপ্ত পরিবার রূপ কোনো এক সময়ে বর্তমান ছিল।

উল্লিখিত আত্মীয়তাবিধি এবং পারিবারিক রূপগুলি বর্তমানে প্রচলিত অবস্থা থেকে এইদিক দিয়ে পৃথক যে, তখন প্রতি শিশুর কয়েকটি পিতা ও মাতা ছিল। আমেরিকায় প্রচলিত যে আত্মীয়তাবিধির সঙ্গে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের পারিবারিক রূপ খাপ খায় তাতে ভ্রাতা ও ভগিনী একই শিশুর পিতা ও মাতা হতে পারে না, অপরপক্ষে হাওয়াইয়ের আত্মীয়তাবিধি এমন একটি পারিবারিক রূপের কথা বলে যাতে এইটাই ছিল নিয়ম। এইভাবে আমরা এমন এক সারি পারিবারিক রূপের সম্মুখীন হই যাতে আমাদের মধ্যে এতদিন যে রূপগুলিকে একমাত্র প্রচলিত রূপ বলে মেনে নেওয়া হত তার খণ্ডন হয়। প্রচলিত ধারণা কেবল একপতিপত্নী সম্পর্কই জানে, তার সঙ্গে কিছু কিছু পুরুষের বহুপত্নীত্ব এবং হয়ত বা কিছু কিছু স্ত্রীলোকের বহুস্বামিত্বও মেনে নেওয়া হয় এবং নীতিবাগীশ কূপমণ্ডূকেরা যা করেন সেভাবে চেপে যাওয়া হয় যে, কার্যতঃ আনুষ্ঠানিক সমাজের এই সীমাগুলি চুপি চুপি হলেও অসংকোচে লংঘন করা হয়। অপরপক্ষে আদিম ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এমন পরিস্থিতির দেখা পাই যেখানে পুরুষের বহুপত্নীত্ব এবং সেই সঙ্গে তাদের স্ত্রীদের বহুস্বামিত্ব রয়েছে এবং তাদের সাধারণ সন্তানসন্ততিরা সেজন্য সকলেরই সন্তানসন্ততি বলে পরিগণিত হচ্ছে; এই অবস্থারও আবার ধারাবাহিক রূপান্তর ঘটতে ঘটতে পরিণামে একপতিপত্নী সম্পর্কে এসে পেঁছায়। এই পরিবর্তনগুলির চরিত্র এরূপ যে, সমষ্টি-বিবাহ-সম্পর্কে আবদ্ধ জনসমষ্টি প্রথমে ব্যাপক থাকলেও ক্রমশঃ তাদের সংখ্যা কমতে কমতে শেষ পর্যন্ত একটি যুগলে এসে দাঁড়ায়, যা বর্তমানের প্রধান রূপ।

এইভাবে পশ্চাৎপ্রেক্ষিতে পরিবারের ইতিহাস সংরচন করতে গিয়ে মর্গান তাঁর অধিকাংশ সহযোগীদের সঙ্গে একমত হয়ে এমন একটি আদিম অবস্থায় উপনীত হন যখন একটি উপজাতির মধ্যে নির্বিচার যৌন সম্পর্কের প্রাধান্য ছিল, ফলে প্রত্যেকটি স্ত্রীলোক সমানভাবে প্রত্যেকটি পুরুষের এবং তেমনই প্রত্যেকটি পুরুষ প্রত্যেকটি স্ত্রীলোকের পতিপত্নী ছিল। এরূপ একটি আদিম অবস্থার কথা অবশ্য গত শতক থেকেই উঠেছে, কিন্তু অত্যন্ত সাধারণভাবে; বাখোফেনই হচ্ছেন সর্বপ্রথম ব্যক্তি যিনি এই অবস্থার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় কিংবদন্তির মধ্যে এর চিহ্ন খোঁজেন এবং এইটিই তাঁর অন্যতম মহৎ অবদান। বর্তমানে আমরা জেনেছি, তিনি যে চিহ্নগুলি আবিষ্কার করেন তাতে নির্বিচার যৌন সম্পর্কের একটা সামাজিক অবস্থা পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় আরও পরবর্তী একটি রূপ, সমষ্টি-বিবাহ। সেই আদিম সামাজিক অবস্থা যদি সত্যই থেকেও থাকে তাহলেও তা হচ্ছে এত সুদূর অতীতের ব্যাপার যে বর্তমানে জীবিত অনুন্নত বন্যদের মধ্যে কোনো শিলীভূত

সমাজে তার অস্তিত্বের **প্রত্যক্ষ** প্রমাণ আশা করা যায় না। বাখোফেনের কৃতিত্ব হচ্ছে এই যে, তিনি এই প্রশ্নটিকে গবেষণার পুরোভাগে এনেছিলেন।*

মনুষ্যজাতির যৌন সম্পর্কের ক্ষেত্রে এরূপ একটি প্রাথমিক অবস্থার অস্তিত্ব অস্বীকার করাই সম্প্রতি রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে মনুষ্যজাতিকে এই 'লজ্জা' থেকে বাঁচান। প্রত্যক্ষ প্রমাণাভাবের কথা ছাড়াও বিশেষ করে বাকি জীবজগতের উল্লেখ করা হয়; সেখান থেকে লেতুর্নো ('বিবাহ ও পরিবারের বিবর্তন', ১৮৮৮ খ্রীঃ**) অসংখ্য তথ্য সংগ্রহ করে দেখিয়ে দেন যে, এক্ষেত্রেও নিম্নতন স্তরে একেবারে নির্বিচার যৌন সম্পর্ক বর্তমান। এই সব তথ্যগুলি থেকে আমি কিন্তু একমাত্র এই সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, এগুলি মানুষ এবং তার আদিম জীবনাবস্থার দিক থেকে কিছুই প্রমাণ করে না। মেরুদণ্ডবিশিষ্ট জীবজন্তুর মধ্যে দীর্ঘকালব্যাপী সঙ্গমপর্বের যথেষ্টই ব্যাখ্যা করা যায় শারীরবৃত্তিক কারণ দিয়ে: যেমন পাখিদের ক্ষেত্রে, ডিম ফোটাবার সময় মাদিটার সাহায্যের প্রয়োজন; পাখিদের মধ্যে বিশ্বস্ত একপতিপত্নী সম্পর্কের দৃষ্টান্ত মানুষ সম্পর্কে কোনো কিছুই প্রমাণ করে না, কারণ মানুষ পাখি থেকে জন্মায়নি। আর যদি কঠোর একপতিপত্নী বিধিই সর্বপ্রধান পুণ্য বলে মনে করা হয় তাহলে টেপ্ওয়ার্মকেই শ্রেষ্ঠ মানতে হয়, কারণ তার পঞ্চাশ থেকে দু'শ খণ্ডে বিভক্ত শরীরের প্রত্যেকটি খণ্ডে একজোড়া পুরুষ ও স্ত্রী যৌন অঙ্গ আছে এবং সারা জীবন ধরে এই কৃমিকীট শরীরের প্রত্যেকটি খণ্ডে আত্মসঙ্গম করে কাটায়। যদি অবশ্য আমরা শুধুমাত্র স্তন্যপায়ী জীবের কথা ধরি তাহলে আমরা তাদের মধ্যে যৌন জীবনের সব রূপই দেখতে পাই — নির্বিচার যৌন সম্পর্ক, সমষ্টি-বিবাহের মতো কিছু, বহুপত্নীত্ব এবং একপতিপত্নী সম্পর্ক। কেবলমাত্র বহুস্বামীপ্রথা পাওয়া যায় না। এটি শুধুমাত্র মানুষেরই পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। এমনকি আমাদের সর্বাপেক্ষা

* বাখোফেন যেটা আবিষ্কার অথবা বলা ভালো অনুমান করলেন সেটাকে তিনি কত অল্প হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন তার প্রমাণ হয় এই আদি অবস্থাটাকে **হেটায়ারিজম** বলে তাঁর বর্ণনায়। কথাটা গ্রীকেরা যখন চালু করে দেয় তখন এতে করে বোঝান হত অবিবাহিত পুরুষ অথবা একবিবাহে আবদ্ধ পুরুষের সঙ্গে অবিবাহিত নারীদের যৌন সঙ্গম। এতে সর্বক্ষেত্রেই একটা নির্দিষ্ট ধরনের বিবাহের অস্তিত্ব ধরে নেওয়া হত যার বাইরে এ সঙ্গম ঘটছে এবং গণিকাবৃত্তি তার অন্তর্গত, অন্তত ইতিমধ্যেই উদ্ভূত একটা সম্ভাবনা রূপে। কথাটা আর কোনো অর্থে কখনো ব্যবহৃত হয়নি এবং মর্গানের সঙ্গে আমিও তা এই অর্থেই ব্যবহার করছি। বাখোফেনের অতি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারগুলি সর্বত্রই অসম্ভব রহস্যাচ্ছন্ন হয়েছে তাঁর এই অপ্রাকৃত বিশ্বাসে যে, ঐতিহাসিকভাবে উদ্ভূত নরনারী সম্পর্কগুলি উঠেছে তাদের জীবনের বাস্তব অবস্থা থেকে নয়, সেই পর্বের মানুষের ধর্মীয় ধ্যান-ধারণা থেকে। (এঙ্গেলসের টীকা।)

** Ch. Letourneau, *L'évolution du mariage et de la famille.* Paris, 1888. — সম্পাঃ

নিকটবর্তী আত্মীয় কোয়াড্রুমানাদের মধ্যেও মাদীমর্দার জোট বন্ধনে যথাসম্ভব বৈচিত্র্যের প্রকাশ দেখা যায়; এবং যদি আমরা আমাদের গণ্ডি আরও সঙ্কীর্ণ করে শুধুমাত্র চারটে এনথ্রপয়েড বানরজাতির কথা ধরি তাহলে লেতুর্নো তাদের সম্পর্কে শুধু এইটুকু বলছেন যে, তারা কখন একপতিপত্নিক এবং কখন বহুপত্নিক, কিন্তু জিরো-তেলোঁ সস্যুরের যে উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তাতে তিনি জোর করে বলছেন যে, এরা একপতিপত্নিক। ভেস্টের্মার্ক তাঁর রচিত 'মানুষের বিবাহের ইতিহাস'এ (লণ্ডন ১৮৯১)* এনথ্রপয়েড বানরদের মধ্যে একপতিপত্নী সম্পর্ক সম্বন্ধে সম্প্রতি যেসব কথা বলেছেন তাতেও বিশেষ কিছু প্রমাণ হয় না। বস্তুতঃ, এইসব তথ্যের প্রকৃতি দেখে সৎ লেতুর্নো স্বীকার করছেন: 'স্তন্যপায়ী জীবদের মধ্যে মানসিক উন্নতির স্তরের সঙ্গে যৌন সম্পর্কের রূপের আদৌ কোন নির্দিষ্ট সম্বন্ধ দেখা যায় না।' এবং এস্পিনাস ('প্রাণী সমাজ', ১৮৭৭)** খোলাখুলি বলছেন, 'পশুদের সর্বোচ্চ যে সামাজিক সংগঠন দেখা যায় সেটা যূথ। এই যূথ বহু পরিবার নিয়ে গঠিত **মনে হয়**, কিন্তু গোড়া থেকেই **পরিবার ও যূথ পরস্পর বিরোধী** এবং তাদের বিকাশ ঘটে পরস্পর বিপরীত অনুপাতে।'

উপরের পর্যালোচনা থেকে বোঝা যায় যে, এনথ্রপয়েড বানরদের পরিবার ও অন্যান্য সামাজিক জোট সম্পর্কে আমরা সুনির্ধারিত কিছুই জানি না। বহু বিবরণ পরস্পর বিরোধী। এতে অবশ্য আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। এমনকি বন্য মানব উপজাতিগুলি সম্পর্কেও আমাদের হাতের বিভিন্ন বিবরণগুলি কত পরস্পর বিরোধী এবং কত সমালোচনামূলক বিচার ও ঝাড়াই-বাছাই তাদের প্রয়োজন! আর মানুষের সমাজ থেকে বানরের সমাজ পর্যবেক্ষণ করা তো অনেক বেশী শক্ত। সেইজন্য এইধরনের সম্পূর্ণ অনির্ভরযোগ্য বিবরণ থেকে কোনো সিদ্ধান্তই আমাদের করা চলবে না।

কিন্তু এস্পিনাসের যে অনুচ্ছেদটি উপরে উদ্ধৃত করা হয়েছে তার থেকে একটি বেশী নির্ভরযোগ্য ইঙ্গিত পাওয়া যায়। উচ্চতর পশুদের মধ্যে যূথ ও পরিবার পরিপূরক নয়, পরন্তু তারা পরস্পর বিরোধী। এস্পিনাস চমৎকার বিবরণ দিয়েছেন কেমন করে সঙ্গম ঋতুর সময়ে মর্দাদের মধ্যে ঈর্ষার ফলে প্রত্যেকটি পশুযূথের বাঁধন আল্‌গা হয়ে যায় অথবা সাময়িকভাবে ভেঙ্গে যায়। 'যেখানে পরিবার খুব দৃঢ়সংবদ্ধ সেখানে যূথ বিরল ব্যতিক্রম হয়ে দাঁড়ায়। অপরপক্ষে যেখানে অবাধ যৌন সম্পর্ক

* E. A. Westermarch, *The History* of *Human Marriage*, London, 1891. — সম্পাঃ

** A. Espinas, *Des sociétés animales, Etude de psychologie comparée*, Paris, 1877. — সম্পাঃ

অথবা বহুবিবাহই রীতি, সেখানে প্রায় স্বাভাবিকভাবেই যূথ গড়ে ওঠে... যূথ গঠনের জন্য পারিবারিক বন্ধনকে শিথিল হতে হয় এবং ব্যক্তিকে আবার মুক্ত হতে হয়। এইজন্যই পাখিদের মধ্যে সংঘবদ্ধ ঝাঁক দেখা যায় অত কদাচিৎ... অপরপক্ষে স্তন্যপায়ী পশুদের মধ্যে অল্পাধিক পরিমাণে সংঘবদ্ধ সমাজ দেখা যায় নিছক এইজন্য যে, ব্যক্তি সেখানে পরিবারবদ্ধ নয়... এইভাবে সূচনায় যূথের সামগ্রিক চেতনার সবচেয়ে বড় শত্রু হচ্ছে পরিবারের সামগ্রিক চেতনা। দ্বিধাহীনভাবে বলা যায়: পরিবারের চেয়ে কোন উচ্চতর সমাজরূপ যদি উদ্ভূত হয়ে থাকে তবে তা সম্ভবপর হয় শুধু এইজন্যই যে, সে সমাজরূপ মৌলিকভাবে পরিবর্তিত পরিবারগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়; এতে করে এমন সম্ভাবনাও বাতিল হয় না যে, ঠিক সেই কারণেই পরবর্তী সময়ে এই পরিবারগুলি অনেক বেশী অনুকূল অবস্থার মধ্যে নিজেদের পুনর্গঠিত করে নিতে পেরেছিল' (এস্পিনাস, প্রথম পরিচ্ছেদ, জিরো-তেলোঁ কর্তৃক 'বিবাহ ও পরিবারের উৎপত্তি' নামক পুস্তকে উদ্ধৃত, ১৮৮৪*, ৫১৮—৫২০ পৃঃ)।

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, মানবসমাজ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত টানার ব্যাপারে পশু-সমাজগুলির অবশ্যই কিছুটা মূল্য আছে, কিন্তু কেবলমাত্র নেতিবাচক দিক দিয়ে। যতদূর জানা গেছে, উচ্চতর মেরুদণ্ডী পশুদের মধ্যে কেবলমাত্র দু-ধরনের পরিবার দেখা গিয়েছে: বহুপত্নীত্ব অথবা একক জোড়ের পরিবার। উভয় ক্ষেত্রেই **একজন** মাত্র পূর্ণবয়স্ক পুরুষ, **একটি** মাত্র স্বামীর স্থান আছে। মর্দার ঈর্ষা দিয়েই পশু পরিবারের বন্ধন ও সীমানা, তাতে পশু পরিবার ও যূথের মধ্যে বিরোধিতা জাগে। উচ্চতর সামাজিক রূপ অর্থাৎ পশু-যূথ কোথাও অসম্ভব হয়, কোথাও শিথিল হয়ে পড়ে বা যৌন সঙ্গমের ঋতুতে একেবারেই ভেঙে যায়; অন্তত যূথের ক্রমাগত বিকাশ মর্দার ঈর্ষার জন্য বাধা পায়। কেবল এতে বেশ প্রমাণিত হয় যে, পশুপরিবার এবং আদিম মানবসমাজ এ দুই ভিন্ন ব্যাপার। পশুস্তর থেকে বেরিয়ে আসা আদিম মানুষের কোনো পরিবারই ছিল না, নয়ত এমন ধরনের কোন পরিবার তাদের মধ্যে ছিল যা পশুদের মধ্যে দেখা যায় না। মানুষরূপে উদীয়মান যে প্রাণীটি অমন হাতিয়ারহীন সেও যূথবদ্ধতার সর্বোচ্চ রূপ একক জোড় বেঁধে বিচ্ছিন্নভাবে অল্পসংখ্যায় টিকে থাকতে পারে। শিকারীদের বিবরণ থেকে ভেস্তের্মার্ক গরিলা ও শিম্পাঞ্জীদের সম্পর্কে এই কথা বলেছেন। কিন্তু পশুস্তর থেকে উদ্বতনের জন্য, প্রকৃতির ক্ষেত্রে যা জানা আছে তার মধ্যে সবচেয়ে বড় অগ্রগতি সম্পন্ন করার জন্য আর একটি জিনিস দরকার: আত্মরক্ষার দিক দিয়ে ব্যক্তির অপ্রতুল সামর্থ্যের জায়গায় যূথের মিলিত শক্তি ও যৌথ ক্রিয়া। এনথ্রপয়েড বানররা আজ যে অবস্থায়

* A. Giraud-Teulon, *Les origines du mariage et de la famille*, Genève, 1884. — সম্পাঃ

বসবাস করে তা দিয়ে মনুষ্যস্তরে উৎক্রান্তির মোটেই ব্যাখ্যা করা যায় না। এই বানরগুলি দেখে বরং এই মনে হয় যে, এরা উপশাখা মাত্র, আস্তে যার লোপ পাবার কথা এবং অন্তত যাদের অবনতি ঘটছে। এদের পারিবারিক রূপের সঙ্গে আদিম মানুষের পারিবারিক রূপের তুলনা বাতিল করার জন্য এইটুকুই যথেষ্ট। প্রাপ্তবয়স্ক মর্দাদের মধ্যে পরস্পর সহিষ্ণুতা, ঈর্ষা থেকে মুক্তিই হচ্ছে সেইসব বৃহৎ এবং স্থায়ী যূথ গঠনের প্রথম শর্ত, যার মধ্যে দিয়েই কেবল পশুস্তর থেকে মানুষে উৎক্রান্তি সম্ভবপর হয়েছে। বস্তুতঃ, আমরা সর্বাপেক্ষা প্রাচীন, একেবারে আদিতম পরিবারের কোন রূপটি দেখতে পাই, যে বিষয়ে ইতিহাসে অবিসংবাদিত প্রমাণ আছে এবং যা আজও কোনো কোনো জায়গায় লক্ষ্য করা যায়? সমষ্টি-বিবাহ, যে বিবাহে একদল পুরুষ ও আর একদল স্ত্রী যৌথভাবে সকলেরই পতি ও পত্নী এবং যে বিবাহে ঈর্ষার স্থান নেই বললেই চলে । তাছাড়া, বিকাশের পরবর্তী পর্যায়ে আমরা পাই অন্য সমস্ত প্রথা বাদ দিয়ে বহুপতিপ্রথা যাতে ঈর্ষাবোধ আরও বেশি বাতিল হয়ে যায় এবং সেই কারণেই পশুজগতে তা অজ্ঞাত। অবশ্য সমষ্টি-বিবাহের যে রূপগুলির সঙ্গে আমরা পরিচিত তাদের সঙ্গে এমন সব অদ্ভুত জটিল অবস্থা জড়িয়ে আছে যাতে অনিবার্যই পূর্ববর্তী যুগের সহজতর যৌন সম্পর্কের ইঙ্গিত পাওয়া যায় এবং এইভাবে শেষ বিচারে পশুত্ব থেকে মানবত্বে উৎক্রমণ পর্বের উপযোগী একটা নির্বিচার যৌন সঙ্গম পর্বের নির্দেশ মেলে; তাই যেখান থেকে আমাদের চিরকালের মতো উত্তীর্ণ হয়ে আসার কথা, পশুদের মধ্যে বিবাহরূপের কথা তুলে আমরা ঠিক সেখানেই ফিরে আসছি।

কারণ নির্বিচার যৌন সম্পর্কের অর্থ কী? এর অর্থ যে, বর্তমানের বা অতীতের বিধিনিষেধগুলি তখন ছিল না। আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি যে, ঈর্ষার প্রতিবন্ধকতা চলে গিয়েছিল। অন্ততপক্ষে এটুকু নিশ্চয়ই যে, ঈর্ষা অপেক্ষাকৃত পরবর্তী বিকাশের একটি আবেগ। অগম্যাগমনের ধারণা সম্পর্কেও ঐ একই কথা খাটে। প্রথমে শুধু যে ভাইবোনই স্বামীস্ত্রী হিসাবে বসবাস করত তাই নয়, পরন্তু আজও পর্যন্ত অনেক জাতির মধ্যে মাতাপিতার সঙ্গে সন্তানসন্ততির যৌন সম্পর্ক প্রচলিত আছে। বানক্রফ্‌ট ('উত্তর আমেরিকার প্রশান্তমহাসাগরীয় রাষ্ট্রগুলির আদি উপজাতি', ১৮৭৫, ১ম খণ্ড*) বেরিং প্রণালীর কেভিয়েট্‌দের মধ্যে, আলাস্কার নিকটবর্তী কাডিয়াক্‌দের মধ্যে এবং বৃটিশ উত্তর আমেরিকার অভ্যন্তরে টিনেদের মধ্যে এই সম্পর্কের অস্তিত্ব দেখেছেন। লেতুর্নো চিপেওয়া-ইন্ডিয়ান, চিলির কিউকাস, কেরিবিয়ানদের মধ্যে এবং ইন্দোচীনের কারেনদের মধ্যে এই বিষয়ের বিবরণ সংগ্রহ

* H. H. Bancroft, *The Native Races of the Pacific States of North America.* Vol. I—V. New York. 1875—1876. — সম্পাঃ

করেছেন; পার্থীয়, পারসিক, শক, হূণ প্রভৃতিদের সম্পর্কে প্রাচীন গ্রীক ও রোমকদের বিবরণ উল্লেখ না করলেও চলে। অগম্য বিভিন্নতর বয়সী লোকেদের মধ্যে যে যৌন সম্পর্ক বস্তুতঃ বিশেষ বিভীষিকার উদ্রেক না করেই এমনকি সর্বাধিক কূপমন্ডূক দেশের মধ্যেই বর্তমানে ঘটে থাকে, অগম্যবিধি উদ্ভাবনের আগে (এটা একটা উদ্ভাবন এবং অতি মূল্যবান উদ্ভাবন) মাতাপিতার সঙ্গে সন্তানসন্ততিদের যৌন সম্পর্ক তার চেয়ে বেশি জঘন্য বলে বোধ হওয়ার কথা ছিল না। বস্তুতঃ, ষাট বছরের 'কুমারীও' পয়সা থাকলে কখনো কখনো ত্রিশ বছরের যুবককে বিয়ে করে। যাই হোক যদি আমরা পরিবারের আদিতম রূপের সঙ্গে জড়িত অগম্যাগমনের ধারণাগুলি সরিয়ে নিই — এই ধারণাগুলি আমাদের ধারণা থেকে পৃথক এবং অনেক সময় একেবারে বিপরীত — তাহলে আমরা এমন এক ধরনের যৌন সম্পর্ক পাই যাকে কেবল নির্বিচারই বলা চলে। নির্বিচার এই দিক থেকে যে পরবর্তী কালের প্রথাবদ্ধ নিষেধগুলি তখন ছিল না। এর থেকে অবশ্য এই কথা আসে না যে, রোজই একটা এলোমেলো যৌন সম্পর্ক চলত। সীমাবদ্ধ সময়ের জন্য আলাদা আলাদা জোড় বাঁধা মোটেই বাতিল হচ্ছে না, বস্তুতঃ সমষ্টি-বিবাহেও এখন বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এইটাই দেখা যায়। সাম্প্রতিকতম গবেষক ভেস্তের্মার্ক যিনি এই আদি অবস্থা অস্বীকার করেছেন তিনি সন্তানের জন্ম পর্যন্ত স্ত্রী পুরুষ জোড় টিকলেই তাকে বিবাহ বলেছেন; তাহলে বলা চলে যে, নির্বিচার যৌন সম্পর্কের অবস্থাতেও এই ধরনের বিবাহ খুবই হতে পারত এবং এতে নির্বিচারত্বের অর্থাৎ যৌন সঙ্গমে প্রথাগত নিষেধের অভাবের কোনো খন্ডন হয় না। ভেস্তের্মার্ক অবশ্য এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে শুরু করেছেন যে, 'নির্বিচার যৌন সম্পর্ক মানে ব্যক্তিগত রুচির দমন', অতএব 'বেশ্যাবৃত্তিই এর সবচেয়ে খাঁটি রূপ'। আমার কিন্তু মনে হয় যে, বেশ্যালয়ের চশমা দিয়ে যতক্ষণ দেখছি ততক্ষণ আদি অবস্থা বুঝবার চেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। সমষ্টি-বিবাহ সম্পর্কে আলোচনার সময় আমরা আবার এই বিষয়ে ফিরে আসব।

মর্গানের মতে নির্বিচার যৌন সম্পর্কের এই আদি অবস্থা থেকে সম্ভবত খুব গোড়ার দিকে দেখা দিল:

১। **একরক্তসম্পর্কের পরিবার** — পরিবারের প্রথম স্তর। এখানে বিবাহের দলগুলি বিভিন্ন পুরুষানুক্রমে নির্ধারিত: পরিবারের গন্ডির মধ্যে সমস্ত ঠাকুর্দা ও ঠাকুমারা পরস্পরের স্বামীস্ত্রী, তাদের সন্তানসন্ততিদের অর্থাৎ বাপেদের ও মায়েদের সম্পর্কেও ঐ একই কথা খাটে; শেষোক্তদের সন্তানসন্ততিরা আবার তৃতীয় চক্রের স্বামীস্ত্রী, এদের সন্তানসন্ততিরা অর্থাৎ প্রথমোক্তদের প্রপৌত্র ও প্রপৌত্রীরা আবার চতুর্থ চক্রের স্বামীস্ত্রী। এইভাবে এই রূপের পরিবারে কেবলমাত্র পূর্বপুরুষের সঙ্গে উত্তরপুরুষের, মাতাপিতার সঙ্গে সন্তানসন্ততিগণের বিবাহ-সম্পর্কের (আমাদের ভাষায়) অধিকার ও দায়িত্ব থাকত না। ভাইয়েরা ও বোনেরা, — নিকট সম্পর্ক বা দূর সম্পর্কের সমস্ত

মামাত পিসতুত মাসতুত জ্যাঠতুত খুড়তুত ভাই বোনেরা — পরস্পরের ভাই ও বোন হত এবং **ঠিক এইজন্যই** তারা সবাই পরস্পরের স্বামী ও স্ত্রী। পরিবারের এই স্তরে ভাইবোন সম্পর্কের মধ্যে যৌন সম্পর্ক স্বাভাবিকভাবেই প্রচলিত ছিল।* এই ধরনের একটি প্রতিনিধিস্থানীয় পরিবার হচ্ছে একজোড়া স্ত্রীপুরুষের বংশধরদের নিয়ে গঠিত, যাদের মধ্যে আবার এক একধাপের বংশধররা সকলেই পরস্পরের ভ্রাতাভগিনী এবং ঠিক এইজন্যই তারা পরস্পরের স্বামী ও স্ত্রী।

একরক্তসম্পর্কের পরিবার লোপ পেয়েছে। ইতিহাসে পরিচিত সবচেয়ে বন্য উপজাতিগুলির মধ্যেও এইধরনের পরিবারের কোন প্রমাণযোগ্য দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। কিন্তু এটি যে একসময়ে **নিশ্চয়ই** ছিল সেই সিদ্ধান্ত আমরা হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের আত্মীয়তাবিধি থেকে করতে বাধ্য হই। এ বিধি এখনো পলিনেশিয়ায় সর্বত্র প্রচলিত, এবং এতে আত্মীয়তার এমন ধাপগুলি প্রকাশিত যার উৎপত্তি কেবল এই ধরনের পরিবারেই

* ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের বসন্তকালে একটি চিঠিতে মার্কস খুব কড়া ভাষায় ভাগনারের 'নিবেলুং' রচনায় আদিম অবস্থার সম্পূর্ণ মিথ্যা বিবরণের নিন্দা করেন। 'কে কখন শুনেছে যে, একজন ভাই তার বোনকে বধূ বলে আলিঙ্গন করছে?' ভাগনারের এই 'লম্পট দেবতা' যারা বেশ আধুনিক ধরনে প্রেমের সঙ্গে একটু অগম্যাগমন মিশিয়ে নিত, এদের উত্তরে মার্কস বলেছেন: 'আদিম যুগে ভগিনীই **ছিল** পত্নী এবং **সেইটাই ছিল নীতি**'। (এঙ্গেলসের টীকা।)

ভাগনারের অনুরাগী একটি ফরাসী বন্ধু এই মন্তব্যের সঙ্গে একমত নন এবং তিনি বলেছেন যে, প্রাচীনতম 'এদ্দায়' অর্থাৎ 'এগিসদ্রেক্কাতেই', যাকে ভাগনার আদর্শ বলে ধরেছেন, লোকি ফ্রেইয়াকে এইভাবে তিরস্কার করছেন, 'তুই দেবতাদের সামনে নিজের ভাইকে আলিঙ্গন করেছিস।' এতে নাকি দেখা যায় যে, তখনই ভাইবোনের বিবাহ নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। 'এগিসদ্রেক্কা' কিন্তু হচ্ছে সেই যুগের প্রকাশ যখন পুরাতন কিংবদন্তিতে বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভেঙে গিয়েছে; এটি হচ্ছে দেবতাদের সম্পর্কে নিছক লুসিয়ানিয়ান ধরনের বিদ্রূপাত্মক রচনা। যদি মেফিস্টোফেলিস্ হিসাবে লোকি ফ্রেইয়াকে এইভাবে তিরস্কার করেন তাহলে এটা বরং ভাগনারের বিরুদ্ধেই যায়। আরও কয়েক ছত্র পরে লোকি নিয়র্দকেও বলছেন: 'তুমি ভগিনীকে দিয়ে (এমন) সন্তান উৎপাদন করেছ।' (Vidh systur thinni gaztu slikan mög.) নিয়র্দ 'আসা' জাতির লোক ছিল না, সে ছিল একজন 'ভানা' এবং সে ইংলিঙ্গা গাথায় বলছে যে, ভানাদের দেশে ভ্রাতা ভগিনীর বিবাহ প্রচলিত, কিন্তু আসাদের মধ্যে নয়। এর থেকে মনে হতে পারত যে, ভানারা আসাদের চেয়ে পুরনো দেবতা ছিল। সে যাই হোক নিয়র্দ আসাদের মধ্যে সমকক্ষ হিসাবে বসবাস করত এবং এইভাবে 'এগিসদ্রেক্কা' থেকে বরং বেশি প্রমাণ পাওয়া যায় যে, যখন নরওয়েতে দেবতাদের সম্পর্কে গাথা রচিত হয় তখন ভ্রাতা ও ভগিনীর পরস্পর বিবাহে, অন্তত দেবতাদের মধ্যে, কোন ঘৃণার উদ্রেক করত না। যদি কেউ ভাগনারের ত্রুটি মার্জনা করতে চান তাহলে তিনি 'এদ্দা' থেকে উদ্ধৃতি না দিয়ে গ্যেটের রচনা থেকে উদ্ধৃতি দিতে পারেন, কারণ গ্যেটে ভগবান ও বায়াদেরে সম্পর্কিত গাথায় অনুরূপ ভুল করে মন্দিরে স্ত্রীলোকদের ধর্মীয় আত্মসমর্পণের কথা বলেছিলেন এবং ব্যাপারটিকে বড়ো বেশি আধুনিক বেশ্যাবৃত্তির অনুরূপ করে তুলেছিলেন। (চতুর্থ সংস্করণে এঙ্গেলসের টীকা।)

সম্ভব। পরিবারের সমগ্র পরবর্তী বিকাশ থেকেও আমরা একই সিদ্ধান্ত করতে বাধ্য হই, সে বিকাশের একটা আবশ্যিক পূর্ববর্তী পর্যায় হিসাবে পরিবারের এই রূপ ধরতে হয়।

২। **পুনালুয়া পরিবার**। পরিবার সংগঠনের ক্ষেত্রে প্রথম পদক্ষেপ যদি হয় মাতাপিতার সঙ্গে সন্তানসন্ততিদের যৌন সম্পর্ক রহিত করা, তাহলে দ্বিতীয় পদক্ষেপ হচ্ছে ভ্রাতা ও ভগিনীদের যৌন সম্পর্ক নিষিদ্ধ করা। এই শেষোক্তদের বয়স খুব কাছাকাছি হওয়ায় এই পদক্ষেপটি ছিল অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ শুধু তাই নয়, পরন্তু প্রথমটির চেয়ে অনেক শক্তও বটে। ধীরগতিতে এই ব্যাপারটি সম্পন্ন হয়, সম্ভবত শুরুতে সহোদর ভাইবোনদের (অর্থাৎ মায়ের দিক থেকে) যৌন সম্পর্ক নিষিদ্ধ করা হয়, প্রথমে বিচ্ছিন্ন কিছু ক্ষেত্রে, পরে ক্রমশ এটাই নিয়ম হয়ে দাঁড়ায় (হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে বর্তমান শতকেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম পাওয়া যেত), এবং সর্বশেষে এমনকি সমান্তরবর্তী সমস্ত ভাইবোনদের মধ্যে অথবা আমরা যা বলি প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় কাজিনদের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ হয়। মর্গানের মতে এতে 'প্রাকৃতিক নির্বাচন নীতির ক্রিয়ার একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত' পাওয়া যায়। এ কথা সন্দেহাতীত, যেসব উপজাতিদের মধ্যে এই অগ্রগতির ফলে অন্তর্প্রজনন সংকুচিত হল তারা যেসব উপজাতির মধ্যে তখনও ভ্রাতা ও ভগিনীদের মধ্যে বিবাহ ছিল নিয়ম ও কর্তব্য, তাদের চেয়ে অনেক তাড়াতাড়ি ও অনেক বেশী পরিমাণে বিকাশলাভ করে। এই অগ্রগতির ফল যে কতখানি প্রবল প্রভাব ফেলল তা **গোত্র** সংগঠন থেকেই প্রমাণ হয়, এ গোত্রের প্রত্যক্ষ উদ্ভব এই অগ্রগতি থেকেই এবং লক্ষ্য ছাড়িয়ে তা বহুদূর এগিয়ে যায়। পৃথিবীর সমস্ত না হলেও অধিকাংশ বর্বর জাতিগুলির সমাজগঠনের ভিত্তি হল গোত্র এবং গ্রীস ও রোমে আমরা সরাসরি এর থেকেই সভ্যতার স্তরে উত্তীর্ণ হই।

প্রত্যেকটি আদি পরিবার বড়জোর কয়েক পুরুষের পরই বিভক্ত হতে বাধ্য হত। বিনা ব্যতিক্রমে বর্বর-যুগের মধ্যবর্তী স্তরের শেষাশেষি পর্যন্ত যে আদিম সাম্যতন্ত্রী সাধারণ গৃহস্থালীর ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল তাতে পারিবারিক গোষ্ঠীর একটা সর্বোচ্চ আয়তন নির্ধারিত হয়ে যায়, অবস্থা বিশেষে কিছু ইতর বিশেষ হলেও প্রত্যেকটি স্থানীয় এলাকায় তা কমবেশি সুনির্দিষ্ট ছিল। কিন্তু এক মায়ের ছেলেমেয়েদের মধ্যে যৌন সম্পর্কের অবৈধতার ধারণা আসার সঙ্গে সঙ্গেই পুরান গৃহস্থালী গোষ্ঠীর বিভাগ এবং নতুন গৃহস্থালী গোষ্ঠী (Hausgemeinden) প্রতিষ্ঠার উপর এর প্রভাব পড়তে বাধ্য (এই গোষ্ঠী পারিবারিক দলের সঙ্গে অনিবার্য মিলবেই এমন নয়)। **একটি** গৃহস্থালী গোষ্ঠীর কেন্দ্র হত এক বা একাধিক ভগিনীদল, তাদের সহোদর ভাইয়েরা হত আর একটি গোষ্ঠীর কেন্দ্র। এইভাবে অথবা অনুরূপ কোন উপায়ে একরক্তসম্পর্কের পরিবার থেকে মর্গান যাকে পুনালুয়া পরিবার বলছেন তার উৎপত্তি হল। হাওয়াই প্রথা

অনুযায়ী সহোদরা অথবা সমান্তরবর্তী (অর্থাৎ প্রথম, দ্বিতীয় বা ততোধিক স্তরের কাজিন বোনেরা) কয়েকজন ভগিনী হত তাদের সাধারণ স্বামীদের সাধারণ স্ত্রী, কিন্তু এই সম্পর্কের মধ্যে থেকে তাদের ভাইয়েরা বাদ পড়ত। এই স্বামীরা এখন আর পরস্পরকে ভাই বলে সম্ভাষণ করে না, বস্তুতঃ, তাদের এখন আর ভাই হবার দরকার নেই, পরন্তু তারা পরস্পরকে ডাকে 'পুনালুয়া' অর্থাৎ ঘনিষ্ঠ সাথী, বলা যেতে পারে অংশীদার। ঠিক একইভাবে একদল সহোদর অথবা সমান্তরবর্তী ভাইয়েরা একত্রে এমন একদল স্ত্রীলোকের সঙ্গে বিবাহে আবদ্ধ হত, যারা তাদের ভগিনী **নয়** এবং এই স্ত্রীলোকেরা পরস্পরকে 'পুনালুয়া' বলে ডাকত। এইটিই হচ্ছে পরিবার গঠনের **(Familienformation)** চিরায়ত রূপ, পরে যার অনেকরকম পরিবর্তন হয়; এর একটি অপরিহার্য মূল বৈশিষ্ট্য হল একটি নির্দিষ্ট পারিবারিক গণ্ডির মধ্যে একদল পুরুষ ও একদল স্ত্রীর যৌথ পতিপত্নী সম্পর্ক, যে সম্পর্ক থেকে প্রথমে স্ত্রীদের সহোদর ভাইয়েদের এবং পরে সমান্তরবর্তী ভাইয়েদেরও বাদ দেওয়া হত এবং ঐ একইভাবে বাদ দেওয়া হত স্বামীদের বোনেদের।

পরিবারের এইরূপ থেকে একেবারে পরিপূর্ণ যথার্থতায় আমেরিকায় প্রচলিত আত্মীয়তাবিধির বিভিন্ন ধাপগুলি মেলে। আমার মায়ের বোনেদের সন্তানসন্ততিরা তখনো থাকছে আমার মায়েরও সন্তানসন্ততি; তেমনই আমার বাপের ভাইয়েদের ছেলেমেয়েরা আমার বাপেরও ছেলেমেয়ে এবং তারা সকলেই হচ্ছে আমার ভাইভগিনী, কিন্তু আমার মায়ের ভাইয়েদের ছেলেমেয়েরা এখন হচ্ছে তার ভাইপোভাইঝি, আমার বাপের বোনেদের ছেলেমেয়েরা হচ্ছে তার বোনপোবোনঝি এবং তারা সকলেই আমার কাজিন। বস্তুতঃ, আমার মায়ের বোনেদের স্বামীরা যখন আমার মায়েরও স্বামী এবং আমার বাপের ভাইয়েদের স্ত্রীরা তেমনই সকলে তারও স্ত্রী থাকছে, ঘটনাক্ষেত্রে সর্বত্র না হলেও অধিকারের দিক দিয়ে, তখন ভাইবোনেদের মধ্যে যৌন সম্পর্ক সমাজে নিন্দিত হওয়ায় প্রথম স্তরের যে কাজিনরা এতকাল নির্বিচারে ভ্রাতাভগিনী বলে গণ্য হত তারা দুটো শ্রেণীতে ভাগ হয়ে গেল: একশ্রেণী এখনও আগের মতো ভাইবোন থাকল (সমান্তর); বাকিরা, একদিকে ভাইয়ের ছেলেমেয়েরা ও অপরদিকে বোনের ছেলেমেয়েরা, আর ভাইবোন হতে **পারে না,** এদের সাধারণ জনকজননী — সাধারণ বাপ বা সাধারণ মা অথবা সাধারণ বাপমা — থাকতে পারে না এবং এজন্য এই প্রথম প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ল ভাইপোভাইঝি ও বোনপোবোনঝিদের, নারীপুরুষ কাজিনদের নতুন শ্রেণী যেটি পূর্বতন পরিবার প্রথায় অর্থহীন ছিল। আমেরিকার আত্মীয়তাবিধি যা ব্যক্তিগত বিবাহের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত যে-কোন পরিবারের সঙ্গে আদৌ খাপ খায় না তার খুঁটিনাটিগুলিরও পর্যন্ত যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা ও স্বাভাবিক সমর্থন পাওয়া যায় এই পুনালুয়া পরিবার থেকে। যে পরিমাণে এই আত্মীয়তাবিধির প্রচলন ছিল অন্ততঃ

ঠিক সেই পরিমাণেই পুনালুয়া পরিবার অথবা তদনুরূপ কোনো পরিবার নিশ্চয়ই বর্তমান ছিল।

পরিবারের এই যে রূপটির অস্তিত্ব হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে সত্যসত্যই প্রমাণিত হয়েছে তার খবর সম্ভবতঃ গোটা পলিনেশিয়াতেই আমরা পেতাম যদি ধর্মপ্রাণ মিশনারিরা আমেরিকার সেকালের স্পেনীয় যাজকদের মতো, এইসব খৃষ্টধর্ম-বিরুদ্ধ সম্পর্কের মধ্যে 'জঘন্যতা'* ছাড়াও আরও বেশী কিছু লক্ষ্য করতে পারতেন। যে বৃটেনরা তখন বর্বরতার মধ্যবর্তী স্তরে তাদের সিজার যে বর্ণনা দিয়েছেন 'তারা দশ-বার জন মিলে যৌথভাবে স্ত্রী রাখত এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তা ভাইয়ে ভাইয়ে মিলে, বাপমা ছেলেমেয়ে মিলে,' তার প্রকৃষ্ট ব্যাখ্যা হয় সমষ্টি-বিবাহ দিয়ে। যৌথভাবে স্ত্রী রাখার মতো বয়স্ক দশ-বার জন পুত্র বর্বর-যুগে মায়েদের থাকত না, কিন্তু আমেরিকার আত্মীয়তাবিধি, যেটি পুনালুয়া পরিবারের সহগামী, তাতে অনেক ভাই থাকতে পারত, কারণ একজন মানুষের নিকট ও দূর সম্পর্কের সমস্ত কাজিনেরাই ছিল তার ভাই। 'বাপমায়ে ছেলেমেয়ে মিলে' এই বর্ণনায় সিজারের দিক থেকে ভুলবুঝা থাকতে পারে বলে মনে হয়। এই প্রথায় অবশ্য পিতা ও পুত্র অথবা মাতা ও কন্যা একই বিবাহদল থেকে একেবারে বাদ পড়ে না, কিন্তু এতে বাপ ও মেয়ে অথবা মা ও ছেলের সম্পর্ক অবশ্যই বাদ পড়ে। হিরোডোটস ও অন্যান্য প্রাচীন লেখকেরা বন্য ও বর্বর জাতিগুলির মধ্যে সমষ্টিগতভাবে পত্নীসম্ভোগের যে বিবরণ দিয়েছেন, তা এইভাবে সমষ্টি-বিবাহের এই বা অন্য কোনো রূপ দিয়েই সবচেয়ে সোজা ব্যাখ্যা করা যায়। ওয়াটসন এবং কেই 'ভারতের জনগণ'** নামক রচনায় অযোধ্যার টিকুরদের (গঙ্গার উত্তর দিকে অবস্থিত) যে বিবরণ দিয়েছেন তাতেও এই কথা খাটে, 'তারা বড় বড় গোষ্ঠীতে প্রায় যথেচ্ছভাবে বসবাস করে (অর্থাৎ যৌন সম্পর্কের ক্ষেত্রে) এবং যখন দুজন লোককে বিবাহিত বলে ধরা হয় তখন সে বন্ধনটা মাত্র নামেই।'

বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই প্রত্যক্ষভাবে পুনালুয়া পরিবার থেকেই **গোত্র** সংগঠনের উৎপত্তি হয়েছে বলে মনে হয়। অস্ট্রেলিয়ার শ্রেণী-বিভাগ*** পদ্ধতি থেকেও এর সূত্রপাত

* এ বিষয়ে এখন কোন সন্দেহ থাকতে পারে না যে, বাখোফেন যে নির্বিচার যৌন সম্পর্কের চিহ্নগুলি আবিষ্কার করেছেন বলে বিশ্বাস করতেন তাঁর সেই sumpfzeugung সমষ্টি-বিবাহে এসে পৌছয়। 'বাখোফেন "পুনালুয়া" বিবাহকে যদি "অবৈধ" মনে করেন, তাহলে সেই যুগের কোন লোক বর্তমানে মাতা অথবা পিতার দিকের দূর বা নিকট সম্পর্কের কাজিনদের মধ্যে বিবাহকেও সহোদর ভাইবোনদের বিবাহের মতো অগম্যাগমন বলতে পারে' (মার্কস)। (এঙ্গেলসের টীকা।)

** J. F. Watson and J. W. Kaye, *The People of India*. Vol. I-VI. London, 1868—1872. — সম্পাঃ

*** অস্ট্রেলীয় উপজাতিদের অধিকাংশই যেসব বৈবাহিক শ্রেণী বা বিভাগ অর্থাৎ বিশেষ নির্দিষ্ট গ্রুপে বিভক্ত হত তার কথা বলা হচ্ছে। এই রূপ প্রতিটি গ্রুপের পুরুষেরা কেবল অন্য একটি নির্দিষ্ট

হওয়া অবশ্যই সম্ভব: অস্ট্রেলীয়দের মধ্যেও গোত্র আছে, কিন্তু তাদের মধ্যে পুনালুয়া পরিবার দেখা দেয়নি; তাদের সমষ্টি-বিবাহের ধরন আরও স্থূলতর।

সব ধরনের সমষ্টিগত পরিবারে শিশুর পিতার নিশ্চয়তা নেই কিন্তু মাতা নিশ্চিত। যদিও মা সমগ্র পরিবারের **সমস্ত** সন্তানসন্ততিদের নিজের সন্তান বলে সম্ভাষণ করত এবং তাদের প্রত্যেকের প্রতি তার মায়ের কর্তব্য থাকত, তাহলেও নিজের পেটের ছেলেমেয়েদের সে আলাদা করে জানে। এইভাবে এটা খুবই স্পষ্ট যে, সমষ্টি-বিবাহ যেখানে রয়েছে সেখানে কেবলমাত্র **মায়ের** দিক দিয়েই বংশপরম্পরা ঠিক করা যায় এবং এইভাবে একমাত্র **মাতৃধারাই** স্বীকৃত হয়। বস্তুত, সমস্ত বন্য জাতিদের মধ্যেই এবং বর্বরতার নিম্নতন স্তরের জাতিদের মধ্যেই এই ব্যাপার দেখা যায় এবং এই বিষয়টির প্রথম আবিষ্কার বাখোফেনের দ্বিতীয় মহৎ কৃতিত্ব। কেবলমাত্র মায়ের মারফৎ বংশ নির্ণয় এবং এর থেকে কালক্রমে যে উত্তরাধিকার সম্পর্ক দেখা দিল তাকে তিনি আখ্যা দিয়েছেন মাতৃ-অধিকার। আমি সংক্ষেপের খাতিরে এই আখ্যাটি বজায় রাখছি। অবশ্য এই আখ্যা ভাল বাছাই হয়নি, কারণ সমাজ বিকাশের সেই স্তরে আইনী অর্থে অধিকার তখনও ছিল না।

এখন যদি আমরা পুনালুয়া পরিবারের দুটি টিপিকাল ধরনের (group) একটি নিই — অর্থাৎ যেটিতে রয়েছে কতকগুলি সহোদরা ও সমান্তরা বোন (অর্থাৎ সহোদরা বোনেদেরই বংশের প্রথম, দ্বিতীয় বা ততোধিক পর্যায়ের ভগিনী) ও তাদের সঙ্গে তাদের সন্তানসন্ততি এবং মায়ের দিক দিয়ে তাদের সহোদর ও সমান্তর ভাইয়েরা (আমাদের মত অনুযায়ী এরা বোনেদের স্বামী **নয়**) তাহলে আমরা ঠিক সেইসব লোকগুলিকে পাই যারা আদিরূপের গোত্রভুক্ত। এরা সকলেই একই মাতা থেকে জন্মেছে, এবং প্রত্যেক পুরুষেই এই মেয়েরা একই আদি মাতার বংশজাত হিসাবে হচ্ছে পরস্পরের ভগিনী। এই ভগিনীদের স্বামীরা কিন্তু এখন আর তাদের ভাই হতে পারে না অর্থাৎ তারা ঐ আদি মাতার বংশজাত হতে পারে না এবং সেইজন্য তারা ঐ রক্তসম্পর্কিত গোষ্ঠীর, পরবর্তী কালের গোত্রের অন্তর্ভুক্ত নয়; কিন্তু তাদের সন্তানসন্ততিরা এই গোষ্ঠীর মধ্যেই পড়ে, কারণ মায়ের দিক দিয়েই জন্মই নির্ধারক, কারণ এইটেই একমাত্র সুনিশ্চিত। যখন সমস্ত ভাইবোনেদের, এমনকি মায়ের দিক দিয়ে দূর সম্পর্কের সমান্তর ভাইবোনেদের মধ্যে পর্যন্ত যৌন সম্পর্ক নিষিদ্ধ হল তখনই উপরোক্ত গোষ্ঠী রূপান্তরিত হচ্ছে গোত্রে — অর্থাৎ মায়ের দিক দিয়ে রক্তসম্পর্কযুক্ত আত্মীয়ের একটি সুনির্দিষ্ট গোষ্ঠী হয়ে ওঠে যাদের নিজেদের মধ্যে বিয়ে চলবে না; এখন থেকে তা সামাজিক ও ধর্মীয় চরিত্রের অন্যান্য সাধারণ প্রতিষ্ঠান মারফৎ নিজেকে

গ্রুপের নারীর সঙ্গেই বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারত। প্রতিটি উপজাতির মধ্যে এই ধরনের গ্রুপ থাকত ৪—৮টি পর্যন্ত। — সম্পাঃ

ক্রমেই সংহত করে তোলে এবং একই উপজাতির অন্যান্য গোত্র থেকে পৃথক হয়ে ওঠে। এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আমরা পরে করব। যদি অবশ্য আমরা দেখি যে, পুনালুয়া পরিবার থেকেই গোত্রের উদ্ভব আবশ্যিক শুধু নয়, স্পষ্টতই তাই হয়েছে, তাহলে প্রায় নিশ্চয়তার সঙ্গে ধরে নেওয়া যায় যে জাতিগুলির মধ্যে গোত্র সংগঠন দেখা যায় সেখানেই, অর্থাৎ প্রায় সমস্ত বর্বর ও সভ্য জাতিগুলির মধ্যে আগে এই রূপের পরিবার ছিল।

যে সময়ে মর্গান তাঁর গ্রন্থটি রচনা করেন তখনও পর্যন্ত সমষ্টি-বিবাহ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। বিভিন্ন শ্রেণীতে সংগঠিত অস্ট্রেলীয়দের মধ্যে সমষ্টি-বিবাহের প্রচলন সম্পর্কে অল্পকিছু জানা ছিল এবং উপরন্তু ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের সময়েই মর্গান হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের পুনালুয়া পরিবার সম্পর্কে যে খবর পেয়েছিলেন সেটি প্রকাশ করেন। এ থেকে একদিকে আমেরিকার ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে প্রচলিত যে আত্মীয়তাবিধি মর্গানের সমস্ত গবেষণার প্রারম্ভবিন্দু তার পূর্ণ ব্যাখ্যা হয়; অপরদিকে মাতৃ-অধিকারভিত্তিক গোত্র উদ্ভবের তৈরি যাত্রাবিন্দু মিলছে এ থেকে। এবং সর্বশেষে অস্ট্রেলিয়ার শ্রেণী-সংগঠনের চেয়ে এটি বিকাশের অনেক উন্নত স্তর। এইজন্যই বেশ বুঝা যায় কেন মর্গান এই পুনালুয়া পরিবারকেই জোড়বাঁধা পরিবারের পূর্ববর্তী একটা আবশ্যিক বিকাশ-স্তর বলে ভেবেছিলেন এবং ধরে নিয়েছিলেন যে, প্রাচীন যুগে এই ধরনের পরিবার সর্বত্র প্রচলিত ছিল। তারপরে আমাদের কাছে সমষ্টি-বিবাহের অন্যান্য ধরনেরও অনেক তথ্য এসেছে এবং এখন আমরা জানি যে, মর্গান একটু বেশী এগিয়ে গিয়েছিলেন। তথাপি এ কথা ঠিক যে, পুনালুয়া পরিবার মারফৎ তিনি সৌভাগ্যক্রমে সমষ্টি-বিবাহের উচ্চতম ও চিরায়ত রূপটির সঙ্গেই পরিচিত হয়েছিলেন, যে রূপটি থেকে উচ্চতর রূপে উৎক্রমণ সবচেয়ে সহজেই ব্যাখ্যা করা যায়।

ইংরেজ মিশনারি লরিমার ফাইসনের কাছে সমষ্টি-বিবাহ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের অতি গুরুত্বপূর্ণ সমৃদ্ধির জন্য আমরা ঋণী, কারণ ইনি এই ধরনের পরিবারের চিরায়ত আবাসভূমি অস্ট্রেলিয়ায় বহুদিন এই নিয়ে চর্চা চালিয়েছেন। দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার মাউণ্ট গ্যাম্বিয়ার অঞ্চলে অস্ট্রেলীয় নিগ্রোদেরই তিনি বিকাশের সর্বনিম্ন স্তরে দেখতে পান। গোটা উপজাতিটা এখানে দুটো বড় শ্রেণীতে বিভক্ত — ক্রোকি ও কুমাইট্। এক একটি শ্রেণীর অভ্যন্তরে যৌন সম্পর্ক কড়াকড়িভাবে নিষিদ্ধ; অপরপক্ষে একটি শ্রেণীর প্রত্যেকটি পুরুষ জন্মের সঙ্গে সঙ্গে অপর শ্রেণীর প্রত্যেকটি স্ত্রীলোকের স্বামী এবং তেমনই ঐ স্ত্রীলোকও জন্মাবামাত্র তার স্ত্রী। অর্থাৎ ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তি নয়, গোটা দলের সঙ্গে দলের বিয়ে, শ্রেণীর সঙ্গে শ্রেণীর। একথা লক্ষ্য করা উচিত যে, দুটি বহির্বিবাহিক শ্রেণীতে বিভাগজনিত বাধানিষেধ ছাড়া বয়সের অথবা বিশেষ রক্ত সম্পর্কের কোনো বাছবিচার করা হয় না। একজন ক্রোকি বৈধভাবেই প্রতিটি কুমাইট্

স্ত্রীলোককে স্ত্রী হিসাবে পাচ্ছে; যেহেতু কোনো কুমাইট্ স্ত্রীলোকের গর্ভজাত তার নিজের কন্যাও মাতৃ-অধিকার অনুযায়ী কুমাইট্ সেজন্য এই কন্যাটি জন্মের সময় থেকেই প্রত্যেক ক্রোকি পুরুষের স্ত্রী অর্থাৎ তার বাপেরও। অন্তত শ্রেণী-সংগঠন যে রূপে আমরা জানি তাতে এ ক্ষেত্রে কোন নিষেধ আরোপ করে না। অতএব এই সংগঠন হয়তো এমন যুগে শুরু হয় যখন অন্তর্প্রজনন সংকুচিত করার সমস্ত অস্পষ্ট প্রেরণা সত্ত্বেও মাতাপিতার সঙ্গে সন্তানসন্ততির যৌন সম্পর্ক তখনো বিশেষ বীভৎস ব্যাপার বলে গণ্য হত না, আর তাই নির্বিচার যৌন সম্পর্কের অবস্থার মধ্যে থেকেই শ্রেণী-সংগঠনের উদ্ভব হয়েছে; নয়ত যখন বিবাহগত শ্রেণীর উৎপন্ন হল তখন মাতাপিতার সঙ্গে সন্তানসন্ততির যৌন সম্পর্ক ইতিপূর্বেই প্রথার দ্বারা নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল; সে ক্ষেত্রে বর্তমান অবস্থাটা আগের একরক্তসম্পর্কযুক্ত পরিবারেরই ইঙ্গিত করে এবং সেটা ছাড়িয়ে যাবার দিক দিয়ে এটা হল প্রথম পদক্ষেপ। এই শেষের অনুমানটি অধিকতর সম্ভব বলে মনে হয়। যতদূর আমি জানি, অস্ট্রেলিয়ার কোন বিবরণে মাতাপিতার সঙ্গে সন্তানসন্ততির যৌন সম্পর্কের নিদর্শন নেই; এবং বহির্বিবাহের পরবর্তী রূপ, মাতৃ-অধিকারভিত্তিক গোত্রগুলিতেও এরূপ সঙ্গমের নিষিদ্ধীকরণ প্রতিষ্ঠার আগে থেকে প্রচলিত বলে ধরে নিতে হয়।

দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার মাউণ্ট গ্যাম্বিয়ার অঞ্চল ছাড়া দ্বি-শ্রেণী প্রথা ডার্লিং নদীর সন্নিহিত অঞ্চলে আরও পূর্ব দিকে এবং উত্তর-পূর্ব দিকে কুইন্সল্যান্ডে দেখা যায়, এইভাবে অত্যন্ত বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে এই প্রথা রয়েছে। এই প্রথায় শুধু ভাই ও বোনের বিবাহ নিষিদ্ধ, মায়ের দিক থেকে ভাইয়েদের সন্তানসন্ততি ও বোনেদের সন্তানসন্ততিদের বিবাহ নিষিদ্ধ, কারণ এরা একই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত; অপরপক্ষে ভাই ও বোনের ছেলেমেয়েরা পরস্পর বিয়ে করতে পারে। অন্তর্প্রজনন বন্ধ করার আরও একটি পদক্ষেপের সন্ধান পাওয়া যায় নিউ সাউথ ওয়েল্সে ডার্লিং নদীর পার্শ্ববর্তী কামিলারোইদের মধ্যে যেখানে দুটি মূল শ্রেণীকে চার ভাগে ভাগ করা হয় এবং এই চারটি শ্রেণীর প্রত্যেকটি দলবদ্ধভাবে একটি বিশেষ শ্রেণীর সঙ্গে বিবাহিত হয়। প্রথম দুটি শ্রেণীর লোকেরা জন্ম থেকেই পরস্পরের স্বামীস্ত্রী; মা কোন শ্রেণীর প্রথম নাকি দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত সেই অনুসারে সন্তানসন্ততিরা তৃতীয় অথবা চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ে এবং তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর সন্তানসন্ততিরা পরস্পর বিবাহিত হয় এবং তারা আবার প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে পড়ে। অর্থাৎ এক পুরুষের লোকেরা সবসময়ই প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, পরের পুরুষের লোকেরা তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর এবং তারপরের পুরুষের লোকেরা আবার প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে আসে। এই প্রথা অনুযায়ী (মায়ের দিকের) ভাই ও বোনেদের ছেলেমেয়েরা পরস্পর স্বামীস্ত্রী হতে পারে না, কিন্তু নাতিনাতনীরা পারে। এই অদ্ভুত জটিল প্রথাটির ওপর — অন্তত পরবর্তী যুগে — মাতৃ-অধিকারভিত্তিক গোত্র

সংযুক্ত হয়ে তা আরও জটিল হয়ে পড়ে। কিন্তু এখন আমরা সে আলোচনা করতে পারব না। এইভাবে আমরা দেখি যে, অন্তপ্রজনন রোধের প্রেরণা বার বার নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছে, কিন্তু সেটা করেছে হাতড়ে হাতড়ে চলে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে, উদ্দেশ্যের স্পষ্ট চেতনা ছাড়া।

সমষ্টি-বিবাহ, যা অস্ট্রেলিয়ার ক্ষেত্রে আজও পর্যন্ত শ্রেণীতে শ্রেণীতে বিবাহ, অর্থাৎ প্রায়ই সমগ্র মহাদেশে বিক্ষিপ্ত একটি গোটা শ্রেণীর পুরুষ মানুষের সঙ্গে ঐ একইভাবে বিক্ষিপ্ত একটি শ্রেণীর স্ত্রীলোকদের বিবাহ, খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করলে এই সমষ্টি-বিবাহ তত ভয়ংকর নয়, গণিকা-রঞ্জিত কল্পনায় কূপমণ্ডূক যা ভাবেন। বরং এই বিবাহের অস্তিত্ব সম্পর্কে বহু বৎসর ধরে কেউ সন্দেহই করেনি এবং অত্যন্ত সম্প্রতি এই নিয়ে আবার বিতর্ক উঠেছে। ভাসাভাসা দেখলে একে মনে হবে একধরনের একটু শিথিল একপতিপত্নী প্রথা এবং কোথাও কোথাও বহুপত্নী প্রথা, তার সঙ্গে সময় সময় বিশ্বাসলংঘন। যে বিধি অনুযায়ী এই বিবাহ নিয়ন্ত্রিত হয় তা আবিষ্কার করতে হলে ফাইসন ও হাউইট যেমন করেছিলেন তেমনই বহু বৎসরের পর্যবেক্ষণ দরকার (কার্যক্ষেত্রে একজন সাধারণ ইউরোপীয়ের নিজেদের বিবাহ-পদ্ধতির কথাই মনে পড়বে); সে বিধি অনুযায়ী নিজের বাড়ি থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে সম্পূর্ণ অপরিচিত লোকেদের মধ্যে, এমন সব লোকেদের মধ্যে যাদের ভাষা পর্যন্ত সে বোঝে না, একজন অস্ট্রেলীয় নিগ্রো অনেকসময় শিবির থেকে শিবিরে ও উপজাতি থেকে উপজাতিতে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে এমন স্ত্রীলোক পাচ্ছে যারা তার কাছে সরল মনে বিনা প্রতিরোধে আত্মদান করছে এবং এ প্রথা অনুযায়ী যার একাধিক স্ত্রী আছে সে মানুষ অতিথির সেবায় রাত্রির জন্য একজনকে দিচ্ছে। যেখানে একজন ইউরোপীয় কেবলমাত্র দুর্নীতি ও আইনহীনতা দেখতে পায়, সেখানে আসলে রয়েছে কড়াকড়ি নিয়ম। এই স্ত্রীলোকেরা অপরিচিত লোকটির বৈবাহিক শ্রেণীর মধ্যে পড়ে এবং সেইজন্য জন্ম থেকেই তারা তার স্ত্রী; যে একই বিবাহবিধি অনুযায়ী এক দল অপর দলের জন্য বরাদ্দ থাকছে তাতেই বিবাহের জন্য বরাদ্দ শ্রেণীর বাহিরে যৌন সম্পর্ক বহিষ্কার দণ্ডে নিষিদ্ধ। এমনকি যেখানে নারীহরণ চলে, যা প্রায়ই ঘটে এবং অনেক এলাকায় তাই রীতি, সেখানে পর্যন্ত শ্রেণী বিবাহের বিধি কড়াকড়িভাবে মানা হয়।

নারীহরণ প্রথার মধ্যেই একপতিপত্নী প্রথায় উৎক্রমণের লক্ষণ দেখা যায় — অন্ততপক্ষে জোড়বাঁধা বিবাহের রূপে। একজন যুবক যখন তার বন্ধুবান্ধবদের সাহায্যে একটি মেয়েকে হরণ করে বা নিয়ে পালায়, তখন একের পর এক সকলের সঙ্গেই ঐ মেয়েটির যৌন সম্পর্ক হয়, কিন্তু তারপর যে যুবক হরণের ব্যাপারে অগ্রণী, মেয়েটিকে তারই পত্নী বলে গণ্য করা হয়। আবার অপরদিকে অপহৃতা মেয়েটি যদি লোকটার কাছ থেকে পালিয়ে যায় এবং অপর কারও কাছে ধরা পড়ে তাহলে সে এই শেষোক্ত ব্যক্তির

স্ত্রী হয় এবং প্রথম মানুষটির অধিকার চলে যায়। এইভাবে সাধারণভাবে প্রচলিত সমষ্টি-বিবাহের পাশাপাশি — এবং তার মধ্যে — দেখা দেয় ঐকান্তিক সম্পর্ক, বেশী বা কম সময়ের জন্য জোড়বাঁধা এবং সেই সঙ্গে বহুপত্নীত্ব; ফলে এখানেও সমষ্টি-বিবাহ ক্রমশ লুপ্ত হতে থাকে, শুধু একমাত্র প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, ইউরোপীয়দের প্রভাবে কোনটা আগে লোপ পাবে — সমষ্টি-বিবাহ অথবা এরকম বিবাহ যারা করে সেই অস্ট্রেলীয় নিগ্রোরাই।

সে যাই হোক, অস্ট্রেলিয়ায় যা প্রচলিত এইভাবে গোটা শ্রেণীতে শ্রেণীতে বিবাহ হচ্ছে সমষ্টি-বিবাহের খুব নিচু ও আদিম রূপ; অপরপক্ষে আমরা যতদূর জানি পুনালুয়া পরিবার হচ্ছে এর বিকাশের উচ্চতম পর্যায়। আগেরটি যাযাবর বন্যদের সামাজিক অবস্থার উপযোগী বলে মনে হয়, কিন্তু শেষেরটির জন্য সাম্যতন্ত্রী গোষ্ঠীর অপেক্ষাকৃত স্থায়ী বসতি ধরে নিতে হয় এবং এর থেকেই সরাসরিভাবে পরবর্তী উচ্চতর স্তরের বিকাশ ঘটে। এই দুয়ের মধ্যে নিশ্চয় কোনো কোনো মধ্যবর্তী স্তর আবিষ্কার হবে; এখানে আমাদের সামনে রয়েছে অনুসন্ধানের এমন একটি ক্ষেত্র যা সদ্যোন্মুক্ত ও প্রায় অকর্ষিত।

৩। **জোড়বাঁধা পরিবার**। সমষ্টি-বিবাহের আমলে অথবা তারও আগে কমবেশী সময়ের জন্য জোড়বাঁধা পরিবার দেখা যেত; বহু পত্নীর মধ্যেও একজন মানুষের একটি প্রধানা পত্নী (একে অবশ্য তখনও প্রিয় পত্নী বলা প্রায় চলে না) থাকত এবং ঐ মানুষটি হত আবার অনেক পতির মধ্যে তার প্রধান পতি। এই অবস্থার জন্য মিশনারিদের মধ্যে নেহাৎ কম ভ্রান্তির সৃষ্টি হয়নি, তাঁরা সমষ্টি-বিবাহের মধ্যে কখনও দেখতেন নির্বিচারে বহু ভোগ্যা স্ত্রী, কখনও বা খুশিমতো বিবাহভঙ্গন। এই ধরনের জোড়বাঁধার অভ্যাস অবশ্য গোত্রের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই এবং যাদের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ সেই 'ভাইয়েদের' ও 'বোনেদের' শ্রেণীর সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্বভাবতই ক্রমেই বেশি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। রক্তসম্পর্কযুক্ত আত্মীয়দের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ করার যে প্রেরণা দেয় গোত্র তাতে ঘটনাবলী আরও এগিয়ে চলে। এইভাবে আমরা ইরকোয়াস এবং বর্বরতার নিম্নতন স্তরে অবস্থিত অন্যান্য ইণ্ডিয়ান উপজাতিগুলির বেশির ভাগের মধ্যে দেখি যে, তাদের প্রথা অনুযায়ী আত্মীয় বলে স্বীকৃত **সকলের** মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ এবং এই আত্মীয়েরা কয়েক শত রকমের। বিবাহের এই নিষেধাজ্ঞার ক্রমবর্ধিত জটিলতা সমষ্টি-বিবাহকে ক্রমেই অসম্ভব করে; তার জায়গা নেয় **জোড়বাঁধা পরিবার**। এই স্তরে একজন মানুষ একটিমাত্র স্ত্রীলোকের সঙ্গে বাস করে, কিন্তু সেটা এমনভাবে যে পুরুষের পক্ষে বহুপত্নীত্ব এবং কখন সখন বিশ্বাসভঙ্গের অধিকার থাকে, যদিও অবশ্য অর্থনৈতিক কারণের জন্য বহুপত্নীত্ব কদাচিৎ আচরিত হয়; সেই সঙ্গে স্ত্রীলোকের তরফ থেকে একত্র বসবাসের সময় কড়াকড়িভাবে পাতিব্রত্য দাবি করা হয় এবং তার তরফে ব্যভিচার হলে কঠোর শাস্তি দেওয়া হয়। এই বিবাহের সম্পর্ক অবশ্য যে কোনো পক্ষ থেকেই

সহজেই ভেঙে দেওয়া যায় এবং সন্তানসন্ততিরা আগের মতো কেবল মায়েরই অধিকারভুক্ত।

এইভাবে রক্তসম্পর্কযুক্ত আত্মীয়দের মধ্যে ক্রমাগত বেশি করে বিবাহ নিষিদ্ধ হওয়ার মধ্যে প্রাকৃতিক নির্বাচনের ক্রিয়া চলতে থাকে। মর্গানের কথায়, 'রক্তসম্পর্কশূন্য গোত্রের মধ্যে বিবাহে শারীরিক ও মানসিক দিক দিয়ে একটি অধিকতর শক্তিশালী জাত সৃষ্টি হয়। যখন দুটি উন্নতিশীল উপজাতি একত্রে মিলে গিয়ে একটি জাতি হয় — তখন উভয় উপজাতির নৈপুণ্যের যোগফল অনুযায়ী বেড়ে উঠবে নতুন পুরুষদের খুলি ও মস্তিষ্ক।' গোত্রভিত্তিক উপজাতিগুলি সেইজন্য পশ্চাৎপদ উপজাতিদের হারিয়ে দিতে অথবা নিজেদের দৃষ্টান্তের জোরে স্বপথে চালাতে বাধ্য।

এইভাবে, স্ত্রীপুরুষের বৈবাহিক সম্পর্ক চলবার যে পরিধিটা একসময় সমস্ত উপজাতি জুড়ে ছিল, তাকে ক্রমেই সংকীর্ণ করে আনার মধ্যেই রয়েছে প্রাগৈতিহাসিক যুগে পরিবারের বিবর্তন। একের পর এক বাদ পড়তে থাকে, প্রথমে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়, পরে আরও দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়েরা, এবং শেষ পর্যন্ত বিবাহসূত্রের কুটুম্বরা পর্যন্ত; অবশেষে কার্যক্ষেত্রে যেকোনো ধরনের সমষ্টি-বিবাহ অসম্ভব হয়ে পড়ে; এবং সবশেষে বাকি রইল কেবলমাত্র একটি, তখনো শিথিলভাবে মিলিত যুগল, সেই অণু যা ভেঙে গেলেই বিবাহই আর থাকে না। শুধু এই ঘটনা দিয়েই প্রমাণ হয় যে একপতিপত্নী প্রথার উৎপত্তির পিছনে আধুনিক যুগের অর্থে ব্যক্তিগত যৌন প্রেম কত সামান্য ছিল। এই স্তরে অবস্থিত সব জাতির মানুষের বাস্তব আচরণ এর পক্ষে আরও প্রমাণ দেয়। পরিবারের পূর্ববর্তী রূপগুলির আমলে পুরুষের জন্য স্ত্রীলোকের কখনও অভাব হত না, বরং ঠিক উল্টো অর্থাৎ প্রয়োজনের অতিরিক্ত স্ত্রীলোক ছিল, কিন্তু এখন স্ত্রীলোক হয়ে পড়ল দুর্লভ, তাদের খুঁজে পেতে হত। এর ফলে জোড়বাঁধা বিবাহের উৎপত্তির সঙ্গেই স্ত্রীহরণ ও স্ত্রীলোক ক্রয় শুরু হয়। এটি ছিল গভীরতর যে পরিবর্তন ঘটে গেছে তার ব্যাপক **লক্ষণ**, কিন্তু তার বেশি কিছু নয়। এগুলি লক্ষণ, নারী সংগ্রহের নিতান্ত পদ্ধতি হলেও পাণ্ডিত্যবাগীশ স্কচ্ ম্যাক-লেনান সেগুলিকে পরিবারের বিশেষ বিশেষ ধরনে রূপান্তরিত করে নাম দিলেন 'হরণপূর্বক বিবাহ' এবং 'ক্রয়পূর্বক বিবাহ'। উপরন্তু আমেরিকার ইন্ডিয়ানদের মধ্যে এবং (ঐ একই স্তরে অবস্থিত) অন্যান্য উপজাতিদের মধ্যে বিবাহ ঘটাবার দায়িত্ব পাত্রপাত্রীর নয়, বস্তুত, অনেক সময় এদের কোন মতামতই নেওয়া হয় না, এটি হচ্ছে উভয়ের মায়েদের ব্যাপার। এইভাবে প্রায় সম্পূর্ণ অপরিচিত দুটি নরনারীর মধ্যে বাগ্‌দান হয় এবং বিবাহের দিন কাছে আসবার সময়ই কেবল তারা এই চুক্তির কথা জানতে পারে। বিবাহের আগে পাত্রীর গোত্র-আত্মীয়দের জন্য (অর্থাৎ পাত্রীর মায়ের দিকের আত্মীয়দের, বাপের বা তার দিকের আত্মীয়দের নয়) পাত্রকে উপহার দিতে হয়, এই উপহারগুলি হল দত্তা কন্যার

ক্রয়পণস্বরূপ। এই বিবাহ পাত্রপাত্রী উভয়ের যে কোনো একজনের ইচ্ছামতো ভেঙে দেওয়া যায়। তথাপি বহু উপজাতির মধ্যে, দৃষ্টান্তস্বরূপ, ইরকোয়াসদের মধ্যে ক্রমে ক্রমে এইরূপ বিচ্ছেদের বিরুদ্ধে জনমত বেড়ে ওঠে। পতিপত্নীর মধ্যে কোনো বিরোধ হলে উভয় তরফের গোত্র-আত্মীয়রা হস্তক্ষেপ করে মিটমাটের চেষ্টা করে এবং সেই চেষ্টা একেবারে ব্যর্থ হলেই বিচ্ছেদ হয়; সন্তানসন্ততিরা মায়ের সঙ্গে থাকে এবং উভয়েরই আবার বিবাহ করবার অধিকার থাকে।

জোড়বাঁধা পরিবার এত দুর্বল ও অস্থায়ী ছিল যে, এর জন্য স্বতন্ত্র গৃহস্থালী প্রয়োজনীয় অথবা বাঞ্ছনীয় হত না এবং এর ফলে আগের কাল থেকে পাওয়া সাম্যতন্ত্রী গৃহস্থালী ভেঙে যায়নি। কিন্তু সাম্যতন্ত্রী গৃহস্থালীর অর্থ গৃহে মেয়েদের আধিপত্য, ঠিক যেমন জন্মদাতা পিতাকে নিশ্চিতভাবে জানা অসম্ভব থাকায় গর্ভধারিণী মাকেই একমাত্র স্বীকৃতিদানের অর্থ মেয়েদের অর্থাৎ মায়েদের উচ্চ মর্যাদা। সমাজের সূচনায় নারীরা নাকি পুরুষের দাসী ছিল, এটি হচ্ছে আঠার শতকের আলোকোদয়ের যুগ (Enlightenment) থেকে পাওয়া অতি আজগুবি একটি ধারণা। সমস্ত বন্যদের মধ্যে এবং নিম্নতন ও মধ্যবর্তী অবস্থার এবং অংশত উচ্চতন স্তরের বর্বরদের মধ্যেও স্ত্রীলোক শুধু স্বাধীনই ছিল না, পরন্তু তার অত্যন্ত সম্মানের আসন ছিল। সেনেকা উপজাতির ইরকোয়াসদের মধ্যে যিনি বহু বৎসর যাবৎ মিশনারি ছিলেন সেই আর্থার রাইট তখনও পর্যন্ত জোড়বাঁধা পরিবারের স্ত্রীলোকের আসন সম্বন্ধে যে সাক্ষ্য দিয়েছেন তা শোনা যাক: 'তাদের পারিবারিক ব্যবস্থার কথা বলতে গেলে, যখন এই পরিবারগুলি পুরনো লম্বা বাড়িতে (সাম্যতন্ত্রী গৃহস্থালীগুলিতে অনেকগুলি করে পরিবার থাকত) বসবাস করত... তখন সর্বদাই কোনো একটি কুল (গোত্র) সেখানে আধিপত্য করত, মেয়েরা অন্যান্য কুল (গোত্র) হতে স্বামী গ্রহণ করত... সচরাচর মেয়েরাই বাড়ির মধ্যে আধিপত্য করত; বাড়ির ভাণ্ডার ছিল সাধারণের সম্পত্তি; কিন্তু যে হতভাগ্য স্বামী অথবা প্রেমিক রসদ জোগানের ব্যাপারে নিজের কাজটুকু করতে খুবই অকর্মণ্য বা অলস হত তার কপাল খারাপ। বাড়িতে তার সন্তানসন্ততির সংখ্যা অথবা জিনিসপত্র যতই থাক না কেন যে-কোন সময় তাকে তল্পি গুটিয়ে চলে যাবার হুকুম দেওয়া যেত; এবং এই ধরনের আদেশ পাওয়ার পর অমান্য করার চেষ্টা তার পক্ষে শুভ হত না; এই বাড়ি তার পক্ষে অসহনীয় করে তোলা হত, এবং তাকে নিজের কুলে (গোত্র) ফিরে যেতে হত অথবা — প্রায়ই যা ঘটত — অপর একটি কুলে গিয়ে নতুন বিবাহ-সম্পর্ক পাততে হত। কুলের (গোত্র) মধ্যে, তথা অন্য সর্বত্রই মেয়েদেরই প্রবল ক্ষমতা। যখন দরকার পড়ত তখন তারা সর্দারের মাথা থেকে, তাদের ভাষায়, শিঙ ভেঙে দিয়ে সাধারণ যোদ্ধাদের সারিতে নামিয়ে দিতে ইতস্তত করত না।' সাম্যতন্ত্রী যে গৃহস্থালীতে সমস্ত মেয়েরা অথবা বেশীর ভাগ মেয়েরাই একই গোত্রের লোক, আর পুরুষেরা আসছে

অন্যান্য সব গোত্র থেকে, সেই হচ্ছে আদিম যুগে সাধারণত প্রচলিত নারী আধিপত্যের বাস্তব ভিত্তি; এবং এইটির আবিষ্কার হচ্ছে বাখোফেনের তৃতীয় মহৎ অবদান। অধিকন্তু এই সঙ্গে আরো যোগ করতে পারি যে, পর্যটক ও মিশনারিদের বিবরণে বন্য ও বর্বরদের মধ্যে মেয়েদের উপর অত্যধিক পরিশ্রমের বোঝার যে কথা আছে তার সঙ্গে উপরের বক্তব্যের কোন বিরোধ নেই। স্ত্রীপুরুষের মধ্যে শ্রম-বিভাগ যে কারণগুলি দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়, আর সমাজে স্ত্রীলোকের স্থান নির্ধারিত হয় যে কারণে তা একেবারেই আলাদা। যেসব জাতির স্ত্রীলোকেরা আমাদের বিবেচনায় ন্যায্যের চেয়ে অনেক বেশী খাটে, তারা যে প্রকৃত শ্রদ্ধা পায় সেটা ইউরোপীয়েরা মেয়েদের যে মর্যাদা দেয়, তার চেয়ে অনেক বেশী। সভ্যতার যে মহিলা কৃত্রিম মর্যাদার দ্বারা পরিবেষ্টিত ও সমস্ত বাস্তব কর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন, তার সামাজিক অবস্থান বর্বর-যুগের কঠোর পরিশ্রমী নারীর চেয়ে ঢের নীচে, — স্বজাতির মধ্যে বর্বর-যুগের সে নারী গণ্য হত সত্যকার মহিলা (lady, frowa, Frau —কর্ত্রী) হিসাবে এবং সেটা হত তার সামাজিক প্রতিষ্ঠার প্রকৃতিবশেই।

জোড়বাঁধা পরিবার বর্তমান সময়ে আমেরিকায় সমষ্টি-বিবাহকে সম্পূর্ণভাবে স্থানচ্যুত করেছে কি না জানতে হলে উত্তর-পশ্চিমের এবং বিশেষ করে দক্ষিণ আমেরিকার যে জাতিগুলি এখনো বন্য অবস্থার উচ্চতন স্তরে আছে তাদের মধ্যে ভালোভাবে অনুসন্ধান করতে হবে। এই শেষোক্তদের মধ্যে যৌন স্বাধীনতার এত সব দৃষ্টান্তের বিবরণ পাওয়া যায় যাতে মোটেই মনে করা চলে না যে, পুরনো সমষ্টি-বিবাহ পুরোপুরি দমিত হয়েছে। অন্ততপক্ষে এর সমস্ত চিহ্ন আজও পর্যন্ত লোপ হয়নি। উত্তর আমেরিকার কমপক্ষে চল্লিশটি উপজাতির মধ্যে কোনো পুরুষ একটি পরিবারের বড় মেয়েকে বিয়ে করলে তার বাকি বোনেরাও প্রাপ্তবয়স্কা হলে তার স্ত্রীরূপে গণ্য — এটা হচ্ছে একদল ভগিনীদের আগেকার যৌথ পতি-প্রথার জের। এবং বানক্রফ্‌ট বলেছেন যে, বন্য অবস্থার উচ্চতন স্তরে অবস্থিত কালিফোর্নিয়া উপদ্বীপের উপজাতিদের কয়েকটি উৎসব আছে, তখন অনেকগুলি উপজাতি একত্র হয় নির্বিচার যৌন সম্পর্কের উদ্দেশ্যে। স্পষ্টত বুঝা যায় যে, এগুলি হচ্ছে বিভিন্ন গোত্র এবং ঐ উৎসবগুলি এদের কাছে সেই অতীত দিনের অস্পষ্ট স্মৃতি যখন একটি গোত্রের সমস্ত স্ত্রীলোক আর একটি গোত্রের সমস্ত পুরুষকে স্বামী হিসাবে গ্রহণ করত এবং সে গোত্রের পুরুষেরা আবার অন্য গোত্রের সমস্ত নারীদের স্ত্রী হিসাবে ধরত। তেমন প্রথা আজও পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়ায় প্রচলিত। কয়েকটি জাতির মধ্যে দেখা যায় যে, বয়ঃবৃদ্ধ পুরুষেরা, দলপতি ও যাদুকর-পুরোহিতেরা নিজেদের স্বার্থে সাধারণ স্ত্রী-প্রথার সুযোগ নেয় এবং বেশির ভাগ স্ত্রীলোককে নিজেদের একচেটিয়া হিসাবে রাখে; কিন্তু তারাও কোনো কোনো উৎসব এবং বৃহৎ জনজমায়েতের সময় পুরাতন সমষ্টিগত সঙ্গম অনুমোদন করতে বাধ্য

হয় এবং বয়ঃকনিষ্ঠ পুরুষ নিয়ে সম্ভোগের জন্য নিজেদের স্ত্রীদের ছেড়ে দেয়। ভেস্তেমার্ক (পৃঃ ২৮—২৯) এই ধরনের মধ্যে মধ্যে ঘটা স্যাটার্ন উৎসবের* ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, যখন স্বল্পকালের জন্য সাবেকী অবাধ যৌন সঙ্গম বলবৎ হয়, যেমন ভারতবর্ষে হো, সাঁওতাল, পাঞ্জা ও কোটারদের মধ্যে এবং আফ্রিকার কিছু উপজাতির মধ্যে ইত্যাদি। কিন্তু অদ্ভুত লাগে যখন এইসব দেখে ভেস্তেমার্ক সিদ্ধান্ত করেন যে, এইগুলি যা তিনি মানেন না সেই সমষ্টি-বিবাহের লুপ্তাবশেষ নয়, পরন্তু এইগুলি হচ্ছে পশু ও আদিম মানুষের মধ্যে সমভাবে প্রচলিত সঙ্গম-ঋতুর জের।

এইবার আমরা বাখোফেনের চতুর্থ মহৎ আবিষ্কারে পোঁছাই, সমষ্টি-বিবাহ থেকে জোড়বাঁধা পরিবারে উৎক্রমণের বহু প্রচলিত রূপ আবিষ্কারে। বাখোফেন যে জিনিসটিকে দেবতাদের সনাতন নির্দেশ লংঘন করার প্রায়শ্চিত্ত বলে বর্ণনা করেছেন, যে প্রায়শ্চিত্ত করে নারী পাতিব্রত্যের অধিকার ক্রয় করে, এটি বস্তুত আদিম সমাজের বহুস্বামী প্রথা থেকে মুক্ত হয়ে **একটি** পুরুষের স্ত্রী হওয়ার অধিকার অর্জনের যে প্রায়শ্চিত্ত তার একটি রহস্যাবৃত প্রকাশ ছাড়া আর কিছুই নয়। এই প্রায়শ্চিত্ত নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আত্মদানের রূপ নেয়: ব্যাবিলোনীয় মেয়েদের মিলিট্টার মন্দিরে বৎসরে একদিন করে আত্মদান করতে হত; মধ্য প্রাচ্যের অন্যান্য উপজাতিরা তাদের মেয়েদের কয়েক বছরের জন্য আনাইটিসের মন্দিরে পাঠাত, সেখানে নিজেদের বাছাই করা পুরুষদের সঙ্গে স্বাধীন ভালবাসা অভ্যাস করার পর তারা বিবাহের অনুমতি পেত। ভূমধ্যসাগর থেকে গঙ্গার উপকূল পর্যন্ত এশিয়ার প্রায় সমস্ত জাতির মধ্যে ধর্মের আবরণে এইধরনের প্রথা দেখা যায়। যত দিন যায় মুক্তির জন্য প্রায়শ্চিত্তমূলক আত্মত্যাগ তত হালকা হয়ে আসে, বাখোফেনও সেটা লিখেছেন: 'বৎসরে একবার করে আত্মদানের বদলে মাত্র একবার আত্মদান চালু হয়; বিবাহিতা স্ত্রীলোকের হেটায়ারিজমের জায়গায় দেখা দেয় কুমারীদের হেটায়ারিজম, বিবাহিত অবস্থায় তার আচরণের বদলে বিবাহের পূর্বে আচরণ, সকলের কাছে নির্বিচারে আত্মদানের বদলে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির কাছে আত্মদান' (মাতৃ-অধিকার**, পৃঃ ১৯)। অন্যান্য কিছু জাতিদের মধ্যে আবার ধর্মের এ আবরণ নেই; কোনো কোনো জাতির মধ্যে যেমন পুরাকালের থ্রেশিয়ান, কেল্টিক প্রভৃতি, ভারতবর্ষের বহু আদিম অধিবাসী, মালয়ের

* স্যাটার্ন উৎসব — স্যাটার্ন দেবতার সম্মানে প্রাচীন রোমের বার্ষিক উৎসব, অনুষ্ঠিত হত কৃষিকাজ শেষ হবার উপলক্ষে, বছরের বড়ো দিনে। এ উৎসবের সময় গণ ভোজ ও মাতলামি চলত। দাসেরাও এতে অংশ নিত এবং স্বাধীন প্রজাদের সঙ্গে এক টেবিলে বসতে পেত। স্যাটার্ন উৎসবের সময় অবাধ যৌন সঙ্গমের রেওয়াজ ছিল। এই থেকে 'স্যাটার্ন উৎসব' অর্থে উদ্দাম উপভোগের খানাপিনাকে বোঝায়। — সম্পাঃ

** J. J. Bachofen, *Das Mutterrecht*, Stuttgart, 1861. — সম্পাঃ

উপজাতিগুলি, প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসী এবং আমেরিকার অনেক ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে আজ পর্যন্ত বিবাহের আগে মেয়েদের প্রচুর যৌন স্বাধীনতা থাকে। দক্ষিণ আমেরিকাতেও সর্বত্র এই জিনিস দেখা যায়। যে-কোনো ব্যক্তি যিনি ঐ দেশের কিছুটা ভিতরে গিয়েছেন তিনি একথার সত্যতা মানবেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আগাসিজ্ (বস্টন ও নিউ ইয়র্ক থেকে ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত 'ব্রাজিল ভ্রমণ'* পুস্তকের ২৬৬ পৃঃ) ইণ্ডিয়ান বংশ থেকে উদ্ভূত একটি ধনী পরিবার সম্পর্কে নিম্নলিখিত বিবরণ দেন। যখন তাঁকে পরিবারের মেয়েটির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেওয়া হল এবং তিনি এর পিতার কথা জিজ্ঞাসা করলেন — তিনি মনে করেছিলেন যে, প্যারাগুয়ের বিরুদ্ধে সক্রিয় সংগ্রামে নিযুক্ত একজন অফিসার, ঐ বালিকার মায়ের স্বামীই হচ্ছে তার পিতা, — তখন মা হেসে উত্তর দিলেন: 'naõ tem pai, é filha da fortuna' — তার কোন বাপ নেই, সে দৈবাৎ হয়েছে। 'এইভাবেই ইণ্ডিয়ান অথবা অর্ধমিশ্র স্ত্রীলোকেরা এদেশে তাদের অবৈধ সন্তানদের পরিচয় দেয়, এতে কোনো অন্যায় বা লজ্জার কিছু আছে বলে তারা মনে করে না। এটি মোটেই একটি অস্বাভাবিক ঘটনা নয়; পরন্তু উল্টোটাই ব্যতিক্রম বলে মনে হয়। শিশুরা ... প্রায়ই কেবল তাদের মাকে জানে, কারণ সমস্ত যত্ন ও দায়িত্ব মাকেই পালন করতে হয়; তাদের বাপ সম্পর্কে তারা কিছুই জানে না আর মাতা বা তার সন্তানেদের কারও মনে হয় না যে, বাপের উপর তাদের কোনো দাবি-দাওয়া আছে।' সভ্য মানুষের কাছে যা নিতান্ত অদ্ভুত মনে হয়, মাতৃ-অধিকার ও সমষ্টি-বিবাহ অনুসারে সেইটেই রীতি।

কোনো কোনো জাতির মধ্যে আবার বরের বন্ধু ও আত্মীয়েরা অথবা বরযাত্রীরা বিবাহের সময়ই কন্যার উপর তাদের চিরাচরিত অধিকার খাটায় এবং সবশেষে পাত্রের পালা আসে; উদাহরণস্বরূপ, পুরাকালে বেলিয়ারিক দ্বীপপুঞ্জে এবং আফ্রিকার অগিলাদের মধ্যে এবং আজও পর্যন্ত আবিসিনিয়ার বারিয়াদের মধ্যে এটি দেখা যায়। অন্য কোনো কোনো জাতির মধ্যে আবার একজন কর্তৃপক্ষীয় ব্যক্তি — উপজাতি অথবা গোত্রের দলপতি, কাসিক, শামান, পুরোহিত, প্রিন্স অথবা যে উপাধিই হোক না কেন — ইনিই সমস্ত সমাজের প্রতিনিধিত্ব করেন এবং কন্যার সঙ্গে প্রথম রাত্রি যাপনের অধিকার ভোগ করেন। নব্য রোম্যাণ্টিক চিন্তাধারার হাজারও চুণকাম সত্ত্বেও এই 'প্রথম রাত্রির অধিকার' (jus primae noctis) আজও পর্যন্ত আলাস্কার বেশীর ভাগ বাসিন্দাদের মধ্যে (বানক্রফ্ট রচিত 'আদিম জাতিগুলি', ১ম খণ্ড, পৃঃ ৮১), উত্তর মেক্সিকোর তাহুদের মধ্যে (ঐ পুস্তক, পৃঃ ৫৮৪) এবং অন্য জাতিদের মধ্যে সমষ্টি-বিবাহের লুপ্তাবশেষ হিসাবে রয়েছে; এবং এই প্রথা গোটা মধ্যযুগে অন্ততপক্ষে মূল কেল্টিক দেশগুলিতে ছিল, যেখানে এটি সরাসরি সমষ্টি-বিবাহ থেকে এসেছিল; যেমন

* L. Agassiz, *A Journey in Brasil.* Boston, 1886. — সম্পাঃ

আরাগনে। ক্যাস্টিলের কৃষক কোনোদিনই ভূমিদাস ছিল না, আরাগনে কিন্তু ক্যাথলিক ফার্ডিন্যান্ড ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে এই প্রথা রদ করার আগে পর্যন্ত অত্যন্ত জঘন্য ভূমিদাসপ্রথা প্রচলিত ছিল। সরকারী আইনটিতে বলা হয়েছে: 'আমরা এই সাব্যস্ত ও ঘোষণা করছি যে, উল্লিখিত ভূস্বামীরা (সেনিওর, ব্যারন)... আর কৃষকদের বিবাহিত বধূদের সঙ্গে প্রথম রাত্রি যাপন করতেও পারবে না, অথবা বিবাহের রাত্রে পাত্রী বিছানায় শোবার পরে নিজের কর্তৃত্বের চিহ্নস্বরূপ বিছানা ও পাত্রীকে মাড়িয়ে যেতে পারবে না; অথবা উপরোক্ত ভূস্বামীরা কৃষকের সন্তানসন্ততিদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিনামূল্যে অথবা মূল্যে দিয়ে তাদের সেবা গ্রহণ করতে পারবে না।' (ক্যাটালনীয় ভাষায় লেখা থেকে উদ্ধৃত, জুগেনহাইমের 'ভূমিদাসপ্রথা', পিটার্সবুর্গ, ১৮৬১,* পৃঃ ৩৫।)

বাখোফেন যেখানে জোর করে বলেছেন যে তাঁর কথিত 'হেটায়ারিজম' অথবা Sumpfzeugung থেকে একপতিপত্নী প্রথা মূলত স্ত্রীলোকদের চেষ্টাতেই এসেছিল, সেখানেও তিনি সম্পূর্ণ নির্ভুল। জীবনযাত্রার অর্থনৈতিক অবস্থার বিকাশের ফলে অর্থাৎ আদিম সাম্যতন্ত্রী ব্যবস্থার অবনতি ও জনসংখ্যার ঘনবসতির সঙ্গে সঙ্গে পুরাকাল থেকে প্রাপ্ত যৌন সম্পর্কগুলি যতই তার আদিম আরণ্যক চরিত্র হারিয়ে ফেলতে থাকল মেয়েদের কাছে ততই তা অধিকতর পরিমাণে হীন ও পীড়নমূলক প্রতিভাত হবার কথা; ততই আগ্রহের সঙ্গে পরিত্রাণ হিসাবে তারা অবশ্য পাতিব্রত্যের অধিকার, একটি পুরুষের সঙ্গে অস্থায়ী অথবা স্থায়ী বিবাহ চেয়ে থাকবে। এই অগ্রগতি পুরুষের কাছ থেকে আসতে পারে না, অন্ততঃ এই কারণে যে, তারা আজও পর্যন্ত স্বপ্নেও কখনও আসল সমষ্টি-বিবাহের সুবিধা ছাড়তে চায়নি। যখন মেয়েদের চেষ্টার ফলে জোড়বাঁধা পরিবার দেখা দিল তখনই কেবল পুরুষেরা কড়াকড়িভাবে একপতিপত্নী প্রথা প্রচলন করতে পারল — অবশ্য কেবল স্ত্রীলোকদের পক্ষে প্রযোজ্য হিসাবেই।

বন্যাবস্থা ও বর্বরতার সীমারেখায় জোড়বাঁধা পরিবার দেখা দেয়; প্রধানত, বন্যাবস্থার উচ্চতন পর্যায়ে এবং কোথাও কোথাও বর্বরতার নিম্নতন স্তরে। পরিবারের এই রূপটিই বর্বর-যুগের বৈশিষ্ট্য, ঠিক যেমন সমষ্টি-বিবাহ হচ্ছে বন্যাবস্থার বৈশিষ্ট্য এবং একপতিপত্নী প্রথা সভ্যতার। এই জোড়বাঁধা পরিবার থেকে স্থায়ী একপতিপত্নী প্রথায় পরিণতির জন্য ইতিপূর্বে যে সব কারণগুলি সক্রিয় ছিল তাছাড়াও পৃথক কারণের প্রয়োজন। জোড়বাঁধা পরিবারের ক্ষেত্রে সমষ্টি কমে এসেছে একেবারে তার শেষ এককে, তার দুই পরমাণুসমন্বিত এক অণুতে — একটি পুরুষ ও একটি নারীতে।

* S. Sugenheim, *Geschichte der Aufhebung der Leibeigenschaft und Hörigkeit in Europa bis an die Mitte des neunzehnten Jahrunderts.* (উনিশ শতকের মধ্যভাগ অবধি ইউরোপে ভূমিদাসপ্রথা ও বেগারির অবসানের ইতিহাস), St. Petersburg, 1861. — সম্পাঃ

ক্রমাগত সমষ্টি-বিবাহের পরিধি কমিয়ে কমিয়ে প্রাকৃতিক নির্বাচন তার কর্তব্য সমাপ্ত করেছে; এইদিক দিয়ে তার আর করবার কিছু ছিল না। তাই যদি কোন নতুন সামাজিক চালিকা শক্তিগুলি সক্রিয় না হত তাহলে জোড়বাঁধা পরিবার থেকে নতুনতর এক পরিবার উদ্ভবের কোনো কারণ থাকত না। কিন্তু এই চালিকা শক্তিগুলি সক্রিয় হয়ে উঠল।

আমাদের জোড়বাঁধা পরিবারের চিরায়ত জন্মভূমি আমেরিকা এবার থাক। এমন কোনো সাক্ষ্য মেলে না যার থেকে আমরা বলতে পারি যে, এখানে পরিবারের আরও উচ্চতর রূপ বিকশিত হয়েছিল অথবা এই মহাদেশ আবিষ্কার ও বিজয়ের আগে এখানকার কোনোখানে কোন সময়ে কড়াকড়ি একপতিপত্নী প্রথার চলন ছিল। প্রাচীন গোলার্ধে কিন্তু ব্যাপার অন্যরূপ।

এখানে পশুকে গৃহপালিত করে এবং পশুযূথের বংশবৃদ্ধি ঘটিয়ে ইতিপূর্বে অপ্রত্যাশিত সম্পদ দেখা দিল এবং সম্পূর্ণ নতুন ধরনের সামাজিক সম্পর্ক গড়ে উঠল। বর্বরতার নিম্নতন স্তর পর্যন্ত স্থায়ী সম্পদ বলতে ছিল প্রায় একমাত্র ঘরবাড়ি, পরিধেয়, স্থূল অলংকার এবং খাদ্য সংগ্রহ ও প্রস্তুত করবার হাতিয়ার: নৌকা, অস্ত্রশস্ত্র এবং সরলতম গার্হস্থ্য তৈজসপত্র। প্রত্যহ নতুন করে খাদ্য সংগ্রহ করতে হত। আর এখন ঘোড়া, উট, গাধা, গোরু, ভেড়া, ছাগল ও শূকরের দল নিয়ে অগ্রগামী পশুপালক জাতিগুলি — ভারতবর্ষের পঞ্চনদ ও গঙ্গার এলাকা, তথা অক্সাস ও জাক্সার্তেসের তখনকার আমলের অতি সমৃদ্ধ রূপে জল সিঞ্চিত স্তেপভূমির আর্যগণ এবং তাইগ্রীস ও ইউফ্রেটিস নদীর তীরবর্তী সেমিটিক জাতিগুলি যে সম্পদ অর্জন করেছিল তার শুধু তদারকি ও নিতান্ত প্রাথমিক যত্ন করলেই ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় প্রজনন ও দুধ ও মাংসের সমৃদ্ধতম খাদ্য সম্ভব হত। খাদ্যসংগ্রহের আগেকার সমস্ত পদ্ধতি পেছনে পড়ে গেল। বন্য পশু শিকার আগে ছিল প্রয়োজন, এখন হয়ে উঠল একটি বিলাস।

কিন্তু এই নতুন সম্পদ কাদের অধিকারে ছিল? নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, শুরুতে গোত্রের অধিকারে ছিল। কিন্তু খুব গোড়ার দিকেই পশুযূথের উপর ব্যক্তিগত মালিকানা নিশ্চয় দেখা দিয়ে থাকবে। একথা বলা খুবই শক্ত যে, মোজেসের তথাকথিত প্রথম পুস্তকের রচয়িতার কাছে পিতা এব্রাহাম পশুযূথের মালিক হিসাবে যে প্রতীয়মান হয়েছিলেন সেটা একটা পারিবারিক গোষ্ঠীর কর্তা হিসাবে স্বীয় অধিকার বলে, নাকি বস্তুত একটি গোত্রের বংশপরম্পরাগত দলপতির পদমর্যাদা বলে। একটা জিনিস কিন্তু নিঃসন্দেহ এবং সেটি হচ্ছে এই যে, আধুনিক অর্থে তাঁকে সম্পত্তির মালিক মনে করলে চলবে না। একথাও সমভাবে নিশ্চিত যে, প্রামাণ্য ইতিহাসের সূচনাতেই আমরা সর্বত্র দেখতে পাই যে, পশুযূথগুলি ইতিমধ্যেই পরিবারের কর্তাদের পৃথক সম্পত্তি হয়ে গিয়েছে, ঠিক যেভাবে বর্বর-যুগের শিল্পসামগ্রীগুলি, ধাতুনির্মিত তৈজসপত্র,

বিলাসদ্রব্য এবং সর্বশেষে মানবিক পশুদল অর্থাৎ ক্রীতদাসেরাও সম্পত্তি হয়ে গিয়েছিল।

কারণ এই সময় দাসপ্রথারও আবিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। বর্বরতার নিম্নতন স্তরে ক্রীতদাস কোনো কাজের নয়। এইজন্যই বিকাশের উচ্চতন পর্যায়ে পরাজিত শত্রুর প্রতি যে আচরণ করা হত আমেরিকার ইণ্ডিয়ানরা তা থেকে ভিন্নতর আচরণ করত। পুরুষ হলে হয় তাদের হত্যা করা হত অথবা বিজয়ী উপজাতিতে ভাই বলে গ্রহণ করা হত। মেয়েদের হয় বিবাহ করা হত অথবা অন্য কোনোভাবে তাদের বেঁচে যাওয়া সন্তানসন্ততিদের সহ নিজের উপজাতিতে গ্রহণ করা হত। এই স্তরে মানুষের শ্রমশক্তি থেকে তার ভরণপোষণের চেয়ে উল্লেখযোগ্য উদ্বৃত্তি কিছু হত না। পশুপালন, ধাতুকর্ম, বয়নশিল্প এবং সর্বশেষে ক্ষেত্রকর্ষণ প্রবর্তনের সঙ্গে এই অবস্থা বদলে গেল। যেমন এতদিন পর্যন্ত অতি সুলভ স্ত্রীদের এখন একটি বিনিময় মূল্য হল এবং তাদের ক্রয় করা হতে থাকল, তেমনই ঘটল শ্রমশক্তির ক্ষেত্রেও, বিশেষতঃ পশুযূথগুলি শেষপর্যন্ত পরিবারের সম্পত্তি হয়ে যাবার পরে। গবাদি পশুর মতো অত তাড়াতাড়ি পরিবার বাড়েনি। পশুপালনের জন্য বেশী লোকের দরকার হত; যুদ্ধবন্দীরা ঠিক এই উদ্দেশ্যেই কাজে লাগত এবং উপরন্তু ঠিক পশুদের মতোই এদেরও বংশবৃদ্ধি হতে পারত।

এই ধরনের সম্পদ একবার পরিবারগুলির মালিকানায় যাবার পর এবং সেখানে এর দ্রুত বৃদ্ধির ফলে জোড়বাঁধা পরিবার ও মাতৃ-অধিকার-ভিত্তিক গোত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজব্যবস্থার উপর দারুণ আঘাত এল। জোড়বাঁধা বিবাহ পরিবারের মধ্যে একটি নতুন উপাদান এনেছিল। এই ব্যবস্থায় গর্ভধারিণী মায়ের পাশে জন্মদাতা প্রামাণ্য পিতাকেও পাওয়া যেত, যিনি আধুনিক যুগের অনেক 'পিতার' চেয়ে সম্ভবত বেশী প্রামাণ্য ছিলেন। তখনকার দিনে পরিবারের মধ্যে প্রচলিত শ্রমবিভাগের ধারা অনুযায়ী খাদ্যসংগ্রহ এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণের ভার এবং সেইহেতু হাতিয়ারগুলির মালিকানাও ছিল পুরুষদের; বিবাহবিচ্ছেদ হলে পুরুষেরা এগুলি নিয়ে যেত ঠিক যেমন স্ত্রীলোকরা রেখে দিত গৃহস্থালীর সমস্ত জিনিসপত্র। তখনকার সমাজব্যবস্থার রীতি অনুযায়ী পুরুষ ছিল খাদ্য দ্রব্যাদির নতুন সূত্রগুলিরও মালিক অর্থাৎ গবাদিপশুর ও পরে পরিশ্রমের নতুন হাতিয়াররূপে ক্রীতদাসদেরও মালিক। কিন্তু ঐ সমাজেরই রীতি অনুযায়ী পুরুষের সন্তানসন্ততিরা উত্তরাধিকার সূত্রে বাপের সম্পত্তি পেত না, কারণ এ ব্যাপারে অবস্থাটা ছিল এই রকম।

মাতৃ-অধিকার অনুযায়ী, অর্থাৎ যতদিন মায়ের দিক দিয়ে বংশপরম্পরা ধরা হত, এবং গোত্রের আদি উত্তরাধিকারপ্রথা অনুযায়ী গোত্রের কেউ মারা গেলে তার সম্পত্তি পেত গোত্রভুক্ত আত্মীয়রা। সম্পত্তিকে গোত্রের মধ্যেই থাকতে হত। প্রথম দিকে, আলোচ্য

সম্পত্তি যেহেতু খুবই অকিঞ্চিৎকর, তাই তা সম্ভবত গোত্রের নিকটতম আত্মীয়দের দখলে যেত — অর্থাৎ মায়ের দিক দিয়ে রক্তসম্পর্কযুক্ত আত্মীয়। মৃত পুরুষের সন্তানসন্ততিরা কিন্তু তার নিজের গোত্রের লোক নয়, তারা মায়ের গোত্রের লোক। গোড়ার দিকে তারা মায়ের সম্পত্তি মায়ের রক্তসম্পর্কের বাকি আত্মীয়দের সঙ্গে একত্রে উত্তরাধিকারে পেত, এবং হয়ত পরে মায়ের সম্পত্তির ওপর ছেলেমেয়েদেরই হল প্রথম দাবি; কিন্তু তারা তাদের বাপের সম্পত্তি পেত না, কারণ তারা বাপের গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল না, অথচ সে সম্পত্তি সে গোত্রের মধ্যেই থাকবে। অতএব পশুযূথের মালিকের মৃত্যুতে পশুযূথের মালিকানা গিয়ে পড়ত প্রথমত তার ভাইবোন ও বোনের ছেলেমেয়েদের দখলে, অথবা তার মায়ের বোনেদের ছেলেমেয়েদের কাছে। তার নিজের ছেলেমেয়েরা কিন্তু উত্তরাধিকারে বঞ্চিত হত।

অর্থাৎ যেমন সম্পদ বাড়তে থাকল তাতে একদিকে পরিবারের মধ্যে স্ত্রীলোকের চেয়ে পুরুষের প্রতিষ্ঠা বেশী গুরুত্বপূর্ণ হতে থাকল এবং অপরদিকে তার নিজের শক্তিশালী সামাজিক অবস্থার জোরে নিজের সন্তানসন্ততির স্বপক্ষে প্রচলিত উত্তরাধিকারপ্রথা রূপান্তরের প্রেরণা দিল। কিন্তু মাতৃ-অধিকার অনুযায়ী বংশধারা থাকাতে এটি হওয়া অসম্ভব ছিল। সেইজন্য এই প্রথা ভাঙ্গার প্রয়োজন ছিল এবং তা ভাঙ্গা হল। এবং এই কাজটি আজ যেমন মনে হয় তেমন কিছু শক্ত ছিল না। কারণ এই বিপ্লব যদিও মানবসমাজের অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে একটি সবচেয়ে নির্ধারক বিপ্লব, তবু এতে গোত্রের কোন জীবিত সদস্যের কোন অবস্থান্তর ঘটাবার প্রয়োজন হয়নি। আগেকার মতই সকলে যেখানে ছিল, সেইখানেই রইল। এই সহজ সিদ্ধান্তটুকুই যথেষ্ট যে, ভবিষ্যতে পুরুষের সন্তানসন্ততিরা হবে তার গোত্রের অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু নারীর সন্তানসন্ততিরা গোত্র থেকে বাদ পড়বে এবং তারা তাদের বাপেদের গোত্রে অন্তর্ভুক্ত হবে। এইভাবে মায়েদের দিক থেকে বংশপরম্পরার হিসাব এবং সম্পত্তির উত্তরাধিকারের উচ্ছেদ হল এবং তার জায়গায় বাপের দিক দিয়ে বংশপরম্পরা ও সম্পত্তির উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠিত হল। সভ্য জাতিগুলির মধ্যে কবে এবং ঠিক কী ভাবে এই বিপ্লব ঘটেছিল আমরা তার কিছুই জানি না। এটি পুরোপুরি প্রাগৈতিহাসিক যুগের মধ্যে পড়ে। কিন্তু এই বিপ্লব যে **ঘটেছিল** তা রীতিমত প্রমাণিত হয় মাতৃ-অধিকারের অসংখ্য লুপ্তাবশেষ থেকে যেগুলি বিশেষ করে বাখোফেন সংগ্রহ করেন। অনেকগুলি ইণ্ডিয়ান উপজাতির মধ্যে দেখতে পাওয়া যাবে, কত সহজে এই বিপ্লব সম্পন্ন হচ্ছে, এদের মধ্যে এই ব্যাপারটি অত্যন্ত সম্প্রতি ঘটেছে এবং এখনও ঘটে চলছে অংশতঃ সম্পদবৃদ্ধি ও জীবনযাত্রা প্রণালীর পরিবর্তনের (বনজঙ্গল থেকে প্রান্তরে বসবাস) ফলে এবং অংশত সভ্যতা ও মিশনারিদের নৈতিক প্রভাবে। মিসৌরী অববাহিকার আটটি উপজাতির মধ্যে ছয়টিতে পুরুষের দিক দিয়ে এবং দুটিতে এখনও নারীর দিক দিয়ে বংশ ঠিক

করা ও তদনুযায়ী উত্তরাধিকার বজায় আছে। শনী, মিয়ামি ও দেলওয়ারদের মধ্যে সন্তানসন্ততিদের বাপের গোত্রে প্রচলিত একটা নাম দিয়ে বাপের গোত্রে অন্তর্ভুক্ত করার প্রথা প্রচলিত হয়েছে, যাতে করে তারা বাপের সম্পত্তি পেতে পারে। 'নাম বদলে বস্তু বদলে দেবার স্বাভাবিক মানবীয় কারচুপি, যেখানেই প্রত্যক্ষ স্বার্থের যথেষ্ট প্রেরণা থাকে, সেখানেই কোন ছিদ্র ধরে প্রচলিত ঐতিহ্যের মধ্যেই ঐতিহ্য ভাঙতে যাওয়া!' (মার্কস।) ফলে অসম্ভব রকমের গোলমাল দেখা দেয় এবং তখন তার সমাধান করা সম্ভব ছিল এবং অংশতঃ সমাধান করা হল পিতৃ-অধিকারে উৎক্রমণ করে। 'এইটেই মনে হয় সবচেয়ে স্বাভাবিক পরিবর্তন।' (মার্কস।) প্রাচীন গোলার্ধের সভ্য জাতিগুলির মধ্যে কী ভাবে এই পরিবর্তন ঘটেছিল সে বিষয়ে তুলনামূলক আইনের বিশেষজ্ঞরা যা বলেছেন তা অবশ্য নিতান্ত প্রকল্প মাত্র — ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে স্টকহল্ম থেকে প্রকাশিত কভালেভ্স্কির রচিত 'পরিবার ও সম্পত্তির উৎপত্তি ও বিবর্তনের রূপরেখা'* দ্রষ্টব্য।

মাতৃ-অধিকারের উচ্ছেদ হচ্ছে **স্ত্রীজাতির এক বিশ্ব ঐতিহাসিক পরাজয়।** পুরুষ গৃহস্থালীর কর্তৃত্বও দখল করল, স্ত্রীলোক হল পদানত, শৃংখলিত, পুরুষের লালসার দাসী, সন্তানসৃষ্টির যন্ত্র মাত্র। স্ত্রীলোকের এই অবনত অবস্থা যা বিশেষভাবে বীর যুগের এবং ততোধিক চিরায়ত যুগের গ্রীকদের মধ্যে পরিস্ফুট হয়েছিল, তাকেই আস্তে আস্তে পালিশ করে এবং কিছুটা রূপান্তর করে মোলায়েম করা হয়েছে, কিন্তু মোটেই লুপ্ত হয়নি।

পুরুষদের এই যে একচ্ছত্র শাসন এখন প্রতিষ্ঠিত হল তার প্রথম ফল হল পিতৃপ্রধান পরিবারের তখন উদীয়মান একটি মধ্যবর্তী রূপ। এই ধরনের পরিবারের মূল বৈশিষ্ট্য বহুপত্নী প্রথা নয় (এই প্রথা সম্পর্কে পরে বলা হবে), পরন্তু 'স্বাধীন ও পরাধীন কিছুসংখ্যক ব্যক্তিদের পরিবার কর্তার পিতৃক্ষমতাধীনস্থ এক পরিবারে সংগঠন। সেমিটিক রূপে এই পরিবারের দলপতি বহুপত্নী গ্রহণ করে, পরাধীনদেরও স্ত্রীসন্তান থাকে, এবং সমগ্র পরিবার সংগঠনের উদ্দেশ্য হচ্ছে একটি সীমাবদ্ধ অঞ্চলে পশুপালন।' মূল বৈশিষ্ট্য হল বাঁধা গোলাম ও পিতৃ-ক্ষমতার প্রতিষ্ঠা, তাই এই ধরনের পরিবারের পূর্ণাঙ্গ রূপ হল রোমক পরিবার। *Familia* কথাটি শুরুতে আমাদের আধুনিক কূপমণ্ডূকদের যা আদর্শ, ভাবপ্রবণতা ও সাংসারিক গরমিলের সেই যুগ্মটা বোঝাত না। এমনকি রোমকদের মধ্যে গোড়ার দিকে এতে বিবাহিত দম্পতি ও তাদের সন্তানসন্ততিকেও বোঝাত না, শুধু গোলামদেরই বোঝাত। Famulus মানে একজন ঘরোয়া দাস এবং familia মানে একটি ব্যক্তির অধিকারভুক্ত সমস্ত ক্রীতদাস।

---

* M. Kovalevsky, *Tableau des origines et de l'évolution de la famille et de la propriété.* Stockholm, 1890. — সম্পাঃ

এমনকি গেয়াসের সময় পর্যন্ত familia, id est patrimonium (অর্থাৎ উত্তরাধিকার), উইল করে হস্তান্তর করা হত। রোমকরা একটি নতুন ধরনের সামাজিক সংগঠন বোঝাবার জন্য এই শব্দটি আবিষ্কার করে, — এতে পরিবারের প্রধানের অধীনে তার স্ত্রী ও সন্তানসন্ততি এবং কয়েকজন গোলাম থাকত, রোমকদের পিতৃ-ক্ষমতার অনুযায়ী পরিবার-প্রধান ছিলেন সকলের জীবনমরণের মালিক। 'অতএব এই শব্দটি ল্যাটিন জাতিগুলির বর্মাবৃত পারিবারিক প্রথার চেয়ে পুরনো নয়, যা এসেছে চাষবাস ও বিধিবদ্ধ দাসপ্রথার সূচনার পরে এবং গ্রীক ও আর্যবংশীয় ল্যাটিন জাতিগুলির পৃথক হয়ে যাওয়ার পরে।' এর সঙ্গে মার্কস একটু যোগ করেছেন, 'আধুনিক পরিবারের মধ্যে ভ্রূণ অবস্থায় শুধু দাসত্ব (servitus) নয়, পরন্তু ভূমিদাসত্বও আছে, কারণ গোড়া থেকেই এটির সঙ্গে কৃষি বেগারির সম্পর্ক ছিল। পরবর্তী যুগে সমাজ ও তার রাষ্ট্রের মধ্যে ব্যাপকভাবে যতরকমের বিরোধ দেখা দিয়েছে তার সবই **ছোট আকারে** এর মধ্যে আছে।'

এই ধরনের পরিবারে দেখা যায় জোড়বাঁধা পরিবার থেকে একপতিপত্নী প্রথায় উত্তরণ। স্ত্রীলোকের সতীত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত হবার জন্য, অর্থাৎ সন্তানসন্ততির পিতৃত্বের নিশ্চয়তার জন্য স্ত্রীলোককে সম্পূর্ণভাবে পুরুষের অধীন করা হয়; পুরুষ যদি স্ত্রীকে হত্যা করে তবে সে তার অধিকার প্রয়োগ করছে মাত্র।

পিতৃপ্রধান পরিবারের সঙ্গে সঙ্গেই আমরা লিখিত ইতিহাসের যুগে এসে যাই এবং তাতে করে আসি এমন একটা ক্ষেত্রে যেখানে তুলনামূলক আইনবিচার পদ্ধতি থেকে আমরা গুরুত্বপূর্ণ সাহায্য পেতে পারি। বস্তুত, এর ফলেই আমাদের এ ক্ষেত্রে যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছে। আমরা মাক্সিম কভালেভ্স্কির নিকট ('পরিবার ও সম্পত্তির উৎপত্তি ও বিবর্তনের রূপরেখা', স্টকহল্ম, ১৮৯০, পৃঃ ৬০—১০০) এই প্রমাণের জন্য ঋণী যে, পিতৃপ্রধান সাংসারিক গোষ্ঠী, (patriarchalische Hausgenossenschaft) যেগুলি আজও সার্ভ ও বুলগারদের মধ্যে 'জাদ্রুগা' (অর্থাৎ মৈত্রীর মতো কিছু একটা) অথবা 'ব্রাৎস্তভো' (ভ্রাতৃত্ব) বলে প্রচলিত এবং প্রাচ্য জাতিগুলির মধ্যে যার আকৃতি একটু অন্য রকমের, — এইটেই হচ্ছে সমষ্টি-বিবাহসঞ্জাত মাতৃ-অধিকার সমন্বিত পরিবার ও আধুনিক কালের কাছে জানা ব্যক্তিগত পরিবারের মধ্যবর্তী উৎক্রমণ স্তর। অন্তত পক্ষে প্রাচীন গোলার্ধের সভ্য জাতিগুলি, আর্য ও সেমিটিক জাতিদের সম্বন্ধে এটি প্রমাণিত বলে মনে হয়।

দক্ষিণী স্লাভদের 'জাদ্রুগা' এই ধরনের বর্তমানে প্রচলিত পারিবাবিক গোষ্ঠীর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই পরিবার একজন পিতার কয়েক পুরুষের পুত্রপ্রপৌত্র ও তাদের স্ত্রীদের নিয়ে গঠিত; সকলেই এক গৃহস্থালীর অন্তর্ভুক্ত, তারা একত্র জমি চাষ করে, একই সাধারণ ভাঁড়ার থেকে খাওয়া পরা চালায় এবং সমবেতভাবে সমস্ত

উদ্বৃত্ত জিনিসের অধিকারী হয়। এই ধরনের গোষ্ঠীতে একটিমাত্র গৃহকর্তার (domàcin) চূড়ান্ত আধিপত্য থাকে, যিনি বাহিরের ব্যাপারে গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করেন, ছোটখাট বিষয়ে নিজেই নিষ্পত্তি করেন এবং টাকাকড়ির পরিচালনা তাঁরই হাতে থাকে, — তিনিই এই তহবিল এবং সমস্ত কাজকর্ম পরিচালনার জন্য দায়ী। তাঁকে নির্বাচিত হতে হয় এবং সবসময়তেই যে তাঁকে বয়োজ্যেষ্ঠ হতে হবে তার কোন কথা নেই। পরিবারের মেয়েদের ও তাদের কাজকর্মের উপর পরিচালনা করেন গৃহকর্ত্রী (domàcica), যিনি সাধারণত ঐ গৃহকর্তারই স্ত্রী। মেয়েদের জন্য স্বামী নির্বাচনে এ'র মত খুব গুরুত্বপূর্ণ, অনেক সময় তাই চূড়ান্ত। কিন্তু গোষ্ঠীর চূড়ান্ত ক্ষমতা পারিবারিক সভার উপর ন্যস্ত, সমস্ত পূর্ণবয়স্ক সদস্য, স্ত্রী ও পুরুষদের নিয়ে এই সভা। এই সভার সামনে গৃহকর্তা তাঁর কাজের হিসাব দেন; এই সভা শেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, সভ্যদের মধ্যে বিচার মীমাংসা করে; কোন গুরুত্বপূর্ণ ক্রয়-বিক্রয়, বিশেষতঃ জমি জায়গা প্রভৃতি সম্বন্ধে এখানেই সিদ্ধান্ত হয়।

মাত্র বছর দশেক আগে রাশিয়ায় এই ধরনের বৃহৎ পারিবারিক গোষ্ঠীর অস্তিত্ব প্রমাণ হয়েছে; রুশ দেশের লোকাচারে এইগুলি ওব্‌শিচনা বা গ্রাম গোষ্ঠীর মতোই দৃঢ়মূল বলে এখন সাধারণভাবে স্বীকৃত। রাশিয়ার সবচেয়ে পুরনো আইনসংহিতা -- ইয়ারোস্লাভের 'প্রাভ্‌দায়'* এই জিনিসটি পাওয়া যায় ডালমেটিয়ার আইনে যে নামে উল্লিখিত সেই একই নামে (verv) এবং পোলীয় ও চেকদের ঐতিহাসিক সূত্র থেকে এদের উল্লেখ পাওয়া যায়।

হৈসলারের মতে ('জার্মান অধিকার প্রথা'**) জার্মানদের মধ্যে আদিতে যে অর্থনৈতিক একক ছিল সেটা আধুনিক অর্থের ব্যক্তিকেন্দ্রিক পরিবার নয়, পরন্তু একটি গৃহগোষ্ঠী (Hausgenossenschaft) যাতে স্ব স্ব পরিবার সমেত কয়েক পুরুষের লোকজন থাকত এবং অনেক ক্ষেত্রে তাতে দাসও থাকত। রোমক পরিবারও শেষ পর্যন্ত এই ধরনের পরিবারে এসে পেঁাছায় এবং তার ফলে গৃহকর্তার স্বৈরক্ষমতা এবং তার তুলনায় পরিবারের বাকি সভ্যদের অধীকারহীনতা সম্পর্কেও সম্প্রতি জোর প্রশ্ন উঠেছে। এই ধরনের পারিবারিক গোষ্ঠী আয়র্ল্যান্ডে কেল্টিকদের মধ্যেও ছিল বলে অনুমান করা হয়; ফ্রান্সে একেবারে ফরাসী বিপ্লবের সময় পর্যন্ত নিভের্নেতে parçonneries নামে এগুলি বজায় ছিল এবং ফ্রান্‌শ কঁতেতে এগুলি আজও

* ইয়ারোস্লাভের 'প্রাভদা' — প্রাচীন রুশে তৎকালীন প্রচলিত আইনের ভিত্তিতে ১১শ — ১২শ শতাব্দীতে রচিত ও সে সময়কার অর্থনৈতিক ও সামাজিক সম্পর্কের অভিব্যক্তিস্বরূপ 'রুশী ন্যায়' বা প্রাচীন রুশের আইন সংকলনের প্রাচীন সংস্করণের প্রথম ভাগের নাম। — সম্পাঃ

** A. Heusler, *Institutionen des deutschen Rechts*, Bd. I-II, Leipzig, 1885-1886. — সম্পাঃ

একেবারে লোপ পায়নি। ল্যুআঁ জেলায় (Saône et Loire) বড় বড় কৃষক গৃহস্থালী দেখা যায় যেখানে একটি ছাদ সমান উচ্চ সাধারণের ব্যবহার্য কেন্দ্রীয় হলঘর থাকে, এর চারদিকে ঘুমাবার ঘরগুলি, এইসব ঘরে ছয় থেকে আট ধাপের সিঁড়ি দিয়ে পৌঁছাতে হয় এবং এইগুলিতে একই পরিবারের কয়েক পুরুষের লোকজন বাস করে।

ভারতবর্ষে মহান আলেকজাণ্ডারের যুগে নিয়ার্কাস এই গৃহস্থালী গোষ্ঠী ও তার এজমালি চাষবাসের উল্লেখ করেছেন এবং এগুলি আজও পর্যন্ত সেই একই অঞ্চলে, পাঞ্জাবে ও সমগ্র উত্তর-পশ্চিমে বিদ্যমান রয়েছে। ককেশাস অঞ্চলে কভালেভ্স্কি নিজে এর অস্তিত্বের সাক্ষ্য দিয়েছেন। আলজিরিয়ার কাবিলদের মধ্যে এখনো এই জিনিস দেখা যায়। এমনকি আমেরিকাতেও এর অস্তিত্ব ছিল বলা হয়ে থাকে; জুরিটার বিবরণে প্রাচীন মেক্সিকোর 'ক্যালপুলিসকে'* এই ধরনের গৃহস্থালীর সঙ্গে অভিন্ন বলে দেখাবার চেষ্টা হচ্ছে, অপরপক্ষে কুনভ (Ausland, 1890, Nos. 42-44) মোটামুটি স্পষ্টভাবে প্রমাণ করেছেন যে, পেরুতে ঐ দেশজয়ের পূর্বে কর্ষিত জমির নিয়মিত বণ্টন অর্থাৎ ব্যক্তিগত চাষ সমেত একধরনের মার্ক সংবিধান ছিল (আশ্চর্য যে এখানে মার্ক কথাটির প্রতিশব্দ ছিল marca)।

সে যাই হোক, জমির সাধারণ মালিকানা ও সমবেত কৃষির সঙ্গে সংযুক্ত পিতৃপ্রধান গৃহস্থালী গোষ্ঠী এখন আগেকার চেয়ে নতুন তাৎপর্য অর্জন করল। এখন আর কোন সন্দেহ নেই যে, প্রাচীন গোলার্ধের সভ্য ও অন্যান্য জাতিগুলির মধ্যে মাতৃপ্রধান পরিবার থেকে একপতিপত্নিক পরিবারে উত্তরণের সময় এই ধরনের গৃহস্থালীর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। পরে আমরা কভালেভ্স্কির আরও একটি সিদ্ধান্ত নিয়ে আলোচনা করব; যথা: পিতৃপ্রধান গৃহস্থালী গোষ্ঠী হল একটা উৎক্রমণমূলক পর্যায়, যা থেকে আলাদা আলাদা পরিবারের চাষ এবং চাষজমি ও চারণ-ভূমির প্রথমে কিছু সময় পরপর এবং পরে স্থায়ীভাবে বিলি করার পদ্ধতি সহ গ্রাম গোষ্ঠী বা মার্ক বিকশিত হয়েছে।

এইসব গৃহস্থালী গোষ্ঠীর ভিতরকার পারিবারিক জীবনের ব্যাপারে অন্তত রাশিয়ার ক্ষেত্রে এটা উল্লেখযোগ্য যে, গৃহকর্তা তরুণীদের সম্পর্কে, বিশেষতঃ পুত্রবধূদের ক্ষেত্রে পদমর্যাদার প্রবল অপব্যবহার করত বলে শোনা যায় এবং অনেক সময় তারা হয়ে উঠত তার হারেম; রুশ দেশের লোকসঙ্গীতে এই অবস্থার বেশ মুখর প্রতিফলন পাওয়া যায়।

মাতৃ অধিকারের উচ্ছেদের পরে দ্রুতগতিতে যে একপতিপত্নী প্রথা দেখা দেয়, সে বিষয়ে আলোচনার আগেই এখানে বহুপত্নীত্ব ও বহুস্বামিত্ব সম্পর্কে গোটাকতক কথা

* Calpullis — আজটেকদের পারিবারিক গোষ্ঠী। — সম্পাঃ

বলতে চাই। এই দুরকমের বিবাহই হতে পারে কেবল নিয়মের ব্যতিক্রম, ইতিহাসের বলা যেতে পারে বিলাস সৃষ্টি, যদি না কোনো দেশে এই দু'রকমের বিবাহকে পাশাপাশি দেখা যায় এবং যতদূর জানা গেছে এমনটি কোথাও ঘটেনি। অতএব, সমাজের প্রথা নির্বিশেষে স্ত্রী পুরুষের সংখ্যা এযাবৎ প্রায় সমানই থাকায় বহুপত্নী বিবাহের আওতাবহির্ভূত পুরুষেরা যেহেতু বহুস্বামী প্রথা থেকে পরিত্যক্ত স্ত্রীলোকদের নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারে না, তাই এটা খুবই স্পষ্ট যে, উপরোক্ত দু-রকমের বিবাহের কোনোটারই ব্যাপক প্রচলন হতে পারেনি। বস্তুত, পুরুষের পক্ষ থেকে বহুপত্নীত্ব স্পষ্টত দাসপ্রথারই ফল এবং ব্যতিরেকমূলক অল্প কয়েকটি ক্ষেত্রেই তা সীমাবদ্ধ। সেমাইট্‌দের পিতৃপ্রধান পরিবারে কেবলমাত্র পরিবার-পিতা স্বয়ং এবং বড়জোর তার জন কয়েক ছেলের বহু স্ত্রী থাকত, বাকি সকলকে এক একটি পত্নী নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হত। প্রাচ্যের সর্বত্র আজও এই জিনিসটি চলছে। বহুপত্নীত্ব হচ্ছে ধনী ও হোমরা-চোমরাদের একটি বিশেষ অধিকার এবং স্ত্রী সংগ্রহ হত প্রধানত নারীদাসীদের কিনে; সাধারণ লোকের অধিকাংশ এক পত্নী নিয়েই থাকে। ভারতবর্ষ ও তিব্বতে বহুস্বামী প্রথা এইরকমই একটি ব্যতিক্রম, সমষ্টি-বিবাহ থেকে এর অবশ্যই চিত্তাকর্ষক উদ্ভবের জন্য আরো খুঁটিয়ে অনুসন্ধান প্রয়োজন। তবু বাস্তবক্ষেত্রে মুসলমানদের ঈর্ষাপরায়ণ হারেমগুলির তুলনায় এগুলি অনেকবেশী সহনীয়। যেমন, ভারতের নায়ারদের মধ্যে তিন, চার অথবা বেশী সংখ্যক পুরুষ মানুষের একটিমাত্র সাধারণ স্ত্রী থাকে; কিন্তু এদের মধ্যে আবার প্রত্যেকেই ঐ একই সময়ে আরও তিন বা ততোধিক পুরুষের সঙ্গে মিলে একটি দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ বা ততোধিক স্ত্রীও রাখতে পারে। বিস্ময়ের কথা যে, ম্যাক-লেনান এইসব বিবাহ ক্লাবের বর্ণনা দিয়ে **ক্লাব বিবাহের** নতুন বর্গ আবিষ্কার করেননি — পুরুষেরা একই সময়ে কয়েকটি ক্লাবের সভ্য হতে পারত। এই বিবাহের ক্লাবকে অবশ্য যথার্থ বহুস্বামী প্রথা বলা যায় না; অপরপক্ষে জিরো-তেলোঁ যা বলেছেন, এটি হচ্ছে সমষ্টি-বিবাহের এক বিশেষ (spezialisierte) রূপ যাতে পুরুষের বহুস্ত্রী থাকছে এবং স্ত্রীলোকের বহুস্বামী থাকছে।

৪। **একপতিপত্নী পরিবার**। ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে যে, বর্বরতার মধ্যবর্তী স্তর থেকে উচ্চতন স্তরে উৎক্রমণ যুগে জোড়বাঁধা পরিবার থেকে এর উৎপত্তি হয়েছে; এর চরম বিজয় হচ্ছে সভ্যতার সূচনার অন্যতম লক্ষণ। এই প্রথার ভিত্তিতে আছে পুরুষের আধিপত্য, এর সুস্পষ্ট লক্ষ্য হচ্ছে সুনিশ্চিত পিতৃত্বে সন্তানোৎপাদন, কারণ এটি সুনিশ্চিত হলে তবেই সন্তানসন্ততি প্রত্যক্ষ উত্তরাধিকারী হিসাবে যথা সময়ে বাপের সম্পত্তি পাবে। জোড়বাঁধা বিবাহ থেকে একপতিপত্নী পরিবারের পার্থক্য হচ্ছে এই যে, এখানে বিবাহের বন্ধন অনেক বেশী শক্ত, যেকোন পক্ষের মর্জিমত সেটা এখন আর ভাঙ্গা যায় না। এখন, সাধারণত কেবলমাত্র স্বামীই বিবাহ বন্ধন ছেদ করে স্ত্রীকে

পরিত্যাগ করতে পারে। দাম্পত্য জীবনে বিশ্বাসভঙ্গের অধিকার এখনও পুরুষের থাকছে, অন্ততপক্ষে লোকাচারে অনুমোদিত হচ্ছে (নেপোলিয়ন সংহিতা অনুযায়ী স্বামীকে সুস্পষ্টভাবে এই অধিকার দেওয়া হয়েছে যতক্ষণ পর্যন্ত না সে রক্ষিতাকে দম্পতির গৃহে নিয়ে আসছে), এবং সমাজের অধিকতর অগ্রগতিব সঙ্গে পুরুষেরা এই অধিকার বেশী বেশী খাটাতে থাকে। যদি কোথাও কোনো স্ত্রীলোক প্রাচীন যৌন প্রথা স্মরণ করে তাকে ফিরে পেতে চায় তবে আগের চেয়েও তাকে অনেক কঠোর শাস্তি দেওয়া হচ্ছে।

গ্রীকদের মধ্যে এই নতুন ধরনের পরিবারের কঠোরতম রূপ দেখা যায়। মার্কসের মতে, পুরানে দেবীদের যে প্রতিষ্ঠা তাতে এমন একটা পূর্বতন পর্ব বোঝায় যখন স্ত্রীলোক তখনো পর্যন্ত অনেক বেশী স্বাধীন ও শ্রদ্ধার পাত্রী ছিল; কিন্তু বীর যুগে দেখা যায় যে, পুরুষমানুষের আধিপত্য এবং নারীদাসীদের প্রতিযোগিতায় স্ত্রীলোকদের অবস্থার অনেক অবনতি হয়েছে। 'অডিসি'তে পাওয়া যায় কী ভাবে টেলিমেকাশ মাকে ধমক দিয়ে চুপ করে থাকতে বলে। হোমারের কাব্যে বন্দী তরুণীরা বিজয়ীদের লালসার শিকার হচ্ছে; সামরিক দলপতিরা পদমর্যাদাক্রমে একের পর এক সর্বাপেক্ষা সুন্দরীদের নিজেদের জন্য বাছাই করছে। এই ধরনের একটি দাসী নিয়ে আকিলিস ও আগামেম্‌নসের ঝগড়াকে কেন্দ্র করেই যে সমগ্র 'ইলিয়ড' কাব্য তা আমরা জানি। হোমারের কাব্যে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিটি বীর প্রসঙ্গেই তার শিবির ও শয্যার অংশীদার বন্দিনী কুমারীরও উল্লেখ আছে। এই কুমারীদের আবার গৃহে নিয়ে তোলা হয় দম্পতির সংসারে; যেমন এস্কাইলাসের আগামেম্‌নস কাস্‌সান্দ্রাকে নিয়ে গিয়েছিলেন। এইসব দাসীদের ছেলেরা বাপের বিষয়-সম্পত্তির একটা ক্ষুদ্র ভাগ পায় এবং এদের স্বাধীন নাগরিক বলে ধরা হয়। টিউক্রশ হচ্ছেন টেলামনের এরকম এক অবৈধ পুত্র এবং তাকে পিতার নাম ধারণ করতে দেওয়া হয়েছিল। বিবাহিত স্ত্রীকে এইসবই সহ্য করতে হবে, কিন্তু তার নিজের বেলায় চাই কঠোর সতীত্ব এবং পাতিব্রত্য। এ কথা অবশ্য সত্য যে, সভ্যতার যুগের চেয়ে বীর যুগের গ্রীক স্ত্রীর সম্মান বেশী, কিন্তু তবে স্বামীর কাছে সে আসলে কেবল তার বৈধ উত্তরাধিকারীদের মা, তার প্রধান গৃহকর্ত্রী এবং দাসীদের কর্মাধ্যক্ষ যে দাসীদের সঙ্গে স্বামী ইচ্ছামতো রক্ষিতার মত ব্যবহার করতে পারত ও করত। একপতিপত্নী বিবাহের পাশাপাশি এই দাসপ্রথার অস্তিত্ব, এই যে সুন্দরী তরুণী দাসীরা সর্বতোভাবে **পুরুষটির** দখলে, এইটাই শুরু থেকে একপতিপত্নী প্রথার উপর এই চারিত্র্য-বৈশিষ্ট্য দেগে দেয় যে, একপতিপত্নীত্ব **কেবল নারীর** জন্য, পুরুষের জন্য নয়। এই বৈশিষ্ট্য তার আজও রয়ে গিয়েছে।

পরবর্তী যুগের গ্রীকদের মধ্যে ডোরিয়ান ও ইয়োনিয়ানদের পৃথক করে দেখতে হবে। প্রথমোক্তদের মধ্যে স্পার্টা হচ্ছে প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত, হোমারে যা পাওয়া যায় তার

চেয়েও প্রাচীনতর বিবাহ-সম্পর্ক এদের মধ্যে ছিল। স্পার্টায় একধরনের জোড়বাঁধা বিবাহ দেখা যায়, স্থানীয় ধারণা অনুযায়ী রাষ্ট্র যে প্রথার কিছুটা পরিবর্তন করে; এতে সমষ্টি-বিবাহের অনেক চিহ্ন ছিল। সন্তানহীন বিবাহ ভেঙ্গে দেওয়া হত: রাজা আনাক্সান্দ্রিদাসের (খ্রীঃ পূঃ ৬৫০) স্ত্রী নিঃসন্তান হওয়ায় তিনি আর একটি বিবাহ করেন এবং দুটি গৃহস্থালী চালান; ঐ যুগেরই রাজা এরিস্টোনিস পূর্ববিবাহিত দুটি নিঃসন্তান স্ত্রীর ওপর তৃতীয়বার একটি বিবাহ করেন, তবে প্রথমোক্তদের একজনকে ছেড়ে দেন। অপরপক্ষে কয়েকজন ভ্রাতার একটিমাত্র সাধারণ স্ত্রী থাকতে পারত। বন্ধুর স্ত্রীর প্রতি অনুরাগ থাকলে কোনো লোকে তাকে ভাগে পেতে পারত এবং এটাও সঙ্গতই গণ্য হত, যদি কেউ নিজের স্ত্রীকে তুলে দিত বিসমার্ক কথিত একটা তাগড়া 'মর্দা ঘোড়ার' কাছে, — এই শেষোক্ত ব্যক্তি তার সহনাগরিক না হলেও। প্লুটার্কের রচনায় একজায়গায় স্পার্টার একজন স্ত্রীলোক তার পশ্চাদ্ধাবক প্রণয়ীকে স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যে পাঠালেন, — তা থেকে শোমানের মতে, অধিকতর যৌন স্বাধীনতারই ইঙ্গিত মেলে। প্রকৃত ব্যভিচার অর্থাৎ স্বামীর অজানতে স্ত্রীর অবিশ্বস্ততা তাই তখনো আশ্রুতপূর্ব। অপরদিকে স্পার্টায় অন্তত তার গৌরবের যুগে গার্হস্থ্য দাসদাসী ছিল না: হেলট গোলামেরা মহালের মধ্যে আলাদাভাবে থাকত এবং এইজন্য তাদের নারীদের সঙ্গে সংসর্গের প্রলোভন স্পার্টিয়াটেসদের* কম থাকত। এই ধরনের অবস্থার মধ্যে স্পার্টার মেয়েরা যে অন্যান্য গ্রীক মেয়েদের চেয়ে অনেক বেশী সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন সেটা খুবই স্বাভাবিক। গ্রীক নারীদের মধ্যে প্রাচীনেরা শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করেছেন কেবল স্পার্টার স্ত্রীলোক এবং এথেন্সের হেটায়ার শিরোমণিদের এবং এদের উক্তি তাঁরা লিপিবদ্ধ করার যোগ্য বলে মনে করতেন।

ইয়োনিয়ানদের মধ্যে অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ অন্য রকমের; এথেন্স তাদের দৃষ্টান্তস্থল। মেয়েরা শুধু সুতোকাটা, কাপড়বোনা ও সেলাই শিখত, বড়জোর একটু আধটু লেখাপড়া। তাদের পৃথক রাখা হত এবং শুধু মেয়েদের সঙ্গেই মিশতে দেওয়া হত। মেয়েদের মহল হত বাড়ির একটি পৃথক ও নির্দিষ্ট অংশে, হয় উপর তলায় অথবা বাড়ির পিছন দিকে — যেখানে পুরুষ মানুষ, বিশেষতঃ অচেনা লোকেরা যেতে পারত না, বাইরের কোনো পুরুষ এলে মেয়েরা সেখানে চলে যেত। দাসী সঙ্গে না নিয়ে মেয়েরা বাইরে যেত না; বাড়িতে তারা কার্যতঃ পাহারার মধ্যে থাকত; এরিস্টোফেনিস লম্পটদের ভয় দেখাবার জন্য ডালকুত্তা পোষার কথা বলেছেন এবং এশিয়ার নগরগুলিতে মেয়েদের

---

* স্পার্টিয়াটেস — প্রাচীন স্পার্টার পূর্ণাধিকারসম্পন্ন নাগরিক।

হেলট — প্রাচীন স্পার্টার অধিকারহীন অধিবাসী, জমির সঙ্গে এরা বাঁধা থাকত এবং ভূস্বামী স্পার্টিয়াটেসদের জন্য নির্দিষ্ট দায়দায়িত্বে বদ্ধ ছিল। হেলটদের অবস্থা আসলে দাসদের চেয়ে মোটেই পৃথক ছিল না। — সম্পাঃ

পাহারা দেবার জন্য খোজা-প্রহরী রাখা হত; হেরোডেটাসের সেই প্রাচীন যুগেই ব্যবসার জন্য চিওস দ্বীপে খোজা তৈরী করা হত এবং ভাক্সমুথের মতে এটি শুধু বর্বরদের জন্যই নয়। ইউরিপিডিস্-এর রচনায় স্ত্রীকে বলা হয়েছে oikurema, গৃহস্থালী চালানোর একটি জিনিস (শব্দটি ক্লীবলিঙ্গের), এবং সন্তান প্রসবের কথা ছেড়ে দিলে এথেন্সীয়দের কাছে তারা ছিল মাত্র প্রধানা ঝি। স্বামী ব্যায়ামাদি করত, তার সামাজিক কাজকর্ম ছিল এবং তা থেকে স্ত্রী ছিল বহিষ্কৃত; এছাড়াও স্বামীর ব্যবহারের জন্য ছিল দাসীরা এবং এথেন্সের সমৃদ্ধির সময়ে ছিল ব্যাপক গণিকাবৃত্তি— যা কম করে বললেও, রাষ্ট্রের আনুকূল্য পেত। এই গণিকাবৃত্তিকে ভিত্তি করেই দেখা দেয় সেই একমাত্র বিশিষ্ট গ্রীক মহিলারা যারা তাদের রসবোধ ও শিল্পরুচিতে প্রাচীনকালের মেয়েদের সাধারণ স্তরের অনেক উঁচুতে পৌঁছেছিল, যেমন স্পার্টার মেয়েরা পৌঁছেছিল নিজেদের চরিত্রবলে। এথেন্সীয় পরিবারের সবচেয়ে কঠোর সমালোচনা হচ্ছে এই যে, ওখানে মেয়েকে নারী হতে হলে আগে হতে হত হেটায়ার।

কালক্রমে এই এথেন্সীয় পরিবারের ছাঁচেই শুধু বাকি ইয়োনিয়ানরাই নয়, পরন্তু মূল ভূখণ্ড এবং উপনিবেশের সমস্ত গ্রীকরাও নিজেদের গার্হস্থ্য সম্পর্ক ক্রমেই বেশি করে গড়ে তুলতে থাকে। কিন্তু সবরকম অবরোধ ও প্রহরা সত্ত্বেও গ্রীক স্ত্রীলোকেরা স্বামীদের প্রতারণা করবার যথেষ্ট সুযোগ পেত। এই যে স্বামীরা নিজেদের স্ত্রী সম্পর্কে কোন ভালবাসা প্রকাশ করতে লজ্জিত বোধ করত, তারা সবরকমের কামক্রিয়ায় চিত্ত বিনোদন করত হেটায়ারদের নিয়ে, কিন্তু স্ত্রীলোকদের এই অপমান ফিরে আঘাত করল পুরুষদের ওপরেই এবং অধঃপতিত হয়ে তারা বালক-রতির বিকৃতিপঙ্কে নেমে গেল, গ্যানিমেডের পুরাকথা দিয়ে অবনত করল নিজেদের এবং নিজ দেবতাদের।

প্রাচীন যুগের সবচেয়ে সভ্য ও উন্নত জাতির মধ্যে যতখানি খোঁজ পাওয়া যায় তদনুযায়ী এইটাই হচ্ছে একপতিপত্নী বিবাহের সূচনা। ব্যক্তিগত যৌন ভালোবাসা থেকে কোনোক্রমেই এটি জন্মায়নি, এই দুয়ের মধ্যে কোনোই মিল নেই, কারণ আগের মতোই বিবাহ রয়ে গেল শুধু সুবিধার বিয়ে। এটি হচ্ছে পরিবারের প্রথম রূপ যা স্বাভাবিক অবস্থার উপর নির্ভরশীল নয়, পরন্তু অর্থনৈতিক অবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত যথা, আদি স্বাভাবিকভাবে বিকশিত সাধারণ মালিকানার উপর ব্যক্তিমালিকানার জয়লাভের উপর। পরিবারের মধ্যে পুরুষের আধিপত্য, সন্তানসন্ততি কেবলমাত্র তার দ্বারাই হবে এবং এরা ভবিষ্যতে তার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে — গ্রীকরা খোলা-খুলিই বলত যে, এইগুলিই হচ্ছে একপতিপত্নী বিবাহের একমাত্র লক্ষ্য। এইটুকু ছাড়া এই বিবাহ ছিল একটা বোঝা, দেবতা, রাষ্ট্র ও পূর্বপুরুষদের প্রতি একটি কর্তব্য যা পালন না করে উপায় নেই। এথেন্সের আইন শুধু বিবাহকেই বাধ্যতামূলক করেনি, পরন্তু পুরুষ কর্তৃক ন্যূনতম কতকগুলি তথাকথিত দাম্পত্য কর্তব্যের পালনকেও।

অতএব ইতিহাসে একবিবাহ দেখা দিল মোটেই স্ত্রী ও পুরুষের সদ্ভাব সূত্রে নয়, বিবাহের উচ্চতম রূপ হিসাবে তো আরো নয়। বরং তা দেখা দিচ্ছে নারী পুরুষের একজন কর্তৃক অপরের উপর আধিপত্য হিসাবে, প্রাগৈতিহাসিক যুগে এযাবৎ সম্পূর্ণ অজ্ঞাত স্ত্রী পুরুষের মধ্যে একটি বৈরীর ঘোষণা রূপে। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে মার্কস ও আমার রচিত অপ্রকাশিত একটি পাণ্ডুলিপিতে* নিম্নোক্ত কথাগুলি আছে: 'শ্রমের প্রথম বিভাগ হচ্ছে সন্তান উৎপাদনের জন্য স্ত্রী ও পুরুষের বিভাগ।' বর্তমানে আমি এর সঙ্গে আরও যোগ করতে চাই: ইতিহাসে শ্রেণী-বিরোধ প্রথম যা দেখা দেয় সেটা মিলে যায় একপতিপত্নী বিবাহে স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে বিরোধের বিকাশের সঙ্গে এবং প্রথম শ্রেণী পীড়ন মেলে পুরুষ কর্তৃক স্ত্রীজাতির ওপর পীড়নের সঙ্গে। একপতিপত্নী বিবাহ ইতিহাসের একটি বড় অগ্রসর পদক্ষেপ, কিন্তু সেই সঙ্গেই দাসপ্রথা ও ব্যক্তিগত সম্পদসহ তা এমন এক যুগের পত্তন করে যা আজও পর্যন্ত চলছে এবং যাতে প্রত্যেকটি অগ্রগতিই হচ্ছে সেই সঙ্গে একটা আপেক্ষিক পশ্চাদ্গতি, যেখানে জনসমষ্টির একাংশের সচ্ছলতা ও উন্নতি হয় অপর এক অংশের দুঃখ ও পীড়নের মধ্যে দিয়ে। একপতিপত্নী বিবাহ হচ্ছে সভ্য সমাজের কোষ-রূপ, এখানে আমরা সেইসব বৈরিতা ও বিরোধের প্রকৃতি লক্ষ্য করতে পারি যেগুলি শেষোক্তের মধ্যে পূর্ণ পরিণতি লাভ করেছে।

জোড়বাঁধা পরিবার এমনকি একপতিপত্নী বিবাহের বিজয়ের সঙ্গেই যৌন সম্পর্কের প্রাচীন আপেক্ষিক স্বাধীনতা আদৌ লুপ্ত হয়নি। '"পুনালুয়া" গ্রুপগুলি ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হতে থাকায় পুরাতন বিবাহ-প্রথার গণ্ডী অনেক ছোট হয়ে এলেও তখনো এটি বিকাশমান পরিবারকে ঘিরে থাকে এবং সভ্যতার একেবারে সূচনা পর্যন্ত তার ঘাড়ে চেপে থাকে. . শেষ পর্যন্ত এটি মিলিয়ে যায় হেটায়ারিজমের সেই নতুন রূপে যা পরিবারের ওপর একটি কালো ছায়া হিসাবে সভ্যতার মধ্যেও মানবসমাজের অনুগমন করে চলেছে।' হেটায়ারিজম কথাটি দিয়ে মর্গান বোঝাতে চেয়েছেন **একপতিপত্নী বিবাহের সঙ্গে সঙ্গেই** পুরুষ ও অবিবাহিত স্ত্রীলোকের মধ্যে বিবাহ-বন্ধনের বাহিরের যৌন সম্পর্ককে এবং সকলেই জানেন যে, বিবিধরূপে সভ্য যুগের আগাগোড়া এটি প্রস্ফুরিত হয়েছে এবং ক্রমাগত প্রকাশ্য গণিকাবৃত্তির রূপ নিচ্ছে। এই হেটায়ারিজমের মূল পাওয়া যায় সরাসরি সমষ্টি-বিবাহের মধ্যে, এবং পাতিব্রত্যের অধিকার অর্জনের জন্য স্ত্রীলোকের প্রায়শ্চিত্তমূলক আত্মদান করার প্রথাতে। টাকা নিয়ে আত্মদান প্রথমে ছিল একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান, ঘটত প্রণয়ের দেবীর মন্দিরে এবং প্রথমে টাকাকড়ি জমা হত মন্দিরের তহবিলে। আর্মেনিয়ার আনাইটিসের মন্দিরে ও করিন্থের আফ্রোদিতের

* *Die deutsche Ideologie* (জার্মান ভাবাদর্শ) বইটির কথা বলা হচ্ছে। — সম্পাঃ

মন্দিরে গিয়েরোদ্‌লেরা* এবং ভারতবর্ষের মন্দিরের সঙ্গে সংযুক্ত দেবদাসীরা, তথাকথিত বায়াদেররা (কথাটি পর্তুগীজ শব্দ bailadeira বা নর্তকীর অপভ্রংশ) ছিল প্রথম গণিকা। গোড়ার দিকে এই যে ধর্মীয় আত্মদান সব স্ত্রীলোককেই করতে হত, পরে কেবল দেবমন্দিরের পূজারিণীরাই বাকি সকলের বদলে সেই কাজ করত। মেয়েরা বিবাহের আগে যে যৌন স্বাধীনতা পেত তার থেকেই অন্যান্য জাতির মধ্যে হেটায়ারিজম দেখা দেয় — অতএব এ দিক থেকেও এটি হচ্ছে সমষ্টি-বিবাহের লুপ্তাবশেষ, কেবল আমাদের কাছে এটি অন্য রকম রাস্তা দিয়ে এসেছে। সম্পত্তির বৈষম্য শুরু হবার পরে অর্থাৎ বর্বরতার উচ্চতন স্তরের সময় থেকেই দাস শ্রমের পাশেই কখন সখন খাপছাড়াভাবে মজুরি-শ্রমও দেখা দেয় এবং যুগপৎ তার আনুষঙ্গিক হিসেবে ক্রীতদাসী মেয়েদের বাধ্যতামূলক আত্মদানের পাশাপাশি দেখা দেয় স্বাধীন নারীদের পেশাগত গণিকাবৃত্তি। এইভাবে সমষ্টি-বিবাহ সভ্যতার ঘাড়ে যে উত্তরদায়িত্ব চাপিয়ে দেয় সেটা দুপেশে ব্যাপার, যেমন সভ্যতার সৃষ্ট সবকিছুই দুপেশে, দুমুখো, স্ববিরোধী ও বৈরদ্যোতক: একদিকে একপতিপত্নী প্রথা,- অন্যদিকে হেটায়ারিজম ও তার চূড়ান্ত রূপ গণিকাবৃত্তি। হেটায়ারিজম হচ্ছে অন্যান্য যেকোনো প্রথার মতই একটা সামাজিক প্রথা; এর মারফত পুরনো যৌন স্বাধীনতা বজায় থাকছে — পুরুষের জন্য। যদিও বাস্তবক্ষেত্রে এই প্রথা শুধু সহ্য নয়, উৎসাহের সঙ্গে তা আচরিত করে বিশেষ করে শাসক শ্রেণীরা, তবুও মুখের কথায় এর নিন্দে করা হয়। অবশ্য বাস্তবক্ষেত্রে এই নিন্দাবাদ গণিকা বিলাসী পুরুষকে আঘাত করে না, আঘাত করে মাত্র স্ত্রীলোককে: তারা বর্জিত ও পতিত হয়ে আর একবার প্রমাণ করে যে, সমাজের বনিয়াদী নিয়ম হচ্ছে স্ত্রীলোকের ওপর পুরুষের চূড়ান্ত আধিপত্য।

একপতিপত্নী প্রথার মধ্যেই কিন্তু এতে করে দ্বিতীয় আর একটি বিরোধ দেখা দেয়। যে স্বামীর জীবন হেটায়ারিজমে সুশোভিত, তার পাশেই রয়েছে অবহেলিতা স্ত্রী। একটি আপেলের আধখানা খেয়ে তার পুরোটা হাতে ধরে রাখা যেমন অসম্ভব, একটা বিরোধের একটি দিক থাকবে অন্য দিকটি থাকবে না, সেও তেমনি অসম্ভব। তবু স্ত্রীদের কাছ থেকে উচিত শিক্ষা না পাওয়া পর্যন্ত পুরুষ অন্য কথাই ভেবেছিল মনে হয়। একপতিপত্নী বিবাহের সঙ্গে আগেকার দিনে অজ্ঞাত দুটি স্থায়ী সামাজিক জীব ঘটনাস্থলে এসে পড়ে — স্ত্রীর উপপতি ও প্রতারিত স্বামী। পুরুষ স্ত্রীলোকের ওপর জয়লাভ করেছে, কিন্তু বিজয়ীর মাথায় মুকুট পরাবার ভার উদারচিত্তে গ্রহণ করেছে বিজিতারা। ব্যভিচার নিষিদ্ধ, কঠোরভাবে দণ্ডিত তবু অদম্য, — একপতিপত্নী প্রথা ও হেটায়ারিজমের পাশাপাশি এটিও হয়ে উঠেছে একটি অপরিহার্য সামাজিক প্রথা।

* গিয়েরোদ্‌লেরা (hierodules) — মন্দিরের দাসী পরিচারিকা। — সম্পাঃ

সন্তানের নিশ্চিত পিতৃত্ব এখনো পর্যন্ত বড়জোর নৈতিক বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত, এবং এই সমাধানহীন বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য নেপোলিয়ন সংহিতার তিনশ' বারো ধারা নির্দেশ দিচ্ছে: 'L'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari' — 'বিবাহের স্থিতিকালের মধ্যে গর্ভাধান হলে স্বামীই হল সে সন্তানের পিতা।' তিনহাজার বছরের একপতিপত্নী প্রথার এই হচ্ছে পরিণাম।

অতএব একপতিপত্নী পরিবারের যেসব ক্ষেত্রে এর ঐতিহাসিক উদ্ভব বিশ্বস্তভাবে প্রতিফলিত এবং পুরুষের নিরঙ্কুশ আধিপত্যের ফলে স্ত্রী পুরুষের তীব্র বিরোধ সুপরিস্ফুট; সেখানে আমরা ক্ষুদ্র আকারে ঠিক সেই সব বিরোধ ও বৈরিতার ছবি পাই যা নিয়ে সভ্যতার সূত্রপাত থেকেই শ্রেণীবিভক্ত সমাজ এগিয়ে চলেছে, আর যার নিষ্পত্তি বা সমাধান করতে তা অক্ষম। স্বভাবতই আমি এখানে কেবল একপতিপত্নী প্রথার সেইসব ঘটনার কথা বলতে চাইছি যেখানে বিবাহিত জীবন সত্যসত্যই সমগ্র প্রথার আদি চরিত্রের নিয়ম অনুসারেই চলে, কিন্তু যেখানে স্ত্রী স্বামীর আধিপত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। সব বিবাহের ক্ষেত্রেই যে ব্যাপারটা এমন নয় তা জার্মান কূপমন্ডূককে বলে দিতে হবে না, যেমন রাষ্ট্রে তেমনি গৃহেও শাসনের সামর্থ্য তার আর নেই এবং তার স্ত্রী তাই সঙ্গত কারণেই সেই ব্রিচেস পরে, স্বামীটি যা পরার অনুপযুক্ত। তবে সান্ত্বনা হিসাবে জার্মান কূপমন্ডূক তার সহব্যথী ফরাসী কূপমন্ডূকের চেয়ে নিজেকে সৌভাগ্যবান কল্পনা করে, কারণ ফরাসীর হাল প্রায়শই তার চেয়েও খারাপ।

তবে গ্রীকদের মধ্যে একপতিপত্নী পরিবার যে চিরায়ত কঠোর রূপ নিয়েছিল ঠিক সেই রূপেই তা সর্বত্র ও সর্বদাই দেখা দিয়েছে তা মোটেই নয়। ভবিষ্যতে বিশ্ববিজয়ী যে রোমকদের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গি ছিল গ্রীকদের চেয়ে একটু অমার্জিত, কিন্তু বেশি দূরপ্রসারী, এদের মধ্যে স্ত্রীলোক অনেক বেশী স্বাধীন ও সম্মানিত ছিল। রোমকেরা বিশ্বাস করত যে, স্ত্রীর উপরে জীবন মৃত্যুর ক্ষমতা থাকলেই স্ত্রীর সতীত্ব যথেষ্ট নিশ্চিত হচ্ছে। তাছাড়া, এখানে স্ত্রীও ঠিক স্বামীর মতোই স্বেচ্ছায় বিবাহ বিচ্ছেদ করতে পারত। কিন্তু ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে জার্মানদের প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই অবশ্য একপতিপত্নী পরিবারের সর্বাধিক অগ্রগতি হয়, কারণ সম্ভবত এদের দারিদ্র্যের জন্য এদের মধ্যে তখনও পর্যন্ত জোড়বাঁধা বিবাহ থেকে পুরোপুরি একপতিপত্নী বিবাহে বিবর্তন সম্পূর্ণ হয়নি বলে মনে হয়। ট্যাসিটাসের বর্ণিত তিনটি ঘটনা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে এসেছি: প্রথমত, বিবাহের পবিত্রতায় এদের দৃঢ় বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও — 'প্রত্যেকটি পুরুষ একটি স্ত্রী নিয়েই সন্তুষ্ট থাকত এবং স্ত্রীলোকেরা সতীত্বের রক্ষণীর মধ্যেই বসবাস করত', — পদমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি ও উপজাতির দলপতিদের মধ্যে বহুপত্নীত্ব থাকত, অবস্থাটা আমেরিকানদেরই অনুরূপ, যাদের মধ্যে জোড়বাঁধা বিবাহ প্রচলিত ছিল। দ্বিতীয়ত, মাতৃ-অধিকার থেকে পিতৃ-অধিকারে উৎক্রমণ তাদের ঘটেছে

নিশ্চয় অল্প কিছুদিন আগে, কারণ মায়ের ভাই অর্থাৎ মাতৃ-অধিকার অনুযায়ী গোত্রের সবচেয়ে নিকট পুরুষ আত্মীয়কেই তখনও প্রায় নিজের জন্মদাতা পিতার চেয়েও নিকট আত্মীয় বলে মনে করা হত; এই ব্যাপারটিও আমেরিকার ইন্ডিয়ানদের দৃষ্টিভঙ্গির অনুরূপ, যাদের মধ্যে আমাদের প্রাগৈতিহাসিক অতীতকে বোঝবার চাবিকাঠি দেখেছিলেন মার্কস — কথাটা তিনি প্রায়ই বলতেন। এবং তৃতীয়ত, জার্মানদের মধ্যে স্ত্রীলোকেরা উচ্চ সম্মান পেত এবং সামাজিক ব্যাপারেও তাদের প্রতিপত্তি ছিল, — এই ব্যাপারটি একপতিপত্নী বিবাহের বৈশিষ্ট্যসূচক পুরুষের আধিপত্যের সরাসরি বিরোধী। এইসব বিষয়েই জার্মানদের সঙ্গে স্পার্টানদের মিল আছে; আমরা আগেই দেখেছি যে, এদের মধ্যেও জোড়বাঁধা বিবাহ সম্পূর্ণরূপে লোপ পায়নি। এইভাবে এইদিক দিয়ে বিচার করলেও জার্মানদের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে একটি নতুন উপাদান বিশ্বপ্রাধান্য অর্জন করল। রোমক দুনিয়ার ধ্বংসস্তূপের ওপর বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণের মধ্যে দিয়ে যে নতুন একপতিপত্নী প্রথা এবারে দেখা দিল তাতে পুরুষের আধিপত্য অনেক নম্রতর রূপে আচ্ছাদিত হল এবং চিরায়ত প্রাচীন যুগে যা কখনো ছিল না, অন্তত বাইরের দিক দিয়ে অনেক বেশী স্বাধীন ও সম্মানের আসন নিতে দেওয়া হল নারীদের। এতে করে এই প্রথম বৃহত্তম নৈতিক অগ্রগতির সম্ভাবনা সৃষ্টি হল যা আমরা পেয়েছি একপতিপত্নী বিবাহ থেকে ও তারই কল্যাণে — বিকাশটা চলেছে ক্ষেত্র বিশেষে একপতিপত্নী বিবাহের অভ্যন্তরে অথবা সমান্তরালভাবে, অথবা তার বিরোধিতায়, — যথা আধুনিক ব্যক্তিগত যৌন প্রেম যা আগেকার দিনে সারা দুনিয়ায় অজ্ঞাত ছিল।

কিন্তু এ অগ্রগতি নিশ্চিতই এসেছে এই পরিস্থিতি থেকে যে, জার্মানরা তখনো বাস করত জোড়বাঁধা পরিবারের মধ্যে এবং এই প্রথা অনুযায়ী স্ত্রীলোকের যে মর্যাদা সেটা তারা যথাসম্ভব একপতিপত্নী বিবাহের সঙ্গে জুড়ে দেয়। জার্মানদের চরিত্রের কোন রূপকথাসুলভ বিস্ময়কর নৈতিক শুদ্ধতা থেকে এটি হয়নি, এর পেছনে সত্য এইটুকু যে, জোড়বাঁধা পরিবারে একপতিপত্নী বিবাহের মতো এত তীব্র নৈতিক দ্বন্দ্ব প্রকাশ পায়নি। অপরপক্ষে জার্মানরা যখন দেশান্তরী হয়ে বিশেষতঃ দক্ষিণ-পূর্ব দিকে কৃষ্ণসাগরের তৃণভূমির যাযাবরদের কাছে পৌঁছেছে তখন তাদের যথেষ্ট নৈতিক অবনতি ঘটে এবং অশ্বারোহণ পারদর্শিতা ছাড়াও এরা তাদের কাছ থেকে গুরুতর অস্বাভাবিক অনাচার আয়ত্ত করে, আমিয়ানাস তাইফালি সম্পর্কে এবং প্রকোপিয়াস হেরুলি সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবেই তা বলে গেছেন।

যদিও একপতিপত্নী বিবাহই হচ্ছে পরিবারের একমাত্র বিদিত রূপ যার থেকে আধুনিক যৌন প্রেমের বিকাশ ঘটা সম্ভব তবু এ কথা বলা ঠিক হবে না যে, সে প্রেম কেবলমাত্র অথবা প্রধানতঃ স্বামীস্ত্রীর পরস্পর ভালোবাসা হিসাবেই তার মধ্যে বিকশিত হয়েছে। সেটা নাকচ হয়ে যায় পুরুষাধিপত্যাধীন কঠোর একবিবাহের সমগ্র চরিত্রের

ফলেই। ঐতিহাসিকভাবে সক্রিয় সমস্ত শ্রেণীগ‍ুলির মধ্যে অর্থাৎ সমস্ত শাসক শ্রেণীর মধ্যে জোড়বাঁধা পরিবারের সময়ের পর থেকে বিবাহ যা ছিল ঠিক তাই থেকে গিয়েছে — মাতাপিতার ব্যবস্থা করা একটা ব্যাপার। এবং যৌন প্রেমের প্রথম যে র‍ূপ ঐতিহাসিকভাবে আবির্ভূত হচ্ছে প্রেমাবেগ র‍ূপে, যে প্রেমাবেগে অধিকার থাকছে যে কোন ব্যক্তির (অন্তত শাসক শ্রেণীর যে কোন ব্যক্তির), আবির্ভূত হচ্ছে যৌন প্রেরণার সর্বোচ্চ র‍ূপ হিসাবে — এই হল তার বৈশিষ্ট্য — এই যৌন প্রেমের প্রথম র‍ূপটি, মধ্য য‍ুগের শিভালরি প্রণয় আদৌ দাম্পত্য প্রণয় ছিল না। অপরপক্ষে তার চিরায়ত র‍ূপে, প্রভেন্সালদের মধ্যে তা পাল তুলে ছ‍ুটেছে ব্যভিচারের দিকে, আর তার গ‍ুণগান করেছেন কবিরা। জার্মান যে প্রভাত সঙ্গীত (Tagelieder) সেই 'আলবাস' (albas) হচ্ছে প্রভেন্সালদের প্রেমের কবিতার মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তাতে বর্ণোচ্ছল বর্ণনা আছে নাইট্ কী ভাবে প্রণয়িনীর সঙ্গে (অপরের স্ত্রী) রাত্রি যাপন করছে এবং প্রহরী বাইরে পাহারা দিচ্ছে এবং প্রভাতের ক্ষীণ আলো (alba) ফুটবার সঙ্গে সঙ্গেই ডেকে দিচ্ছে যাতে সে অলক্ষিতে পালাতে পারে। তখনকার বিদায় দ‍ৃশ্যই এর শীর্ষবিন্দ‍ু। উত্তরাঞ্চলের ফরাসীরা ও গণ্যমান্য জার্মানরা উভয়েই কাব্যের এ রীতি গ্রহণ করে এর সঙ্গে জড়িত শিভালরি প্রণয়ের রীতিনীতিসমেত; এবং এই ইঙ্গিতপ‍ূর্ণ বিষয় নিয়েই আমাদের প‍ুরাতন কবি ভলফ্রাম ফন এশেনবাখ তিনটি অপ‍ূর্ব প্রভাত-সঙ্গীত দিয়ে গেছেন যেগ‍ুলিকে আমি তাঁর তিনটি বড় বড় বীরগাথার চেয়ে অনেক বেশী পছন্দ করি।

আমাদের য‍ুগে ব‍ুর্জোয়া বিবাহ প্রথা হচ্ছে দ‍ু-রকমের। ক্যাথলিক দেশসম‍ূহে আগের মতোই মাতাপিতা তর‍ুণ ব‍ুর্জোয়া সন্তানের জন্য উপযোগী পাত্রী যোগাড় করে দেন এবং এর ফলে স্বভাবতঃই একপতিপত্নী প্রথার আত্মবিরোধ প‍ূর্ণভাবেই ফুটে ওঠে — স্বামীর দিক থেকে ঢালাও হেটায়ারিজম এবং স্ত্রীর দিক থেকে ঢালাও ব্যভিচার। ক্যাথলিক গির্জা থেকে বিবাহবিচ্ছেদ নিশ্চয়ই এইজন্য নিষিদ্ধ করা হয় যে, তাঁরা ব‍ুঝেছিলেন যে ম‍ৃত্যুর মতোই ব্যভিচারেরও কোন চিকিৎসা নেই। অপরপক্ষে প্রটেস্টাণ্ট দেশগ‍ুলিতে সাধারণতঃ ব‍ুর্জোয়া ঘরের ছেলেকে স্বশ্রেণী থেকে কমবেশী স্বাধীনভাবে স্ত্রী নির্বাচন করতে দেওয়া হয়। ফলে বিবাহের ভিত্তিতে কিছ‍ুটা ভালোবাসা থাকতে পারে এবং শালীনতার জন্য প্রটেস্টাণ্টস‍ুলভ ভণ্ডামিবশে সে ভালোবাসা আছে বলে ধরে নেওয়া হয়। এই ক্ষেত্রে প‍ুর‍ুষের দিক থেকে হেটায়ারিজম অনেক কম এবং স্ত্রীলোকদের পক্ষ থেকে ব্যভিচারও ততটা সাধারণ নয়। কিন্তু যেহেতু প্রত্যেক ধরনের বিবাহেই স্ত্রীপ‍ুর‍ুষ বিবাহের আগে যেমন ছিল পরেও তেমনই থাকে এবং যেহেতু প্রটেস্টাণ্ট দেশসম‍ূহের ব‍ুর্জোয়ারা বেশির ভাগই কূপমণ্ড‍ূক তাই প্রটেস্টাণ্টদের একপতিপত্নী বিবাহের উত্তম দ‍ৃষ্টান্তগ‍ুলির গড়পড়তা ধরলেও তা পরিণত হয় এক নিরেট একঘেঁয়েমির দাম্পত্য-জীবনে, যাকেই বলা হয় দাম্পত্য স‍ুখ। এই দ‍ু-ধরনের বিবাহের

প্রকৃষ্ট দর্পণ হচ্ছে উপন্যাস; ফরাসী উপন্যাসে ক্যাথলিক ধরনের বিবাহের সাক্ষাৎ মেলে এবং জার্মান উপন্যাসে প্রটেস্টাণ্ট ধরনের। উভয় ক্ষেত্রে পুরুষই 'পায়': জার্মান নভেলের তরুণ যুবক পায় একটি তরুণী, ফরাসী নভেলে স্বামী পায় তার প্রবঞ্চনার হেনস্থা। কার দুর্ভোগ যে বেশী সব ক্ষেত্রে বলা শক্ত, কেননা জার্মান নভেলের নীরসতা ফরাসী বুর্জোয়ার মনে যতখানি ভীতি জাগায়, ফরাসী নভেলের 'দুর্নীতি' জার্মান কূপমণ্ডূকের মনে ঠিক ততখানি ভীতি উদ্রেক করে। তবু সম্প্রতি 'বার্লিন মহা নগরীতে পরিণত হওয়ায়' যে হেটায়ারিজম ও ব্যভিচার এখানে বহুদিন থেকেই বর্তমান বলে জানা, তা নিয়ে জার্মান উপন্যাসে কিছুটা কম ভীতি দেখা দিচ্ছে।

কিন্তু উভয় ক্ষেত্রে বিবাহ নির্ভর করে পাত্রপাত্রীদের শ্রেণীর ওপর এবং সেই হিসাবে এগুলি সুবিধার বিবাহই থেকে যায়। উভয় ক্ষেত্রেই এই সুবিধার বিবাহ প্রায়ই অত্যন্ত স্থূল বেশ্যাবৃত্তিতে পরিণত হয় — কখন দুপক্ষের কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রে স্ত্রীর বেলায়; স্ত্রীর সঙ্গে সাধারণ পতিতার পার্থক্য এইটুকু যে, সে ফুরনের মজুরের মতো নিজের দেহ ভাড়া খাটায় না, পরন্তু সে দেহটা বিক্রি করে চিরকালের মতো দাসত্বে। সমস্ত সুবিধামাফিক বিবাহ সম্পর্কে ফুরিয়ের এই মন্তব্য প্রযোজ্য: 'ব্যাকরণে যেমন দুটি নেতিবাচক শব্দে একটি ইতিবাচক শব্দ হয়, তেমনই বিবাহের নীতিশাস্ত্রে দুটি বেশ্যাবৃত্তি মিলে পুণ্যধর্ম হয়ে ওঠে।' কেবলমাত্র শোষিত শ্রেণীগুলির মধ্যে অর্থাৎ বর্তমানে প্রলেতারীয়দের মধ্যে স্ত্রী সম্পর্কে যৌন প্রেম সাধারণ ব্যাপার হতে পারে ও হয়ে থাকে, সরকারীভাবে এই সম্পর্ককে স্বীকার হোক বা না হোক। কিন্তু এ ক্ষেত্রে চিরায়ত একপতিপত্নী প্রথার সমস্ত পুরনো বনিয়াদই আর থাকছে না। যে সম্পত্তির সংরক্ষণ ও উত্তরাধিকারের জন্য একপতিপত্নী প্রথা ও পুরুষের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেরকম সব সম্পত্তিই এখানে অনুপস্থিত। অতএব এখানে পুরুষের আধিপত্য খাটাবার কোন প্রেরণা নেই। উপরন্তু তার উপায়ও নেই: এই আধিপত্য রক্ষা করে যে নাগরিক আইন তার অস্তিত্ব শুধু বিত্তবান শ্রেণীগুলির জন্য এবং প্রলেতারীয়দের সঙ্গে তাদের কারবারের জন্য। এতে টাকাকড়ি লাগে এবং সেইজন্যই শ্রমিকের দারিদ্র্যের জন্য স্ত্রীর সঙ্গে তার আচরণের ব্যাপারে এর কোন কার্যকারিতা নেই। এখানে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধরনের ব্যক্তিগত আর সামাজিক সম্বন্ধই হচ্ছে নির্ধারক ব্যাপার। উপরন্তু, যখন থেকে বৃহৎ শিল্প স্ত্রীলোককে ঘর থেকে শ্রমবাজার ও কারখানায় পাঠাল এবং প্রায়ই তাকে পরিবার পালনে রোজগার করতে হল তখন থেকে প্রলেতারীয় সংসারে পুরুষের আধিপত্যের যা কিছু ভিত্তি ছিল সবই লোপ পেল — একপতিপত্নী বিবাহের প্রতিষ্ঠা থেকে স্ত্রীলোকের প্রতি যে রূঢ়তা দৃঢ়মূল হয়ে গিয়েছিল সম্ভবত তার কিছু কিছু ছাড়া। এইভাবে প্রলেতারীয় পরিবার সঠিক অর্থে আর একপতিপত্নীক নয়; এমনকি যেখানে নিবিড় প্রেম এবং উভয় পক্ষের পরিপূর্ণ বিশ্বস্ততা বর্তমান সেখানেও, এবং

আধ্যাত্মিক ও পার্থিব সমস্ত রকমে মন্ত্রপূত হয়েও। একপতিপত্নী প্রথার দুটি চিরন্তন সঙ্গী হেটায়ারিজম ও ব্যাভিচারের ভূমিকা তাই এখানে প্রায় নগণ্য। বস্তুতঃ স্ত্রীলোক বিবাহবিচ্ছেদের অধিকার ফিরে পেয়েছে এবং বনিবনাও না হলে স্বামী স্ত্রী ছাড়াছাড়ি হতেই পছন্দ করে। সংক্ষেপে, প্রলেতারীয় বিবাহ ব্যুৎপত্তিগত অর্থে একপতিপত্নী হলেও ঐতিহাসিক অর্থে মোটেই নয়।

আমাদের আইনজ্ঞরা অবশ্য বলে থাকেন যে, আইনপ্রণয়নে প্রগতির মধ্যে দিয়ে ক্রমেই বেশী বেশী পরিমাণে স্ত্রীলোকের অভিযোগের কারণগুলি দূর হচ্ছে। আধুনিক সভ্য দেশের আইনবিধি ক্রমশঃই এই জিনিসটা মেনে নিচ্ছে যে, প্রথমত, কার্যকরী হতে গেলে বিবাহকে দুই পক্ষ থেকে স্বেচ্ছামূলক চুক্তির ভিত্তিতে হতে হবে; এবং দ্বিতীয়ত, বিবাহিত অবস্থায় অধিকার ও দায়িত্বের দিক দিয়ে উভয়পক্ষের সমতা থাকবে। যদি এই দুটি দাবি যথাযথভাবে কার্যকরী হয় তাহলে মেয়েদের চাওয়ার আর কিছু থাকে না।

এই টিপিকাল উকিলী যুক্তি হচ্ছে ঠিক সেইরকম যা দিয়ে র‍্যাডিকাল বুর্জোয়া-প্রজাতন্ত্রী প্রলেতারীয়কে ফেরায়। কাজের চুক্তিকে মালিক-শ্রমিক উভয়পক্ষের স্বেচ্ছামূলক মনে করা হয়। কিন্তু **কাগজে কলমে** আইন উভয়পক্ষকে একই ভিত্তিতে দাঁড় করিয়ে দেয় বলে ধরা হয় চুক্তিটি স্বেচ্ছামূলক। ভিন্ন শ্রেণী-অবস্থানের জন্য প্রাপ্ত একটি পক্ষের ক্ষমতা, অপরপক্ষের ওপর তার চাপ, উভয়ের বাস্তব অর্থনৈতিক অবস্থা—এ সব নিয়ে আইন মাথা ঘামায় না। এবং কাজের চুক্তি বলবৎ থাকার সময় উভয়পক্ষকেই সমান অধিকারভোগী মনে করা হয়, যতক্ষণ না কোন এক পক্ষ সুস্পষ্টভাবে এই অধিকার ছেড়ে দিচ্ছে। বিশেষ অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যে শ্রমিক যে তার সমান অধিকারের সামান্যতম আভাসটুকুও ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়, এই বিষয়েও আইনের কিছু করবার নেই।

বিবাহের ব্যাপারে খুব প্রগতিশীল আইনও এইটুকুতেই সন্তুষ্ট যে, উভয়পক্ষ বিবাহে সরকারীভাবে নিজেদের সম্মতি জানিয়েছে। আইনের যবনিকার আড়ালে যেখানে বাস্তব জীবন চলে সেখানে কী ঘটছে, কী ভাবে এই স্বেচ্ছামূলক চুক্তিতে পৌঁছান হচ্ছে, তা নিয়ে আইন এবং আইনজ্ঞ মাথা ঘামায় না। অথচ বিভিন্ন দেশের আইনের মামুলি তুলনা থেকেও আইনজ্ঞ বুঝতে পারবেন যে, এই স্বেচ্ছামূলক চুক্তি আসলে কী দাঁড়ায়। জার্মানিতে, ফরাসী আইনের অধীন সব দেশ ও অন্যান্য দেশগুলিতে যেখানে সন্তানসন্ততিরা বাধ্যতামূলকভাবে পিতামাতার সম্পত্তির ভাগ আইনত পায়, তাদের উত্তরাধিকারচ্যুত করা যায় না, সেখানে বিবাহের প্রশ্নে সন্তানসন্ততিদের মাতাপিতার সম্মতি নিতেই হয়। যেসব দেশে ইংরেজী আইন খাটে, যেখানে বিবাহে মাতাপিতার সম্মতির জন্য আইন-বাধ্যবাধকতা নেই, সেখানে সম্পত্তির ব্যাপারে মাতাপিতার উইলের নিরঙ্কুশ অধিকার আছে এবং তারা যদি ইচ্ছে করে তাহলে সন্তানসন্ততিদের

সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করতে পারে। অতএব এটা স্পষ্ট যে, এ সত্ত্বেও, কিংবা বলা উচিত এইজন্যই যেসব শ্রেণীর মধ্যে উত্তরাধিকারের মতো সম্পত্তি আছে, ইংলন্ডে বা আমেরিকায় তাদের মধ্যে বিবাহের স্বাধীনতা ফ্রান্স বা জার্মানির চেয়ে একছিটে বেশি নয়।

বিবাহে স্ত্রী পুরুষের আইনী সমাধিকারের ক্ষেত্রেও অবস্থা এর চেয়ে ভাল নয়। পূর্বতন সামাজিক অবস্থার উত্তরদায়িত্ব হিসাবে প্রাপ্ত উভয়ের আইনগত অসম অধিকার, এটি স্ত্রীলোকের ওপর অর্থনৈতিক পীড়নের কারণ নয়, ফল। পুরনো সাম্যতন্ত্রী গৃহস্থালীতে যেখানে বহু দম্পতি ও তাদের ছেলেমেয়েরা থাকত সেখানে গৃহস্থালীর ব্যবস্থা স্ত্রীলোকদের উপর ন্যস্ত ছিল, — এই কাজটি পুরুষের খাদ্য আহরণের মতোই একটা সামাজিকভাবে প্রয়োজনীয় বৃত্তি বলে গণ্য হত। পিতৃপ্রধান পরিবার আসার সঙ্গে অবস্থা বদলে গেল এবং আরও বেশী বদলাল একপতিপত্নী স্বতন্ত্র পরিবার আসার ফলে। গৃহস্থালীর কাজকর্মের সামাজিক বৈশিষ্ট্য চলে গেল। এটি আর সমাজের দেখবার বিষয় রইল না, এটি হয়ে দাঁড়াল **ব্যক্তিগত সেবা**। সামাজিক উৎপাদনের ক্ষেত্র থেকে বহিষ্কৃত হয়ে স্ত্রী-ই হল প্রথম ঘরোয়া ঝি। কেবলমাত্র আধুনিক বৃহৎ শিল্পই আবার তাদের সামনে সামাজিক উৎপাদনে প্রবেশের দরজা খুলে দিয়েছে, অবশ্য কেবলমাত্র প্রলেতারীয় স্ত্রীলোকদের জন্যই। কিন্তু সেটা করেছে এরকম ভাবে যে, যখন সে নিজের পরিবারের ব্যক্তিগত সেবার কর্তব্য পালন করে তখন সে সামাজিক উৎপাদনের বাইরে পড়ে যায় এবং কোন কিছু উপার্জন করে না; এবং যখন সে সামাজিক পরিশ্রমে অংশ নিয়ে স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জন করতে চায় তখন আর সে পারিবারিক কর্তব্য পালন করতে পারে না। কারখানার স্ত্রীলোকের পক্ষে যা প্রযোজ্য তা অন্য সব পেশা এমনকি চিকিৎসা ও আইনের পেশাতেও প্রযোজ্য। আধুনিক ব্যক্তিগত পরিবার স্ত্রীলোকের প্রকাশ্য অথবা গোপন গার্হস্থ্য দাসত্বের ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে এবং বর্তমান সমাজ হচ্ছে এইসব ব্যক্তিগত পরিবারের অণুর সমষ্টি। বর্তমানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে অন্তত পক্ষে বিত্তবান শ্রেণীগুলির মধ্যে পুরুষই হচ্ছে উপার্জনকারী, পরিবারের ভরণপোষণের কর্তা এবং এইজন্যই তার আধিপত্য দেখা দেয়, যার জন্য কোন বিশেষ আইনগত সুবিধা দরকার পড়ে না। পরিবারের মধ্যে সে হচ্ছে বুর্জোয়া; স্ত্রী হচ্ছে প্রলেতারিয়েত। কিন্তু শিল্পজগতে যে অর্থনৈতিক শোষণ প্রলেতারিয়েতকে পিষে ধরে তার বিশেষ প্রকৃতি সমগ্র তীক্ষ্নতায় তখনই ফুটে ওঠে যখন পুঁজিপতি শ্রেণীর আইনগত সমস্ত বিশেষ সুবিধা দূর হয়েছে এবং আইনের চক্ষে উভয় শ্রেণীর সম্পূর্ণ সমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র উভয় শ্রেণীর বিরোধ লোপ করে না; পরন্তু সে বিরোধ লড়ে শেষ করার ক্ষেত্র জোগায়। ঠিক একইভাবে আধুনিক পরিবারের মধ্যে স্ত্রীলোকের ওপর স্বামীর আধিপত্যের

বিশেষ চরিত্র এবং উভয়ের মধ্যে সত্যকার সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন ও পদ্ধতি তখনই পুরো ফুটে উঠবে যখন আইনের চক্ষে উভয়ের অধিকার সমান বলে স্বীকৃত হচ্ছে। তখন এ কথা স্পষ্ট হবে যে, সামাজিক উৎপাদনের মধ্যে গোটা স্ত্রীজাতিকে আবার নিয়ে আসাই হচ্ছে তাদের মুক্তির প্রথম শর্ত; এবং এর জন্যই আবার দরকার হচ্ছে সমাজের অর্থনীতির একক হিসাবে ব্যক্তিগত পরিবারের যে গুণটি রয়েছে তার বিলোপ।

* * *

আমরা তাহলে বিবাহের তিনটি মূল রূপ দেখতে পাচ্ছি — এগুলি মনুষ্যজাতির ক্রমবিকাশের তিনটি মূল স্তরের সঙ্গে মোটামুটি মেলে। বন্যাবস্থায় সমষ্টি-বিবাহ, বর্বর-যুগে জোড়বাঁধা বিবাহ, সভ্যতার যুগে একপতিপত্নী সম্পর্ক, তার সঙ্গে ব্যভিচার ও গণিকাবৃত্তির অনুপূরণ। বর্বরতার উচ্চতন স্তরে জোড়বাঁধা বিবাহ ও একপতিপত্নী সম্পর্কের মাঝামাঝি ঢুকে আছে ক্রীতদাসীদের উপর পুরুষের কর্তৃত্ব এবং বহুপত্নী প্রথা।

আমাদের সমগ্র বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, এই পর্যায়ক্রমের অগ্রগতি জড়িয়ে আছে এই একটা অদ্ভুত ব্যাপারের সঙ্গে যে, নারীরাই ক্রমে সমষ্টি-বিবাহের যৌন স্বাধীনতা হারাচ্ছে, পুরুষেরা নয়। বস্তুতঃ পুরুষদের জন্য আজও সমষ্টি-বিবাহ থেকে গিয়েছে। নারীর পক্ষে যা একটা অপরাধ এবং যার জন্য আইন ও সামাজিক বিচারে কঠোর সাজা পেতে হয়, পুরুষের বেলায় সেটা একটা সম্মানের ব্যাপার, বড়জোর সেটা সানন্দে বহন করার মতো একটু নৈতিক কলঙ্ক। অতীতকালের প্রথাগত হেটায়ারিজম যতই আমাদের যুগের পুঁজিবাদী পণ্য উৎপাদন প্রণালীর ফলে বদলে যায় ও তার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া হতে থাকে, এবং যতই এটি নগ্ন পতিতাবৃত্তির রূপ নেয়, এর নৈতিক ফল ততই খারাপ হয়। এবং এতে নারীর চেয়ে পুরুষের অধঃপতন হয় বেশী। নারীদের মধ্যে যে দুর্ভাগারা এর শিকার হতে বাধ্য হয় কেবল তাদেরই অধঃপতন ঘটে এবং তারাও সকলে যতটা সাধারণতঃ মনে করা হয় ততটা অধঃপাতে যায় না। অপরপক্ষে এতে গোটা পুরুষজাতির নৈতিক অধঃপতন ঘটে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, দশটার মধ্যে নয়টি ক্ষেত্রেই দীর্ঘস্থায়ী পূর্বরাগ হয়ে পড়ে কার্যতঃ বিবাহিত জীবনে বিশ্বাসহানির হাতে একটা প্রস্তুতিমূলক পাঠ।

আমরা এমন একটি সমাজ-বিপ্লবের দিকে এগোচ্ছি যখন বর্তমানের একপতিপত্নী প্রথার অর্থনৈতিক ভিত্তি তেমন নিশ্চিতই লোপ পাবে, যেমন লোপ পাবে তার অনুপূরণ পতিতাবৃত্তির অর্থনৈতিক ভিত্তি। একই ব্যক্তির, মানে এক পুরুষের অধিকারে প্রচুর সম্পত্তি কেন্দ্রীভূত হওয়ার ফলে এবং অপর কাউকে নয়, কেবলমাত্র সে পুরুষের নিজের সন্তানসন্ততিকেই সম্পত্তির উত্তরাধিকার দিয়ে যাবার ইচ্ছা থেকেই

এই একপতিপত্নী প্রথা আসে। এইজন্যই নারীর পক্ষেই একপতিত্ব বাধ্যতামূলক, পুরুষের জন্য নয়। অতএব স্ত্রীলোকদের একপতিত্বে পুরুষদের গোপন বা প্রকাশ্য বহুপত্নীত্ব বাধেনি। উত্তরাধিকারযোগ্য স্থায়ী সম্পদের অন্ততপক্ষে বেশির ভাগ অংশকে — উৎপাদনের উপায়কে — সামাজিক সম্পত্তিতে পরিণত করে আসন্ন সমাজ-বিপ্লব কিন্তু উত্তরাধিকারের এই সব দুশ্চিন্তাকে সর্বনিম্নে নামিয়ে আনবে। যেহেতু একপতিপত্নী প্রথা অর্থনৈতিক কারণ থেকে জন্মেছে, তাই সেসব কারণ চলে গেলে কি এটিও লোপ পাবে?

এর উত্তরে যৌক্তিকতার সঙ্গেই বলা চলে: এই প্রথা লোপ না পেয়ে পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হবেই। কারণ উৎপাদনের উপায়গুলি সমাজের সম্পত্তি হওয়ার ফলে মজুরি-শ্রম, প্রলেতারিয়েত লোপ পায় এবং সেই সঙ্গে সমাজের কিছু সংখ্যক স্ত্রীলোকের (সংখ্যাগতভাবে যা গণনাযোগ্য) পক্ষে অর্থের জন্য আত্মদানের আবশ্যকতাও লোপ পাবে। পতিতাবৃত্তি লোপ পাবে এবং একপতিপত্নী প্রথা ক্ষয় না পেয়ে শেষ পর্যন্ত বাস্তব হবে — সেটা পুরুষদের পক্ষেও।

মোটের উপর, পুরুষদের অবস্থা এইভাবে যথেষ্ট পরিমাণে বদলে যাবে। কিন্তু নারীর ক্ষেত্রেও, **সমস্ত** নারীর ক্ষেত্রেও অবস্থার গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটবে। উৎপাদনের উপায় সমাজের সম্পত্তি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ব্যক্তিগত পরিবারগুলি আর সমাজের অর্থনীতির একক (unit) থাকবে না। ব্যক্তিগত গৃহস্থালী পরিণত হবে সামাজিক শিল্পে। শিশুর পরিচর্যা ও শিক্ষা হয়ে ওঠবে সামাজিক ব্যাপার, বিবাহবন্ধনের মারফৎ অথবা তার বাইরে, শিশু যেভাবেই জন্মাক না কেন, সমাজ তাদের সকলের সমান দায়িত্ব নেবে। এইজন্যই 'ভবিষ্যৎ ফলাফলের' দুশ্চিন্তা নীতিগত ও অর্থনৈতিক উভয় দিক থেকে যেটি আজ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক কারণ — যেজন্য একটি মেয়ে যাকে ভালবাসে সেই পুরুষের কাছে অবাধে আত্মসমর্পণ করতে পারে না — সেই কারণ আর থাকবে না। এটা কি অধিকতর অবাধ যৌন সঙ্গমের ক্রমিক উদ্ভব ঘটাবার মতো এবং সেই সঙ্গে কৌমার্যের মর্যাদা ও স্ত্রীলোকের লজ্জাশরম সম্বন্ধে আরো শিথিল একটা জনমত উদ্ভবের মতো কারণ ঘটাবে না কি? এবং সর্বশেষে বর্তমান জগতে একপতিপত্নী প্রথা ও পতিতাবৃত্তি সম্পূর্ণ বিপরীত হলেও তারা পরস্পর অবিচ্ছেদ্য বিপরীত, একই সামাজিক অবস্থার দুটি মেরু, — এটা কি আমরা দেখিনি? তাই একপতিপত্নী প্রথাকেও বিলুপ্ত না করে কি গণিকাবৃত্তি লোপ পেতে পারে?

এখানে একটি নতুন জিনিস কার্যকরী হতে থাকবে, এমন একটি জিনিস যা একপতিপত্নী প্রথার সূচনার সময় বড়জোর ভ্রূণ আকারে ছিল, যথা, ব্যক্তিগত যৌন প্রেম।

মধ্য যুগের আগে ব্যক্তিগত যৌন প্রেম বলে কোনো জিনিস ছিল না। এ কথা

স্পষ্ট যে, ব্যক্তিগত সৌন্দর্য, অন্তরঙ্গ সাহচর্য, সমধর্মী প্রবণতা ইত্যাদি অবশ্য তখনও নরনারীর মধ্যে যৌন সম্পর্কের কামনা জাগাত এবং তখনও এই অন্তরঙ্গ সম্পর্ক কার সঙ্গে পাতাচ্ছে সে বিষয়ে নর ও নারী একেবারে নির্বিকার থাকত না। কিন্তু একালের যৌন প্রেম থেকে এটির অনেক পার্থক্য। প্রাচীন যুগে সর্বদা মাতাপিতাই বিবাহ স্থির করতেন; পাত্রপাত্রীরা নীরবে মেনে নিত। প্রাচীন কালে যেটুকু দাম্পত্য প্রেম জানা ছিল সেটা মোটেই একটা মানসিক প্রবৃত্তি ছিল না, ছিল একটা বাস্তব কর্তব্য, সেটা বিয়ের কারণ নয়, বিয়ের আনুষঙ্গিক। প্রাচীন কালে আধুনিক অর্থে প্রেম যদি হয়ে থাকে তাহলে সরকারী সমাজের গণ্ডীর বাইরেই তা হয়েছে। যে মেষপালকদের ভালোবাসার সুখ ও দুঃখের গান থিওক্রিটাস ও মোসাস রচনা করেছেন অথবা লঙ্গোসের রচনার 'ড্যাফনিস ও ক্লোয়ে', — এরা নিতান্তই ক্রীতদাস যারা রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশ নিতে পারত না, যেটা ছিল স্বাধীন নাগরিকদের এলাকা। গোলাম ছাড়া প্রেমের সম্পর্ক যা পাওয়া যেত, তা হচ্ছে ক্ষয়িষ্ণু প্রাচীন জগতের ভাঙ্গনের ফলস্বরূপ; সে প্রেম হত যে স্ত্রীলোকদের সঙ্গে তারা ছিল প্রচলিত সমাজের বহির্ভূত — হেটায়ার অর্থাৎ বিদেশিনী বা মুক্তিপ্রাপ্তা নারী: এথেন্সে অবনতির প্রাক্কালে এবং রোমে সাম্রাজ্যের সময়ে। যদি কখনও স্বাধীন নাগরিক নরনারীর মধ্যে প্রেম সম্পর্ক হত, তো সেটা হত কেবল ব্যভিচার হিসাবেই। আর আমাদের যুগের অর্থে যৌন প্রেম প্রাচীন কালের ক্লাসিকাল প্রেমের কবি এনাক্রিয়নের কাছে এতই অবাস্তব ছিল যে, তাঁর প্রিয় পাত্রটি স্ত্রী কিম্বা পুরুষ তাতে তাঁর একেবারে কিছুই এসে যেত না।

প্রাচীন যুগের সহজ যৌন কামনা বা eros থেকে আমাদের যৌন প্রেমের বহু পার্থক্য আছে। প্রথমত, এতে প্রেমিকদের মধ্যে পরস্পর ভালোবাসা ধরে নেওয়া হয়; এই বিষয়ে নারী পুরুষের সমাধিকারী; কিন্তু প্রাচীন কালের eros-র ব্যাপারে সর্বদাই স্ত্রীলোকের মতামত নেওয়া হত মোটেই এমন নয়। দ্বিতীয়ত, যৌন প্রেম এমন মাত্রার তীব্রতা এবং স্থায়ীত্ব জানে যে, প্রেমিক-প্রেমিকা পরস্পরকে না পাওয়াকে অথবা বিচ্ছেদকে সর্বাধিক না হলেও বৃহৎ দুর্ভাগ্য বলে মনে করে; পরস্পরকে পাবার জন্য তারা বড় বড় বিপদের সম্মুখীন হয়, এমনকি জীবন পর্যন্ত বিপন্ন করে, প্রাচীন কালে যে ব্যাপারটি ঘটে বড়ো জোর কেবল ব্যভিচারের ক্ষেত্রে। সবশেষে যৌন সঙ্গমের ব্যাপারে এক নতুন নৈতিক মানদণ্ড এসে যায়: এখন মূল প্রশ্ন এই নয় যে, এই সম্পর্ক বৈধ বা অবৈধ, এই প্রশ্নও ওঠে যে, সেটা পরস্পর ভালোবাসা থেকে নাকি নয়। বলা বাহুল্য যে, সামন্ত অথবা বুর্জোয়া আচরণে অন্য সব নৈতিক মানদণ্ডের চেয়ে এর অবস্থা বেশী সুবিধার নয়, — একে স্রেফ উপেক্ষা করা হয়। তবে অন্য মানদণ্ডের চেয়ে খারাপ বলেও মনে করা হয় না: অপরগুলির মতো একেও তত্ত্ব হিসাবে কাগজে কলমে মেনে নেওয়া হয় এবং বর্তমানে এর চেয়ে বেশী আশা করা যায় না।

যৌন প্রেমের যে সূচনাতেই প্রাচীন যুগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, মধ্য যুগ সেখান থেকেই, অর্থাৎ ব্যাভিচার থেকেই শুরু করল। আমরা ইতিপূর্বেই শিভালরি প্রেমের বর্ণনা দিয়েছি যা থেকে প্রভাত সঙ্গীতের উৎপত্তি। এই যে প্রেমের লক্ষ্য ছিল বিবাহবন্ধন ভাঙ্গা আর যে প্রেম হবে বিবাহবন্ধনের ভিত্তিস্থানীয়, এই দুয়ের মধ্যে তখনো দুস্তর ব্যবধান থেকে গেছে। শিভালরির যুগে এই ব্যবধান সম্পূর্ণভাবে কাটান যায়নি। এমনকি যখন আমরা লঘুচরিত্র ল্যাটিন জাতি ছেড়ে ধর্মপ্রাণ জার্মানদের দিকে তাকাই তাহলে নিবেলুঙ্গের গানে আমরা দেখতে পাই, — যে, ক্রিমহিল্ড্ ও জিগফ্রিড উভয় উভয়কে গোপনে কেউ কাউকে একচুল কম ভালোবাসত না, তবু গুন্থার যখন একজন অনামিত নাইটকে তার জন্য বাগদান করেছেন জানালেন, তখন জবাবে ক্রিমহিল্ড শুধু বলল, 'আমাকে জিজ্ঞাসা করবার কোনো দরকার নেই। আপনি যা আদেশ করবেন, আমি তাই করব। হে প্রভু, আপনি যাকেই আমার স্বামী মনোনীত করবেন আমি তাকেই বরণ করব।' এ কথা তার মনে কখনই স্থান পায়নি যে, এই ব্যাপারে তার প্রেম কোনো রূপে বিবেচ্য হতে পারে। গুন্থার আগে কখন না দেখেও ব্রুনহিল্ডের পাণিপ্রার্থনা করলেন আর এট্জেলও তাই করলেন ক্রিমহিল্ডের ক্ষেত্রে। 'গুড্রুন'এ এই একই ব্যাপার দেখা যায়, এতে আয়র্ল্যাণ্ডের সিগেবাণ্ট নরওয়ের উটের পাণিপ্রার্থনা করছেন, হেগেলিংগেনের হেটেল হচ্ছেন আয়র্ল্যাণ্ডের হিলডের বিবাহপ্রার্থী; এবং সবশেষে মোর্লাণ্ডের জিগফ্রিড, অর্মানের হার্টমুট্ এবং জিল্যাণ্ডের হেরুইং গুড্রুনের পাণিপ্রার্থনা করলেন, এবং এখানেই সর্বপ্রথম দেখা গেল যে, গুড্রুন স্বেচ্ছায় শেষোক্তের পক্ষেই মত দিলেন। তরুণ রাজপুত্রের পিতামাতা পাত্রী ঠিক করবেন, এই ছিল নিয়ম; এঁদের অবর্তমানে পাত্র অধীনস্থ উচ্চতম সর্দারদের পরামর্শ নিতেন এবং সর্বদাই তাঁদের কথায় যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হত। অন্য কিছু হওয়া সম্ভব ছিল না। কারণ, নাইট অথবা ব্যারনের পক্ষে, যেমন স্বয়ং রাজপুত্রের পক্ষেও বিবাহ ছিল একটি রাজনৈতিক কাজ, নতুন বিবাহসম্পর্ক মারফৎ শক্তিবৃদ্ধির একটি সুযোগ। এতে নির্ধারক ব্যাপার ছিল **বংশের** স্বার্থ, ব্যক্তিগত প্রবণতা নয়। এখানে প্রেমের দাবিই বিবাহের সিদ্ধান্তে চূড়ান্ত হবে এমন আশা কি করা যায়?

মধ্যযুগের নগরগুলিতে গিল্ড শিল্পপতিদের মধ্যেও এই একই জিনিস দেখা যায়। তার রক্ষাকল্পে যে বিশেষ অধিকার রয়েছে, বিশেষ বিশেষ সর্তসহ গিল্ড সনদ, যেসব কৃত্রিম বিধান দিয়ে অন্যান্য গিল্ড থেকে, সহযোগী গিল্ড শিল্পপতিদের থেকে, এর নিজের এ্যাপ্রেণ্টিস ও মজুরদের থেকে পৃথক থাকত, তাতে যোগ্য পাত্রী সংগ্রহের ক্ষেত্র তার হত অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। এই জটিল ব্যবস্থার অধীনে কে উপযুক্ত পাত্রী সেটা নিশ্চয় স্থির হত ব্যক্তিগত পছন্দ দিয়ে নয়, পরন্তু পরিবারের স্বার্থ দিয়ে।

অতএব মধ্য যুগের শেষ পর্যন্ত সুবিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ ক্ষেত্রেই বিবাহ থেকে

গিয়েছিল ঠিক তাই, যা ছিল তার প্রারম্ভিক যুগে — এমন একটি ব্যাপার যা প্রধান দুটি পক্ষ স্থির করছে না। প্রথমে লোকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিবাহিত হয়ে যেত বিপরীত লিঙ্গের গোটা সমষ্টির সঙ্গে। সমষ্টি-বিবাহের পরবর্তী ধাপগুলিতে বিবাহের পরিধি ক্রমশ ছোট হয়ে এলেও সম্পর্কটা সম্ভবতঃ আগের মতোই ছিল। জোড়বাঁধা বিবাহে মায়েরাই সাধারণতঃ ছেলেমেয়েদের বিয়ে ঠিক করত এবং এখানেও গোত্র সংগঠনে ও উপজাতির মধ্যে কী ধরনের নতুন কুটুম্বিতা সূত্রে দম্পতির প্রতিপত্তি বাড়বে সেই বিচারই ছিল নির্ধারক। এবং পরে যখন সাধারণ সম্পত্তির তুলনায় ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রাধান্য এবং উত্তরাধিকারের স্বার্থে পিতৃ-অধিকার ও একপতিপত্নী প্রথা প্রতিষ্ঠিত হল, তখন বিবাহ সম্পূর্ণভাবে অর্থনৈতিক বিচার-বিবেচনার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ল। ক্রয় করে বিবাহের প্রথা লোপ পেল, কিন্তু এই বেচাকেনা ব্যাপারটাই ক্রমশই বেশি করে এমনভাবে চলল, যাতে শুধু মেয়েদের নয় পুরুষেরও মূল্য যাচাই করা হত ব্যক্তিগত গুণ দিয়ে নয়, সম্পত্তি দিয়ে। পাত্রপাত্রীর পরস্পর আকর্ষণকে বিবাহের চূড়ান্ত যুক্তি গণ্য করা শুরু থেকেই শাসক শ্রেণীগুলির ব্যবহারের মধ্যে কখনও শোনা যায়নি। এরকম ঘটনা ঘটত বড়জোর প্রেমের কাহিনীতে অথবা নিপীড়িত শ্রেণীগুলির মধ্যে, যেটা ধর্তব্য নয়।

পুঁজিবাদী উৎপাদনের সূচনায় এই ছিল অবস্থা, যখন ভৌগোলিক আবিষ্কারের যুগের পর পৃথিবীব্যাপী বাণিজ্য ও কারখানা-শিল্প মারফৎ পৃথিবী জয়ে তা প্রবৃত্ত হল। মনে হতে পারে যে, উপরোক্ত ধরনের বিবাহই ছিল এর পক্ষে খুব উপযোগী, কার্যতঃও তাই হল। তবুও বিশ্ব ইতিহাসের বিদ্রূপ অফুরন্ত, পুঁজিবাদী উৎপাদনের ফলেই এই প্রথায় চূড়ান্ত ভাঙ্গন ঘটল। সমস্ত জিনিসকে পণ্যে পরিণত করে এই পদ্ধতি পুরনো ঐতিহ্যগত সব সম্পর্ক ভেঙ্গে দিল এবং বংশানুক্রমিক প্রথা ও ঐতিহাসিক অধিকারের জায়গায় আনল কেনাবেচা, 'স্বাধীন' চুক্তি। ইংরেজ আইনবিদ হেনরি মেইন ভেবেছিলেন, তিনি এ কথা বলে এক বিরাট আবিষ্কার করে ফেলেছেন যে, আগেকার যুগগুলি থেকে আমাদের সমগ্র অগ্রগতি হচ্ছে এই যে, আমরা এসেছি from status to contract, বংশানুক্রমিক একটা অবস্থা থেকে স্বেচ্ছামূলক চুক্তিতে। প্রসঙ্গতঃ, এই উক্তির মধ্যে যতটুকু নির্ভুল, তা অনেক আগেই 'কমিউনিস্ট ইশতেহারে' দেওয়া হয়েছিল।

চুক্তিবদ্ধ হতে হলে চাই এমন সব লোক যারা নিজেদের দেহ, কাজ ও সম্পত্তিকে স্বাধীনভাবে লেনদেন করতে পারে এবং যারা সমান শর্তে পরস্পরের সম্মুখীন হচ্ছে। পুঁজিবাদী উৎপাদনের অন্যতম প্রধান কাজই হল ঠিক এইরকম 'স্বাধীন' ও 'সমাধিকারী' লোক সৃষ্টি করা। যদিও গোড়ার দিকে এই কাজ অর্ধচেতনভাবে এবং তদুপরি ধর্মের আবরণে হয়েছে, তবুও লুথার ও কালভাঁ-এর 'ধর্মসংস্কার আন্দোলনের' (রিফরমেশন) সময় থেকেই এটি একটি বদ্ধমূল নীতি দাঁড়িয়েছে যে, মানুষ তখনই কেবল তার কাজের

জন্য সম্পূর্ণ দায়ী যখন সে কাজ করার সময় তার ইচ্ছার পূর্ণ স্বাধীনতা থেকেছে এবং অনৈতিক কর্মের জন্য সর্ববিধ বাধ্যতা প্রতিরোধ করাই হল নৈতিক কর্তব্য। কিন্তু এই ব্যাপারের সঙ্গে ইতিপূর্বে প্রচলিত বিবাহপ্রথা মেলে কী করে? বুর্জোয়া ধারণা অনুযায়ী বিবাহ হচ্ছে একটি চুক্তি, একটি আইনগত ব্যাপার, তদুপরি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণই চুক্তি, কারণ এতে দুটি মানুষের শরীর ও মন সারা জীবনের জন্য বিকিয়ে যাচ্ছে। খুব সত্য যে, কাগজে কলমে তখন এই চুক্তি স্বেচ্ছামূলকভাবেই হয়; পাত্রপাত্রীর সম্মতি ছাড়া এই কাজ হয় না, কিন্তু সকলেই জানেন, কী করে সে সম্মতি আদায় করা হয় এবং আসলে কারা এ বিবাহ ঘটায়। অথচ অপর সব চুক্তির ক্ষেত্রে যখন সিদ্ধান্তের সত্যকার স্বাধীনতা দাবি করা হচ্ছে তখন এক্ষেত্রে কেন তা হবে না? যে দুজন তরুণ তরুণী জুড়ি বাঁধতে যাচ্ছে, নিজেদের দেহ ও দেহাংশের স্বাধীন বিলিবন্দোবস্তের অধিকার নেই কি তাদের? শিভালরির দরুন কি যৌন প্রেম ফ্যাশন হয়ে ওঠেনি এবং নাইটদের ব্যভিচারী প্রেমের বিপরীতে স্বামীস্ত্রীর ভালোবাসা কি তার সঠিক বুর্জোয়া রূপ নয়? কিন্তু বিবাহিতদের কর্তব্য যদি হয় পরস্পরের প্রতি প্রেম, তাহলে আর কাউকে নয় পরস্পরকেই বিবাহ করা কি প্রেমিকদের কর্তব্য দাঁড়ায় না? প্রেমিক প্রেমিকার এই অধিকার কি বাপমা, আত্মীয়স্বজন প্রভৃতি চিরাচরিত সব ঘটকঘটকীদের চেয়ে অগ্রগণ্য নয়? যদি গির্জা ও ধর্মের ক্ষেত্রে স্বাধীন ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের অধিকার বেপরোয়া ঢুকে পড়ে থাকে, তাহলে তরুণ পুরুষদের দেহমন অর্থসম্পত্তি সুখদুঃখ বিলিবন্দোবস্ত করবার ব্যাপারে বয়োজ্যেষ্ঠদের অসহ্য দাবির সামনেই তা বা চুপ করবে কেন?

যে যুগ সমস্ত পুরনো সামাজিক বন্ধন শিথিল করে দিয়েছিল এবং সমস্ত চিরাচরিত প্রত্যয়ের ভিত্তি নাড়িয়ে দিয়েছিল, সেই যুগে এইসব প্রশ্ন উঠতে বাধ্য। এক ধাক্কায় দুনিয়ার পরিধি প্রায় দশগুণ বেড়ে গেল। একটি গোলার্ধের এক চতুর্থাংশের জায়গায় পশ্চিম ইউরোপের লোকদের কাছে গোটা পৃথিবীই উন্মুক্ত হয়ে গেল এবং এই বাকি সাত চতুর্থাংশ ভাগ দখলের জন্য তাদের মধ্যে তাড়াহুড়া পড়ে গেল। জন্মভূমির সাবেকী সংকীর্ণ গন্ডী যে ভাবে ভাঙল ঠিক সেই ভাবেই মধ্য যুগের নির্দিষ্ট চিন্তাপ্রণালীর আরোপিত হাজার বছরের পুরান সব প্রতিবন্ধও গেল। মানুষের অন্তর্দৃষ্টি ও বহির্দৃষ্টির সামনে একটি অসীম বিস্তারের দিগন্ত খুলে গেল। যে তরুণকে প্রলুব্ধ করেছে ভারতের দৌলত এবং মেক্সিকো ও পতোজির সোনারূপার খনি তার কাছে সাবেকী সম্ভ্রমের শুভেচ্ছা এবং বংশানুক্রমে পাওয়া সম্মানীয় গিল্ড অধিকারের দাম কতটুকু? এটি ছিল বুর্জোয়াদের ভ্রাম্যমাণ নাইটবৃত্তির যুগ; এরও ছিল নিজস্ব রোমান্স এবং নিজস্ব প্রণয়ের স্বপ্ন, কিন্তু তা হচ্ছে বুর্জোয়া ভিত্তিতে এবং শেষ বিচারে, বুর্জোয়া লক্ষ্যেরই অনুসরণে।

দেখা গেল, বিশেষতঃ প্রটেস্টান্ট দেশগুলিতে যেখানে চলতি সমাজব্যবস্থা সবচেয়ে বেশী নাড়া খেয়েছিল সেখানে উদীয়মান বুর্জোয়া শ্রেণী ক্রমেই বিবাহের ক্ষেত্রেও চুক্তির স্বাধীনতা মেনে নিল এবং উল্লিখিতভাবে তা চালু করল। বিবাহ এখনও শ্রেণী বিবাহই রয়ে গেল, কিন্তু শ্রেণীর চৌহদ্দির মধ্যে পাত্রপাত্রীরা বাছাই করবার কিছুটা স্বাধীনতা পেল। এবং কাগজে কলমে, নীতিতত্ত্বে ও কাব্যের বিবরণে প্রত্যেকটি বিবাহ পরস্পরের যৌন প্রেমের দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত না হলে এবং তার পিছনে স্ত্রী পুরুষের সত্যকার স্বাধীন সম্মতি না থাকলে, সে বিবাহ নীতিহীন বলে যতটা অটলভাবে প্রমাণিত হল তেমন আর কিছু নয়। সংক্ষেপে, প্রেম করে বিবাহ ঘোষিত হল মানবীয় অধিকার বলে, শুধু পুরুষের অধিকার নয় (droit de l'homme), পরন্তু, ব্যতিক্রম হিসাবে স্ত্রীলোকেরও অধিকার (droit de la femme)।

কিন্তু এক বিষয়ে এই মানবীয় অধিকারের সঙ্গে অন্য সব তথাকথিত মানবীয় অধিকারের পার্থক্য ছিল। কার্যত শেষোক্ত অধিকারগুলি রইল শাসক শ্রেণী বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ, নিপীড়িত শ্রেণী প্রলেতারিয়েত ছিল প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সে অধিকার থেকে বঞ্চিত, কিন্তু এইখানে ইতিহাসের পরিহাস ফের দেখা যায়। শাসক শ্রেণী পরিচিত অর্থনৈতিক প্রভাবের অধীনেই রইল এবং সেজন্য কিছু কিছু ব্যতিক্রমের ক্ষেত্রেই কেবল তাদের মধ্যে যথার্থ স্বেচ্ছামূলক বিবাহ দেখা যায়, অপরপক্ষে আমরা আগেই দেখেছি যে, নিপীড়িত শ্রেণীর মধ্যে স্বেচ্ছামূলক বিবাহই হচ্ছে নিয়ম।

এইভাবে আমরা দেখি যে, বিবাহের ক্ষেত্রে পূর্ণ স্বাধীনতা সাধারণভাবে তখনই কার্যকরী হতে পারে, যখন পুঁজিবাদী উৎপাদন এবং তারই সৃষ্টি করা মালিকানা সম্পর্ক বিলুপ্ত হয়ে সেইসব গৌণ অর্থনৈতিক হিসাবকে হটিয়ে দেয়, যেগুলি বিবাহের সঙ্গী নির্বাচনের উপর এত প্রভাব বিস্তার করে। তখন পরস্পর আকর্ষণ ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্য থাকবে না।

যেহেতু যৌন প্রেম প্রকৃতিগতভাবেই একবদ্ধ — যদিও বর্তমানে কেবল স্ত্রীলোকের বেলাতেই এই একবদ্ধতা পূর্ণমাত্রায় রূপায়িত হয় — সেইজন্য যৌন প্রেমের ভিত্তিতে বিবাহ হচ্ছে প্রকৃতিগতভাবেই একপতিপত্নী প্রথা। আমরা আগেই দেখেছি যে, বাখোফেন যখন সমষ্টি-বিবাহ থেকে একবিবাহে অগ্রগতিকে প্রধানতঃ স্ত্রী লোকদের কীর্তি বলেছিলেন তখন তিনি কত সঠিক ছিলেন; জোড়বাঁধা বিবাহ থেকে একপতিপত্নী প্রথায় অগ্রগতিকেই কেবল পুরুষের কাজ বলা যায় এবং ঐতিহাসিকভাবে এতে বস্তুতঃ স্ত্রীলোকের অবস্থার ক্রমাবনতি ঘটেছে এবং পুরুষের ক্ষেত্রে বিশ্বাসহানির সুযোগ বেড়েছে। তাই যে সমস্ত অর্থনৈতিক কারণের জন্য স্ত্রীলোকেরা পুরুষের নিত্যকার বিশ্বাসহানি সহ্য করতে বাধ্য হত, — নিজেদের জীবনযাত্রা নিয়ে এবং তার চেয়ে বেশী

সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগ — তার বিলোপের সঙ্গে সঙ্গেই স্ত্রীলোকের যে সমতা অর্জিত হবে তার ফলে অতীত সমস্ত অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায়, স্ত্রীলোক বহুগামিনী না হয়ে বরং পুরুষই আরও কার্যকরীভাবে সত্যই একপত্নীব্রতই হবে।

কিন্তু একপতিপত্নী প্রথা থেকে যা নিশ্চিতই চলে যাবে তা হচ্ছে পুরনো মালিকানা প্রথা থেকে এ বিবাহ উদ্ভূত হওয়ায় তার ওপর যেসব বৈশিষ্ট্য মুদ্রিত হয়ে গিয়েছিল সেগুলি যথা, প্রথমত, পুরুষের আধিপত্য এবং দ্বিতীয়ত, বিবাহবন্ধনের অচ্ছেদ্যতা। বিবাহের ক্ষেত্রে পুরুষের আধিপত্য হচ্ছে তার আর্থিক আধিপত্যের প্রত্যক্ষ ফল এবং এ আর্থিক আধিপত্য লোপের সঙ্গে সঙ্গে আপনা আপনি তা লোপ পাবে। বিবাহবন্ধনের অচ্ছেদ্যতা অংশতঃ এসেছে সেই অর্থনৈতিক অবস্থার কারণে যার মধ্যে একপতিপত্নী প্রথার উদ্ভব এবং অংশতঃ এমন একটি যুগের রীতি থেকে যখন এইসব অর্থনৈতিক অবস্থা ও একপতিপত্নী প্রথার যোগাযোগ সঠিক হৃদয়ঙ্গম করা যায়নি এবং ধর্মে তা অতিরঞ্জিত হয়ে উঠত। বর্তমানেও বিবাহবন্ধন হাজারো গুণ লঙ্ঘিত। যদি কেবলমাত্র প্রেমের ভিত্তিতে বিবাহই নীতিসিদ্ধ হয়, তাহলে বিবাহ তখনই নীতিসিদ্ধ যতক্ষণ প্রেম থাকে। ব্যক্তিগত যৌন প্রেমের অনুভূতির স্থায়িত্ব কিন্তু ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, বিশেষতঃ পুরুষদের মধ্যে খুবই বিভিন্ন হয়; তাই যখন একটি প্রেম একেবারে চলে যায় অথবা অপর একটি নূতন প্রেমাবেগ তার জায়গা নেয়, তখন স্বামী স্ত্রী উভয়ের পক্ষে এবং সমাজের পক্ষেও বিচ্ছেদ একটি আশীর্বাদ। বিবাহবিচ্ছেদ মামলার নিষ্প্রয়োজন কাদা মাড়িয়ে যাবার অভিজ্ঞতাটা শুধু আর সইতে হবে না।

অতএব আমরা এখানে পুঁজিবাদী উৎপাদনের আসন্ন বিলোপের পরে কী ভাবে যৌন সম্পর্ক পরিচালিত হবে, সে বিষয়ে যে আন্দাজ করতে পারি সেটা প্রধানতঃ নেতিমূলক চরিত্রের, কেবলমাত্র কী কী লোপ পাবে তাই নিয়ে তা সীমাবদ্ধ। কিন্তু কোন্ কোন্ জিনিসের উদ্ভব হবে? সেটি দেখা যাবে নতুন পুরুষ গড়ে উঠবার পর, এমন সব পুরুষ যাদের কখনও পয়সা বা অন্য কোন সামাজিক ক্ষমতা দিয়ে কোন স্ত্রীলোককে খরিদ করার কারণ ঘটেনি, আর এমন সব নারী যারা সত্যকার প্রেমের অনুভূতি ছাড়া আর কোন কারণে পুরুষের কাছে আত্মদানে কখনো বাধ্য হয়নি, অথবা যাদের কোন অর্থনৈতিক ফলাফলের ভয়ে প্রণয়পাত্রের কাছে আত্মদানে বিরত হতে হয়নি। এই ধরনের সব লোক একবার আবির্ভূত হলে আজ আমরা তাদের করণীয় বলে কী ভাবি সে নিয়ে তারা বিন্দুমাত্র বিচলিত হবে না। তখন তারা চালু করবে নিজেদের আচার এবং ব্যক্তি আচরণ বিষয়ে নিজেদের সামাজিক মত, যা তার সঙ্গেই মিলবে, বাস।

এবার ফেরা যাক মর্গানের রচনায় যেখান থেকে আমরা অনেকটা সরে এসেছি। সভ্যতার যুগে যেসব সামাজিক প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হয়েছে সেগুলির ঐতিহাসিক

পর্যালোচনা ঐ রচনার গণ্ডীর মধ্যে পড়ে না। কাজে কাজেই তিনি এই পর্বের একপতিপত্নী প্রথার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন। তিনিও এক-পতিপত্নী পরিবারের বিকাশকে একটা অগ্রগতি মনে করেছেন স্ত্রীপুরুষের পূর্ণ সমানাধিকারের কাছাকাছি, যদিও অবশ্য এই লক্ষ্যে পেঁছান গেছে বলে তিনি মনে করেননি। কিন্তু তিনি লিখেছেন, 'যখন এই ব্যাপারটি মেনে নেওয়া হয় যে, পরিবার পর পর চারটি রূপের মধ্য দিয়ে গেছে এবং এখন পঞ্চম রূপ চলছে, তখন অমনি এই প্রশ্ন ওঠে যে, এই বর্তমান রূপ ভবিষ্যতে দীর্ঘস্থায়ী হবে কি না? এর একমাত্র এই উত্তর দেওয়া যায় যে, সমাজের অগ্রগতির সঙ্গে এরও অগ্রগতি হবে এবং সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে এরও পরিবর্তন হবে, যেমনটি অতীতে ঘটেছে। এটি হল সমাজব্যবস্থার সৃষ্টি এবং তারই সংস্কৃতি প্রতিফলিত হবে এতে। সভ্যতার সূচনার পরে যখন একপতিপত্নী পরিবারের অনেক উন্নতি হয়েছে এবং বিশেষ করে আধুনিক কালে, তখন এ কথা অন্তত অনুমান করা চলে যে, স্ত্রীপুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত তা আরো উন্নতির সামর্থ্য রাখে। সুদূর ভবিষ্যতে যদি একপতিপত্নী পরিবার সমাজের প্রয়োজন পূরণের উপযোগী না হয়, তাহলে এর জায়গায় কী আসবে তার প্রকৃতি সম্বন্ধে কোন ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় না।'

৩

ইরকোয়াস গোত্র-সংগঠন

এবার আমরা আসছি মর্গানের আর একটি আবিষ্কারে যেটি আত্মীয়তাবিধি থেকে পরিবারের প্রাগৈতিহাসিক রূপ পুনর্গঠনের চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। মর্গান প্রমাণ করেছেন যে, আমেরিকার ইন্ডিয়ান উপজাতিগুলির মধ্যে বিভিন্ন পশু নামধারী আত্মীয়মণ্ডলীগুলি মূলতঃ গ্রীকদের genea এবং রোমকদের gentes থেকে অভিন্ন; আমেরিকার রূপটি হল আদি রূপ এবং গ্রীক ও রোমকদের রূপগুলি হচ্ছে পরবর্তী ও তদুদ্ভূত রূপ; গোত্র, ফ্রাত্রি, উপজাতি রূপে গ্রীক ও রোমকদের আদি কালের সমগ্র সমাজ সংগঠনের একটা নিখুঁত সমান্তরাল আমেরিকার ইন্ডিয়ানদের মধ্যে দেখা যায়; সমস্ত বর্বরদের মধ্যে সভ্যতায় প্রবেশ করা অবধি এমন কি তারপরেও গোত্র প্রথা একটা সাধারণ প্রতিষ্ঠান (এই সময় পর্যন্ত যত তথ্য পাওয়া গিয়েছে তদনুযায়ী)। এইটে প্রমাণিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আদি গ্রীক ও রোমক ইতিহাসের সবচেয়ে দুর্বোধ্য অংশ এক লহমায় পরিষ্কার হয়ে যায়। একইসঙ্গে এই আবিষ্কারটি **রাষ্ট্রের** সূচনার পূর্ববর্তী প্রাচীন সমাজ সংগঠনের মূল বৈশিষ্ট্যগুলির উপর অপ্রত্যাশিতভাবে আলোকপাত করে। জানবার পরে এটা যতই সোজা মনে হোক না কেন, মর্গান কিন্তু খুব সম্প্রতি

এটি আবিষ্কার করেন। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর পূর্ববর্তী রচনায়* এই গূঢ় তত্ত্ব তিনি ধরতে পারেননি যার আবিষ্কারে ইংরেজদের মতো সাধারণতঃ অতি আত্মবিশ্বাসসম্পন্ন প্রাগৈতিহাসিক পন্ডিতেরাও কিছু দিনের জন্য মূষিকের মতো চুপ হয়ে গিয়েছিলেন।

এই রক্তসম্পর্কযুক্ত আত্মীয়মন্ডলীর জন্য মর্গান সাধারণ আখ্যা হিসাবে ল্যাটিন ভাষার gens শব্দটি ব্যবহার করেছেন, এটি গ্রীক প্রতিশব্দ genos-এর মতোই এসেছে তাদের সাধারণ আর্য মূল gan থেকে (জার্মান ভাষায় আর্য ভাষার g-এর জায়গায় যেখানে সাধারণতঃ k ব্যবহৃত হয়, সেখানে এটি হয় Kan), যার অর্থ হচ্ছে 'জনন'। Gens, genos, সংস্কৃত ভাষার 'জনস্', গথদের Kuni (পূর্বোল্লিখিত নিয়মানুযায়ী), প্রাচীন নর্ডিক ও অ্যাংলোস্যাক্সন kyn, ইংরেজী kin, মধ্য জার্মানির উচ্চভূমিতে künne, এই সমস্ত শব্দগুলিই গোত্র ও উৎপত্তির দ্যোতক। কিন্তু ল্যাটিন শব্দ gens আর গ্রীক শব্দ genos এমন রক্তসম্পর্কযুক্ত আত্মীয়মন্ডলীগুলির জন্য ব্যবহৃত হয় যারা একই উৎপত্তির গর্ব করে (এই ক্ষেত্রে একই সাধারণ পূর্বপুরুষ) এবং কয়েকটি বিশিষ্ট সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের মারফৎ এরা একত্র গ্রথিত হয়ে ওঠে একটা বিশেষ গোষ্ঠী হিসাবে, যদিও এত কাল পর্যন্ত আমাদের সমস্ত ঐতিহাসিকদের কাছে এর উৎপত্তি ও প্রকৃতি অস্পষ্ট ছিল।

পুনালুয়া পরিবারের সম্পর্কে পূর্বের আলোচনায় আমরা দেখেছি আদি রূপের একটা গোত্র সংগঠন কী রূপ। যে সমস্ত লোক পুনালুয়া বিবাহের ফলে এবং অনিবার্যভাবেই তথায় প্রাধান্যকারী ধারণা অনুযায়ী একটি নির্দিষ্ট বিশিষ্ট মাতার গোত্র-প্রতিষ্ঠাত্রীর বংশধররূপে পরিগণিত, তাদের নিয়েই এ গোত্র ওঠে। এই রূপ পরিবারে পিতৃত্ব অনিশ্চিত বলে মাতৃ-ধারাই একমাত্র প্রামাণ্য। যেহেতু ভাইয়েরা নিজেদের বোনদের বিবাহ করতে পারে না, পরন্তু অন্য বংশের মেয়েদের বিবাহ করতে হয়, সেইজন্য এই শেষোক্ত মেয়েদের ছেলেমেয়েরা মাতৃ-অধিকার অনুযায়ী গোত্রের বাইরে পড়ে। অতএব প্রত্যেক পুরুষের শুধু **কন্যাদের** ছেলেমেয়েরাই আত্মীয়মন্ডলীর মধ্যে থেকে যায় এবং ছেলেদের সন্তানসন্ততিরা তাদের মায়েদের গোত্রের অন্তর্ভুক্ত হয়। অতএব একই উপজাতির মধ্যে, অনুরূপ ধরনের বিভিন্ন গোষ্ঠী থেকে এই যে রক্তসম্পর্কযুক্ত গোষ্ঠীটি পৃথক হয়ে যাচ্ছে তার রূপ তখন কী হয়?

মর্গান এই আদি গোত্রের চিরায়ত রূপ হিসাবে ইরকোয়াস গোত্র, বিশেষতঃ সেনেকা উপজাতির গোত্রকে ধরেছেন। এই উপজাতির মধ্যে আটটি গোত্র আছে, বিভিন্ন পশুর

* L. H. Morgan, *System of Consanquinity and Affinity of the Human Family,* Washington, 1871. (এল. এইচ. মর্গান, 'মানব পরিবারের জ্ঞাতি ও আত্মীয়তা ব্যবস্থা', ১৮৭১।) — সম্পাঃ

নাম অনুযায়ী তাদের নাম করা হয়েছে: ১) নেকড়ে, ২) ভালুক, ৩) কচ্ছপ, ৪) বীবর, ৫) হরিণ, ৬) স্নাইপ্, ৭) বক, ৮) বাজপাখি। প্রত্যেকটি গোত্রে নিম্নলিখিত আচার প্রচলিত:

১। এরা নির্বাচিত করে একজন সাচেম্ (শান্তির সময়ে প্রধান ব্যক্তি) এবং একজন সর্দার (যুদ্ধের দলপতি)। গোত্রের ভেতর থেকেই সাচেম্‌কে নির্বাচিত করতে হয় এবং তার পদ হচ্ছে গোত্রের মধ্যে বংশানুক্রমিক এই অর্থে যে, এই পদ শূন্য হলে তৎক্ষণাৎ তা পূরণ করতে হয়। যুদ্ধের দলপতি গোত্রের বাইরে থেকেও নির্বাচিত করা যায় এবং এই পদটি কখন কখন শূন্যও থাকতে পারে। পূর্ববর্তী সাচেমের ছেলে কখনও এই সাচেমের পদ পেতে পারে না, কারণ ইরকোয়াসদের মধ্যে মাতৃ-অধিকার প্রচলিত ছিল এবং সেইজন্য ছেলে অন্য গোত্রে পড়ত। কিন্তু ভাই অথবা ভাগিনেয় প্রায়ই নির্বাচিত হত। পুরুষ ও স্ত্রী সকলেই নির্বাচনে ভোট দিত, কিন্তু এই নির্বাচনকে অপর সাতটি গোত্রের কাছে অনুমোদিত হতে হত এবং তখনই কেবল নির্বাচিত ব্যক্তিকে আনুষ্ঠানিকভাবে বরণ করা হত। আবার সেটা হত সমগ্র ইরকোয়াস উপজাতি সমামেলের সাধারণ পরিষদ দ্বারা। পরে এর তাৎপর্য বোঝা যাবে। গোত্রের মধ্যে সাচেমের কর্তৃত্ব ছিল পিতৃসুলভ ও নিছক নৈতিক ধরনের। জবরদস্তির কোনো উপকরণ তার হাতে থাকত না। নিজের পদমর্যাদার বলে সেইসঙ্গেই সে ছিল সেনেকা উপজাতীয় পরিষদের একজন সভ্য তথা ইরকোয়াস সমামেলের সাধারণ পরিষদেরও সভ্য। যুদ্ধের সর্দার কেবলমাত্র যুদ্ধাভিযানের সময় হুকুম দিতে পারত।

২। গোত্র ইচ্ছামত সাচেম ও সর্দারকে পদচ্যুত করতে পারে। এটাও স্ত্রী ও পুরুষেরা উভয়ে মিলিতভাবে স্থির করে। তারপরে পদচ্যুত ব্যক্তি অপর সকলের মতো সাধারণ যোদ্ধা ও সাধারণ ব্যক্তি বলে পরিগণিত হত। উপজাতির পরিষদ গোত্রের মতের বিরুদ্ধেও সাচেমকে পদচ্যুত করতে পারে।

৩। কোনো লোকই নিজের গোত্রের মধ্যে বিয়ে করতে পারে না। এইটাই হচ্ছে গোত্রের মূল নিয়ম, এই বন্ধন ধরে রাখে গোত্রকে; যে অতি ইতিবাচক রক্তসম্পর্কের জোরে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা মিলিত হয়ে সত্য সত্যই গোত্র গড়ে তোলে, এটি তার নেতিবাচক প্রকাশ। মর্গান এই সহজ ব্যাপারটি আবিষ্কার করে সর্বপ্রথম গোত্রের প্রকৃতি প্রকাশ করলেন। তার আগে পর্যন্ত গোত্রের প্রকৃতি যে কত কম জানা ছিল, বন্য ও বর্বরদের সম্পর্কে ইতিপূর্বের বিবরণ থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়; সেখানে গোত্র সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন গোষ্ঠীকে অজ্ঞতার সঙ্গে নির্বিচারে উপজাতি, ক্লান, থাম্ (thum) প্রভৃতি বলা হয়েছে; এদের সম্পর্কে আবার কখন কখন বলা হয়েছে যে, এ রকম গোষ্ঠীর ভিতরে বিবাহ নিষিদ্ধ। এতে এমন একটা অসম্ভব তালগোলের সৃষ্টি হয় যাতে ম্যাক-লেনান এসে হস্তক্ষেপ করে নেপোলিয়নের মতো শৃঙ্খলা আনলেন এই ফতোয়া দিয়ে:

সমস্ত উপজাতি দুই ভাগে বিভক্ত, একদলদের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ (বহির্বিবাহিক) এবং অন্য দলে নিজেদের মধ্যে বিবাহ চলে (অন্তর্বিবাহিক)। এইভাবে সমস্ত ব্যাপারটিকে একেবারে গুলিয়ে দিয়ে তাঁর এই দুটি আজব শ্রেণীর মধ্যে, বহির্বিবাহ ও অন্তর্বিবাহের মধ্যে কোনটি আগে ও কোনটি পরে তাই নিয়ে গভীর গবেষণায় মাততে পারলেন। এই অর্থহীন চেষ্টা রক্তসম্পর্কের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত গোত্র এবং সেইহেতু গোত্র সভ্যদের মধ্যে বিবাহের অসম্ভাব্যতা আবিষ্কারের পরে আপনা আপনি থেমে গেল। স্পষ্টতঃই ইরকোয়াসদের আমরা বিকাশের যে স্তরে দেখি, সেখানে গোত্রের মধ্যে বিবাহ নিষেধের নিয়ম অটলভাবে মানা হয়।

৪। মৃত ব্যক্তিদের সম্পত্তি গোত্রের বাকি সভ্যদের কাছে যেত — এই সম্পত্তি গোত্রের মধ্যেই থাকা চাই। যেহেতু একজন ইরকোয়াস তেমন বেশী কিছু রেখে যেতে পারত না, সেইজন্য এই উত্তরাধিকার গোত্রের নিকটতম আত্মীয়দের মধ্যে ভাগ হত; একজন পুরুষমানুষ মারা গেলে তা পেত সহোদর ভাইবোন ও নিজের মামারা; একজন স্ত্রীলোক মারা গেলে তা যেত তার নিজের ছেলেমেয়ে ও সহোদর বোনেদের কাছে, কিন্তু তার নিজের ভাইয়েদের কাছে নয়। ঠিক এই কারণেই স্বামী বা স্ত্রী একে অপরের সম্পত্তি পেতে পারত না এবং ছেলেমেয়েরা বাপের সম্পত্তি পেত না।

৫। গোত্রের সভ্যরা পরস্পরের সাহায্য ও রক্ষায় বাধ্য ছিল, বিশেষতঃ বাইরের কেউ কোন ক্ষতি করলে তার প্রতিশোধের জন্য সাহায্য করতে হত। নিজের নিরাপত্তার জন্য ব্যক্তি গোত্রের রক্ষণাবেক্ষণের ওপর নির্ভর করত এবং করতে পারত; একটি ব্যক্তিকে আঘাত করলেই সমগ্র গোত্রকে আঘাত করা হত। এর থেকে অর্থাৎ গোত্রের রক্তের বন্ধন থেকে এসেছে রক্তের বদলা নেবার দায়িত্ব; ইরকোয়াসরা সর্তহীনভাবে এটি মানত। গোত্রের বাইরের কেউ গোত্রের কোন সভ্যকে হত্যা করলে নিহত ব্যক্তির গোটা গোত্র প্রতিশোধের শপথ নিত। প্রথমত মিটমাটের চেষ্টা হত। হত্যাকারীর গোত্র পরিষদের অধিবেশন হত এবং নিহত ব্যক্তির গোত্র পরিষদের কাছে ব্যাপারটি শান্তিতে মীমাংসার জন্য প্রস্তাব পাঠানো হত প্রধানতঃ দুঃখপ্রকাশ করে ও দামী জিনিস উপহার দিয়ে। এই প্রস্তাব গ্রহণ করলে ব্যাপারটি সেইখানে মিটে যেত। অন্যথায় নিহত ব্যক্তির গোত্রের এক বা একাধিক ব্যক্তির উপর প্রতিশোধের ভার দেওয়া হত, তাদের কর্তব্য হত হত্যাকারীর পিছনে লেগে থেকে তাকে হত্যা করা। এই কাজ সম্পন্ন হলে নিহত ব্যক্তির গোত্রের অভিযোগ করবার কোন অধিকার থাকত না; ধরে নেওয়া হত যে, ব্যাপারটি চুকে গেল।

৬। গোত্রের একটি বা একসার নির্দিষ্ট নাম থাকে, যে নাম সমস্ত উপজাতির মধ্যে কেবলমাত্র এরাই ব্যবহার করতে পারে, যাতে করে একজন ব্যক্তির নাম থেকে বোঝা যায় সে কোন গোত্রের লোক। গোত্রের নামের সঙ্গে সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে গোত্রের অধিকারগুলিও জড়িত থাকে।

৭। গোত্র বিজাতীয়দেরও নিজের মধ্যে গ্রহণ করতে পারে এবং তার ফলে এই বিজাতীয়রা গোটা উপজাতির অন্তর্ভুক্ত হয়। যেসব যুদ্ধবন্দীদের মেরে ফেলা হত না তাদের এভাবে কোনো গোত্রের অন্তর্ভুক্ত করে সেনেকা উপজাতির সভ্য করা হত এবং এর ফলে তারা উপজাতি ও গোত্রের পূর্ণ অধিকার পেত। গোত্রের ব্যক্তিগত সদস্যদের প্রস্তাবে এই লোকদের গ্রহণ করা হত: পুরুষমানুষেরা বহিরাগতকে ভাই বা বোন বলে গ্রহণ করত, স্ত্রীলোকেরা সন্তানসন্ততি বলে গ্রহণ করত। জিনিসটিকে পাকা করবার জন্য গোত্র কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করা প্রয়োজনীয় হত। যেসব গোত্রের জনসংখ্যা বিশেষ কোনো অবস্থার জন্য কমে যেত তারা অপর কোন গোত্র থেকে তার সম্মতিতে ব্যাপকভাবে নিজেদের মধ্যে লোক গ্রহণ করত। ইরকোয়াসদের ভেতর উপজাতির পরিষদের প্রকাশ্য সভায় গোত্রের মধ্যে লোক নেবার অনুষ্ঠান হত, কার্যতঃ এই ব্যাপারটি একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানের রূপ নিত।

৮। ইণ্ডিয়ান গোত্রের মধ্যে বিশেষ ধর্মীয় উৎসবের প্রমাণ পাওয়া শক্ত, কিন্তু তবুও ইণ্ডিয়ানদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলি কমবেশী পরিমাণে গোত্রের সঙ্গে জড়িত। ইরকোয়াসদের মধ্যে তাদের বার্ষিক ছয়টি ধর্মের উৎসবে এক একটি গোত্রের সাচেম ও সর্দারদের পদাধিকার বলে 'ধর্মের রক্ষক' হিসেবে গণ্য করা হত এবং তারা পুরোহিতের কাজ করত।

৯। গোত্রের একটি সাধারণ সমাধিস্থান থাকত। নিউ ইয়র্ক স্টেটের যে ইরকোয়াসরা শ্বেতজাতির বেষ্টনীর মধ্যে পড়েছে তাদের মধ্যে এখন এই সমাধিস্থান লোপ পেলেও আগে ছিল। অন্যান্য ইণ্ডিয়ান উপজাতিদের মধ্যে এটা এখনও আছে, যেমন ইরকোয়াসদের খুব ঘনিষ্ঠ একটি উপজাতি টুস্কারোরাসদের মধ্যে। এরা খ্রীষ্টান হয়ে গেলেও এখনও এদের সমাধিস্থানে প্রত্যেকটি গোত্রের জন্য এক একটি পৃথক সারি আছে, যেখানে একই সারিতে মা ও সন্তানসন্ততিদের কবর দেওয়া হয়, কিন্তু বাপকে নয়। ইরকোয়াসদের মধ্যেও গোত্রের সমস্ত সদস্যই অন্ত্যেষ্টিতে অংশগ্রহণ করে, কবর তৈরী করে, অন্ত্যেষ্টি ভাষণ দেয় ইত্যাদি।

১০। গোত্রের একটি পরিষদ থাকে — গোত্রের সমস্ত পূর্ণবয়স্ক পুরুষ ও মেয়েদের নিয়ে সমান অধিকারের ভিত্তিতে গঠিত গণতান্ত্রিক সভা। এই পরিষদ সাচেম ও সর্দারদের এবং একইভাবে অন্যান্য 'ধর্মের রক্ষকদেরও' নির্বাচন ও খারিজ করত। এই পরিষদ গোত্রের নিহত সদস্যদের জন্য প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ দান-দক্ষিণা (Wergeld) অথবা রক্তপ্রতিশোধের সিদ্ধান্ত নিত, বাইরের লোকদের গোত্রে গ্রহণ করত। সংক্ষেপে এইটাই হচ্ছে গোত্রের উচ্চতম ক্ষমতা।

এই হল একটি টিপিকাল ইণ্ডিয়ান গোত্রের অধিকার। 'একটি ইরকোয়াস গোত্রের সমস্ত সদস্যরা ব্যক্তিগতভাবে স্বাধীন এবং পরস্পরের স্বাধীনতা রক্ষা করতে বাধ্য;

ব্যক্তিগত অধিকারের দিক দিয়ে তারা সমান, সাচেম ও সর্দারদের কোনো সুযোগসুবিধা নেই; তারা ছিল রক্তের বন্ধনে মিলিত একটি ভ্রাতৃমণ্ডলী। কদাচ সূত্রবদ্ধ করা না হলেও স্বাধীনতা, সমানাধিকার ও ভ্রাতৃত্ব ছিল গোত্রের মৌলিক নীতি। আবার গোত্র হল একটি সমাজব্যবস্থার ইউনিট, এই বনিয়াদের ওপরই ইন্ডিয়ানদের সমাজ সংগঠিত হয়েছিল। ইন্ডিয়ানদের চরিত্রের সর্বজনীন স্বীকার্য বৈশিষ্ট্য -- স্বাধীনতাবোধ ও ব্যক্তিগত মর্যাদাজ্ঞানের ব্যাখ্যা এর থেকে মেলে।'

আমেরিকা আবিষ্কারের সময় সমগ্র উত্তর আমেরিকার ইন্ডিয়ানরা মাতৃ-অধিকারভিত্তিক গোত্রে সংঘবদ্ধ ছিল। ডাকোটার মতো কয়েকটি মাত্র উপজাতির মধ্যে গোত্র ভগ্নদশায় পড়েছিল এবং ওজিবোয়া ও ওমাহা প্রভৃতি অন্য কয়েকটি উপজাতির মধ্যে পিতৃ-অধিকারের ভিত্তিতে গোত্র সংগঠিত হয়েছিল।

সংখ্যাবহুল যেসব ইন্ডিয়ান উপজাতির মধ্যে পাঁচ বা ছয়ের বেশি গোত্র ছিল, তাদের মধ্যে তিনটি, চারটি বা ততোধিক গোত্র একত্র হয়ে একটি বিশিষ্ট জনসমষ্টি দেখি। তাকে ইন্ডিয়ান ভাষায় যা বলা হয় তার হুবহু গ্রীক অনুবাদে মর্গান এর নাম দেন ফ্রাত্রী (ভ্রাতৃত্ব)। এইভাবে সেনেকাদের মধ্যে দুটি ফ্রাত্রী আছে, প্রথমটির মধ্যে এক থেকে চার নম্বর গোত্র আছে এবং দ্বিতীয়টির মধ্যে পাঁচ থেকে আট নম্বর। পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখলে বোঝা যায় যে, এই ফ্রাত্রীগুলি প্রধানতঃ হচ্ছে সেইসব আদি গোত্র যাতে উপজাতিটি শুরুতে বিভক্ত ছিল। কারণ একই গোত্রের ভিতরে বিবাহ নিষিদ্ধ হবার পর প্রত্যেকটি উপজাতির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রাখতে হলে তার কমপক্ষে দুটি গোত্র থাকা চাই। উপজাতির লোক বাড়ার সঙ্গে প্রত্যেকটি গোত্র আবার দুই বা ততোধিক গোত্রে ভাগ করা হয় এবং এরা প্রত্যেকে একটি স্বতন্ত্র গোত্রের রূপ নেয় আর আদি গোত্রটি সন্ততি গোত্রগুলি নিয়ে ফ্রাত্রীর রূপ নেয়। সেনেকা ও অন্য বেশির ভাগ ইন্ডিয়ান উপজাতির মধ্যে একটি ফ্রাত্রীর অন্তর্ভুক্ত গোত্ররা হচ্ছে ভ্রাতৃ গো.এ. অপরপক্ষে অন্য ফ্রাত্রীর গোত্ররা হল তাদের কাজিন গোত্র। আমেরিকার ইন্ডিয়ানদের আত্মীয়তাবিধির এই নামকরণের যে অতি বাস্তব এবং অর্থব্যঞ্জক তাৎপর্য আছে তা আমরা আগেই দেখেছি। প্রথমে কোনো সেনেকা নিজের ফ্রাত্রীর মধ্যে বিবাহ করতে পারত না, কিন্তু এই নিষেধ অনেকদিন হল চলে গিয়ে এখন কেবল গোত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সেনেকাদের ঐতিহ্য অনুযায়ী 'ভল্লুক' ও 'হরিণ' হচ্ছে দুটি আদি গোত্র এবং বাকিগুলি এদের শাখাপ্রশাখা। এই ধরনের নতুন সংগঠন দৃঢ়মূল হবার পরেই প্রয়োজনমতো এর পরিবর্তন হয়েছে। কোনো ফ্রাত্রীর গোত্রগুলি মরে গেলে ভারসাম্য রক্ষার জন্য অন্য ফ্রাত্রীর মধ্যে থেকে কখন কখন গোটাগুটি সব গোত্র সরিয়ে আনা হত এই ফ্রাত্রীতে। এইজন্যই আমরা দেখি যে, একই নামের গোত্র বিভিন্ন উপজাতির ফ্রাত্রীগুলির মধ্যে বিভিন্ন ধরনে সন্নিবিষ্ট হয়েছে।

ইরকোয়াসদের মধ্যে ফ্রাত্রীর কাজ হচ্ছে অংশতঃ সামাজিক এবং অংশতঃ ধর্মীয়। ১) দুটি ফ্রাত্রীর মধ্যে বল খেলা হয়, প্রতিটি ফ্রাত্রী নিজের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়দের আনে এবং ফ্রাত্রীর বাকি সদস্যরা দর্শক হয়ে ফ্রাত্রী অনুযায়ী স্থান নেয় এবং নিজ নিজ ফ্রাত্রীর জয়লাভের জন্য বাজি ধরে। ২) উপজাতির পরিষদের অধিবেশনে প্রত্যেকটি ফ্রাত্রীর সাচেম ও সর্দারেরা একত্রে বসে দুটি দলে মুখোমুখি হয়ে, এবং প্রত্যেক বক্তা প্রতিটি ফ্রাত্রীর প্রতিনিধিদের পৃথক সংস্থা হিসাবে সম্ভাষণ করে। ৩) যদি উপজাতির মধ্যে কোন লোক নিহত হয় এবং নিহত ব্যক্তি ও হত্যাকারী একই ফ্রাত্রীর সভ্য না হয়, তাহলে নিহতের গোত্র ভ্রাতৃপদবাচ্য গোত্রদের কাছে আবেদন জানায় এবং এরা ফ্রাত্রীর পরিষদ ডেকে গোটা সংস্থা হিসাবে অন্য ফ্রাত্রীর কাছে ব্যাপারটির শান্তিতে মীমাংসার জন্য সেই ফ্রাত্রীর পরিষদ আহ্বান করতে বলে। এ ক্ষেত্রেও তাহলে ফ্রাত্রী আদি গোত্রের রূপেই দেখা দিচ্ছে এবং আলাদা আলাদা দুর্বল শাখাপ্রশাখার গোত্রের চেয়ে তার পক্ষে সফল হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশী। ৪) পদস্থ কোন ব্যক্তির মৃত্যুতে অপর ফ্রাত্রী অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও সমাধির ব্যবস্থা করে এবং মৃতের ফ্রাত্রীর লোকেরা যায় শোকযাত্রী হিসাবে। একজন সাচেম মারা গেলে অপর ফ্রাত্রী ইরকোয়াসদের সমামেলের পরিষদকে পদশূন্য হয়েছে বলে বিজ্ঞাপিত করে। ৫) ফ্রাত্রীর পরিষদকে আবার সাচেম নির্বাচনের সময় দেখা যায়। নির্বাচনে ভ্রাতৃ গোত্রের সমর্থনটা প্রায় অবধারিত বলে ধরা হত, কিন্তু অন্য ফ্রাত্রীর গোত্রেরা বিরোধিতা করতে পারত। এ রকম হলে প্রথম ফ্রাত্রীর পরিষদের বৈঠক হত এবং তারা যদি বিরোধীদের সমর্থন করত তাহলে নির্বাচন বাতিল হয়ে যেত। ৬) আগেকার দিনে ইরকোয়াসদের বিশেষ বিশেষ ধর্মীয় গুহ্যাচার ছিল যাকে শ্বেত জাতির লোকেরা medicine-lodges (বৈদ্যের সভা) আখ্যা দিয়েছিলেন। সেনেকাদের মধ্যে এই ধরনের অনুষ্ঠানগুলি দুটি ধর্মীয় ভ্রাতৃমণ্ডলীর দ্বারা অনুষ্ঠিত হত, এক একটি ফ্রাত্রীর জন্য একটি মণ্ডলী; এতে নতুন সদস্য নেবার জন্য নিয়মিত দীক্ষানুষ্ঠান হত। ৭) দেশজয়ের সময়ে* যে চারটি linages (গোত্র) ত্লাসকালার চারটি এলাকা অধিকার করেছিল তারা যদি চারটি ফ্রাত্রী হয়ে থাকে, যা প্রায় নিশ্চিত, তাহলে প্রমাণিত হয় যে, এই ফ্রাত্রীরা গ্রীকদের মতো অথবা জার্মানদের সমজাতীয় আত্মীয়গোষ্ঠীর মতো সামরিক ইউনিট হিসাবেও কাজ করত। এই চারটি linages পৃথক সৈন্যদল হিসাবে নিজস্ব উর্দি ও পতাকা নিয়ে এবং নিজস্ব নেতার অধীনে যুদ্ধে যেত।

যেমন কয়েকটি গোত্র নিয়ে একটি ফ্রাত্রী, তেমনই গোত্র প্রথার চিরায়ত রূপ হিসাবে কয়েকটি ফ্রাত্রী মিলে একটি উপজাতি হত। কিছু ক্ষেত্রে খুব ক্ষয়িষ্ণু

* ১৫১৯—১৫২১ সালে স্পেনীয়-বিজয়ীগণ কর্তৃক মেক্সিকো জয়ের কথা বলা হচ্ছে। — সম্পাঃ

উপজাতির মধ্যে এই মধ্যবর্তী স্তর বা ফ্রাত্রী দেখা যায় না। আমেরিকায় ইন্ডিয়ান উপজাতিগুলির বৈশিষ্ট্য কী কী?

১। নিজস্ব ভূখন্ড ও নিজস্ব নামের অস্তিত্ব। প্রত্যক্ষ বসবাসের এলাকা ছাড়াও প্রত্যেকটি উপজাতির দখলে মাছ ধরা ও পশু শিকারের জন্য বেশ বিস্তীর্ণ অঞ্চল থাকত। এর পরে এবং প্রতিবেশী উপজাতির দখলী অঞ্চল অবধি বেশ বিস্তৃত নিরপেক্ষ ভূখন্ড থাকত; দুটি পাশাপাশি উপজাতির ভাষা সমগোত্রীয় হলে এই নিরপেক্ষ ভূখন্ড অপেক্ষাকৃত ছোট হত, এবং না হলে তা বিস্তৃত হত। এই রকম নিরপেক্ষ ভূখন্ডই ছিল জার্মানদের সেই সীমান্ত অরণ্য, সিজারের সুয়েভিরা (suevi) নিজস্ব ভূখন্ডের চারপাশে যে ঊষরভূমি রেখেছিল, দিনেমার ও জার্মানদের মাঝখানকার îsarnholt (ডেনিশ ভাষায় jarnved, limes Danicus), জার্মান ও স্লাভদের মাঝখানে স্যাক্সন অরণ্য এবং branibor (স্লাভ ভাষায় 'প্রতিরক্ষার অরণ্য') যার থেকে ব্রান্দেনবুর্গ নাম এসেছে। এইভাবে অসুনির্দিষ্ট সীমানার ভিতরকার ভূখন্ডটি ছিল উপজাতির সাধারণের ভূমি যা প্রতিবেশী উপজাতিরা মানত এবং উপজাতিটি বাইরের আক্রমণ থেকে এ ভূমিটা রক্ষা করত। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে সীমানার অনিশ্চয়তা নিয়ে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে অসুবিধা হত কেবল তখনই, যখন জনসংখ্যা খুব বেড়ে গেছে। উপজাতির নাম ভেবেচিন্তে স্থির করার চেয়ে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আকস্মিকতার ফল বলেই মনে হয়। কালক্রমে প্রায় দেখা যেত যে, প্রতিবেশী উপজাতিরা একটি উপজাতির নিজেদের ব্যবহৃত নামের বদলে অন্য নাম দিয়েছে, যেমন জার্মানদের (die Deutschen) ক্ষেত্রে, এদের প্রথম ব্যাপক ঐতিহাসিক নাম 'জার্মানী' (germanen) হচ্ছে কেল্টিকদের দেওয়া।

২। একটি উপজাতির একটি বিশেষ **উপভাষা**। বস্তুত উপজাতি ও উপভাষা মোটামুটি মিলে যায়। অল্প কিছুকাল আগেও আমেরিকায় বিভাজনের মধ্যে দিয়ে নূতন নূতন উপজাতি ও উপভাষার সৃষ্টির প্রক্রিয়া চলছিল এবং এখনও তা একেবারে থেমে গেছে বলে মনে হয় না। যেখানে দুটি ক্ষয়িষ্ণু উপজাতি মিলে একটি হয়, সেখানে দেখা যায় যে, ব্যতিক্রম হিসাবে একই উপজাতির মধ্যে দুটি ঘনিষ্ঠ উপভাষা বলা হচ্ছে। এক একটি আমেরিকান উপজাতির জনসংখ্যা গড়ে দুই হাজারের নীচে। চেরকী উপজাতির লোকসংখ্যা কিন্তু প্রায় ছাব্বিশ হাজার — এই হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইন্ডিয়ানদের মধ্যে সর্বাধিক সংখ্যা যারা একই উপভাষা ব্যবহার করে।

৩। গোত্রগুলির দ্বারা নির্বাচিত সাচেম ও সর্দারদের ক্ষমতাভিষিক্ত করার অধিকার।

৪। গোত্রের মতের বিরুদ্ধে হলেও তাদের অপসারণের অধিকার। যেহেতু সাচেম ও সর্দারেরা উপজাতির পরিষদেরও সদস্য, সেইজন্য তাদের ওপর উপজাতির এই অধিকারের ব্যাখ্যা স্বতই মিলছে। যেখানে অনেক উপজাতি মিলে একটি সমামেল

প্রতিষ্ঠা করে এবং প্রত্যেক উপজাতিই এক সম্মিলিত পরিষদে প্রতিনিধি পাঠায়, সেখানে উক্ত অধিকার এই সম্মিলিত পরিষদে বর্তায়।

৫। একটি সাধারণ ধর্মীয় ধ্যান-ধারণা (পুরাণ) ও পূজাপদ্ধতির অস্তিত্ব। 'নিজেদের বর্বর ধরনে আমেরিকার ইণ্ডিয়ানরাও ছিল ধর্মপ্রাণ।' তাদের পুরাণ নিয়ে এখনও মোটেই বিচারমূলক অনুসন্ধান হয়েছে বলা যায় না। তারা ধর্মের ধারণাগুলিকে মানবীয় রূপ দিয়েছিল — নানা ধরনের ভূত প্রেত, — কিন্তু বর্বরতার যে নিম্নতন স্তরে তারা ছিল তাতে তাদের মধ্যে তখনো মূর্তি রচনা, তথাকথিত দেব মূর্তির প্রচলন হয়নি। এটা হল প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক শক্তির পূজা, যা বিকশিত হয়ে উঠছিল বহু-ঈশ্বরবাদে (polytheism)। বিভিন্ন উপজাতির ছিল নিজের নিজের বিশিষ্ট পূজাপ্রথা যথা নাচ ও খেলাধূলা সম্বলিত নিয়মিত ধর্মোৎসব। প্রত্যেকটি ধর্মোৎসবে বিশেষ করে নৃত্য ছিল আবশ্যিক অঙ্গ, প্রত্যেকটি উপজাতি নিজের নিজের এ অনুষ্ঠান করত পৃথকভাবে।

৬। সাধারণ ব্যাপার নিষ্পত্তির জন্য একটি উপজাতীয় পরিষদ। এতে থাকত প্রত্যেকটি গোত্রের সাচেম ও সর্দাররা — এরাই ছিল গোত্রের প্রকৃত প্রতিনিধি, কারণ এদের যে-কোন সময়ে পদচ্যুত করা যেত। প্রকাশ্যভাবে পরিষদের অধিবেশন হত, এদের ঘিরে থাকত উপজাতির বাকি মানুষ; এদের আলোচনায় অংশ নেওয়া ও নিজেদের মতামত ব্যক্ত করার অধিকার ছিল; পরিষদই সিদ্ধান্ত করত। উপস্থিত প্রত্যেকেই পরিষদের সামনে সাধারণতঃ বলতে পারত, স্ত্রীলোকেরাও নিজেদের পছন্দমত কোন মুখপাত্র মারফৎ নিজেদের অভিমত প্রকাশ করতে পারত। ইরকোয়াসদের মধ্যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তগুলি সর্বসম্মতিক্রমে করতে হত, ঠিক যেমনটি হত জার্মানদের মার্ক গোষ্ঠীগুলির অনেক সিদ্ধান্তের ব্যাপারে। বিশেষ করে অন্যান্য উপজাতির সঙ্গে সম্পর্কের ব্যাপারগুলি উপজাতীয় পরিষদের দায়িত্বে হত। এরা দূত গ্রহণ করত ও দূত পাঠাত, যুদ্ধ ঘোষণা ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করত। যুদ্ধ শুরু হলে স্বেচ্ছাসেবকরাই প্রধানতঃ যুদ্ধ চালাত। যাদের সঙ্গে সুস্পষ্ট শান্তি চুক্তি নেই, তেমন প্রত্যেক উপজাতির সঙ্গেই উপজাতিটির নীতিগতভাবে যুদ্ধের অবস্থা বর্তমান। এই ধরনের শত্রুদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানের সংগঠন করত সাধারণতঃ কয়েকজন পুরোগামী যোদ্ধা। তারা যুদ্ধের একটি নাচের ব্যবস্থা করত; এই নাচে যোগদানের অর্থ ছিল অভিযানে যোগ দিতে রাজী হওয়া। তখনই একটি সৈন্যদল গঠিত হত এবং দেরি না করে তারা যাত্রা করত। যখন উপজাতির এলাকা আক্রান্ত হত তখনও ঐ একইভাবে প্রধানতঃ স্বেচ্ছাসেবকরাই প্রতিরক্ষা চালাত। এই ধরনের দলের যাত্রা ও প্রত্যাবর্তন সর্বদাই হত এক একটা সামাজিক উৎসবের উপলক্ষ। এইরকম অভিযানের জন্য উপজাতীয় পরিষদের মত নেবার দরকার হত না। এইরকম সম্মতি চাওয়াও হত না এবং দেওয়াও

হত না। এগুলি ছিল ঠিক সেই ট্যাসিটাসের বর্ণিত জার্মান বাহিনীগুলির বেসরকারী (প্রাইভেট) অভিযানের মতো, কেবল পার্থক্য এই যে, জার্মানদের মধ্যে বাহিনীগুলি ইতিমধ্যেই বেশী স্থায়ী রূপ নিয়েছিল এবং শান্তির সময়ে এরা একটি শক্তিশালী কেন্দ্ররূপে থাকত যাদের চারপাশে যুদ্ধের সময়ে স্বেচ্ছাসৈনিকেরা এসে জমত। এই ধরনের যোধবাহিনী বেশির ভাগ সময় সংখ্যায় বেশী হত না। ইন্ডিয়ানদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অভিযানগুলি, বহুদূর পর্যন্ত অভিযান চালালেও, সৈন্য সংখ্যায় ছিল নগণ্য। যখন কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারের জন্য এই ধরনের কয়েকটি বাহিনী একত্র হত, তখন প্রত্যেক দল কেবল নিজেদের দলপতিকে মেনে চলত। অভিযানের পরিকল্পনায় ঐক্য আসত কমবেশী পরিমাণে এইসব দলপতিদের পরিষদ থেকে। আমিয়ানাস মার্সেলিনাসের বর্ণিত চতুর্থ শতাব্দীতে রাইন নদীর ঊর্ধ্বাংশের আলামান্নিরা এই ধরনেই যুদ্ধ করত।

৭। কোনো কোনো উপজাতির মধ্যে আমরা একজন সর্বোচ্চ সর্দার (Oberhäuptling) দেখতে পাই, তার ক্ষমতা অবশ্য খুব বেশী ছিল না। সাচেমদেরই সে একজন, সে সংকটসময়ে দ্রুত কর্মপদ্ধতি নেবার প্রয়োজনে সাময়িকভাবে ব্যবস্থা করত ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ না পরিষদ বসে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করছে। এটি হল কার্যনির্বাহী ক্ষমতাসম্পন্ন সংস্থা সৃষ্টির দুর্বল প্রচেষ্টা, এবং পরবর্তী বিকাশে দেখা গেছে যে এই প্রচেষ্টা সাধারণতঃ উদ্দেশ্যহীন ব্যর্থ প্রচেষ্টা হত। দেখা যাবে যে, কার্যক্ষেত্রে সর্বোচ্চ যুদ্ধনেতাই সর্বত্র না হলেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এইরূপ কার্যনির্বাহী ক্ষমতাধর হয়ে উঠত।

আমেরিকার ইন্ডিয়ানদের বৃহত্তম অংশ উপজাতি মিলনের স্তর থেকে আর আগায়নি। সংখ্যার দিক দিয়ে ছোট এইসব উপজাতিগুলি একটি অপরটি থেকে বিস্তীর্ণ সীমান্ত অঞ্চল দিয়ে বিচ্ছিন্ন এবং অবিরাম যুদ্ধের ফলে দুর্বল, এদের এলাকা বিরাট, লোক ছিল অল্প। সাময়িক সংকটের সময় এখানে ওখানে নিকট সম্পর্কিত উপজাতিদের মধ্যে যে জোট দেখা দিত, সংকট কেটে গেলে তা ভেঙ্গে যায়। কিন্তু কোনো কোনো এলাকায় আদিতে আত্মীয় হলেও পরে বিভক্ত হয়ে যাওয়া উপজাতিগুলি স্থায়ী সমামেলে পুনর্মিলিত হত এবং এইভাবে জাতি গঠনের দিকে প্রথম পদক্ষেপ হয়। যুক্তরাষ্ট্রে ইরকোয়াসদের মধ্যে এরূপ সমামেলের সবচেয়ে অগ্রসর রূপ দেখা যায়। মিসিসিপি নদীর পশ্চিমে তাদের আদি বাসভূমি থেকে তারা যাত্রা করে — সম্ভবতঃ ওখানে তারা সুবৃহৎ ডাকোটা আত্মীয় গোষ্ঠীর একটি শাখা ছিল — দীর্ঘদিন যাযাবরের মতো ঘুরে তারা স্থায়ীভাবে যেখানে বসবাস করে, বর্তমানে সেই জায়গার নাম নিউ ইয়র্ক স্টেট। তাদের মধ্যে ছিল পাঁচটি উপজাতি: সেনেকা, কায়ুগা, ওনন্দাগা, ওনেইডা এবং মোহক। মাছধরা, পশুশিকার ও খুব প্রাথমিক কৃষির দ্বারা তারা জীবনধারণ করত, প্রায়ই কাঠের

বেষ্টনী দিয়ে ঘেরা গ্রামে তারা বাস করত। তাদের সংখ্যা কখনই বিশ হাজারের বেশী ছিল না এবং পাঁচটি উপজাতির মধ্যেই কয়েকটি সাধারণ গোত্র দেখা যেত। তারা একই ভাষার অন্তর্গত ঘনিষ্ঠ উপভাষায় কথাবার্তা বলত এবং পাঁচটি উপজাতির মধ্যে বিভক্ত একই অখণ্ড এলাকায় বাস করত। যেহেতু সদ্য জয়লাভ দ্বারা এই ভূখণ্ড দখল করা হয়েছিল, সেইজন্য বেদখল উপজাতিদের বিরুদ্ধে এদের মধ্যে অভ্যস্ত সহযোগিতা ছিল খুবই স্বাভাবিক। অন্ততঃ পনের শতকের শুরুতে তা একটি রীতিমত 'চিরস্থায়ী সমামেল', বা কনফেডারেসীর রূপ নেয়; নিজের সদ্যলব্ধ ক্ষমতার চেতনায় তা তখনই আক্রমণকারীর চরিত্র নেয় এবং ১৬৭৫ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ যখন এর ক্ষমতা সর্বাধিক, তখন এরা চারপাশের বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড দখল করে কোথাও অধিবাসীদের তাড়িয়ে দিয়েছে এবং কোথাও বা তাদের কর দিতে বাধ্য করেছে। যেসব ইণ্ডিয়ানরা বর্বরতার নিম্নতন স্তর কাটিয়ে উঠতে পারেনি (অর্থাৎ মেক্সিকানরা, নিউ মেক্সিকানরা* ও পেরুবাসীদের বাদে), ইরকোয়াস সমামেল ছিল তাদের সবচেয়ে পরিণত সামাজিক সংগঠন। এই সমামেলের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি ছিল নিম্নরূপ:

১। সম্পূর্ণ সমাধিকার এবং উপজাতির আভ্যন্তরীণ সমস্ত ব্যাপারে স্বাধীনতার ভিত্তিতে পাঁচটি রক্তসম্পর্কিত উপজাতির চিরস্থায়ী সমামেল। এই রক্তসম্পর্কই ছিল সমামেলের সত্যকার ভিত্তি। পাঁচটি উপজাতির মধ্যে তিনটিকে বলা হত পিতৃ-উপজাতি এবং এরা পরস্পর ভ্রাতৃ পদবাচ্য ছিল; বাকি দুটিকে বলা হত পুত্র-উপজাতি এবং তারাও একইভাবে পরস্পরের কাছে ছিল ভাই। তিনটি — প্রাচীনতম — গোত্রের জীবিত প্রতিনিধিদের পাঁচটি উপজাতির মধ্যেই পাওয়া যেত এবং আরও তিনটি গোত্রের সভ্যদের দেখা যেত তিনটি উপজাতির মধ্যে। এইসব গোত্রের লোকেরা সমস্ত পাঁচটি উপজাতির মধ্যেই পরস্পর ভাই ভাই ছিল। নিতান্ত উপভাষার কিছু পার্থক্যসহ এদের যে সাধারণ ভাষা সেটি ছিল একই উদ্ভবের প্রকাশ ও প্রমাণ।

২। সমামেলের সংস্থা হল একটি সমামেল-পরিষদ, তাতে একই পদমর্যাদা ও অধিকার সম্পন্ন পঞ্চাশজন সাচেম থাকত; সমামেল সংক্রান্ত ব্যাপারে এই পরিষদই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করত।

৩। সমামেল গঠিত হবার সময় এই পঞ্চাশজন সাচেমকে উপজাতি ও গোত্রগুলির মধ্যে বণ্টন করা হয় নূতন পদাধিকারী হিসাবে। এ পদগুলি গড়া হয় বিশেষ করে সমামেলের উদ্দেশ্য রেখে। কোন পদ খালি হলে গোত্রেরাই নতুন লোকের নির্বাচন করত এবং সবসময়েই তারা তাকে অপসারিত করতে পারত। কিন্তু তাদের পদাধিষ্ঠিত করার অধিকার ছিল কেবল সমামেল-পরিষদের।

* ১৮৫ পৃষ্ঠার ফুটনোট দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

৪। সমামেল-পরিষদের সাচেমরা নিজ নিজ উপজাতিরও সাচেম ছিল এবং প্রত্যেকেরই উপজাতীয় পরিষদে একটি আসন ও একটি ভোট ছিল।

৫। সমামেল-পরিষদের সমস্ত সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমেই করতে হত।

৬। ভোট হত উপজাতি হিসাবে, ফলে বাধ্যতামূলক সিদ্ধান্ত নিতে হলে তার আগে প্রত্যেক উপজাতি ও তার পরিষদের সমস্ত সভ্যের একমত হতে হত।

৭। পাঁচটি উপজাতীয় পরিষদের যে কেউ সমামেল-পরিষদ আহ্বান করতে পারত, কিন্তু সমামেল-পরিষদের নিজের ইচ্ছায় সভা আহ্বানের ক্ষমতা ছিল না।

৮। সমবেত জনতার উপস্থিতিতে পরিষদের বৈঠক হত। যে-কোন ইরকোয়াসেরই এখানে বলার অধিকার ছিল, কিন্তু সিদ্ধান্ত করত কেবলমাত্র পরিষদ।

৯। সমামেলের সরকারীভাবে কোন শীর্ষ ব্যক্তি অথবা কোন প্রধান কর্মকর্তাও থাকত না।

১০। কিন্তু সমামেলের দুজন সমানাধিকার ও ক্ষমতাবিশিষ্ট সর্বোচ্চ সর্দার ছিল (স্পার্টার দুজন 'রাজা' ও রোমের দুজন 'কন্সাল')।

এই হচ্ছে গোটা সামাজিক ব্যবস্থা যা নিয়ে ইরকোয়াসরা চারশ বছর কাটিয়েছে এবং আজও কাটাচ্ছে। আমি মর্গানের বিবরণ অনুসারে একটু বিশদ করেই এই ব্যবস্থা বর্ণনা করেছি এইজন্য যে, এখানে আমরা এমন একটি সমাজ সংগঠন পর্যালোচনা করবার সুযোগ পাচ্ছি যেখানে তখন পর্যন্ত কোনো **রাষ্ট্র** দেখা দেয়নি। রাষ্ট্র বলতে বুঝায় একটি বিশেষ সামাজিক কর্তৃপক্ষ যা স্থায়ী সংশ্লিষ্ট সকলের সমগ্রতা থেকে বিচ্ছিন্ন; মাউরার নির্ভুলভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন যে, জার্মানদের মার্কের গঠনতন্ত্র রাষ্ট্র থেকে মূলগতভাবে পৃথক, এটা একটি বিশুদ্ধ সামাজিক সংগঠন যদিও পরে এইটিই অনেকাংশে রাষ্ট্রের ভিত্তির কাজ করে; — তাই মাউরার তাঁর সমস্ত রচনায় খুঁজেছেন কী করে মার্ক, গ্রাম, মহাল (manors) ও নগরগুলির গঠনতন্ত্র থেকে এবং তার পাশাপাশি সরকারী কর্তৃপক্ষের ক্রমিক উদ্ভব ঘটল। উত্তর আমেরিকার ইণ্ডিয়ানদের থেকে দেখা যায় যে, আদিতে যা ছিল একটিমাত্র মিলিত উপজাতি, তা ক্রমে ক্রমে কেমন করে এক বিশাল মহাদেশে পরিব্যাপ্ত হয়েছে; কেমন করে উপজাতিগুলি বিভাগের মধ্যে দিয়ে হয়ে উঠেছে নানা জনসমষ্টি, বহু উপজাতির সমষ্টি; কেমন করে ভাষা বদলাতে বদলাতে শুধু পরস্পরের অবোধ্যই হয়নি, পরন্তু তাদের আদি ঐক্যের চিহ্ন নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে; এবং কেমন করে একই সময়ে উপজাতির অভ্যন্তরে বিশিষ্ট গোত্রগুলি ভেঙ্গে ভেঙ্গে বহু হয়েছে, আদি মাতৃ-গোত্রগুলি ফ্রাত্রীরূপে টিকে থেকেছে অথচ প্রাচীনতম এই গোত্রের নামগুলি আজও বহু দূরের ও বহুদিন বিচ্ছিন্ন

উপজাতিগুলির মধ্যে একই রয়ে গেছে — নেকড়েবাঘ ও ভল্লুক আজও অধিকাংশ ইণ্ডিয়ান উপজাতির মধ্যে গোত্রের নাম। সাধারণভাবে বলা যায় যে, উল্লিখিত গঠনতন্ত্র তাদের সকলের পক্ষেই খাটে; ব্যতিক্রম শুধু এই যে, এদের মধ্যে অনেকে আত্মীয় উপজাতিগুলির সমামেলের স্তরে পৌঁছায়নি।

কিন্তু আমরা এও দেখি যে, গোত্রকে যদি সমাজের মূল এককরূপে ধরা হয় তাহলে প্রায় অনিবার্য আবশ্যিকতায় — কারণ স্বাভাবিকভাবেই — গোত্র, ফ্রাত্রী ও উপজাতির গোটা ব্যবস্থা বেড়ে ওঠে এই একক থেকে। এই তিন জনসমষ্টির প্রত্যেকটিই বিভিন্ন পর্যায়ের রক্তসম্পর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত, প্রত্যেকেই নিজের মধ্যে সম্পূর্ণ এবং প্রত্যেকেই নিজের নিজের কাজকর্ম চালায়, কিন্তু সেইসঙ্গে আবার একে অপরের পরিপূরক। তাদের উপর যে সাধারণ কাজকর্মের দায়িত্ব বর্তিয়েছিল, তা হচ্ছে বর্বরতার নিম্নতন স্তরে অবস্থিত লোকদের সমগ্র সামাজিক কাজকর্ম। অতএব যেখানেই আমরা লোকেদের সামাজিক এককরূপে গোত্রকে দেখতে পাব সেখানেই আমরা উপরে উল্লিখিত উপজাতি-সংগঠনের মতো একটা সংগঠন খুঁজে দেখতে পারি; এবং যেখানে যথেষ্ট তথ্য আছে, দৃষ্টান্তস্বরূপ, গ্রীক ও রোমকদের মধ্যে, সেখানে শুধু এ সংগঠন খুঁজে পাব তাই নয়, এ বিষয়েও দৃঢ়-প্রত্যয় হয়ে উঠতে পারব যে, মালমসলার অনুপস্থিতির ক্ষেত্রেও আমেরিকার সমাজ-সংগঠনের সঙ্গে তুলনা করলেই সমস্ত জটিল প্রশ্ন ও ধাঁধার সমাধান মিলবে।

এবং তার শিশুসুলভ সরলতা সত্ত্বেও কত আশ্চর্য এই গোত্র সংগঠন! সব ব্যাপারই সৈন্য, সেপাই পুলিস ছাড়াই অনায়াসে চলে; অভিজাতকুল, রাজা, শাসক, নগরপাল অথবা বিচারক ছাড়াই চলে; কারাগার, মামলা-মকদ্দমা নেই। সমস্ত ঝগড়া ও বিরোধ নিষ্পত্তি করে সংশ্লিষ্ট লোকেরা সমগ্রভাবে মিলে, গোত্র অথবা উপজাতি অথবা একাধিক গোত্র নিজেরা মিলে। রক্তের বদলার ভয় কেবল একেবারে চূড়ান্ত, কদাচিৎ প্রযুক্ত ব্যবস্থা হিসাবে, আমাদের সভ্য সমাজে মৃত্যুদণ্ড হচ্ছে এরই সভ্যরূপ এবং এতে সভ্যতার সুবিধা ও অসুবিধা দুইই আছে। যদিও বর্তমান অপেক্ষা অনেক বেশী কাজ সমবেতভাবে চলত, — গৃহস্থালীর কাজ কয়েকটি পরিবার মিলিতভাবে এবং সাম্যতন্ত্রী ভিত্তিতে চালাত, ভূমি ছিল উপজাতির সম্পত্তি, কেবল ঘরোয়া আবাদ সাময়িকভাবে বরাদ্দ হত গৃহস্থালীদের জন্য, — তবুও আমাদের মতো ব্যবস্থাপনার বিশাল ও জটিল যন্ত্রের কোন দরকার হয়নি। যারা সংশ্লিষ্ট, তারাই সিদ্ধান্ত করে এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই শত শত বৎসরের পুরাতন রীতিতে সবকিছু নিয়ন্ত্রিত হয়ে আছে। গরীব ও অভাবগ্রস্ত কেউ থাকতে পারে না — সাম্যতন্ত্রী গৃহস্থালী এবং গোত্র সংগঠন বৃদ্ধ, রুগ্ন ও যুদ্ধ-পঙ্গুদের দায়িত্ব মানে। স্ত্রীলোক সমেত সকলেই স্বাধীন ও সমানাধিকার সম্পন্ন। তখনও পর্যন্ত দাসের কোন স্থান ছিল না অথবা সাধারণভাবে অপর কোনও উপজাতিকে অধীন

করাও হত না। যখন ১৬৫১ সাল নাগাদ ইরকোয়াসরা 'এরি' এবং 'নিরপেক্ষ উপজাতি'* জয় করল, তখন তারা এদের সমানাধিকারের ভিত্তিতে সমামেলে যোগ দিতে বলে; বিজিতরা অস্বীকার করলে পরেই তাদের ভূখণ্ড থেকে বিতাড়িত করা হয়। এবং এই সমাজ কী ধরনের নরনারী সৃষ্টি করেছিল, তার ইঙ্গিত পাই অকলুষিত ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে সংস্পর্শে এসে শ্বেত জাতির সমস্ত ব্যক্তিই এই বর্বরদের যে আত্মসম্ভ্রমবোধ, অকপটতা, চরিত্রের দৃঢ়তা ও সাহসের প্রশংসা করেছেন তা থেকে।

খুব সম্প্রতি আমরা আফ্রিকায় এই বীরত্বের দৃষ্টান্ত দেখেছি। কয়েক বছর আগে জুলু কাফ্রিরা, তেমনই মাস কয়েক মাত্র আগে নুবিয়ানরা** — উভয় উপজাতির মধ্যেই গোত্র সংগঠন এখনও লোপ পায়নি — যা করেছে, তা যে কোন ইউরোপীয় সৈন্যবাহিনীর অসাধ্য। শুধুমাত্র কোঁচ ও বর্শা নিয়ে, কোন আগ্নেয়াস্ত্র ছাড়াই তারা ব্রিচলোডার বন্দুকের গুলিবর্ষণের ভিতর দিয়ে এগিয়ে আসে একেবারে ইংরেজ পদাতিকদের সঙ্গীনের মুখে। সকলেই মানে যে, ঘনিষ্ঠ পঙক্তি বন্ধনে থাকলে ইংরেজ পদাতিক বিশ্বে অতুলনীয়। কিন্তু তাদের এরা বিশৃঙ্খল করে দেয় ও একাধিকবার হটিয়ে দেয়, যদিও সমরসজ্জায় আসমান-জমিন ফারাক ছিল, যদিও এদের মধ্যে সমরসেবা বলে কিছু ছিল না এবং যদিও ওরা সামরিক অনুশীলন কিছুই জানত না। তাদের ক্ষমতা ও সহ্যশক্তি ইংরেজদের এই নালিশ থেকেই ভালো বুঝা যায় যে, একজন কাফ্রি চব্বিশ ঘণ্টায় একটি ঘোড়ার চেয়ে তাড়াতাড়ি এবং বেশীদূর যেতে পারে। একজন ইংরেজ চিত্রকর বলেছেন, 'এদের ক্ষুদ্রতম পেশীটি পর্যন্ত ইস্পাত কঠিন হয়ে দড়ির মতো ফুটে ওঠে'।

শ্রেণী-বিভাগ দেখা দেবার আগে এইরকম ছিল মানুষজাতি ও তার সমাজ। এবং যদি এদের সঙ্গে আজকের দিনের বেশীর ভাগ সভ্য মানুষকে তুলনা করি, তাহলে বর্তমানের প্রলেতারীয় ও গরীব কৃষকদের সঙ্গে প্রাচীন কালের গোত্রের স্বাধীন সদস্যদের বিরাট পার্থক্য নজরে পড়বে।

এটি হচ্ছে ছবির একটি দিক মাত্র। এ কথা আমাদের ভুললে চলবে না যে, এই সংগঠনের ধ্বংস ছিল অনিবার্য। উপজাতি ছাড়িয়ে তা বাড়তে পারেনি; উপজাতিগুলির সমামেলের মধ্যেই ইতিমধ্যেই এই সংগঠনের পতন সূচিত হয়েছিল, তা পরে আমরা দেখব, এবং অন্যদের পরাধীন করার জন্য ইরকোয়াসদের প্রচেষ্টার মধ্যে তা দেখা গেছে।

* 'নিরপেক্ষ জাতি' ('নিরপেক্ষ উপজাতি') — ১৭শ শতাব্দীতে এরি হ্রদের উত্তর উপকূলবাসী ইণ্ডিয়ান ইরকোয়াসদের কয়েকটি আত্মীয় উপজাতির সমর মৈত্রীকে এই নামে অভিহিত করা হয়। এই মৈত্রীকে ফরাসী উপনিবেশিকেরা এই নাম দেয়, কারণ নিজেদের ইরকোয়াস ও গুরনদের মধ্যে যুদ্ধে তারা নিরপেক্ষতা অবলম্বন করে। — সম্পাঃ

** ১৮৭৯ সালে আফ্রিকার জুলুদের সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধ এবং ১৮৮৩ সালে নুবিয়ানদের সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধের কথা বলা হচ্ছে। — সম্পাঃ

যেটা উপজাতির বাইরে, সেটা আইনেরও বাইরে; যেখানে স্পষ্ট কোন শান্তিচুক্তি ছিল না, সেখানেই উপজাতিতে উপজাতিতে যুদ্ধ চলত; এবং যুদ্ধ চলত তার সেই নিষ্ঠুরতা নিয়ে, যার জন্য অন্য পশুজগৎ থেকে মানুষ বিশিষ্ট এবং যে নিষ্ঠুরতা হ্রাস পেয়েছে কেবল পরে বৈষয়িক স্বার্থবুদ্ধি থেকে। যার নিদর্শন আমরা আমেরিকায় দেখেছি, সেই পরিপূর্ণ বিকশিত গোত্র-সংগঠনের সঙ্গে ধরে নিতে হয় একটি অতি মাত্রায় অপরিণত উৎপাদন, অর্থাৎ বিরাট ভূখণ্ড নিয়ে অল্পসংখ্যক মানুষের বাস, এবং এইজন্য তার উপর অনাত্মীয়, প্রতিকূল ও অবোধ্য বাহ্য প্রকৃতির প্রায় পরিপূর্ণ প্রভুত্ব, এ প্রভুত্বের প্রতিফলন ঘটেছে তার শিশুসুলভ সরল ধর্মীয় ধারণায়। যেমন বহিরাগতের পক্ষে তেমনি নিজের পক্ষেও উপজাতিই ছিল মানুষের সীমানা, উপজাতি গোত্র ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলি ছিল পবিত্র ও অলঙ্ঘনীয়, প্রকৃতি নির্দিষ্ট একটি উচ্চতর শক্তি যার কাছে অনুভূতি, চিন্তা ও কার্যে ব্যক্তি ছিল সম্পূর্ণ অধীন। এই যুগের লোকেরা আপাতদৃষ্টিতে যতই আকর্ষণীয় হোক না কেন, তারা কিন্তু একে অন্যের থেকে মোটেই পৃথক ছিল না, মার্কসের কথায় বলা যায় যে, তারা তখনও আদিম গোষ্ঠীর নাড়ির সঙ্গে বাঁধা। এই আদিম গোষ্ঠীর আধিপত্য ভাঙ্গা দরকার ছিল এবং এটি ভাঙ্গাও হল। কিন্তু যেসব প্রভাবের ফলে এটি ভাঙ্গল, সেগুলো আমাদের কাছে মনে হয় প্রাচীন গোত্র-সমাজের সহজ নৈতিক গরিমা থেকে একটি অধোগতি, পতন। নীচতম স্বার্থসমূহ — হীন লোভ, পাশবিক কামনাবৃত্তি, জঘন্য লালসা, সাধারণ সম্পদের স্বার্থপর লুণ্ঠন, এর মধ্যে দিয়েই নতুন সভ্য শ্রেণীবিভক্ত সমাজ এল; সর্বাপেক্ষা ঘৃণ্য উপায়ে — চৌর্য, ধর্ষণ, প্রবঞ্চনা ও বেইমানিতে শ্রেণীহীন প্রাচীন গোত্র সংগঠনের ভিত্তি দুর্বল করে তাকে ধ্বংস করল। এবং আড়াই হাজার বছরের অস্তিত্বের মধ্যে এই নতুন সমাজ শোষিত ও উৎপীড়িত বৃহত্তম জনসংখ্যার স্বার্থের বিনিময়ে একটি ছোট সংখ্যাল্প অংশের বিকাশ ছাড়া আর কিছুই নয়; এবং বর্তমানে সে অবস্থা আরো বেশি সত্য।

৪

গ্রীক গোত্র-সংগঠন

পেলাস্‌গিয়ান এবং একই উপজাতি থেকে উদ্ভূত অন্যান্য জনসমষ্টির মতো গ্রীকরাও প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে আমেরিকানদের মতোই একই সংস্থা-পর্যায়ক্রমে গড়ে উঠেছিল: গোত্র, ফ্রাত্রী, উপজাতি এবং উপজাতিসমূহের সমামেল। কোথাও হয়তো ফ্রাত্রী ছিল না, যেমন ডোরিয়ানদের মধ্যে; সকল ক্ষেত্রেই উপজাতিগুলির সমামেল গড়ে উঠেনি; কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই গোত্র ছিল একক। যে সময় থেকে গ্রীকরা ইতিহাসের মধ্যে এল, তখন তারা সভ্যতার প্রবেশ-মুখে। বীর-যুগের গ্রীকরা ইরকোয়াসদের চেয়ে

এতখানি এগিয়ে ছিল যে, পরিণতির প্রায় দুটি যুগের ব্যবধান রয়েছে গ্রীক ও আমেরিকার উপরিকথিত উপজাতিগুলির মধ্যে। এইজন্যই গ্রীক গোত্রের মধ্যে ইরকোয়াস গোত্রের আদিম বৈশিষ্ট্যগুলি ছিল না; সমষ্টি-বিবাহের ছাপ সেখানে বহুলাংশে বিলীন হয়ে যাচ্ছিল। মাতৃ-অধিকারের জায়গায় পিতৃ-অধিকার এসেছিল; এর মধ্যে দিয়ে উদীয়মান ব্যক্তিগত সম্পদ গোত্র-প্রথায় প্রথম ভাঙ্গন আনল। দ্বিতীয় আর একটি ভাঙ্গন স্বাভাবিকভাবেই প্রথমটির পিছু পিছু এল: পিতৃ-অধিকার প্রবর্তনের পরে ধনী উত্তরাধিকারিণীর সম্পত্তি বিবাহের ফলে তার স্বামীতে অর্সায় অর্থাৎ অন্য গোত্রের হাতে যায়, এবং তাই গোত্র-সংগঠনের সমস্ত আইনকানুনের ভিত্তিটাই ভাঙা হল এবং এইরকম ক্ষেত্রে যাতে গোত্রের মধ্যেই সম্পত্তি থাকে তাই পাত্রীকে শুধু অনুমতি দেওয়া নয়, পরন্তু **বাধ্য** করা হয় নিজের গোত্রের মধ্যেই বিবাহ করবার জন্য।

গ্রোট রচিত 'গ্রীসের ইতিহাস' অনুসারে বিশেষ করে এথেনীয় গোত্রের সংহতি নিম্নলিখিতভাবে রক্ষা করা হত:

১। সাধারণ ধর্মোৎসব এবং বিশেষ একটি দেবতার পূজারী পুরোহিতদের বিশেষ অধিকারসমূহ, এই দেবতাকে গোত্রের আদিম জনক মনে করা হত এবং এই হিসাবে তাঁর একটি বিশেষ নাম ছিল।

২। একটি সাধারণ সমাধিস্থান (ডেমোসথেনাসের 'এভবুলিডাস'* তুলনীয়)।

৩। পারস্পরিক উত্তরাধিকার।

৪। বলপ্রয়োগের বিরুদ্ধে পরস্পরকে সাহায্য, রক্ষা ও সমর্থনের বাধ্যবাধকতা।

৫। কোনো কোনো ক্ষেত্রে গোত্রের মধ্যেই বিবাহ করার পারস্পরিক অধিকার ও বাধ্যবাধকতা, মাতৃপিতৃহীনা বা ধনী পাত্রীদের সম্পর্কে এটা বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

৬। অন্তত কয়েকটি ক্ষেত্রে সাধারণ সম্পত্তি, এবং একজন archon (প্রধান) ও নিজস্ব খাজাঞ্চী।

কয়েকটি গোত্র নিয়ে এক একটি ফ্রাত্রী, কিন্তু তত ঘনিষ্ঠ নয়, তবু এখানেও আমরা একই ধরনের পারস্পরিক অধিকার ও দায়িত্ব দেখতে পাই, বিশেষতঃ কয়েকটি ধর্মাচরণের ব্যাপারে মিলিত কাজকর্ম এবং ফ্রাত্রীর কোন লোক নিহত হলে তার শাস্তিদানের অধিকার। অধিকন্তু একটি উপজাতির অন্তর্ভুক্ত সমস্ত ফ্রাত্রী একজন প্রধানের সভাপতিত্বে নিয়মিতভাবে কয়েকটি সাধারণ ধর্মোৎসব করত, ঐ প্রধানকে বলা হত ফিলবাসিলিউস এবং তাকে বাছাই করা হত অভিজাতদের (ইউপেট্রাইডিস) মধ্য থেকে।

* এভবুলিডাসের বিরুদ্ধে ডেমোসথেনাসের অভিশংসক ভাষণের কথা বলা হচ্ছে। এই বক্তৃতায় গোত্রের সমাধিস্তূপে কেবল সেই গোত্রের লোকেদের সমাধিদানের প্রাচীন রীতির উল্লেখ পাওয়া যায়। — সম্পাঃ

এই কথা বলেছিলেন গ্রোট। মার্কস তার সঙ্গে যোগ করেছেন, 'কিন্তু গ্রীক গোত্রের মধ্যেও বন্যকে (যেমন ইরকোয়াস) স্পষ্টভাবে দেখতে পাওয়া যায়।' আমাদের অনুসন্ধান আরও একটু চালালেই আরও স্পষ্টভাবে সে ধরা পড়ে।

কারণ গ্রীক গোত্রগুলির নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যও ছিল:

৭। পিতৃ-অধিকার অনুযায়ী বংশপরম্পরা।

৮। উত্তরাধিকারিণীর ক্ষেত্রে ছাড়া গোত্রের মধ্যে বিবাহের নিষেধ। এই ব্যতিক্রম এবং এর জন্য বিধানের সৃষ্টি পরিষ্কারভাবে পুরনো নিয়মের অস্তিত্বই প্রমাণ করে। আর একটি সর্বজনমান্য নিয়ম থেকেও এটি প্রমাণ হয়, যখন একজন নারী বিবাহ করে, তখন সে তার নিজের গোত্রের ধর্মীয় আচার ছেড়ে স্বামীর গোত্রের আচার গ্রহণ করে এবং স্বামীর ফ্রাত্রীর অন্তর্ভুক্ত হয়। এই ব্যাপার থেকে এবং ডিসিয়ার্কাসের একটি বিখ্যাত অনুচ্ছেদ থেকে প্রমাণ হয় যে, গোত্রের বাহিরে বিবাহই ছিল নিয়ম। 'চারিক্লিসে' বেকার সরাসরি ধরে নিয়েছেন যে, কাউকেই নিজের গোত্রের মধ্যে বিবাহ করতে দেওয়া হত না।

৯। গোত্রে বাইরের লোক গ্রহণ করবার অধিকার; সেটা করা হত পরিবারের মধ্যে পোষ্য নিয়ে, কিন্তু প্রকাশ্য অনুষ্ঠান করতে হত এবং এটা ব্যতিক্রম হিসাবেই হত।

১০। প্রধানদের নির্বাচন ও বাতিল করার অধিকার। আমরা জানি যে প্রত্যেক গোত্রেই প্রধান থাকত, কিন্তু কোথাও শোনা যায় না যে, এই পদ গুটিকয়েক পরিবারের মধ্যে বংশানুক্রমে চলত। বর্বরতার যুগ শেষ পর্যন্ত সম্ভাবনা বংশানুক্রমিক পদের বিরুদ্ধেই, গোত্রের মধ্যে যেখানে ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে একেবারে সমান অধিকারপ্রাপ্ত সে অবস্থার সঙ্গে তা একেবারে খাপ খেত না।

শুধু গ্রোটই নন, উপরন্তু নিয়েবুর, মম্‌সেন ও অপর সমস্ত প্রাচীন যুগের ইতিহাসবিদরা গোত্রের সমস্যা সমাধান করতে ব্যর্থ হন। যদিও তাঁরা যথাযথভাবে এর অনেক বৈশিষ্ট্যের বিবরণ দিয়েছেন, তবু তাঁরা সর্বদাই একে **কয়েকটি পরিবারের সমষ্টিমাত্র** ভেবেছেন এবং এইজন্যই গোত্রের প্রকৃতি ও উৎপত্তি বোঝা তাঁদের পক্ষে অসম্ভব হয়। গোত্র-প্রথায় পরিবার কখনই সংগঠনের একক ছিল না এবং তা হওয়া সম্ভবও ছিল না, কারণ স্বামী ও স্ত্রী অনিবার্যভাবেই দুটি পৃথক গোত্রের লোক হত। গোত্র ছিল সমগ্রভাবে ফ্রাত্রীর অন্তর্ভুক্ত এবং ফ্রাত্রী ছিল উপজাতির অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু পরিবারের বেলায় অর্ধেক ছিল স্বামীর গোত্রে, বাকি অর্ধেক স্ত্রীর গোত্রে। রাষ্ট্র তার রাষ্ট্রীয় আইনের ক্ষেত্রে (public law) পরিবারকে স্বীকার করে না, আজ পর্যন্ত নাগরিক আইন (civil law) কেবল এর অস্তিত্ব মানে। অথচ আজ পর্যন্ত আমাদের সমস্ত লিখিত ইতিহাস এই অসম্ভব ধারণা নিয়েই শুরু করেছে যে, — আঠার শতকে তা হয়ে ওঠে অলঙ্ঘ্য — একপতিপত্নী ব্যক্তিগত পরিবার, যা প্রতিষ্ঠান হিসাবে সভ্যতার চেয়ে বিশেষ প্রাচীন নয়, তাকে কেন্দ্র করেই নাকি ক্রমে ক্রমে সমাজ ও রাষ্ট্র দানা বেঁধেছে।

মার্কস মন্তব্য করেছেন, 'শ্রী গ্রোট অনুগ্রহ করে খেয়াল রাখুন যে, গ্রীকেরা পুরাণের মধ্যে গোত্রের উৎপত্তির কারণ খুঁজলেও গোত্রগুলিই ছিল **তাদের নিজেদেরই** সৃষ্ট দেবতা ও অর্ধদেবতা সম্বলিত পুরাণের চেয়ে প্রাচীন।'

একজন প্রামাণিক ও সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষী হিসাবে গ্রোট থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া পছন্দ করতেন মর্গান। গ্রোট বর্ণনা করেছেন যে, এথেন্সের প্রত্যেকটি গোত্রে তথাকথিত পূর্বপুরুষ অনুযায়ী একটি নাম থাকত; সোলনের যুগের আগে পর্যন্ত সাধারণ নিয়ম হিসাবেই এবং পরে উইল না করে কেউ মারা গেলে তার গোত্রের লোকেরাই সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হত; এবং কোনো একজন নিহত হলে, প্রথমে তার আত্মীয়দের বা তারপর তার গোত্রের লোকেদের এবং শেষে নিহত ব্যক্তির ফ্রাত্রীর লোকেদের অধিকার ও কর্তব্য হত হত্যাকারীকে আদালতে অভিযুক্ত করা, 'সর্বাধিক প্রাচীন এথেনীয় আইন বিষয়ে আমরা যা কিছু শুনেছি তা গোত্র ও ফ্রাত্রীতে বিভাগের ভিত্তিতেই গড়া।'

'স্কুলপঠিত কূপমণ্ডূকদের' (মার্কসের কথায়) কাছে একই পূর্বপুরুষ থেকে গোত্রের উৎপত্তি এক অবোধ্য ধাঁধা হয়ে ওঠে। না হয়ে উপায় কী, কারণ তাঁরা পূর্বপুরুষদের নিছক পুরাকথা বলে মনে করায় আদিতে সম্পূর্ণ অনাত্মীয় পৃথক ও স্বতন্ত্র পরিবারগুলি থেকে গোত্রের উৎপত্তি কী ভাবে হল, তার কোন ব্যাখ্যা করতে অসমর্থ। তবু অন্তত গোত্রগুলির অস্তিত্ব ব্যাখ্যা করার জন্যও এই ধাঁধার সমাধান তাঁদের করতেই হবে। তাঁরা কথার ঘূর্ণিতে পাক খেতে লাগলেন এবং এই প্রতিপাদ্য ছাড়িয়ে যেতে পারলেন না: বংশতত্ত্ব অবশ্যই নিতান্ত উপকথা, কিন্তু গোত্র হচ্ছে বাস্তব। এবং শেষ পর্যন্ত গ্রোট বলছেন (বন্ধনীর মধ্যের মন্তব্যগুলি মার্কসের): 'এই বংশপরম্পরার কথা আমরা কদাচিৎ শুনতে পাই, কারণ কয়েকটি অতিখ্যাত ও গুরুগম্ভীর ক্ষেত্রেই মাত্র এই কথা প্রকাশ্যে তুলে ধরা হয়। কিন্তু বিখ্যাত গোত্রগুলির মতোই কম প্রসিদ্ধ গোত্রগুলিরও সাধারণ পূজানুষ্ঠান ছিল (আশ্চর্য নয় কি শ্রী গ্রোট!) এবং তাদেরও সাধারণ অতিমানবিক পূর্বপুরুষ ও বংশপরম্পরা থাকত (এটাও কি আশ্চর্য নয় শ্রী গ্রোট, **কম প্রসিদ্ধ** গোত্রগুলিরও!); প্রধান ছক ও আদর্শ ভিত্তি (হায় পণ্ডিতপ্রবর, **আদর্শ** নয়, রক্তমাংসের ভিত্তি, germanice*, fleischlich!) সকলের বেলায় এক ছিল।'

এই বক্তব্যের জবাবে মর্গানের উক্তিকে মার্কস সংক্ষেপে এইভাবে রেখেছেন, 'গোত্রের আদিম রূপ অনুযায়ী আত্মীয়তাবিধি — অন্য সব নশ্বরদের মতো গ্রীকদেরও এককালে এ জিনিস ছিল — এর মধ্যেই গোত্রের সকল সদস্যের পরস্পর-সম্পর্কের জ্ঞান বেঁচে থেকেছে। তাদের পক্ষে চূড়ান্ত গুরুত্বের এই ব্যাপারটি তারা শৈশব থেকে আচার ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে শিখত। একপতিপত্নী পরিবার দেখা দেবার পর এই

* সোজা জার্মানে। — সম্পাঃ

জিনিস বিস্মৃতির মধ্যে তলিয়ে গেল। গোত্রের নাম এমন একটি বংশধারা সৃষ্টি করেছিল যার সঙ্গে আলাদা পরিবারের বংশধারাকে তুচ্ছ মনে হয়। এই গোত্রের নামে এবার নামধারীদের একই সাধারণ আদি পুরুষের নিশ্চয়তা থাকে, কিন্তু গোত্রের বংশকান্ড এতদূর অতীতের মধ্যে প্রসারিত যে, এর অন্তর্ভুক্ত সভ্যরা তাদের পরস্পর আত্মীয়তার প্রমাণ আর দিতে পারত না, ব্যতিক্রম হল সেই কয়েকটি ক্ষেত্র যেখানে পরবর্তী কালের সাধারণ পূর্বপুরুষ ছিল। নামই ছিল একবংশজাত হবার প্রমাণ এবং কেবলমাত্র বাইরের লোককে পোষ্যগ্রহণের ক্ষেত্র ছাড়া এইটাই ছিল চূড়ান্ত প্রমাণ। গোত্রের সদস্যদের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক কার্যত অস্বীকার করায় — যেমনটি গ্রোট ও নিয়েবুর করেছেন — গোত্রকে একটি অলীক কপোল-কল্পনায় পরিণত করা হয়। এইরূপ কাজ কিন্তু 'ভাববাদী' বিজ্ঞানীদের অর্থাৎ কুনো গ্রন্থকীটদেরই সাজে। যেহেতু বিশেষতঃ একপতিপত্নীত্ব আসবার পর থেকে বংশক্রমের যোগাযোগ দূরে পড়ে যায় এবং অতীতের বাস্তবতা পুরাণকথার উদ্ভট কল্পনার মধ্যে প্রতিফলিত হয়, সেইজন্যই ভালোমানুষ কূপমন্ডূকেরা সিদ্ধান্ত করলেন এবং এখনও করছেন যে, কল্পিত বংশপরম্পরা বাস্তব গোত্রগুলিকে সৃষ্টি করল।'

আমেরিকানদের মতো এখানেও **ফ্রাত্রীই** গোত্র-জননী, এটিই খন্ডিত হয়ে কয়েকটি গোত্র-সন্ততি হয়। সেইসঙ্গে এই গোত্র-জননী তাদের ঐক্যও বজায় রাখে এবং প্রায়ই একই আদিম জনক থেকে তাদের সকলের সম্পর্ক টানত। যেমন, গ্রোটের কথায়, 'হেকাটিউস ফ্রাত্রীর সমস্ত সমসাময়িক সদস্যেরা একই দেবতাকে ষোল পুরুষ আগের আদিম জনক বলে মনে করত'; তাই এই ফ্রাত্রীর অন্তর্ভুক্ত সমস্ত গোত্র হল আক্ষরিকভাবে ভ্রাতৃ-গোত্র। হোমার পর্যন্ত ফ্রাত্রীকে সামরিক একক বলে উল্লেখ করেছেন সেই বিখ্যাত অনুচ্ছেদটিতে, যেখানে নেস্টর আগামেম্‌নসকে উপদেশ দিচ্ছেন, 'ফ্রাত্রী ও উপজাতি হিসাবে সৈন্য সাজাও যাতে ফ্রাত্রী ফ্রাত্রীকে এবং উপজাতি উপজাতিকে সাহায্য করতে পারে'। ফ্রাত্রীর আর একটি অধিকার ও কর্তব্য হচ্ছে যে-কোন সদস্যের হত্যাকারীর শাস্তিবিধানের ব্যবস্থা করা, এ থেকে বোঝা যায়, অতীতে এর রক্তের বদলা দায়িত্বও ছিল। অধিকন্তু এর ছিল সাধারণ পবিত্র স্থানগুলি এবং উৎসব; আর্যদের ঐতিহ্যগত প্রাচীন প্রকৃতিপূজা থেকে প্রাপ্ত গ্রীকদের সমগ্র পুরাণের বিকাশ ঘটেছিল মূলতঃ গোত্র ও ফ্রাত্রীর জন্য এবং তার ভেতরেই এটা চলল। ফ্রাত্রীর থাকত একজন প্রধান (ফ্রাত্রীয়ার্কস) এবং দ্য'কুলাঁজের মতে, বাধ্যতামূলক সিদ্ধান্ত করবার অধিকারসম্পন্ন সভা, ট্রাইবুন্যাল ও প্রশাসন। এমনকি পরবর্তী কালের রাষ্ট্র গোত্রকে গ্রাহ্য না করলেও ফ্রাত্রীর হাতে প্রশাসনের কয়েকটি সামাজিক কাজ রেখে দিয়েছিল।

কয়েকটি আত্মীয় ফ্রাত্রী মিলে একটি উপজাতি হত। অ্যাটিকাতে প্রতি উপজাতিতে তিনটি করে ফ্রাত্রী নিয়ে চারটি উপজাতি ছিল এবং এক একটি ফ্রাত্রীতে ত্রিশটি করে

গোত্র ছিল। এইরকম নিখুঁত ভাগাভাগি দেখে ধরে নিতে হয় যে, সমাজব্যবস্থার স্বতঃস্ফূর্ত ধারাকে একটি সচেতন ও পরিকল্পিত ভাবে নিয়মিত করা হয়েছিল। কেমন করে, কখন ও কেন এই ব্যাপারটি করা হয়, তার কোন সন্ধান গ্রীক ইতিহাসে মেলে না, কারণ গ্রীকরা প্রাকবীর-যুগের স্মৃতি রক্ষা করেনি।

অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ভূখণ্ডে ঘন বসতির মধ্যে বাস করায় গ্রীকদের মধ্যে উপভাষার পার্থক্য ততটা সুস্পষ্ট হয়নি, যতটা আমেরিকার বিস্তীর্ণ বনভূমিতে দেখা দিয়েছিল। তবু এখানেও আমরা দেখি যে, একই প্রধান উপভাষা ব্যবহার করে এমন উপজাতিগুলিই কেবল বৃহত্তর জনসমষ্টিতে একত্রিত হয়; এবং ক্ষুদ্র অ্যাটিকার পর্যন্ত নিজস্ব উপভাষা ছিল ও সেইটিই পরে গ্রীক গদ্যের সাধারণ ভাষা হয়ে ওঠে।

হোমারের মহাকাব্যে আমরা সাধারণতঃ দেখি যে, গ্রীক উপজাতিগুলি তখনই মিলিত হয়ে ছোট ছোট জাতিসত্তা সৃষ্টি করেছিল, কিন্তু সেই জাতির অভ্যন্তরে গোত্র, ফ্রাত্রী ও উপজাতিগুলির পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য অক্ষুন্ন ছিল। ইতিমধ্যেই তারা প্রাচীর বেষ্টিত নগরে বাস করছে। পশুযূথগুলির সংখ্যাবৃদ্ধি, ক্ষেত্র-কর্ষণ বিস্তারে এবং হস্তশিল্পের সূত্রপাতের সঙ্গে সঙ্গেই জনসংখ্যা বাড়তে থাকে। এই সঙ্গে সম্পদের পার্থক্য বেড়ে উঠল এবং এর ফলে স্বাভাবিকভাবে গড়ে-ওঠা প্রাচীন গণতন্ত্রের মধ্যে একটা আভিজাতিক উপাদান দেখা দেয়। বিভিন্ন ছোট ছোট জাতিগুলি উত্তম ভূমি দখলের জন্য এবং সামরিক লুণ্ঠনের জন্যও অবিরত যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকত। ইতিমধ্যেই যুদ্ধবন্দীদের দাসে পরিণত করা একটি স্বীকৃত প্রথায় পরিণত হয়েছিল।

এইসব উপজাতি ও জাতিসত্তাগুলির সংবিধান ছিল নিম্নরূপ:

১। স্থায়ী কর্তৃপক্ষ ছিল **পরিষদ** (bulê)। সূচনায় এটি খুব সম্ভব গোত্র প্রধানদের নিয়ে গঠিত হত, কিন্তু পরে তাদের সংখ্যা খুব বেড়ে যাওয়ার ফলে এদের মধ্যে থেকে নির্বাচন করা হত এবং এতে আভিজাতিক উপাদানটির বিকাশ ও শক্তিবৃদ্ধির সুযোগ ঘটে। ডায়োনিসিউস স্পষ্টতঃ বলেছেন যে, বীর-যুগের পরিষদগুলি অভিজাতদের (kratistoi) নিয়ে গঠিত হত। গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে এই পরিষদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। এস্কাইলাসের রচনায় দেখি যে, থিবিসের পরিষদ সেই ক্ষেত্রে একটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করল যে, ইটিয়োক্লিসের দেহ পূর্ণ সম্মানের সঙ্গে কবরস্থ করা হবে এবং পলিনিসিসের দেহ কুকুরদের ভোজ্য হিসাবে ফেলে দেওয়া হবে। পরবর্তী কালে রাষ্ট্রের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে এই পরিষদ সেনেটে রূপান্তরিত হয়।

২। **জনসভা** (agora): ইরকোয়াসদের মধ্যে আমরা দেখেছি যে, স্ত্রী পুরুষ পরিষদের অধিবেশনকে ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকত, শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করত এবং তার মধ্যে দিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণকে প্রভাবিত করত। হোমারের গ্রীকদের মধ্যে, সাবেকী জার্মান আইনের ভাষায় এই ঘিরে দাঁড়ানো (Umstand) একটি পুরোপুরি

জনসভায় পরিণত হয়; প্রাচীন জার্মানদের মধ্যেও একই ব্যাপার ঘটে। গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবার জন্য পরিষদ এই জনসভা আহ্বান করত; প্রত্যেক পুরুষেরই বলবার অধিকার থাকত এবং সিদ্ধান্ত হত হাত তুলে (এস্কাইলাস তাঁর 'প্রার্থিনী' রচনায় তা লিখেছেন) অথবা ধ্বনি দিয়ে। এই সিদ্ধান্ত হত সার্বভৌম ও চূড়ান্ত, কারণ শোমান তাঁর 'গ্রীসের প্রাচীন কথা'য়* যেমন বলছেন: 'যে ক্ষেত্রে এমন কোন বিষয় আলোচনা হত যা কার্যকরী করতে হলে জনগণের সহযোগিতা দরকার, সে সব ক্ষেত্রে হোমার আমাদের কাছে এমন কোন ইঙ্গিত রেখে যাননি যাতে ইচ্ছার বিরুদ্ধেও জনগণকে জোর করে তা করান হত।' এই সময়ে যখন উপজাতিটির প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষই যোদ্ধা, তখন জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো সামাজিক কর্তৃপক্ষ ছিল না যা জনগণের বিরুদ্ধে দাঁড় করানো যায়। আদিম গণতন্ত্রের তখন পূর্ণবিকাশের যুগ এবং পরিষদ ও basileus'এর প্রতিষ্ঠা ও ক্ষমতার বিচার করতে গেলে এই কথাটা থেকেই শুরু করতে হবে।

৩। **সমরনায়ক** (basileus)। এই বিষয়ে মার্কস নিচের মন্তব্যটি করেছেন, 'ইউরোপীয় পণ্ডিতকুল যাঁদের অধিকাংশই আজন্ম রাজারাজড়াদের ভৃত্য, তাঁরা বাসিলিয়ুসকে আধুনিক অর্থের রাজায় রূপান্তরিত করেন। ইয়াঙ্কি-প্রজাতন্ত্রী মর্গান এতে আপত্তি করেছেন। তীব্র বিদ্রূপের সঙ্গে কিন্তু যথার্থভাবেই তিনি তৈলাক্ত গ্ল্যাডস্টোন সাহেব ও তাঁর 'জগতের যৌবনের'** কথা বলেছেন, 'শ্রী গ্ল্যাডস্টোন যিনি পাঠকদের কাছে বীর-যুগের গ্রীক নায়কদের রাজা মহারাজা হিসাবে উপস্থিত করতে চেয়েছেন এবং তার সঙ্গে জেণ্টলম্যানের গুণ জুড়ে দিয়েছেন, তিনিও মানতে বাধ্য হয়েছেন যে, মোটের উপর যে জ্যেষ্ঠাধিকার রীতি বা আইনটা পাই তা যথেষ্টরূপে হলেও অতি সুস্পষ্টরূপে যেন নির্দিষ্ট নয়।' বস্তুতঃ শ্রী গ্ল্যাডস্টোনের নিজেরই কাছে এটা বোঝার কথা যে যথেষ্টরূপে হলেও অতি সুস্পষ্ট রূপে যা নির্দিষ্ট নয় তেমন একটা আপাতিক জ্যেষ্ঠাধিকার প্রথার মূল্য নেই বললেই চলে।

ইরকোয়াস ও অন্যান্য ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে প্রধানদের পদের বেলায় বংশানুক্রমিকতার ব্যাপারটা ঠিক কী ছিল তা আমরা ইতিপূর্বেই দেখেছি। যেহেতু সমস্ত পদাধিকারীই নির্বাচিত হতেন অধিকাংশ ক্ষেত্রে গোত্রের মধ্যে থেকেই, তাই সেই পরিমাণে পদগুলি গোত্রের মধ্যে বংশানুক্রমিক ছিল। ক্রমে ক্রমে শূন্যস্থান পূর্ণ করবার জন্য প্রাক্তন পদাধিকারীর নিকটতম আত্মীয় — তার ভাই অথবা ভাগিনেয়কেই অগ্রাধিকার দেওয়া

* G. F. Schömann, *Griechische Alterthümer,* Bd. I-II, Berlin, 1855-59. — সম্পাঃ

** W. E. Gladstone, *Juventus Mundi. The Gods and Men of the Heroic Age,* London, 1869. — সম্পাঃ

হত, যদি না তাকে বাদ দেবার কোন বিশেষ কারণ থাকত। পিতৃ-অধিকারের আমলে গ্রীসে বাসিলিয়ুসের পদ সাধারণতঃ বাপ থেকে ছেলেতে বা ছেলেদের একজনের উপর অর্সাত, এই ঘটনা শুধু এই ইঙ্গিত করে যে, সামাজিক নির্বাচন মারফৎ পদাধিকার অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছেলের অনুকূলে হত, সামাজিক নির্বাচন ছাড়াই বৈধ উত্তরাধিকার তা মোটেই বোঝায় না। এখানেই আমরা লক্ষ্য করি যে, ইরকোয়াস ও গ্রীকদের মধ্যে গোত্রের ভিতর বিশিষ্ট অভিজাত পরিবারগুলির প্রাথমিক ভ্রূণ দেখা দিচ্ছে এবং গ্রীকদের ক্ষেত্রে তাছাড়া ভবিষ্যতের বংশানুক্রমিক প্রধান বা রাজার সূচনাও লক্ষ্য করা যাচ্ছে। অতএব অনুমান করা চলে যে, গ্রীকদের মধ্যে বাসিলিয়ুস হয় জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হত অথবা তার পদগ্রহণে জনগণের স্বীকৃত সংস্থা — পরিষদ অথবা আগোরার সম্মতি দরকার হত, যেমনটি হত রোমকদের 'রাজার' (rex) ক্ষেত্রে।

'ইলিয়ডে' নরশাসক আগামেম্‌নসকে গ্রীকদের মহারাজা রূপে দেখতে পাই না, তাঁকে দেখি একটি অবরুদ্ধ নগরীর সামনে সম্মিলিত সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাপতি রূপে। যখন গ্রীকদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দিল, তখন অডিসিউস তাঁর এই গুণেরই উল্লেখ করেছেন সেই বিখ্যাত অনুচ্ছেদে: অনেক সেনাপতি ভালো নয়, একটিমাত্র সর্বাধিনায়ক দরকার ইত্যাদি (তারপর রাজদণ্ড বিষয়ক জনপ্রিয় শ্লোক আছে, কিন্তু সেটা যুক্ত হয়েছে পরে)। 'এখানে অডিসিউস সরকারের রূপ নিয়ে বক্তৃতা করেননি, তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যবাহিনীর সর্বাধিনায়কের কাছে অধীনতার দাবি জানিয়েছেন। ট্রয় নগরীর সামনে যে গ্রীকরা এসেছে কেবল সৈন্যবাহিনী হিসাবে, তাদের আগোরা যথেষ্ট গণতান্ত্রিক। উপহার অর্থাৎ লুণ্ঠিত সম্পদের বণ্টনের কথা বলবার সময় আকিলিস কখনও আগামেম্‌নস অথবা অপর কোন বাসিলিয়ুসকে বণ্টনকর্তা বলেননি, সর্বদাই তিনি উল্লেখ করছেন 'এখিয়ান্সদের পুত্রগণ', অর্থাৎ জনগণ। 'জিউস পুত্র', 'জিউস কর্তৃক লালিত' প্রভৃতি বিশেষণগুলি কোন কিছুই প্রমাণ করে না, কারণ প্রত্যেকটি গোত্রই কোন না কোন দেবতার বংশসম্ভূত এবং উপজাতির প্রধানের গোত্র আবার একটি 'প্রধান' দেবতা, এ ক্ষেত্রে জিউসের বংশোদ্ভূত। এমনকি 'অডিসিতে' সুতরাং 'ইলিয়ডের' অনেক পরের যুগেও শূকরপালক ইউমেন প্রভৃতি গোলামেরাও 'দিব্য' জন (dioi বা theioi)। একইভাবে আমরা 'অডিসিতে' দূত মুলিয়স ও অন্ধ চারণ ডেমোডোকাসকেও বীর আখ্যায় ভূষিত দেখি। সংক্ষেপে বলা যায় যে, basileia এই যে শব্দটি গ্রীক লেখকরা হোমারের তথাকথিত রাজক্ষমতার অর্থে ব্যবহার করে যদিও তার পাশাপাশি পরিষদ ও জনসভা আছে, এটির মানে মাত্র সামরিক গণতন্ত্র (যেহেতু সামরিক নেতৃত্বই এর মূল বৈশিষ্ট্য)' (মার্কস)।

সামরিক কার্যকলাপ ছাড়াও বাসিলিয়ুসের পুরোহিতের ও বিচারকের দায়িত্ব ছিল; এই শেষোক্ত দায়িত্ব স্পষ্ট করে নির্দিষ্ট করা নেই, কিন্তু প্রথমটি তিনি উপজাতি

অথবা উপজাতি সমামেলের সর্বোচ্চ প্রতিনিধি হিসাবে পালন করতেন। কোথাও বেসামরিক প্রশাসনিক অধিকারের উল্লেখও দেখা যায় না, কিন্তু তিনি পদাধিকারবলে সম্ভবতঃ পরিষদের সভ্য। ব্যুৎপত্তিগত অর্থে তাই 'বাসিলিয়ুসকে' অনুবাদে জার্মান শব্দ König বলা খুবই নির্ভুল, কারণ König (Kuning) কথাটা এসেছে Kuni, Künne থেকে এবং তাতে বোঝায় 'গোত্রের প্রধান'। কিন্তু প্রাচীন গ্রীক শব্দ 'বাসিলিয়ুস' কোনক্রমেই আধুনিক অর্থে König (রাজা) শব্দের কিছুতেই সমার্থজ্ঞাপক নয়। থুসিডাইডিস স্পষ্টই পুরাতন basileia-কে — patrikê বলেছেন, অর্থাৎ গোত্র থেকে উদ্ভূত এবং তিনি বলছেন যে, এর নির্দিষ্ট সুতরাং সীমাবদ্ধ অধিকার ছিল। আর আরিস্টটল বলেছেন যে, বীর-যুগের basileia হচ্ছে স্বাধীন মানুষদের একটা নেতৃত্ব এবং বাসিলিয়ুস হলেন সমরনায়ক, বিচারক ও প্রধান পুরোহিত; অতএব পরবর্তী কালের অর্থে বাসিলিয়ুসের কোনো শাসনক্ষমতা ছিল না।*

এইভাবে আমরা বীর-যুগের গ্রীকদের সংবিধানে দেখি যে, প্রাচীন গোত্র-সংগঠন তখনও পূর্ণ উদ্যমে চলছে; কিন্তু আমরা তার বিলুপ্তির সূত্রপাতও দেখতে পাই: পিতৃ-অধিকার এবং সন্তানসন্ততি কর্তৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকার, যার ফলে পরিবারের মধ্যে সম্পদ সঞ্চয়ে সাহায্য হল এবং গোত্রের বিরুদ্ধে পরিবারকে শক্তি যোগাল; ধনের অসমতা, বংশানুক্রমিক অভিজাতকুল ও রাজতন্ত্রের প্রাথমিক ভ্রূণ সৃষ্টি করে যা সামাজিক ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করল; দাসপ্রথা, যা প্রথমে যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু ইতিমধ্যেই উপজাতির অন্যান্য ব্যক্তি, এমনকি গোত্রের সদস্যদেরও দাসত্ববন্ধনের পথ করছিল, আন্ত-উপজাতি যুদ্ধ থেকে গবাদি পশু, দাস ও সম্পদ লুট করে নিয়মিত জীবিকানির্বাহের উপায় হিসাবে স্থলে জলে নিয়মিত হানায় অধঃপতন; সংক্ষেপে — ধনের প্রশস্তি শুরু হল ও তাকেই শ্রেষ্ঠ কল্যাণ বলে সম্মান করা হল এবং গোত্রের সাবেকী বিধিবিধানকে বিকৃত করা হল বলপূর্বক ধন লুণ্ঠন সমর্থনের জন্য। কেবলমাত্র একটি জিনিসের তখনও অভাব ছিল: একটি প্রতিষ্ঠান যা নবলব্ধ ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে গোত্র-ব্যবস্থার সাম্যতন্ত্রী ঐতিহ্য থেকে শুধু যে বাঁচাবে তাই নয়, এতদিন

* গ্রীক বাসিলিয়ুসের মতো আজটেক সমরনায়ককে ভুল করে আধুনিক অর্থে রাজা হিসাবে দেখান হয়েছিল।

স্পেনীয়রা প্রথমে ভুল বুঝে ও অতিশয়োক্তি করে এবং পরে ইচ্ছাকৃত বিকৃতি ঘটিয়ে যে বিবরণ দেয় তার প্রথম ইতিহাসগত সমালোচনা করে মর্গান দেখান যে, মেক্সিকানরা বর্বরতার মধ্যবর্তী স্তরে ছিল, কিন্তু নিউ মেক্সিকোর পুয়েব্লো ইন্ডিয়ানদের চেয়ে কিছুটা উন্নত পর্যায়ে এবং বিকৃত বিবরণগুলি থেকে যতটা বোঝা যায়, তাদের সামাজিক পদ্ধতিও ছিল সেইরকম: তিনটি উপজাতির সমামেল — এদের অধীন কয়েকটি করদ উপজাতি ছিল; শাসন চালাত একটি সমামেলের পরিষদ আর একজন সমামেলের সমরনায়ক যাকে স্পেনীয়রা 'সম্রাটে' রূপান্তরিত করেছিল।' (এঙ্গেলসের টীকা।)

যাকে হেয় জ্ঞান করা হত সেই ব্যক্তিগত মালিকানাকে পবিত্র করবে, সেই পবিত্রকরণকে মানবসমাজের শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য বলে ঘোষণা করবে শুধু তাই নয়, অধিকন্তু সম্পত্তি আহরণের ক্রমবিকাশমান নতুন রূপগুলির উপর এবং সুতরাং ধনবৃদ্ধি ত্বরান্বয়ণের উপর সাধারণ সামাজিক অনুমোদনের ছাপ দিয়ে দেবে; এমন একটি প্রতিষ্ঠান যার বলে সমাজের উদীয়মান শ্রেণী-বিভাগ শুধু নয়, পরন্তু বিত্তশালী শ্রেণী কর্তৃক বিত্তহীন শ্রেণীগুলিকে শোষণ করার অধিকার, বিত্তহীনদের উপর বিত্তবানদের শাসনও চিরস্থায়ী করবে।

এবং সে প্রতিষ্ঠান এল। উদ্ভাবিত হল **রাষ্ট্র**।

৫

এথেনীয় রাষ্ট্রের উৎপত্তি

কেমন করে রাষ্ট্র বিকশিত হল, — নতুন নতুন সংস্থার আগমনে গোত্র-প্রথার কোনো কোনো সংস্থা রূপান্তরিত হল, কোনো কোনো সংস্থা স্থানচ্যুত হল এবং শেষ পর্যন্ত সবই উৎখাত করল একটা সত্যকার সরকারী কর্তৃপক্ষ আর গোত্র ফ্রাত্রী ও উপজাতির মাধ্যমে আত্মরক্ষাপরায়ণ আসল 'সশস্ত্র জনগণের' জায়গায় এল সে কর্তৃপক্ষের অধীনস্থ, সুতরাং জনগণের বিরুদ্ধেও প্রযোজ্য একটি সশস্ত্র 'সরকারী ক্ষমতা', — এসব কিছুই অন্ততঃ প্রাথমিক অবস্থায় প্রাচীন এথেন্সের মতো স্পষ্টভাবে আর কোথাও পাওয়া যায় না। এই পরিবর্তনের রূপগুলি প্রধানতঃ মর্গানই বিবৃত করেছেন; যেসব অর্থনৈতিক কারণে এটিকে সম্ভব করেছিল সেটা প্রধানতঃ আমিই যোগ দিয়েছি।

বীর-যুগের চারটি এথেনীয় উপজাতি তখনও অ্যাটিকার বিভিন্ন অঞ্চলে বাস করত। এমনকি যে বারটি ফ্রাত্রী নিয়ে তারা গঠিত ছিল তারাও কেক্রপ্সের বারটি নগরে তখনো পৃথকভাবে অধিষ্ঠিত ছিল বলে মনে হয়। এদের সংবিধান ছিল বীর-যুগের মতো: জনসভা, জনপরিষদ ও একজন বাসিলিয়ুস। লিখিত ইতিহাস থেকে যতটা পাওয়া যায় তাতে আমরা দেখি যে, ভূমি তখনই বিভক্ত হয়ে ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে, — এটি বর্বরতার উচ্চতন স্তরের শেষ দিককার পণ্য-উৎপাদনের অপেক্ষাকৃত উন্নত অবস্থা এবং তদুপযোগী পণ্য-বাণিজ্যের সঙ্গে মেলে। খাদ্যশস্য ছাড়া সুরা ও তৈলও উৎপন্ন হত। ইজিয়ান সাগরের বাণিজ্য ক্রমেই ফিনিশীয়দের হাত থেকে অ্যাটিক গ্রীকদের হাতে আসে। জমি কেনাবেচা এবং কৃষি ও হস্তশিল্প, বাণিজ্য ও নৌচালনায় ক্রমবর্ধিত শ্রমবিভাগের জন্য বিভিন্ন গোত্র, ফ্রাত্রী ও উপজাতির সদস্যরা অচিরে মিশ্রিত হয়ে গেল। একটি ফ্রাত্রী বা উপজাতির বাসভূমিতে এমন সব অধিবাসী এল যারা একই দেশের লোক হলেও এদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না এবং সেইজন্য স্বীয় বাসভূমিতেই তারা পরবাসী হয়ে রইল। কেননা শান্তির সময় প্রত্যেকটি ফ্রাত্রী ও

উপজাতি এথেন্সের জনপরিষদ অথবা বাসিলিয়ুসের অপেক্ষা না করেই নিজেদের এলাকার কাজকর্ম চালাত। কিন্তু এলাকার যেসব অধিবাসীরা ফ্রাত্রী বা উপজাতির অন্তর্ভুক্ত নয়, তারা স্বাভাবিকভাবে শাসনকার্যে কোন অংশ নিতে পারত না।

এর ফলে গোত্র-প্রথার সংস্থাগুলির নিয়মিত কাজে এত বিশৃঙ্খলা ঘটল যে, বীর-যুগেই এর প্রতিকার দরকার হয়ে পড়ে। এইজন্য একটি সংবিধান প্রচলিত হল যা থিসিউসের নামে চলে। এই পরিবর্তনের মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এথেন্সে একটি কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা, অর্থাৎ যেসব ব্যাপার এতদিন উপজাতিগুলি স্বাধীনভাবে চালিয়ে এসেছে তার কতকগুলিকে সাধারণ ব্যাপার ঘোষণা করে এথেন্সে অবস্থিত একটি সাধারণ পরিষদে হস্তান্তরিত হল। এইভাবে আমেরিকার যে-কোনো আদিম অধিবাসীরা যা করতে পেরেছে তার চেয়ে এক ধাপ এগিয়ে গেল এথেনীয়রা: প্রতিবেশী উপজাতিগুলির একটি সরল সমামেলের জায়গায় এখানে সমস্ত উপজাতি পরস্পরের মধ্যে বিলীন হয়ে একটিমাত্র জাতি তৈরী হল। এর ফলে সর্বজনীন এক এথেনীয় আইনের উদ্ভব হল যার স্থান উপজাতি ও গোত্রগুলির আইনী প্রথার চেয়ে উচ্চে। এতে প্রত্যেক এথেন্সবাসী এমন কতকগুলি আইনের সুবিধা ও সংরক্ষণ পেল যা সে স্বীয় উপজাতির এলাকার বাইরেও ভোগ করবে। কিন্তু এইটাই হচ্ছে গোত্র-প্রথার ভিত্তি হানির প্রথম পদক্ষেপ, কেননা সমস্ত অ্যাটিক উপজাতিদের কাছেই যারা বিজাতীয়, এথেনীয় গোত্র-প্রথার যারা বাইরে ছিল তাদের পরে এর অন্তর্ভুক্ত করার প্রথম পদক্ষেপ এটি। দ্বিতীয় আর একটি কীর্তি যা থিসিউসের নামে প্রচলিত সেটি সমগ্র জনগণকে গোত্র, ফ্রাত্রী ও উপজাতি নির্বিশেষে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করল: ইউপেট্রাইডিস (eupatrides) অথবা অভিজাত, জিওমোরই (geomoroi) বা জমির চাষী; এবং ডেমিয়ার্গি (demiurgi) বা হস্তশিল্পী এবং কেবল অভিজাতদেরই সরকারী পদের অধিকার দেওয়া হল। এ কথা সত্য যে, অভিজাতদের পদের অধিকার দেওয়া ছাড়া অন্য বিষয়ে এই শ্রেণী-বিভাগের কোনো ফল হয়নি, কারণ এতে শ্রেণীগুলির মধ্যে অধিকারগত আর কোনও পার্থক্য সৃষ্টি করেনি। কিন্তু এটি গুরুত্বপূর্ণ এইজন্য যে, নতুন যেসব সামাজিক উপাদান নীরবে বেড়ে উঠছে তারা এর মধ্যে দিয়েই প্রকাশ পাচ্ছে। এতে দেখতে পাচ্ছি যে, গোত্রের কয়েকটি পরিবারের মধ্যে সমাজের পদ-বণ্টন প্রচলিত রীতির স্তর ছাড়িয়ে এই পরিবারগুলির বিশেষ অধিকার হয়ে উঠেছে, এবং তার বিরুদ্ধতা প্রায় নেই। এই পরিবারগুলি ইতিমধ্যেই সম্পত্তি সঞ্চয় করে শক্তিশালী হয়েছিল, এখন তারা গোত্রের বাইরে একটি বিশেষ সুবিধাভোগী শ্রেণীরূপে মিলিত হতে শুরু করল এবং উদীয়মান রাষ্ট্র তাদের এই জবরদখল মেনে নিল। অধিকন্তু, এতে আরও দেখা যাচ্ছে যে, কৃষক ও কুটিরশিল্পের মধ্যে শ্রমবিভাগ এত প্রতিষ্ঠা পেয়েছে যে, গোত্র ও উপজাতি নিয়ে পুরানো বিভাগের সামাজিক তাৎপর্য আর

গুরুত্বপূর্ণ থাকছে না। সর্বশেষে এতে ঘোষিত হল যে, গোত্রভিত্তিক সমাজ ও রাষ্ট্রের বিরোধ মিটবার নয়। রাষ্ট্রগঠনের প্রথম চেষ্টাটা হল প্রতি গোত্রের সভ্যদের সুবিধাভোগী ও অবনত, এবং শেষোক্তদের আবার পেশাগতভাবে দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করে ও এইভাবে একের বিরুদ্ধে অপরকে লাগিয়ে গোত্র-সম্পর্ক ভাঙা।

সোলনের যুগ পর্যন্ত এথেন্সের পরবর্তী রাজনৈতিক ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞান অত্যন্ত অসম্পূর্ণ। বাসিলিয়ুসের পদের ভূমিকা ক্রমেই উঠে যেতে থাকে; অভিজাতদের মধ্যে থেকে নির্বাচিত প্রধানরা রাষ্ট্রের মাথা হয়ে উঠল। অভিজাতদের ক্ষমতা ক্রমাগত বাড়তে বাড়তে খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী নাগাদ অসহ্য হয়ে উঠল। জনস্বাধীনতা দলনের মূল হাতিয়ার ছিল অর্থ ও মহাজনি। অভিজাতেরা সাধারণতঃ এথেন্সের ভিতরে বা কাছাকাছি বসবাস করত এবং সমুদ্রবাহিত বাণিজ্য ও তখনো মাঝে মাঝে অনুসৃত নৌ-দস্যুতায় তাদের ধন বাড়ত। এই থেকেই বিকাশমান মুদ্রা ব্যবস্থাটা ক্ষয়কারী দ্রাবকের মতো স্বাভাবিক অর্থনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত গ্রাম্য জনসমষ্টিগুলির চিরাচরিত জীবনযাত্রার মধ্যে প্রবেশ করল। গোত্র-প্রথা মুদ্রা ব্যবস্থার সঙ্গে মোটেই খাপ খায় না। অ্যাটিকার ছোট কৃষিজীবিদের যে ধ্বংস হয়, সেটা তাদের রক্ষক সাবেকী গোত্র-বন্ধনের শিথিলতার সঙ্গে মিলে যায়। পাওনাদারের বিল এবং জমিতে বন্ধকি কবুলিয়ত — এথেনীয়রা এই সময় জমিতে বন্ধকী প্রথাও আবিষ্কার করেছিল — গোত্র অথবা ফ্রাত্রী কোন কিছুরই খাতির করত না। কিন্তু সাবেকী গোত্র-প্রথায় মুদ্রা, দাদন বা আর্থিক ঋণ এসবই একেবারে অজ্ঞাত ছিল। তাই অভিজাতদের ক্রমবর্ধমান মুদ্রা-শাসন থেকে দেখা দিল একটি নতুন প্রথাগত আইন (law of custom) যা দেনদারের বিরুদ্ধে মহাজনকে রক্ষা করত এবং অর্থপতি কর্তৃক ছোট কৃষকের শোষণ মঞ্জুর করত। অ্যাটিকার গ্রাম্য জেলাগুলিতে সর্বত্র বন্দকী খুঁটি গিজগিজ করত, তাতে বিজ্ঞপ্তি দেখা যেত যে, এটি যে ভূখণ্ডে রয়েছে সেটি অমুকের কাছে এত টাকায় বন্ধক আছে। যেসব ক্ষেত্রে এরকম কোন চিহ্ন থাকত না, সেগুলির অধিকাংশই অনাদায়ী বন্ধকী ঋণের দরুন অথবা সুদ দিতে না পারায় বিক্রি হয়ে গিয়ে কোন অভিজাত মহাজনের সম্পত্তি হয়ে গিয়েছিল; প্রজা হিসাবে থাকতে পেলেই কৃষককে খুশী হতে হত এবং নতুন মালিককে খাজনা হিসাবে উৎপন্ন ফসলের **ছয়ভাগের পাঁচভাগ** দিয়ে সে বাকি **একভাগে** জীবনযাপন করত। এতেই শেষ হত না। যদি জমি বিক্রয়ের টাকা দিয়ে দেনা শোধ না হত কিংবা যদি দেনা শোধের মতো কোন বন্ধক না থাকত, তাহলে দেনদার ছেলেমেয়েদের ক্রীতদাস রূপে বিদেশে বিক্রি করে মহাজনের দাবি মেটাত। পিতা কর্তৃক ছেলেমেয়ে বিক্রি, এই হল পিতৃ-অধিকার ও একপতিপত্নীত্বের প্রথম ফল! এবং এতেও যদি রক্তচোষাটার তৃপ্তি না হত, তাহলে দেনদারকেই সে দাস হিসাবে বিক্রি করতে পারত। এই হল এথেনীয় জনগণের মধ্যে সভ্যতার আনন্দোজ্জ্বল অরুণোদয়।

আগে যখন জনগণের জীবনযাত্রার অবস্থা গোত্র-প্রথার অনুযায়ী ছিল, তখন এই ধরনের বিপ্লব সম্ভব ছিল না; কিন্তু এখন এই ব্যাপার যে কী করে এসে গেল, কেউ তা জানতে পারেনি। ইরকোয়াসদের দিকে একবার ফিরে দেখা যাক। এথেনীয়দের ওপর যেটা বলা যেতে পারে তাদের কৃতকর্ম ছাড়াই এবং অবশ্যই ইচ্ছার বিরুদ্ধে এখন তাদের উপর চেপে বসল, তেমনধারা অবস্থা ইরকোয়াসদের কাছে ধারণার অতীত ছিল। সেখানে জীবনোপকরণের যে উৎপাদন-পদ্ধতি বৎসরের পর বৎসর অপরিবর্তিত থাকত তাতে এই ধরনের সংঘর্ষ আসতেই পারত না, যে সংঘর্ষকে বাইরে থেকে আসা মনে হত; আসতে পারত না এই ধনী ও দরিদ্র, শোষক ও শোষিতের বিরোধ। ইরকোয়াসরা তখন প্রকৃতির শক্তিগুলিকে বশে আনার দিক দিয়ে অনেক পিছিয়ে ছিল, কিন্তু প্রকৃতি-নির্দিষ্ট গন্ডীর মধ্যে তারা ছিল নিজেদের উৎপাদনের প্রভু। তাদের ছোট ছোট বাগিচার ফসলহানি, হ্রদ ও নদীতে মাছ অথবা বনে শিকার দুর্লভ হওয়ার কথা ছেড়ে দিলে তারা আগে থেকে জানত যে তাদের জীবিকার্জন পদ্ধতির ফল কী হবে। ফল হবে জীবনোপকরণ, তা প্রচুর হোক অথবা অপ্রচুর হোক, কিন্তু অচিন্তিত এক সামাজিক ওলটপালট, গোত্রের বন্ধন ছেদন অথবা গোত্র ও উপজাতির সদস্যরা বিরোধী শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পরস্পর সংগ্রাম করবে এমন ফল কখনো হতে পারত না। খুব সংকীর্ণ গন্ডীর মধ্যে উৎপাদন চালাতে হত, কিন্তু উৎপাদকরাই উৎপন্ন জিনিসের উপর দখল রাখত। বর্বর-যুগের উৎপাদন-প্রণালীর এই অসীম সুবিধাটাই সভ্যতার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে নষ্ট হয়ে গেল। প্রকৃতির শক্তিপুঞ্জের উপর মানুষের এখন যে অপরিসীম ক্ষমতা তার ভিত্তিতে এবং বর্তমানে যে স্বাধীন সহযোগিতা সম্ভব হয়ে উঠেছে তার ভিত্তিতে এই সুবিধা আবার ফিরে পাওয়াই হবে পরবর্তী পুরুষদের কর্তব্য।

গ্রীকদের মধ্যে অবস্থা ছিল অন্য রকম। গবাদি পশুযূথ ও বিলাসদ্রব্য নিয়ে ব্যক্তিগত সম্পত্তির আবির্ভাবের ফলে বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে বিনিময় প্রচলিত হল, উৎপন্ন রূপান্তরিত হল **পণ্যে**। পরে যে বিপ্লব দেখা দেয় তার মূলটাই এখানে। উৎপাদকরা যেই নিজেদের উৎপন্ন জিনিস আর প্রত্যক্ষভাবে ভোগ না করে বিনিময়ের মধ্যে একে হাতছাড়া করল, অমনি তারা এর উপর দখল হারাল। সে উৎপন্নের কী গতি হবে সেটা তারা আর জানতে পারত না, এবং এমন একটি সম্ভাবনা দেখা দিল যাতে একদিন উৎপাদকদের বিরুদ্ধেই উৎপন্নকে প্রয়োগ করা হবে, তাদের শোষণ ও পীড়নের মাধ্যম রূপে ব্যবহৃত হবে। এইজন্যই কোন সমাজব্যবস্থাই দীর্ঘদিন ধরে নিজেদের উৎপন্ন জিনিসের প্রভু হয়ে থাকতে ও উৎপাদন-প্রক্রিয়ার সামাজিক ফলাফল নিয়ন্ত্রণাধীন রাখতে পারে না যদি না সে সমাজ বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে বিনিময়ের অবসান করে।

এথেনীয়রা কিন্তু খুব শীঘ্রই টের পেল যে ব্যক্তিদের মধ্যে বিনিময় শুরু ও উৎপন্ন জিনিস পণ্যে পরিণত হবার পর কত শীঘ্র উৎপাদকদের ওপর পণ্যের প্রভুত্ব শুরু

হয়ে যায়। পণ্য-উৎপাদনের সঙ্গেই এল নিজ নিজ কারবার হিসাবে ব্যক্তিগত কৃষকদের জমিচাষ, অল্প পরেই আসে জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানা। তারপর এল মুদ্রা, এই সার্বজনীন পণ্য যার বিনিময়ে সব পণ্যই পাওয়া যায়। কিন্তু মুদ্রা আবিষ্কার করার সময় মানুষ ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারেনি যে, তারা এমন একটি নতুন সামাজিক শক্তি সৃষ্টি করছে, এমন এক সার্বজনীন শক্তি সৃষ্টি করছে যার কাছে সমগ্র সমাজ মাথা নোয়াতে বাধ্য হবে। স্রষ্টাদের ইচ্ছা ব্যতীতই অজ্ঞাতসারে হঠাৎ গজিয়ে ওঠা এই নতুন শক্তিকেই তার যৌবনসুলভ নিষ্ঠুরতায় এখন এথেনীয়রা উপলব্ধি করল।

এই অবস্থায় কী করা দরকার ছিল? মুদ্রার জয়যাত্রার সামনে সাবেকী গোত্র-প্রথা অক্ষম বলে প্রতিপন্ন হল শুধু তাই নয়: এর কাঠামোর মধ্যে মুদ্রা, মহাজন, দেনদার এবং বলপূর্বক ঋণ-আদায়ের মতো ব্যাপারগুলির স্থান সংকুলানেও সে ছিল একেবারে অসমর্থ। কিন্তু নতুন সামাজিক শক্তি যে হাজির, এবং কোন সদিচ্ছা অথবা সাবেকী সুসময়ে ফিরে যাবার কোনো ব্যাকুলতাই মুদ্রা ও মহাজনী প্রথার অস্তিত্ব লোপ করতে অক্ষম। উপরন্তু ইতিমধ্যেই গোত্র-প্রথায় আরো কয়েকটি গৌণ ভাঙ্গন দেখা দিয়েছিল। অ্যাটিকার সর্বত্র, বিশেষ করে এথেন্সে বিভিন্ন গোত্র ও ফ্রাত্রীর লোকেদের যথেচ্ছ মিশ্রণ পুরুষানুক্রমে বাড়তে থাকে, যদিও একজন এথেনীয় তার গোত্রের বাইরে চাষের জোত বিক্রি করতে পারলেও তখনো তার বসত বাড়ী বিক্রি করতে পারত না। উৎপাদনের বিভিন্ন শাখায় শ্রমবিভাগ — কৃষি, হস্তশিল্প, হস্তশিল্পের মধ্যেই আবার বহু রকমের রূপভেদ, বাণিজ্য, নৌচালনা প্রভৃতিতে — শিল্প ও বাণিজ্য সম্পর্ক প্রসারের সঙ্গে অনেক বেশী বিকাশলাভ করে। জনসংখ্যা এখন বিভক্ত হল পেশা অনুযায়ী কয়েকটি সুনির্দিষ্ট গ্রুপে, — এদের প্রত্যেকটিরই এমন কতকগুলি নতুন সাধারণ স্বার্থ ছিল, গোত্র বা ফ্রাত্রীর মধ্যে যাদের স্থান ছিল না, সুতরাং সেগুলির দেখার জন্য নতুন পদসৃষ্টির প্রয়োজন হল। ক্রীতদাসদের সংখ্যা খুবই বেড়ে গিয়েছিল এবং এই আদি অবস্থাতেই তাদের সংখ্যা স্বাধীন এথেনীয়দের চেয়ে নিশ্চয় অনেক বেশী হয়ে থাকবে। গোত্র-প্রথার প্রথম দিকে দাসপ্রথা ছিল না, তাই এত বেশী সংখ্যক দাসকে বশে রাখবার উপায়ও তার অজানা। সর্বশেষে বাণিজ্যের প্রয়োজনে বহু বিদেশী এথেন্সে আকৃষ্ট হয়ে বসবাস শুরু করে, কারণ এখানে টাকা করা সহজসাধ্য ছিল, কিন্তু পুরানো সংবিধান অনুসারে এদেরও কোন অধিকার ছিল না এবং আইন এদের রক্ষাও করত না। তাই ঐতিহ্যগত সহনশীলতা সত্ত্বেও জনগণের মধ্যে এরা একটা ব্যাঘাত করা বিজাতীয় উপাদান হিসাবেই ছিল।

সংক্ষেপে বলা যায় যে, গোত্র-প্রথা ধ্বংস হতে চলেছিল। সমাজ প্রত্যহ একে ক্রমাগত ছাপিয়ে বেড়ে উঠছিল; অত্যন্ত পীড়াদায়ক যেসব ত্রুটি চোখের সামনেই জাগছে তাদের উপশম বা প্রতীকার করার ক্ষমতা পর্যন্ত এর ছিল না। ইতিমধ্যে কিন্তু

চুপি চুপি গড়ে উঠছিল রাষ্ট্র। প্রথমে গ্রাম ও নগরে এবং পরে নগরাঞ্চলে শিল্পের বিভিন্ন শাখায় শ্রমবিভাগের ফলে যে নতুন জনসমষ্টিগুলি দেখা দেয় তারা নিজের স্বার্থ রক্ষার জন্য নতুন নতুন সংস্থা সৃষ্টি করে। রকমারি রাষ্ট্রীয় দায়িত্বের পদ সৃষ্টি হয়। এবং তারপর ছোটখাট যুদ্ধের ক্ষেত্রে অথবা বাণিজ্য-জাহাজ রক্ষাকল্পে তরুণ রাষ্ট্রের সর্বোপরি প্রয়োজন ছিল নিজস্ব যুদ্ধ-বাহিনী, সমুদ্রযাত্রী এথেনীয়দের মধ্যে প্রথমে এই শক্তি কেবল নৌবাহিনী হতে পারত। সোলনের সময়ের আগেই কোনো অনির্দিষ্ট কালে প্রতিষ্ঠিত হয় নৌক্রারি (naucrarie) — ছোটো ছোটো আঞ্চলিক জেলা, প্রত্যেক উপজাতিতে বারটি করে। প্রত্যেকটি নৌক্রারিকে একটি করে যুদ্ধ-জাহাজ লস্কর ও অস্ত্র সমেত পূর্ণভাবে সজ্জিত করতে হত এবং অধিকন্তু দুজন অশ্বারোহী দিতে হত। এই ব্যবস্থায় গোত্র-প্রথার উপর দুদিক দিয়ে আক্রমণ এল। প্রথমত, এতে একটি সামাজিক শক্তি সৃষ্টি হল যা আর আগেকার সামগ্রিক সশস্ত্র জনগণের সঙ্গে একাত্মক নয়। দ্বিতীয়ত, এতে সর্বপ্রথম সামাজিক উদ্দেশ্যে জনগণকে আত্মীয়তার ভিত্তিতে নয়, পরন্তু **আঞ্চলিকভাবে বাসস্থান** অনুযায়ী ভাগ করা হল। এর তাৎপর্য কী তা পরে দেখা যাবে।

গোত্র-প্রথা যেহেতু শোষিত জনগণকে সাহায্য করতে পারত না, তাই কেবল অভ্যুদয়শীল রাষ্ট্রের মুখাপেক্ষী হতে হত তাদের। এবং রাষ্ট্র এই সাহায্যের জন্য সোলনের সংবিধান উপস্থিত করল এবং পুরাতন প্রথার বিনিময়ে নতুন করে নিজের শক্তি বাড়াল। সোলন — কী প্রণালীতে তিনি ৫৯৪ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে সংস্কার ঘটালেন, তা আমাদের আলোচ্য নয় — মালিকানার অধিকারে হস্তক্ষেপ করে তথাকথিত রাজনৈতিক বিপ্লবগুলি শুরু করলেন। এতাবৎকাল পর্যন্ত একধরনের মালিকানার বিরুদ্ধে আর একধরনের মালিকানা রক্ষা করার জন্যই সমস্ত রাজনৈতিক বিপ্লব ঘটেছে। এইগুলি একধরনের মালিকানাকে লংঘন না করে অপর একটি ধরনকে রক্ষা করতে পারে না। মহান ফরাসী বিপ্লবে সামন্ত মালিকানাকে বলি দেওয়া হয়েছিল বুর্জোয়া মালিকানা রক্ষার জন্য; সোলনের বিপ্লবে মহাজনের সম্পত্তি ক্ষুণ্ণ করে দেনদারের সম্পত্তি রক্ষা করার কথা। দেনা সোজাসুজি বাতিল করা হল। বিস্তারিত বিবরণ আমরা জানি না, কিন্তু সোলন তাঁর কবিতায় গর্ব প্রকাশ করেছেন এই বলে যে, বন্ধক-দেওয়া ভূখণ্ডগুলি থেকে বন্ধক-চিহ্নিত থামগুলি তিনি সরিয়ে দেন এবং যারা পালিয়ে গিয়েছিল অথবা দেনার দায়ে বিদেশে বিক্রি হয়েছিল, তারা আবার ঘরে ফিরতে পারল। কেবলমাত্র প্রকাশ্যভাবে মালিকানার অধিকার লংঘন করেই এ কাজ করা সম্ভব ছিল। বস্তুতঃ প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত তথাকথিত রাজনৈতিক বিপ্লবের লক্ষ্যই হচ্ছে **এক**ধরনের সম্পত্তি রক্ষা করবার জন্য **অপর** ধরনের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা, যাকে অপহরণ করাও বলা যায়। এইজন্য এ কথা সর্বৈব সত্য যে, আড়াই হাজার বছর ধরে ব্যক্তিগত মালিকানা রক্ষা করা গেছে কেবল মালিকানা অধিকার লংঘন করেই।

কিন্তু এখন এমন একটি উপায় উদ্ভাবনের দরকার হল যাতে স্বাধীন এথেনীয়দের মধ্যে দাসত্বের পুনরাবৃত্তি ঘটতে না পারে। প্রথমে কয়েকটি সাধারণ ব্যবস্থার দ্বারা এটি করা হল যেমন, দেনদার নিজে বন্ধক হয় এমন চুক্তি নিষিদ্ধ হল। তাছাড়া, চাষীর জমির ওপর অভিজাতদের লালসা অন্তত কিছুটা খর্ব করার জন্য ব্যক্তিগত মালিকানাধীন জমির উচ্চতম সীমা স্থির করা হল। তারপরে এল সংবিধানগত (Verfassung) সংশোধন, যাদের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি হচ্ছে আমাদের কাছে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ:

পরিষদের সদস্য-সংখ্যা চারশ করা হল, প্রত্যেক উপজাতি থেকে একশ করে। এই ব্যাপারে উপজাতি এখনও ভিত্তি হিসাবে কাজ করছে। কিন্তু এইটি হচ্ছে পুরনো ব্যবস্থার একমাত্র জিনিস যা নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থায় স্থান পেল। অন্যদিকে সোলন নাগরিকদের জমি ও ফসলের পরিমাণ অনুযায়ী চারটি শ্রেণীতে ভাগ করলেন: প্রথম তিন শ্রেণীর ন্যূনতম উৎপাদন ছিল পাঁচশ', তিনশ' ও দেড়শ' মেডিম্নাস শস্য (এক মেডিম্নাস মানে প্রায় ৪১ লিটার); যাদের জমি এর চেয়ে কম বা ভূসম্পত্তি নেই তারা চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ত। কেবলমাত্র প্রথম তিনটি শ্রেণী পদাধিকারী হতে পারত; উচ্চতম পদগুলি কেবল প্রথম শ্রেণীর লোক দিয়ে পূরণ করা হত। চতুর্থ শ্রেণী জনসভায় বলতে ও ভোট দিতে শুধু পারত, কিন্তু এই জনসভাতেই সমস্ত পদাধিকারী নির্বাচিত হত, নিজেদের কাজের জবাবদিহি করতে হত তাদের, এখানেই সমস্ত আইন তৈরী হত এবং এইখানে চতুর্থ শ্রেণী ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। অভিজাতদের বিশেষ সুবিধাগুলি ধনের বিশেষ সুবিধা হিসাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলেও জনগণের হাতে চূড়ান্ত ক্ষমতা রইল। শ্রেণী চারটি সৈন্যবাহিনী পুনর্গঠনেরও ভিত্তি জোগাল। প্রথম দুটি শ্রেণী অশ্বারোহী বাহিনী দিত, তৃতীয় শ্রেণী করত ভারি পদাতিক সৈন্যের কাজ; চতুর্থ শ্রেণী আসত হালকা পদাতিক অথবা নৌবাহিনী হিসাবে এবং এরা সম্ভবতঃ পারিশ্রমিক পে...।

এইভাবে সংবিধানের মধ্যে একেবারে নতুন একটি উপাদান এসে গেল — ব্যক্তিগত মালিকানা। নাগরিকদের অধিকার ও কর্তব্যের মাত্রা তাদের মালিকানাধীন জমির পরিমাণ দিয়ে স্থির হত; এবং বিত্তশীল শ্রেণীগুলির প্রভাব যত বাড়ল ততই পুরাতন রক্তসম্পর্কযুক্ত জনসমষ্টি আড়ালে পড়ে যেতে লাগল। গোত্র-প্রথার আর একবার পরাজয় হল।

অবশ্য সম্পত্তির পরিমাপে রাজনৈতিক অধিকারের মাত্রা নির্ণয় রাষ্ট্রের পক্ষে অপরিহার্য প্রথা নয়। বিভিন্ন রাষ্ট্রের সংবিধানের ইতিহাসে এর গুরুত্ব থাকলেও বেশ কিছুসংখ্যক রাষ্ট্র, বলতে কি তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা পরিণত রাষ্ট্র, এ জিনিস ছাড়াই চলেছে। এমনকি এথেন্সেও এর ভূমিকা অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী ছিল; এরিস্টাইডিসের সময় থেকেই সকল নাগরিকদের জন্যই সমস্ত পদ উন্মুক্ত থাকে।

পরবর্তী আশি বছরে এথেনীয় সমাজ ক্রমশ যে পথ নিল, সেই পথেই পরবর্তী শতাব্দীগুলিতে তার পরিণতি চলে। সোলনের আগের যুগে যেভাবে জমি নিয়ে মহাজনী কারবারের প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল, এখন তাকে এবং সেই সঙ্গে ভূসম্পত্তির সীমাহীন কেন্দ্রীভবনকে সংযত করা হয়। ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ক্রমবর্ধিত পরিমাণে দাস-শ্রমের সাহায্যে পরিচালিত হস্তশিল্প ও কারুশিল্প হয়ে উঠল মূল পেশা। জ্ঞানের চর্চা বাড়তে লাগল। আগের মতো নিজেদের সহনাগরিকদের শোষণ না করে এখন এথেনীয়রা প্রধানতঃ দাস ও বিদেশী ক্রেতাদের শোষণ করতে থাকল। অস্থাবর সম্পত্তি, অর্থ, ক্রীতদাস ও জাহাজ রূপে সম্পদ ক্রমেই বাড়তে থাকল; কিন্তু আগের সীমাবদ্ধতার যুগে এগুলিকে জমি কেনবার উপায় মাত্র মনে করার বদলে এখন এই সঞ্চয়ই লক্ষ্য হয়ে উঠল। এতে একদিকে যেমন পুরাতন অভিজাতদের ক্ষমতার সঙ্গে এক নতুন ধনী শিল্পপতি ও বণিক শ্রেণীর সফল প্রতিদ্বন্দ্বিতার উদ্ভব হল, অপরদিকে এতে পুরাতন গোত্র-প্রথা তার শেষ আশ্রয় হারাল। গোত্র, ফ্রাত্রী ও উপজাতি-সভ্যরা এখন অ্যাটিকার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল এবং সকলে একেবারে মিশ্রিতভাবে বসবাস করত, এগুলি তাই রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে একেবারে অব্যবহার্য হয়ে পড়েছিল। এথেনীয় নাগরিকদের এক বৃহৎ সংখ্যা কোন গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল না; এরা বিদেশাগত, নাগরিক হিসাবে গৃহীত হলেও রক্তসম্পর্কযুক্ত কোনো সাবেকী গোষ্ঠীর মধ্যে গৃহীত হয় না। এরা ছাড়াও নিতান্ত রক্ষণপ্রাপ্ত বিদেশাগতদের সংখ্যাও কেবলই বেড়ে চলল।

ইতিমধ্যে বিভিন্ন পার্টির সংগ্রাম চলতে থাকে। অভিজাতরা পুরনো সুবিধা ফিরে পাবার চেষ্টা করে এবং অল্প কালের জন্য প্রাধান্য পায়। পরে ক্লিস্থিনিসের বিপ্লব (৫০৯ খ্রীঃ পূঃ) তাদের চূড়ান্ত পতন ঘটাল এবং এদের পতনের সঙ্গেই গোত্র-প্রথার শেষ কাঠামোও ধ্বসে পড়ল।

ক্লিস্থিনিস তাঁর নতুন সংবিধানে গোত্র ও ফ্রাত্রীর ভিত্তিতে গঠিত পুরনো চারটি উপজাতিকে উপেক্ষা করলেন। তাদের জায়গায় এল সম্পূর্ণ নতুন একটি সংগঠন যাতে নাগরিকদের বাসস্থানের ভিত্তিতে ভাগ করা হল, ইতিপূর্বে নৌক্রারিতে যার চেষ্টা হয়েছিল। এখন কোন রক্তসম্পর্কযুক্ত গোষ্ঠীভুক্তি নয়, স্থায়ী বাসস্থানই হল চূড়ান্ত ব্যাপার। এখন আর জনগণের বিভাগ নয়, পরন্তু ভূখণ্ডের বিভাগ করা হল; রাষ্ট্রনীতির দিক দিয়ে অধিবাসীরা হল ভূখণ্ডসংশ্লিষ্ট মাত্র।

সমগ্র অ্যাটিকাকে একশত স্বায়ত্তশাসনশীল অঞ্চল বা ডেমে (dem) ভাগ করা হল। এক একটি ডেমের নাগরিকরা (demot) নিজেদের একজন সরকারী প্রধান (demarch), একজন খাজাঞ্চী এবং ছোট ছোট মামলা চালাবার ক্ষমতা সম্বলিত ত্রিশজন বিচারক নির্বাচিত করত। তারা তাদের নিজস্ব একটি মন্দির এবং একজন উপাস্য দেবতা অথবা বীর (heros) রাখত, এর পুরোহিতরা নির্বাচিত হতেন। ডেমের

সর্বোচ্চ ক্ষমতা ন্যস্ত ছিল ডেমটদের সভার উপর। মর্গান সঠিকভাবেই মন্তব্য করেছেন যে, এটাই হচ্ছে আমেরিকার স্বায়ত্তশাসনশীল মিউনিসিপ্যালিটির আদিরূপ। পূর্ণাঙ্গ পরিণতিতে আধুনিক রাষ্ট্রের শেষ হচ্ছে ঠিক সেই এককে যা নিয়ে এথেন্সের উদীয়মান রাষ্ট্রের শুরু।

এইরকম দশটি একক, ডেম নিয়ে একটি উপজাতি গঠিত হয়; কিন্তু গোত্রভিত্তিক পুরাতন উপজাতি (Geschlechtsstamm) থেকে পার্থক্য করে এটিকে এখন বলা হল অঞ্চলভিত্তিক উপজাতি (Ortsstamm)। আঞ্চলিক উপজাতি শুধু স্বায়ত্তশাসিত রাজনৈতিক সংস্থাই নয়, এটি আবার সামরিক সংস্থাও বটে। এরা নির্বাচন করত একজন ফাইলার্ক অথবা উপজাতীয় প্রধান, যিনি অশ্বারোহী বাহিনী চালনা করতেন, একজন ট্যাক্সিয়ার্ক যিনি পদাতিক বাহিনী চালনা করতেন এবং একজন স্ট্রাটেগস যিনি উপজাতির এলাকায় সংগঠিত সমগ্র সামরিক শক্তির অধিনায়ক ছিলেন। অধিকন্তু লোকলশকর ও কম্যান্ডার সমেত পাঁচখানি করে সজ্জিত জাহাজ অঞ্চলকে দিতে হত এবং এরা পেত অঞ্চলের রক্ষক-দেবতা হিসাবে একটি অ্যাটিক বীরকে যাঁর নামে এরা পরিচিত হত। সর্বশেষে এরা এথেন্সের পরিষদের জন্য পঞ্চাশজন সদস্য নির্বাচিত করত।

এর পরিণতি হল এথেনীয় রাষ্ট্র, যা দশটি উপজাতি থেকে নির্বাচিত পাঁচশ' সদস্যের পরিষদ কর্তৃক, এবং শেষ বিচারে জনসভা কর্তৃক শাসিত, এ জনসভায় প্রত্যেক এথেনীয় নাগরিক উপস্থিত থাকতে ও ভোট দিতে পারত। এর সঙ্গে আর্খন ও অন্যান্য পদাধিকারীরা শাসনকার্যের বিভিন্ন বিভাগ ও আদালতের কাজ চালাতেন। এথেন্সে সর্বোচ্চ কার্যনির্বাহক কোনো পদাধিকারী ছিল না।

এই নতুন সংবিধানের ফলে এবং অংশতঃ বিদেশাগত ও অংশতঃ মুক্ত দাসদের মধ্যে থেকে এক বৃহৎ সংখ্যার অসমাধিকারী অধিবাসীকে (Schutzverwandter) গ্রহণ করার ফলে সামাজিক ক্ষেত্র থেকে পুরাতন গোত্র-সংস্থাগুলো অপসারিত হল। এগুলি গৌণ সমিতি ও ধর্মীয় সম্প্রদায়ের স্তরে নেমে পড়ল। কিন্তু তাদের নৈতিক প্রভাব, পুরনো গোত্রভিত্তিক যুগের ঐতিহ্যগত ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গি দীর্ঘদিন টিকে থাকে এবং ক্রমে ক্রমে সেগুলির বিলুপ্তি ঘটে। তা ফুটে ওঠে পরবর্তী একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠানে।

আমরা দেখেছি যে, রাষ্ট্রের একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সাধারণ জনগণ থেকে স্বতন্ত্র একটি সামাজিক শক্তি। ঐ সময়ে এথেন্সের মাত্র জনবাহিনী ও নৌবাহিনী ছিল যাতে জনগণই সরাসরি লোক ও উপকরণ যোগাত। এ দিয়ে বাইরের শত্রু থেকে আত্মরক্ষা ও দাসদের সংযত রাখা হত, এই শেষোক্তরা তখনই জনসংখ্যার বৃহত্তম অংশ হয়ে উঠেছিল। নাগরিকদের পক্ষে এই সামাজিক শক্তিটা প্রথমে ছিল কেবল

পুলিশবাহিনী রূপে, — এই পুলিশ হচ্ছে রাষ্ট্রের সমবয়সী এবং এইজন্যই অষ্টাদশ শতাব্দীর সাদামাটা সরল ফরাসীরা সভ্য জাতি না বলে পুলিশসম্বলিত জাতি (nations policées) বলত। এইভাবে রাষ্ট্র পত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই এথেনীয়রা একটি পুলিশবাহিনীও প্রতিষ্ঠা করল, পদাতিক ও অশ্বারোহী তীরন্দাজদের নিয়ে একটি রীতিমতো সান্ত্রীবাহিনী — দক্ষিণ জার্মানি ও সুইজারল্যান্ডে যাকে বলা হয় landjäger। কিন্তু এই সান্ত্রীবাহিনী গঠিত ছিল দাসদের নিয়ে। স্বাধীন নাগরিক পুলিশের কাজকে এতই ঘৃণ্য মনে করত যে, সে নিজে তেমন হেয় কাজ করার চেয়ে একজন সশস্ত্র দাসের হাতে গ্রেপ্তার হওয়া পছন্দ করত। এটা হল তখনো সেই সাবেকী গোত্র মনোভাবের একটা অভিব্যক্তি। পুলিশ ছাড়া রাষ্ট্র বাঁচতে পারে না, কিন্তু তখনও রাষ্ট্র নেহাৎ নতুন এবং তার ততখানি নৈতিক মর্যাদা হয়নি যাতে এই পেশা যা পুরনো গোত্রের দৃষ্টিভঙ্গিতে অবশ্যই জঘন্য মনে হত তা সম্মানীয় হবে।

এই নতুন রাষ্ট্র যার মূল অঙ্গগুলি এখন সম্পূর্ণ হয়ে উঠেছিল, এটি এথেনীয় সমাজের নতুন অবস্থার কতখানি উপযোগী হয়েছিল তা বুঝা যায় অর্থসম্পদ, বাণিজ্য ও শিল্পের দ্রুত বৃদ্ধি থেকে। যে শ্রেণী-বিরোধকে ভিত্তি করে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলি দাঁড়িয়েছিল, সেটি আর অভিজাত ও সাধারণ নাগরিকদের বিরোধ নয়, সেটি হচ্ছে দাস ও স্বাধীন মানুষের মধ্যে, অসমাধিকারী অধিবাসী ও নাগরিকদের মধ্যে বিরোধ। এথেন্সের সর্বাধিক শ্রীবৃদ্ধির সময়ে স্ত্রীলোক ও সন্তানসন্ততি সমেত স্বাধীন নাগরিকদের সংখ্যা ছিল ৯০,০০০-এর কাছাকাছি; স্ত্রীপুরুষ দাসদের সংখ্যা ছিল ৩,৬৫,০০০ এবং অসমাধিকারী অধিবাসীদের সংখ্যা — বিদেশাগত ব্যক্তি ও মুক্ত দাসদের নিয়ে — ছিল ৪৫,০০০। অতএব প্রত্যেক সাবালক পুরুষ নাগরিক পিছু কমপক্ষে আঠার জন দাস ও দুজনের বেশী অসমাধিকারী ছিল। দাসদের বৃহৎ সংখ্যার কারণ ছিল এই যে, তাদের অনেকে বড় বড় ঘরে অবস্থিত হস্তশিল্প কারখানায় পরিদর্শকের অধীনে কাজ করত। বাণিজ্য ও শিল্পের বিকাশের সঙ্গে অল্প কয়েকজনের হাতে ধনের সঞ্চয় ও কেন্দ্রীকরণ হল; স্বাধীন নাগরিকদের ব্যাপক সংখ্যা দরিদ্র হতে থাকল এবং তাদের বেছে নিতে হল, হয় হস্তশিল্প গ্রহণ ও দাসের সঙ্গে শ্রমের প্রতিযোগিতা যা তখন ঘৃণ্য ও নীচ বলে মনে করা হত এবং উপরন্তু যার কোন ভবিষ্যৎ ছিল না, নয়ত একেবারে নিঃস্বতা। তখনকার প্রচলিত অবস্থার মধ্যে এই শেষটাই অনিবার্যভাবে ঘটত এবং এরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ার ফলে সেই সঙ্গে গোটা এথেনীয় রাষ্ট্রকেই নিচে টানতে থাকল। গণতন্ত্রের জন্য এথেন্সের পতন হয়নি, যদিও রাজরাজড়াদের পদলেহী ইউরোপীয় শিক্ষকেরা আমাদের এই কথা বিশ্বাস করাতে চেয়েছেন, — পতন হয়েছে দাসপ্রথার ফলে, যে প্রথা স্বাধীন নাগরিকের শ্রমকে অশ্রদ্ধেয় করে তুলেছিল।

এথেনীয়দের মধ্যে রাষ্ট্রের উদ্ভব সাধারণভাবে রাষ্ট্রগঠনের একটি টিপিকাল দৃষ্টান্তস্বরূপ; কারণ, একদিকে এটি বাইরের অথবা ভিতরের হিংস্র হস্তক্ষেপ ছাড়াই একটি বিশুদ্ধ রূপ নেয় (পিসিস্ট্রেটাসের অল্পস্থায়ী ক্ষমতাদখল কোন চিহ্ন রেখে যায়নি); অপরদিকে এটি ছিল রাষ্ট্রের একটি অত্যন্ত উন্নত রূপ, গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র যা সরাসরি গোত্রভিত্তিক সমাজ থেকে উদ্ভূত; এবং সর্বশেষে, এই ক্ষেত্রে আমরা সমস্ত মৌলিক খুঁটিনাটির যথেষ্ট বিবরণ পাই।

৬

রোমের গোত্র ও রাষ্ট্র

রোম প্রতিষ্ঠার উপকথা অনুযায়ী একটি উপজাতিতে মিলিত কয়েকটি ল্যাটিন গোত্র এখানে বসবাসের উদ্যোগ করে (উপকথায় এদের সংখ্যা একশত) এবং তাদের একটু পরেই একটি সাবেলিয়ান উপজাতি আসে, এদেরও গোত্র-সংখ্যা নাকি একশত, এবং সর্বশেষে একটি বিভিন্ন ধরনের জনসমষ্টি নিয়ে গঠিত উপজাতি এদের সঙ্গে যোগ দিল, এই শেষোক্তদেরও গোত্র-সংখ্যা একশত। এই গোটা কাহিনী থেকে এক নজরেই প্রকাশ পায় যে, গোত্র ছাড়া অপর কিছুই এখানে স্বাভাবিক জিনিস নয় এবং বহু ক্ষেত্রে গোত্রগুলিও হল পুরাতন বাসভূমিতে তখনও অবস্থিত কোনো আদি মাতৃগোত্রের শাখা প্রশাখা। উপজাতিগুলি কৃত্রিমভাবে গঠিত হওয়ার চিহ্ন বহন করত; তবুও সেগুলি আত্মীয় ব্যক্তিবর্গ নিয়েই প্রধানতঃ গড়ে ওঠে এবং তারা পুরনো স্বাভাবিকভাবে বিকশিত উপজাতিগুলির ছাঁচেই গড়া, কোন কৃত্রিমভাবে নয়; এবং এটা আদৌ অসম্ভব নয় যে, এই তিনটি উপজাতির প্রত্যেকেরই কেন্দ্র ছিল কোন পুরানো খাঁটি উপজাতি। মধ্যবর্তী যোগসূত্র ফ্রাত্রীতে দশটি করে গোত্র ছিল এবং এর নাম ছিল কিউরিয়া। অতএব এদের সংখ্যা ছিল ত্রিশ।

রোমক গোত্র যে গ্রীক গোত্রের মতোই অভিন্ন একটা প্রতিষ্ঠান ছিল সেটা স্বীকৃত সত্য; মার্কিন লাল চামড়াদের ক্ষেত্রে যার আদিরূপ দেখা যায়, গ্রীক গোত্র যদি হয় সেই সামাজিক এককেরই অনুবর্তন, তাহলে স্বভাবতই সে কথা সম্পূর্ণভাবে রোমক গোত্রের পক্ষেও খাটে। তাই আলোচনাটা আমরা সংক্ষিপ্ত করতে পারি।

অন্ততঃ নগরের একেবারে আদি কালে রোমক গোত্রের গঠন ছিল নিম্নরূপ:

১। গোত্রের কেউ মারা গেলে তার সম্পত্তির পারস্পরিক উত্তরাধিকার; সম্পত্তি গোত্রের মধ্যেই থাকত। যেহেতু গ্রীক গোত্রের মতো রোমক গোত্রেও পিতৃ-অধিকার ইতিমধ্যে প্রচলিত ছিল, সেইজন্য মেয়েদের সন্তানসন্ততিরা উত্তরাধিকারে বঞ্চিত হত।

আমাদের জানা রোমের প্রাচীনতম লিপিবদ্ধ আইন, দ্বাদশ ফলকের আইন* অনুযায়ী সন্তানসন্ততি হত সম্পত্তির প্রথম উত্তরাধিকারী; কোনো সন্তান না থাকলে এগ্‌নেটরা (**পুরুষের** দিক দিয়ে নিকটতম জ্ঞাতি) অধিকারী হত; এবং এদেরও অবর্তমানে গোত্র-সদস্যরা। সকল ক্ষেত্রেই সম্পত্তি গোত্রের মধ্যেই থাকত। এখানে আমরা গোত্র-সংবিধানের মধ্যে সম্পত্তি বৃদ্ধি ও একপতিপত্নীত্বের ফলে উদ্ভূত নতুন আইনগত ব্যবস্থার ধীরে ধীরে অন্তর্প্রবেশ লক্ষ্য করি। আদিতে উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে গোত্র-সভ্যদের সমান অধিকারকে প্রথমে সংকুচিত করে কার্যত এগনেটদের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হল,—এটি আগে যা বলেছি সম্ভবত খুব আদিম কালের ব্যাপার — এবং তারপরে সন্তানসন্ততি আর তাদের পুরুষ ধারার ছেলেমেয়েরা উত্তরাধিকারী হয়। অবশ্য দ্বাদশ ফলকের আইনে এটি উল্টোভাবে প্রকাশ পাচ্ছে।

২। একটি সাধারণ সমাধিস্থান। ক্লাডিয়ার প্যাট্রিশিয়ান গোত্র রেগিলি থেকে এসে রোমে বসবাস করতে শুরু করলে নগরে তাদের জন্য ভূমিখন্ড ও একটি সাধারণ সমাধিস্থান দেওয়া হল। এমনকি অগাস্টসের সময়ে ভেরস যখন টিউটোবুর্গের অরণ্যে** মারা যান, তখন তাঁর মাথা রোমে এনে গোত্রের সমাধিস্তূপে (gentilitius tumulus) সমাধি দেওয়া হয়; অতএব তাঁর গোত্রের (ক্‌ভিঙ্গটিলিয়া) তখনও নিজস্ব সমাধিস্তূপ ছিল।

৩। সাধারণ ধর্মোৎসব। এই sacra gentilitia সুপরিচিত।

৪। গোত্রের মধ্যে বিবাহ না করবার বাধ্যবাধকতা। রোমে এটি কখনো আইন রূপে লিপিবদ্ধ হয়েছিল বলে মনে হয় না, কিন্তু এই রীতি ছিল। রোমের বিবাহিত দম্পতিদের যে অসংখ্য নাম আজ পর্যন্ত আমরা পেয়েছি, তার মধ্যে এমন একটি দৃষ্টান্তও নেই যেখানে স্বামী ও স্ত্রী দুজনের গোত্রের নাম একই। উত্তরাধিকার আইনও এই নিয়মই প্রমাণ করে। বিবাহের পরে স্ত্রীলোক তার এগ্‌নেটিক্ অধিকার হারাত, নিজের গোত্র পরিত্যাগ করত এবং সে অথবা তার ছেলেমেয়েরা তার বাপ অথবা কাকাদের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে পারত না, কারণ তাহলে বাপের গোত্রকে সম্পত্তি

* দ্বাদশ ফলকের আইন — রোমক আইনের প্রাচীন নিদর্শন। প্যাট্রিশীয়দের বিরুদ্ধে প্লেবদের সংগ্রামের ফলস্বরূপ। এগুলো সূত্রবদ্ধ হয় খৃঃ পূঃ ৫ম শতকের মাঝামাঝি, এবং রোমের পূর্বপ্রচলিত প্রথাগত আইন বদলে দেয়। রোম সমাজের সম্পত্তিভেদ, দাসপ্রথার বৃদ্ধি এবং দাসমালিক রাষ্ট্রগঠনের প্রক্রিয়া প্রতিফলিত হয় এই আইনে। আইনগুলি লিপিবদ্ধ ছিল দ্বাদশটি ফলকে। — সম্পাঃ

** টিউটোবুর্গের অরণ্যে রোম বিজেতাদের বিরুদ্ধে উত্থিত জার্মান উপজাতিগুলির সঙ্গে ভেরসের নেতৃত্বাধীন রোমক সৈন্যদের যুদ্ধের কথা বলা হচ্ছে (৯ খৃষ্টাব্দ)। যুদ্ধে রোমকরা পরাজিত ও সেনানায়ক নিহত হয়। — সম্পাঃ

হারাতে হত। স্ত্রীলোক নিজের গোত্রের কাউকে বিবাহ করতে পারত না, এই কথা মানলে তবে এই নিয়ম বোধগম্য হয়।

৫। জমির যৌথ মালিকানা। আদি যুগে উপজাতির জমির প্রথম ভাগ না হওয়া পর্যন্ত এই ব্যাপারই দেখা যেত। ল্যাটিন উপজাতিগুলির মধ্যে আমরা দেখি যে, জমি অংশতঃ উপজাতির অধিকারে, অংশতঃ গোত্রের এবং অংশতঃ গৃহস্থালীর দখলে। মনে হয় এই গৃহস্থালী তখনও মোটেই একটি পরিবার নিয়ে হতে পারত না। রমুলাসই প্রথম ব্যক্তিবিশেষ ধরে জমি বণ্টন করেছিলেন শোনা যায়, মাথাপিছু এক হেক্টেয়ার (দুই জুগেরা)। তথাপি পরেও গোত্রের সাধারণ দখলে জমি দেখা যায়, রাষ্ট্রের জমির কথা ছেড়েই দিই, যাকে কেন্দ্র করে প্রজাতন্ত্রের সমগ্র আভ্যন্তরীণ ইতিহাস আবর্তিত হয়েছে।

৬। গোত্রের সভ্যদের পরস্পর সাহায্য ও অন্যায় প্রতীকারের বাধ্যবাধকতা। লিখিত ইতিহাসে এর সামান্য লুপ্তাবশেষ পাওয়া যায়; সূচনা থেকেই রোমক রাষ্ট্রের এতখানি ঊর্ধ্বতন শক্তির প্রকাশ ঘটে যে, অন্যায় প্রতীকারের দায়িত্ব এতেই অর্সায়। এ্যাপিয়াস ক্লডিয়াস যখন গ্রেপ্তার হন, তখন তাঁর ব্যক্তিগত শত্রু সমেত তাঁর সমগ্র গোত্র শোক করে। দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধের* সময় গোত্রাধীন বন্দীদের মুক্তিক্রয়ের জন্য গোত্রগুলি ঐক্যবদ্ধ হয়; সেনেট এই কাজ **নিষিদ্ধ করে।**

৭। গোত্র নাম ব্যবহারের অধিকার। এইটি সাম্রাজ্যের যুগের আগে পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। মুক্তদাসেরা প্রাক্তন প্রভুর গোত্র-নাম নিতে পারত, অবশ্য তারা গোত্রের কোন অধিকার পেত না।

৮। বিদেশীদের গোত্রে অন্তর্ভুক্ত করবার অধিকার। এই কাজ সম্পন্ন করা হত একটি পরিবারে অন্তর্ভুক্ত করে (যেমন রেড ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে) এবং তাহলেই ঐ ব্যক্তি একইসঙ্গে গোত্রের অন্তর্ভুক্ত হত।

৯। প্রধানদের নির্বাচন বা পদচ্যুতির অধিকারের উল্লেখ কোথাও পাওয়া যায় না। কিন্তু যেহেতু রোমের অস্তিত্বের প্রথম যুগে নির্বাচিত রাজা থেকে নিচের দিকে সমস্ত সরকারী পদই নির্বাচন অথবা নিয়োগ দ্বারা পূর্ণ করা হত এবং যেহেতু কিউরিয়াগুলিও তাদের পুরোহিতদের নির্বাচিত করত, সেইজন্য ধরে নেওয়া চলে যে, গোত্র-প্রধানের সম্বন্ধেও এই প্রণালীই প্রচলিত ছিল — একই পরিবার থেকে প্রার্থী বাছাই করার রীতি ততদিনে যতই সুপ্রতিষ্ঠিত হক না কেন।

রোমক গোত্রের অধিকারগুলি ছিল এইরকম। শুধুমাত্র পরিপূর্ণভাবে পিতৃ-

* পিউনিক যুদ্ধ — রোমের সঙ্গে পিউনিকদের অর্থাৎ উত্তর আফ্রিকার ফিনিসীয় উপনিবেশ কার্থেজের অধিবাসীদের যুদ্ধ। এটি চলে খৃঃ পূঃ ২৬৪ থেকে ১৪৬ পর্যন্ত। — সম্পাঃ

অধিকারে উৎক্রান্তি ছাড়া এটি হচ্ছে ইরকোয়াস গোত্রের কর্তব্য ও অধিকারের যথাযথ প্রতিচ্ছবি। অর্থাৎ এখানেও 'পরিষ্কারভাবে ইরকোয়াসের সাক্ষাৎ মিলছে'।

আমাদের সবচেয়ে প্রামাণ্য ঐতিহাসিকদের মধ্যেও রোমক গোত্র-প্রথার প্রকৃতি সম্পর্কে যে কত ভুল ধারণা আজও রয়েছে, তা নিচের দৃষ্টান্ত থেকে বুঝা যায়: প্রজাতন্ত্রী এবং অগাস্টেসীয় যুগের রোমকদের নাম সম্পর্কিত রচনায় ('রোম বিষয়ক গবেষণা', বার্লিন, ১৮৬৪, ১ম খণ্ড*) মমসেন লিখছেন, 'গোত্রের নাম শুধু সকল পুরুষরাই — দাস বাদে কিন্তু পোষ্যরাও তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত — ব্যবহার করত না, পরন্তু স্ত্রীলোকেরাও করত... উপজাতি (Stamm, মমসেন এ ক্ষেত্রে এই বলে gens কথাটির অনুবাদ করেছেন) হচ্ছে... একই সাধারণ — বাস্তব বা কল্পিত অথবা উদ্ভাবিত — বংশোদ্ভূত একটি জনসমষ্টি এবং এর সাধারণ পূজাপদ্ধতি, সমাধিস্থান ও উত্তরাধিকার দিয়ে একতাবদ্ধ। সমস্ত স্বাধীন ব্যক্তি, অতএব স্ত্রীলোকেরাও এর তালিকাভুক্ত হতে পারত এবং হতে হত। কিন্তু বিবাহিতা স্ত্রীলোকের গোত্র-গত নাম স্থির করা কিছুটা শক্ত। বস্তুতঃ নিজেদের গোত্রের বাইরে নারীর বিবাহ যখন নিষিদ্ধ ছিল তখন এ জিনিস ছিলই না; এবং এ কথা স্পষ্ট যে, অনেকদিন পর্যন্ত মেয়েদের পক্ষে নিজের গোত্রের ভিতরে অপেক্ষা বাইরে বিবাহ করা অনেক বেশী শক্ত ছিল। এই অধিকার, অর্থাৎ gentis enuptio** ষষ্ঠ শতাব্দীতেও ব্যক্তিগত সুবিধা ও পুরস্কার হিসাবে দান করা হত... কিন্তু যেখানেই এইরকম বাইরে বিবাহ হত, সেইখানেই আদিম যুগে স্ত্রীলোককে তার স্বামীর উপজাতিতে যেতে হত মনে হয়। পুরানো ধর্মীয় বিবাহের ফলে স্ত্রীলোককে নিজের গোষ্ঠী ছেড়ে সম্পূর্ণভাবে স্বামীর আইনগত ও ধর্মীয় গোষ্ঠীতে যোগ যে দিতে হত সে কথা নিশ্চয় করে বলা যায়। কার জানা নেই যে, বিবাহিতা স্ত্রীলোকেরা নিজের গোত্রে উত্তরাধিকারের সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় সমস্ত অধিকার হারায় এবং তার স্বামী, তার ছেলেমেয়ে ও তার স্বামীর জ্ঞাতিদের উত্তরাধিকার গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয়? এবং তার স্বামী তাকে যখন পোষ্য হিসাবে নিজের পরিবারে আনে, তখন কেমন করে সে স্বামীর গোত্রের বাইরে থাকবে?' (পৃঃ ৯—১১।)

এইভাবে মমসেন জোর করে বলছেন যে, কোনো একটি গোত্রের রোমক স্ত্রীলোকেরা গোড়ার দিকে কেবলমাত্র গোত্রের **মধ্যেই** বিবাহ করতে পারত; অতএব তাঁর মতে রোমক গোত্র ছিল অন্তর্বিবাহিক, বহির্বিবাহিক নয়। এই যে মত অন্য সকল জাতির অভিজ্ঞতার বিরোধী, এটি সম্পূর্ণ না হলেও মুখ্যত লিভিয়াসের রচনার (বুক ৩৯শ,

---

* Th. Mommsen, *Römische Forschungen*, Ausg. 2, Bd. I-II Berlin, 1864 — 1878. — সম্পাঃ

** ভিন্ন গোত্রে বিবাহ। — সম্পাঃ

১৯ পরিচ্ছেদ) একটিমাত্র তর্কাধীন উদ্ধৃতি থেকে করা হয়েছে; এতে বলা হচ্ছে রোম প্রতিষ্ঠার ৫৬৮ বৎসরে অথবা ১৮৬ খৃষ্ট পূর্বাব্দে সেনেট নির্দেশ দেন যে, uti Feceniae Hispallae datio, deminutio, gentis enuptio, tutoris optio item esset quasi ei vir testamento dedisset; utique ei ingenuo nubere liceret, neu quid ei qui eam duxisset, ob id fraudi ignominiaeve esset, — ফেসেনিয়া হিস্পালা তার সম্পত্তির বিলিবন্দোবস্ত করতে পারবে, তাকে হ্রাস করতে পারবে, গোত্রের বাইরে বিবাহ করতে পারবে, অভিভাবক মনোনীত করতে পারবে — যেন উপরোক্ত অধিকারগুলি তার (মৃত) স্বামী উইলে লিখে গিয়েছে; সে যে-কোন স্বাধীন নাগরিককে বিবাহ করতে পারবে এবং যাকে সে বিবাহ করবে সেই ব্যক্তির এজন্য কোন দোষ বা সম্মানহানি হবে না।

নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ফেসেনিয়া ছিল একজন মুক্তদাসী এবং এখানে সে গোত্রের বাইরে বিবাহ করবার অনুমতি পাচ্ছে। এবং এই বিবরণ অনুযায়ী এ কথাও সমানভাবে নিঃসন্দেহ যে, স্বামী উইল করে তার মৃত্যুর পরে তার স্ত্রীকে গোত্রের বাইরে বিবাহের অধিকার দিতে পারত। কিন্তু **কোন** গোত্রের বাইরে?

যদি একজন স্ত্রীলোককে নিজের গোত্রের মধ্যেই বিবাহ করতে হত, যেমন মমসেন ধরে নিয়েছেন, তাহলে সে বিবাহের পরও গোত্রের মধ্যেই থাকে। কিন্তু প্রথমত, এই উক্তিরই প্রমাণ চাই যে, গোত্র ছিল অন্তর্বিবাহিক। দ্বিতীয়ত, স্ত্রীলোক যদি গোত্রের মধ্যে বিবাহ করে, তাহলে পুরুষকেও তাই করতে হয়, কারণ তা না হলে সে পাত্রী পাবে কোথায়? অতএব আমরা এমন একটা অবস্থায় এসে পড়ছি যেখানে একজন পুরুষ উইল করে তার স্ত্রীকে এমন অধিকার দিতে পারত, যে অধিকার তার নিজের উপভোগের ব্যাপারে ছিল না। এতে আইনের দিক দিয়ে একটি উদ্ভটত্বে পৌঁছতে হয়। মমসেনও এই ব্যাপার বোঝেন, তাই অনুমান করেন, 'সম্ভবতঃ গোত্রের বাইরে বিবাহ করতে হলে শুধুমাত্র অধিকারসম্পন্ন ব্যক্তির আইনগত সম্মতি নয়, উপরন্তু গোত্রের সকলের সম্মতি দরকার হত' (পৃঃ ১০, টীকা)। প্রথমত, এটি অত্যন্ত দুঃসাহসী অনুমান এবং দ্বিতীয়ত, এটা উদ্ধৃতির সুস্পষ্ট পাঠের বিরোধী। সেনেট **স্বামীর প্রতিভূ হিসাবে** তাকে এই অধিকার দিচ্ছে, তার স্বামী তাকে যা দিতে পারত এতে সুস্পষ্টভাবেই তাই দেওয়া হচ্ছে, তার চেয়ে কম নয় এবং বেশী নয়। কিন্তু সে যে অধিকার পেল তা **অনপেক্ষ** অধিকার যাতে কোন বাধা নিষেধ নেই, যাতে সে যদি একে ব্যবহার করে তাহলে তার নতুন স্বামী এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। সেনেট আবার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কন্সাল ও প্রিটরদের নির্দেশ দেয় যেন এই অধিকার ব্যবহার করতে গিয়ে তার কোন অসুবিধা না হয়। অতএব মমসেনের অনুমান একেবারেই **অচল** মনে হয়।

তারপরে ধরা যাক যে, একজন স্ত্রীলোক অপর গোত্রের একজন পুরুষকে বিবাহ করল, কিন্তু নিজের গোত্রেই রইল। তাহলে উপরোক্ত উদ্ধৃতি অনুযায়ী স্ত্রীর গোত্রের বাইরে তাকে বিবাহ করতে বলবার অধিকার তার স্বামীর থাকবে। অর্থাৎ স্বামী আদৌ যে গোত্রের সভ্য নয় তারই ব্যাপারে ব্যবস্থা করবার অধিকার তার থাকবে। এ জিনিসটি এত অযৌক্তিক যে, এই বিষয়ে আর আলোচনা না করাই ভাল।

এখন শুধু বাকি রইল এই অনুমান করা যে, স্ত্রীলোকটির প্রথম বিবাহ তার গোত্রের বাইরের কোন পুরুষের সঙ্গে হয়েছিল এবং সেইজন্য সে নিঃসন্দেহে তার স্বামীর গোত্রের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল, এরকম ক্ষেত্রে মমসেনও যা বাস্তবিক মেনে নিয়েছেন। এখন সব ব্যাপারটির আপনিই ব্যাখ্যা হয়। বিবাহের ফলে নিজের পুরনো গোত্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্ত্রীলোকটি স্বামীর গোত্রে অন্তর্ভুক্ত হয় এবং সেখানে তার বিশেষ একটি অবস্থান রয়েছে। সে এই গোত্রের সদস্য, কিন্তু রক্তসম্পর্কযুক্ত আত্মীয় নয়; যেভাবে সে গোত্রে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, তাতে এই বিবাহজনিত গোত্রে তার বিবাহের উপর সমস্ত নিষেধ গোড়াতেই নাকচ হয়ে যায়। অধিকন্তু সে এই গোত্রের বিবাহ-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে তার স্বামীর মৃত্যুতে সম্পত্তির উত্তরাধিকার পাচ্ছে, অর্থাৎ গোত্রের একজন সভ্যের সম্পত্তি পাচ্ছে। ঐ সম্পত্তি যাতে গোত্রের মধ্যেই থাকে তার জন্য তার প্রথম স্বামীর গোত্রের কোনো সদস্যকেই যে সে বিবাহ করতে বাধ্য হবে তার চেয়ে বেশী স্বাভাবিক আর কী হতে পারে? এর যদি কোন ব্যতিক্রম করতে হয়, তাহলে যে তাকে সম্পত্তি দান করেছে, তার সেই প্রথম স্বামীর চেয়ে এরকম অধিকার দেবার যোগ্যতর ব্যক্তি আর কে হতে পারে? যে সময়ে সে তার সম্পত্তির একাংশ স্ত্রীকে দান করছে, ও যুগপৎ সে স্ত্রীকে বিবাহ দ্বারা অথবা বিবাহের ফলে ঐ সম্পত্তি অন্য গোত্রে হস্তান্তর করবার অনুমতি দিচ্ছে, সে সময় সেই তখনো ঐ সম্পত্তির মালিক, আক্ষরিকভাবে সে তার নিজের সম্পত্তিই বিতরণ করছে। আর স্ত্রীলোকটি এবং স্বামীর গোত্রের সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা ধরলে, স্বামীই নিজের স্বাধীন ইচ্ছা অনুযায়ী বিবাহ দ্বারা স্ত্রীকে নিজের গোত্রে এনেছিল। অতএব এটা খুবই স্বাভাবিক যে, সেই আবার অপর একটি বিবাহের দ্বারা স্ত্রীকে তার গোত্র ত্যাগ করবার অধিকার দেবে। সংক্ষেপে বলা যায়, যেই আমরা অন্তর্বিবাহিক রোমক গোত্রের আজগুবি ধারণা পরিত্যাগ করি এবং মর্গানের মতানুযায়ী আদিতে এটি বহির্বিবাহিক ছিল বলে গণ্য করি, অমনি ব্যাপারটা সহজ ও স্বতঃস্পষ্ট হয়ে যায়।

সর্বশেষে আরও একটি অভিমত আছে এবং তার অনুগামীর সংখ্যা সম্ভবত সর্বাধিক; এতে লিভিয়াসের ঐ উদ্ধৃতির অর্থ ধরা হয় মাত্র এই যে, 'মুক্ত ক্রীতদাসীরা (libertae) বিশেষ অনুমতি ছাড়া গোত্রের বাইরে বিবাহ করতে (e gente enubere) পারত না, অথবা এমন কিছু করতে পারত না যাতে পরিবারের অধিকার ক্ষুণ্ণ হয়ে

(capitis deminutio minima) গোত্র-গোষ্ঠী পরিত্যাগের কারণ হয়' (লাঙ্গে, 'রোমের প্রাচীন কথা', বার্লিন ১৮৫৬, ১ম খন্ড*, পৃঃ ১৯৫ যেখানে লিভিয়াসের উদ্ধৃতি নিয়ে হুশকের লেখার উপর মন্তব্য করা হয়েছে)। এই অনুমান যদি সঠিক হয়, তাহলে উদ্ধৃতিটা স্বাধীন রোমক স্ত্রীলোক সম্পর্কে কিছুই প্রমাণ করে না এবং নিজের গোত্রের মধ্যে বিবাহের বাধ্যবাধকতার কথা বলার যুক্তি একেবারে নেই।

Enuptio gentis বাক্যাংশটি লিভিয়াসের মাত্র এই একটি জায়গাতেই আছে এবং সমগ্র রোমক সাহিত্যের অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। Enubere শব্দটি, যার অর্থ বাইরে বিবাহ করা, এটিও লিভিয়াসে মাত্র তিন জায়গায় পাওয়া যায়, কিন্তু গোত্রের প্রসঙ্গে নয়। রোমক স্ত্রীলোকেরা কেবল গোত্রের মধ্যেই বিবাহ করতে পারে এই আজগুবি ধারণা শুধু এই একটি মাত্র উদ্ধৃতি থেকেই। কিন্তু এই ধারণা দাঁড়াতে পারে না কারণ, হয় উদ্ধৃতিটি মুক্তদাসীদের উপর বিশেষ বিধিনিষেধ সম্পর্কিত যে ক্ষেত্রে স্বাধীন স্ত্রীলোকদের (ingenuae) সম্পর্কে কিছুই প্রমাণিত হচ্ছে না, অথবা যদি এটি স্বাধীন স্ত্রীলোকদের সম্বন্ধেও প্রযোজ্য হয় তাহলে বরং এতে প্রমাণই হয় যে, তারা নিয়মমতো গোত্রের বাইরেই বিবাহ করত এবং তাদের বিবাহের ফলে তারা স্বামীর গোত্রে চলে যেত। অতএব এই উদ্ধৃতিটি মমসেনের বিরুদ্ধে এবং মর্গানের পক্ষে সাক্ষ্য দেয়।

রোমের প্রতিষ্ঠার প্রায় তিনশ' বছর পরেও গোত্রের বন্ধন এত শক্ত ছিল যে, ফেবিয়ান নামে একটি প্যাট্রিশিয়ান গোত্র সেনেটের অনুমতি নিয়ে নিজেরাই প্রতিবেশী ভেই নগরের বিরুদ্ধে অভিযান করে। কথিত আছে যে তিনশ' ছজন ফেবিয়ান অভিযানে যায় এবং একটি চোরা আক্রমণে নিহত হয়। একটি মাত্র বালক অবশিষ্ট ছিল এবং তার থেকেই গোত্রের বংশধারা চলে।

আমরা আগেই বলেছি যে, দশটি গোত্র নিয়ে একটি ফ্রাত্রী গঠিত হত, যাকে এরা বলত 'কিউরিয়া' এবং গ্রীক ফ্রাত্রীর চেয়ে এর অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক দায়িত্ব ছিল। প্রত্যেক কিউরিয়ার নিজের ধর্মানুষ্ঠান, পূতবস্তু এবং পুরোহিতরা থাকত। সমস্ত পুরোহিত একত্র হয়ে রোমকদের একটি পুরোহিত মন্ডলী গঠিত হত। দশটি কিউরিয়া নিয়ে একটি উপজাতি গঠিত হত যারও সম্ভবত প্রথম দিকে নির্বাচিত প্রধান থাকত -- যুদ্ধের নেতা ও প্রধান পুরোহিত - যেমন অন্য সব ল্যাটিন উপজাতির ছিল। তিনটি উপজাতি একত্র মিলে হয় রোমক জাতি -- populus romanus।

অতএব রোমক জাতির সভ্য কেবল তারাই হতে পারত যারা ছিল কোন গোত্রের সভ্য এবং সেজন্য কোন একটি কিউরিয়া ও উপজাতির সভ্য। এই জাতির প্রথম

* L. Lange, *Römische Alterthümer*, Bd. I-III, Berlin, 1856—1871. — সম্পাঃ

সংবিধান ছিল নিম্নরূপ। সামাজিক কাজকর্ম পরিচালনা করত সেনেট যার সম্পর্কে নিয়েবুরই প্রথমে নির্ভুল বিবরণ দিয়েছেন যে, এটি তিনশ' গোত্র প্রধানদের নিয়ে গঠিত; গোত্রের প্রধান হিসাবে এই ব্যক্তিদের পিতা (patres) বলে সম্ভাষণ করা হত এবং সমবেতভাবে এদের বলা হত সেনেট (প্রধানদের পরিষদ, senex কথাটি থেকে, যার মানে বৃদ্ধ)। এখানেও গোত্রের একই পরিবার থেকে প্রধান বাছাই করবার রীতি থেকে প্রথম গোত্রের আভিজাত্য এসে পড়ল। এই পরিবারগুলিকে প্যাট্রিশিয়ান আখ্যা দেওয়া হল এবং সেনেটে আসার বিশেষ অধিকার ও সব সরকারী পদগুলির সর্বৈব অধিকার তারা দাবি করল। জনগণ যে কালক্রমে এই দাবি মেনে নেয় এবং তার ফলে এটি একটি সত্যকার অধিকার হয়ে দাঁড়ায়, এই ব্যাপারটি এই কিংবদন্তীতে প্রকাশ পেয়েছে যে, রমুলাস আদি সেনেটরগণ ও তাদের বংশধরদের প্যাট্রিশিয়ানের পদমর্যাদা ও সুবিধাগুলি দান করেন। যেমন এথেনীয় bulê তেমনি সেনেটেরও বহু ব্যাপারে সিদ্ধান্ত করবার ক্ষমতা ছিল এবং অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থাগুলির, বিশেষতঃ নতুন আইনের, প্রাথমিক আলোচনা করত। এই আইনগুলো গ্রহণ করত জনসভা, যার নাম ছিল comitia curiata (কিউরিয়াগুলির সভা)। সমবেত জনগণ কিউরিয়া অনুযায়ী স্থান নিত এবং প্রত্যেক কিউরিয়ায় সম্ভবতঃ আবার গোত্র হিসাবে; সিদ্ধান্ত নেবার সময়ে ত্রিশটি কিউরিয়ার প্রত্যেকের একটি করে ভোট থাকত। কিউরিয়াদের এই সভা আইন গ্রহণ বা বর্জন করত, rex সমেত (তথাকথিত রাজা) সমস্ত উচ্চতর পদাধিকারীদের নির্বাচিত করত, যুদ্ধ ঘোষণা করত (কিন্তু শান্তি প্রতিষ্ঠা করত সেনেট) এবং সর্বোচ্চ আদালত রূপে রোমক নাগরিকদের প্রাণদণ্ডের সমস্ত মামলার সংশ্লিষ্ট পক্ষদের আপীল নিষ্পত্তি করত। সর্বশেষে সেনেট ও জনসভার পাশেই ছিল rex, ঠিক গ্রীকদের বাসিলিয়ুসের অনুরূপ এবং মমসেন যেভাবে দেখিয়েছেন মোটেই তিনি সেরূপ একচ্ছত্র রাজা নন।* তিনিও যুদ্ধের সেনাপতি, প্রধান পুরোহিত এবং কোন কোন বিচারালয়ের সভাপতি ছিলেন। বেসামরিক প্রশাসনে তাঁর কোন অধিকার ছিল না অথবা নাগরিকদের জীবন, স্বাধীনতা

* ল্যাটিন rex শব্দ কেল্টিক-আইরিশ righ (উপজাতির প্রধান) এবং গথদের reiks শব্দের সমার্থজ্ঞাপক। শেষ শব্দটি যে আমাদের Fürst'এর মতো (ইংরেজী first ও ডেনিশ förste শব্দ) শুরুতে বোঝাত গোত্র বা উপজাতির প্রধান, সেটা স্পষ্ট হয় এই তথ্য থেকে যে, গথেরা চতুর্থ শতাব্দীতে পরবর্তী কালের রাজা, সমগ্র জনগণের সমরনায়ক বুঝাবার জন্য ইতিমধ্যে একটি বিশেষ শব্দ ব্যবহার করত যথা, thiudans। আলফিলার অনুবাদিত বাইবেলে আর্টাক্সেরক্‌সেস্‌ ও হেরড্‌কে কখনই reiks বলা হয়নি, পরন্তু কেবল thiudans বলা হয়েছে এবং সম্রাট টাইবেরিয়াসের শাসিত দেশকে reiki নয়, পরন্তু thiudinassus বলা হয়েছে। গথদের thiudans অথবা ভুল অনুবাদ করে আমরা যে নাম দিয়েছি সেই রাজা Thiudareiks, Theodorich অর্থাৎ Dietrich দুটো নামই একসঙ্গে মিলে যায়। (এঙ্গেলসের টীকা।)

ও সম্পত্তির ব্যাপারে তাঁর কোনো ক্ষমতা ছিল না, কেবল যুদ্ধের অধিনায়ক হিসাবে তাঁর শৃঙ্খলাবিধায়ক শক্তি থেকে অথবা আদালতের প্রধান বিচারপতি রূপে রায় কার্যকরী করার শক্তি থেকে যেটুকু অধিকার বর্তাত তা ছাড়া। রেক্সের পদ বংশগত ছিল না, বরং তাঁকে, সম্ভবতঃ বিদায়ী রেক্সের মনোনয়নক্রমে, প্রথমে কিউরিয়াগুলির সভা নির্বাচিত করত, এবং-তারপর আবার দ্বিতীয় সভায় তাঁকে বিধিমতো অভিষেক করা হত। তাঁকে যে পদচ্যুত করা যেত, তা গর্বিত টার্কুইনিয়সের ভাগ্য থেকেই প্রমাণ হয়।

বীর-যুগের গ্রীকদের মতোই তথাকথিত রাজাদের সময়কার রোমকেরা একটি সামরিক গণতন্ত্রে বসবাস করত যার ভিত্তি ছিল গোত্র, ফ্রাত্রী ও উপজাতি, এর থেকেই ঐ গণতন্ত্রের বিকাশ হয়। যদিও কিউরিয়াগুলি ও উপজাতিগুলি অংশতঃ এক কৃত্রিম সংগঠন হয়ে থাকতে পারে, তবু যে সমাজে তাদের উদ্ভব হয় এবং যা তখনো তাদের চারিদিকে ঘিরে ছিল, সেই সমাজেরই খাঁটি ও স্বাভাবিকভাবে উদ্ভূত আদর্শের ছাঁচেই তাদের গড়া হয়। যদিও স্বাভাবিকভাবেই বিকশিত প্যাট্রিশিয়ান অভিজাতেরা ইতিমধ্যেই তাদের পদভূমি পেয়ে গিয়েছিল, এবং রাজারা ক্রমে ক্রমে নিজেদের অধিকার বাড়াবার চেষ্টা করছিল, তাহলেও এতে সংবিধানের আদি মৌলিক চরিত্র বদলে যায় না এবং এইটাই হচ্ছে আসল কথা।

ইতিমধ্যে রোম নগরীর এবং দেশজয়ের ফলে প্রসারিত রোমক প্রদেশের জনসংখ্যাও বাড়তে থাকে, অংশতঃ বহিরাগতদের জন্য এবং অংশতঃ বিজিত অঞ্চলগুলি, বিশেষ করে ল্যাটিন জেলাগুলির জনগণ মারফত। এইসব নতুন প্রজারা (এখনকার মতো আমরা আশ্রয়াধীনদের কথা আলোচনা করছি না) পুরাতন গোত্র, কিউরিয়া ও উপজাতির বাহিরের লোক এবং সেইজন্য এরা populus romanus বা যথার্থ রোমক জনসম্প্রদায়ের অন্তর্গত নয়। এরা ব্যক্তিগতভাবে স্বাধীন ছিল, এরা জমির মালিক হতে পারত, এদের খাজনা দিতে হত এবং যুদ্ধের কাজ করবারও দায়িত্ব ছিল। কিন্তু তারা সরকারী পদ পেতে পারত না এবং কিউরিয়াগুলির সভায় অংশ নিতে পারত না, কিংবা বিজিত রাষ্ট্রের ভূমি বণ্টনেও অংশ গ্রহণ করত না। তারাই হল প্লেব, সমস্ত রাষ্ট্রীয় অধিকার থেকে বঞ্চিত। তাদের অবিরাম সংখ্যাবৃদ্ধি এবং তাদের সামরিক শিক্ষা ও অস্ত্রসজ্জার জন্য তারা পুরাতন populus-এর কাছে — যারা এখন বাইরে থেকে সংখ্যাবৃদ্ধির সমস্ত পথ কঠোরভাবে বন্ধ করে দিয়েছিল — ভয়ের কারণ হয়ে উঠল। উপরন্তু মনে হয় যে, 'পপুলুস' ও প্লেবের মধ্যে জমির মালিকানা একরকম সমভাবেই বণ্টন করা হয়েছিল, কিন্তু বাণিজ্য ও শিল্পজাত সম্পদ তখনও তত প্রচুর না হলেও প্রধানতঃ প্লেবদের হাতেই ছিল।

একেই তো রোমের ঐতিহাসিক সূচনাপর্বের কিংবদন্তীগত উৎপত্তিটা সবই ঘন অন্ধকারে আবৃত; তার উপরে আবার তাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে যে সমস্ত যুক্তিবাদী-

প্রয়োগবাদী (rationalistic-pragmatic) চেষ্টা হয়েছে এবং পরবর্তী কালে আইনগত শিক্ষাপ্রাপ্ত লেখকেরা আমাদের কাছে মূল গ্রন্থস্বরূপ যে সমস্ত রচনা রেখে গেছেন, সে সমস্তের ফলে এই অন্ধকার আরও ঘনীভূত হয়েছে। এই কারণেই কখন, কোন পথে, কী কী কারণে বিপ্লব এসে পুরনো গোত্র-প্রথার অবসান ঘটিয়েছিল সে সম্পর্কে কোনো নির্দিষ্ট বক্তব্য উপস্থিত করা অসম্ভব। তবে প্লেব এবং পপুলুস-এর মধ্যে সংঘটিত সংঘর্ষের মধ্যেই যে এই সমস্ত কারণ নিহিত সে সম্পর্কে আমরা নিশ্চিত।

রেক্স সার্ভিয়াস টুল্লিয়াসের নামে প্রচলিত নতুন সংবিধান অনেকটা গ্রীক ধাঁচের সঙ্গে, বিশেষতঃ সোলনের সংবিধানের সঙ্গে মেলে; এতে যে নতুন জনসভা সৃষ্টি করা হল তাতে পপুলুস ও প্লেব সমভাবে অন্তর্ভুক্ত হল অথবা বাদ পড়ল শুধু এই বিচার করে যে তারা সামরিক কর্তব্য করে কি না। সামরিক কর্তব্য করতে বাধ্য সমগ্র পুরুষ জনসংখ্যাকে ধনসম্পত্তি অনুযায়ী ছয়টি শ্রেণীতে ভাগ করা হল। প্রথম পাঁচটি শ্রেণীর ন্যূনতম সম্পত্তি-গুণ ছিল যথাক্রমে: প্রথম — ১,০০,০০০ অ্যাসেস (asses), দ্বিতীয় — ৭৫,০০০ অ্যাসেস, তৃতীয় — ৫০,০০০; চতুর্থ — ২৫,০০০ এবং পঞ্চম — ১১,০০০। দ্যুরো দ্য লা মালের হিসাবে ঐ পরিমাণগুলি যথাক্রমে ছিল ১৪,০০০; ১০,৫০০; ৭,০০০; ৩,৬০০ ও ১,৫৭০ মার্ক। ষষ্ঠ শ্রেণীতে ছিল প্রলেতারীয়রা যাদের ধনসম্পত্তি ছিল আরও কম এবং যাদের সামরিক দায়িত্ব ছিল না ও কর দিতে হত না। সেণ্টুরিয়াগুলির নতুন সভায় (comitia centuriata) নাগরিকরা সৈন্যদের কায়দায় সংঘবদ্ধ হত, একশ লোকের এক একটি বাহিনীতে (সেণ্টুরিয়া) এবং প্রত্যেক সেণ্টুরিয়ার একটি করে ভোট থাকত। কিন্তু প্রথম শ্রেণী ৮০ সেণ্টুরিয়া যোগাত; দ্বিতীয় শ্রেণী — ২২টি, তৃতীয় — ২০, চতুর্থ — ২২ ও পঞ্চম — ৩০ এবং ষষ্ঠ শ্রেণী শুধু শোভনতার জন্য একটি। এর সঙ্গে সর্বাপেক্ষা ধনীদের নিয়ে ১৮ সেণ্টুরিয়া অশ্বারোহী গঠন করা হত; সবশুদ্ধ ১৯৩ সেণ্টুরিয়া। সংখ্যাধিক্যের জন্য ৯৭ ভোট দরকার এবং কেবল প্রথম শ্রেণী ও অশ্বারোহীদের মিলিয়ে হয় ৯৮ ভোট অর্থাৎ সংখ্যাগরিষ্ঠ; তারা একমত হলে অন্য শ্রেণীর মত ছাড়াই তারা বৈধ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করত।

এই নবগঠিত সেণ্টুরিয়ার সভার উপর সেইসব রাজনৈতিক অধিকার অর্সাল যা পূর্বতন কিউরিয়াদের সভার হাতে ছিল (নামমাত্র কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া); এর ফলে এথেন্সের মতো এখানে কিউরিয়াগুলি ও তাদের অন্তর্ভুক্ত গোত্রগুলি অবনত হয়ে কেবল ব্যক্তিগত ও ধর্মীয় সংগঠনে পরিণত হল এবং সেইভাবে তারা বহুদিন টিকেছিল, আর কিউরিয়াদের সভা শীঘ্রই উঠে গেল। তিনটি পুরনো গোত্রভিত্তিক উপজাতিকেও রাষ্ট্র থেকে বাদ দেবার জন্য চারটি অঞ্চলভিত্তিক উপজাতি গড়া হল — এরা নগরের এক একটি পাড়ায় বাস করত এবং কিছু কিছু রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করত।

এইভাবে রোমেও ব্যক্তিগত রক্তসম্পর্কের ভিত্তিতে গঠিত পুরাতন সামাজিক ব্যবস্থা তথাকথিত রাজ-প্রথা অবসানের আগেই ধ্বংস হল এবং আঞ্চলিক বিভাগ ও ধনসম্পত্তির তারতম্যের ভিত্তিতে একটি নতুন সংবিধান, রীতিমতো একটি রাষ্ট্রীয় সংবিধান তার জায়গা দখল করল। এখানে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ছিল সৈন্যদলে কাজ করতে বাধ্য নাগরিকদের হাতে, এবং এই ক্ষমতা প্রযুক্ত হত শুধু দাসদের বিরুদ্ধে নয়, অধিকন্তু তথাকথিত প্রলেতারীয়দের বিরুদ্ধে — যারা সামরিক কাজ করতে পেত না এবং যাদের অস্ত্রবহনের অধিকার ছিল না।

সর্বশেষ রেক্স গর্বিত টার্কুভিনিয়স — যিনি সত্যকার রাজকীয় ক্ষমতাকে করতলগত করেছিলেন — তাঁকে বহিষ্কার করার পর, রেক্সের স্থলে (ইরকোয়াসদের মতো) সমক্ষমতাসম্পন্ন দুইজন সামরিক অধিনায়কের (কন্সাল) ব্যবস্থা করে নতুন সংবিধান আরো বিকশিত হয়েছিল মাত্র। এই সংবিধানের মধ্য দিয়েই চলেছে রোমক প্রজাতন্ত্রের সমগ্র ইতিহাস — কর্তৃপক্ষীয় পদে প্রবেশলাভ ও সরকারী জমিতে অংশলাভের জন্য প্যাট্রিশিয়ান ও প্লেবদের মধ্যকার সংগ্রাম ও সংঘাত, এবং বড় বড় ভূমিপতি ও অর্থপতিদের নতুন এক শ্রেণীতে শেষ পর্যন্ত প্যাট্রিশিয়ান অভিজাততন্ত্রের লয়প্রাপ্তি; এরা সামরিক বৃত্তিতে ধ্বংসপ্রাপ্ত কৃষকদের সমস্ত জমিকে ক্রমে ক্রমে আত্মসাৎ করে নিয়েছিল, এইভাবে তৈরী বিরাট বিরাট ভূখণ্ডকে ক্রীতদাসদের সাহায্যে চাষ করবার ব্যবস্থা করেছিল, ইতালিকে জনশূন্য করে দিয়েছিল এবং এইভাবে কেবল সাম্রাজ্যের শাসনের দ্বারই উন্মুক্ত করে দেয়নি, তার অনুগামী জার্মান বর্বরদেরও দ্বার অবারিত করে দিয়েছিল।

৭

কেল্টিক ও জার্মানদের মধ্যে গোত্র

বর্তমান যুগের বিভিন্ন বন্য ও বর্বর জাতিগুলির মধ্যে অল্পাধিক বিশুদ্ধরূপে যে সব গোত্র-প্রতিষ্ঠান পাওয়া গিয়েছে, অথবা এশিয়ার সভ্য জাতিগুলির প্রাচীন ইতিহাসে এই ধরনের সংগঠনের যেসব চিহ্ন আছে স্থানাভাবের জন্য তা নিয়ে আলোচনা করা গেল না। কোনো না কোনো ধরনের গোত্র-প্রতিষ্ঠান সর্বত্রই দেখা যায়। কয়েকটি দৃষ্টান্তই যথেষ্ট। গোত্রকে যথাযথ চিনতে পারার আগেই যিনি একে প্রাণপণে ভুল বুঝাতে চেয়েছেন সেই ম্যাক-লেনানই তার অস্তিত্ব প্রমাণ করেন এবং মূল রূপরেখায় সঠিক বিবরণ দেন কালমিক, চার্কেসিয়ান, সাময়েড এবং তিনটি ভারতীয় উপজাতি, ওয়ারালি, মাগার ও মনিপুরীদের মধ্যে। সম্প্রতি মাক্সিম কভালেভস্কি পশাভ্, খিভ্সুর, সেভানেটিয়ান ও অন্যান্য ককেশীয় উপজাতির মধ্যে একে আবিষ্কার করেন

এবং এর বিবরণ দেন। এখানে আমরা কেল্টিক ও জার্মানদের মধ্যে গোত্রের অস্তিত্ব সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করব।

কেল্টদের সবচেয়ে পুরনো যে আইনগুলি আমাদের কাল পর্যন্ত এসেছে তার মধ্যে গোত্রকে তখনো দেখা যায় পূর্ণ জীবন্ত রূপে। আয়র্ল্যান্ডে ইংরেজরা বলপূর্বক এই প্রথা নষ্ট করবার পরেও তা অন্ততঃ স্বতঃচেতনা রূপে জন-মানসে আজও পর্যন্ত বেঁচে আছে। গত শতাব্দীর মাঝামাঝিতেও স্কটল্যান্ডে এটি পূর্ণরূপে প্রকট ছিল এবং এখানেও কেবল ইংরেজদের অস্ত্র, আইনবিধি ও আদালতের সামনেই তাকে পরাজিত হতে হয়।

একাদশ শতাব্দীর পরে নয়, ইংরেজদের বিজয়লাভের অনেক শতাব্দী আগে রচিত ওয়েল্সের পুরনো আইনগুলিতে দেখা যায় যে, তখনো গোটা গ্রামে সমবেত কৃষি চলছে, যদিও সেটা ব্যতিক্রম হিসাবে এবং পূর্ববর্তী সর্বজনীন প্রথার লুপ্তাবশেষ রূপে। প্রত্যেক পরিবারের পাঁচ একর নিজস্ব চাষের জোত ছিল; ঐ সঙ্গেই আর একটি ভূখণ্ডে সকলে সমবেতভাবে চাষ করত এবং ফসল ভাগাভাগি করত। আইরিশ ও স্কচ দৃষ্টান্তগুলি বিচার করে দেখলে আর কোন সন্দেহই থাকে না যে, এই গ্রাম্য সমাজগুলি ছিল গোত্র বা গোত্রের অনুবিভাগ, যদিও ওয়েল্সের আইন নিয়ে পুনরনুসন্ধান করলেও—যা সময়াভাবে আমার দ্বারা সম্ভব নয় (আমার নোটগুলি ১৮৬৯ সালের)—অবশ্য এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ মিলবে না। কিন্তু ওয়েল্স্ ও আইরিশদের সূত্রে পাওয়া তথ্য থেকে এই জিনিস প্রত্যাক্ষভাবে প্রমাণিত হচ্ছে যে, একাদশ শতাব্দীতেও কেল্টিকদের মধ্যে জোড়বাঁধা পরিবার তখনও একপতিপত্নী পরিবারকে বিশেষ জায়গা ছেড়ে দেয়নি। ওয়েল্সে বিবাহ সাত বছর উত্তীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত অচ্ছেদ্য বলে ধরা হত না অথবা বলা ভালো বিচ্ছেদের নোটিশ দেওয়া চলত। এমনকি সাত বছর পূর্ণ হতে মাত্র তিন রাত্রি বাকি থাকলেও বিবাহিত দম্পতি পৃথক হতে পারত। তারপর তারা নিজেদের মধ্যে সম্পত্তির ভাগাভাগি করত: স্ত্রী ভাগ করত এবং পুরুষ নিজের অংশ বেছে নিত। অত্যন্ত হাস্যকর কতকগুলি নিয়ম অনুযায়ী আসবাবপত্র ভাগ করা হত। যদি পুরুষের দিক থেকে বিচ্ছেদ হয়, তাহলে স্ত্রীকে বিবাহের যৌতুক ও অন্য কয়েকটি জিনিস তাকে ফেরত দিতে হত আর স্ত্রী যদি বিচ্ছেদ চাইত, তাহলে সে কিছু কম পেত। সন্তানসন্ততিদের মধ্যে পুরুষ পেত দুটি এবং স্ত্রী একটি, অর্থাৎ মেঝো সন্তানটি। যদি বিবাহবিচ্ছেদের পরে স্ত্রীলোকটি আবার বিবাহ করত এবং তার প্রথম স্বামী তাকে ফিরিয়ে নিতে আসত, তাহলে স্ত্রীলোক তার প্রথম স্বামীর অনুসরণ করতে বাধ্য, এমনকি সে ইতিমধ্যে তার নতুন স্বামীর ঘরে এক পা বাড়িয়ে থাকলেও। কিন্তু যদি কোন দুজন সাত বছর একসঙ্গে থাকে, তাহলে আনুষ্ঠানিক কোন বিবাহের ব্যাপার ছাড়াই তারা স্বামী স্ত্রী বলে বিবেচিত হয়। বিবাহের পূর্বে

স্ত্রীলোক মোটেই কড়াকড়িভাবে কৌমার্য রক্ষা করত না এবং এরকম দাবিও করা হত না; এই বিষয়ের বিধিনিষেধ ছিল একেবারে চপল এবং এটি বুর্জোয়া নীতির সম্পূর্ণ বিরোধী। যখন একটি স্ত্রীলোক অন্য পুরুষের সঙ্গে ব্যভিচার করত তখন তার স্বামী তাকে প্রহার করতে পারত — এটি হচ্ছে তিনটি উপলক্ষের একটি যখন স্বামী প্রহার করলেও তার কোন শাস্তি হত না — কিন্তু প্রহারের পরে সে অন্য কোনও প্রতীকার দাবি করতে পারত না, কারণ 'একটি অপরাধের জন্য হয় প্রায়শ্চিত্ত নয় প্রতিশোধ, কিন্তু দুইই চলবে না।' যেসব কারণে একজন স্ত্রীলোক বিবাহবিচ্ছেদ দাবি করলে সম্পত্তি বণ্টনের সময়ে তার কোন অধিকার ক্ষুণ্ণ হত না, সেগুলি নানা ধরনের: পুরুষের শ্বাসপ্রশ্বাসের দুর্গন্ধই যথেষ্ট বলে বিবেচিত হত। উপজাতির প্রধান অথবা রাজাকে প্রথম রাত্রির অধিকারের বদলে যে মুক্তিপণ (gobr merch, এ থেকে মধ্য যুগীয় প্রতিশব্দ marcheta, ফরাসী -- marquette) দিতে হত, আইনসংহিতায় তার একটি বড় ভূমিকা ছিল। স্ত্রীলোকদের জনসভায় ভোট দেবার অধিকার ছিল। এইসঙ্গেই বলা যায় যে, আয়র্ল্যাণ্ডেও অনুরূপ অবস্থা দেখা গেছে। সেখানেও মেয়াদী বিবাহের বেশ প্রথা ছিল, এবং বিচ্ছেদের সময়ে স্ত্রীলোকেরা সুনির্দিষ্ট বেশ কিছু সুযোগসুবিধা পেত, এমনকি গার্হস্থ্য কাজের জন্য পারিশ্রমিক পর্যন্ত; অন্যান্য স্ত্রীর সঙ্গে এখানে একজন 'প্রথম স্ত্রী' থাকত এবং মৃতের সম্পত্তিভাগের সময় বৈধ ও অবৈধ সন্তানদের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হত না। এইভাবে আমরা জোড়বাঁধা পরিবারের যে ছবি পাই তার সঙ্গে তুলনায় উত্তর আমেরিকায় প্রচলিত বিবাহ মনে হবে অনেক বেশী কড়া; কিন্তু সিজারের যুগে যাদের মধ্যে সমষ্টি-বিবাহ প্রচলিত ছিল, তাদের মধ্যে একাদশ শতাব্দীতে এই অবস্থা বিশেষ আশ্চর্য নয়।

আইরিশ গোত্রের (sept, এখানে উপজাতিকে বলা হত clainne, ক্ল্যান) প্রমাণ ও উল্লেখ পাই শুধুমাত্র প্রাচীন আইনের পুস্তকেই নয়, উপরন্তু সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংরেজ আইনজ্ঞরাও এর বিবরণ দিয়েছেন — ক্ল্যানের জমিগুলিকে ইংলণ্ডের রাজার দখলে আনবার জন্য এঁদের সমুদ্রপারে পাঠান হয়েছিল। সর্দাররা ইতিমধ্যেই জমিকে নিজের অধিকারভুক্ত যেখানে করেনি সেখানে এই সময় পর্যন্ত জমি যৌথভাবে ক্ল্যান অথবা গোত্রের সম্পত্তি ছিল। যখন গোত্রের কোন লোক মারা যেত ও সেইজন্য একটি গৃহস্থালি বন্ধ হত, তখন গোত্রের প্রধান (ইংরেজ আইনজ্ঞরা তার নাম দিয়েছেন caput cognationis) বাকি গৃহস্থালিগুলির মধ্যে গোত্রের সমস্ত জমি পুনর্বণ্টন করতেন। সম্ভবতঃ এই পুনর্বণ্টন সাধারণতঃ যে নিয়মে করা হত তা আমরা জার্মানিতে দেখতে পাই। এখনও আমরা কিছু কিছু গ্রাম পাই — চল্লিশ পঞ্চাশ বছর আগে বহু বহু গ্রাম পাওয়া যেত, — যেখানে ক্ষেতগুলি তথাকথিত রান্‌ডেল (rundale) বিধির মধ্যে পড়ে। ইংরেজ বিজয়ীরা গোত্রের যৌথ জমি বেদখল করবার পর থেকে সে জমির

কৃষকেরা, স্বতন্ত্র প্রজা হিসাবে তার নিজস্ব জোতের জন্য খাজনা দেয় বটে, কিন্তু সমস্ত আবাদী ও মাঠ জমি একত্র করে গুণ ও অবস্থান বিচার করে ফালি ফালি ভাগ করে বণ্টন করে দেয়, মোসেল নদীর ধারে এই ফালির নাম Gewanne, এবং প্রত্যেকেই এক এক ফালি ভাগে পায়। জলাজমি ও চারণভূমি যৌথভাবে ব্যবহৃত হয়। মাত্র পঞ্চাশ বছর আগেও পুনর্বণ্টন মাঝে মাঝেই, কখনো কখনো বছরে বছরে হত। এইরকম একটি rundale গ্রামের ছবি মোসেলের তীরে অথবা হোকভাল্ডের জার্মান কৃষক গৃহস্থালি গোষ্ঠীগুলির (Gehöfersschaft) সঙ্গে হুবহু মেলে। গোত্রগুলি এখন 'ফ্যাক্‌শনের'* মধ্যেও টিকে রয়েছে। আইরিশ কৃষকেরা অনেক সময় দলবদ্ধ হয় এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য অনুসারে যা মনে হয় যেন একেবারে বিদঘুটে ও অর্থহীন এবং যা ইংরেজদের একেবারে অবোধ্য। এই সব দলের একমাত্র উদ্দেশ্য যেন একটি জনপ্রিয় ক্রীড়ানুষ্ঠানের জন্য জড় হওয়া, যাতে সগাম্ভীর্যে পরস্পরকে পিটিয়ে মারা হয়। এগুলি হল ধ্বংসপ্রাপ্ত গোত্রের কৃত্রিম পুনরুজ্জীবন ও পরে তার বদলি, উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া গোত্র-প্রবৃত্তির ক্রমানুবর্তন এতে প্রকাশিত হত তাদের স্বকীয় একটা রূপে। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে, কোনো কোনো জায়গায় গোত্রের সদস্যরা প্রায় একসঙ্গে তাদের পুরনো এলাকাতে বসবাস করত। দৃষ্টান্তস্বরূপ, তিরিশের দশকে মনাখান কাউণ্টির অধিকাংশ অধিবাসী তখনও মাত্র চারিটি পারিবারিক নাম ব্যবহার করত, অর্থাৎ সেগুলি চারটি গোত্র অথবা ক্ল্যানের** উত্তরাধিকারী।

১৭৪৫ খৃষ্টাব্দের বিদ্রোহ দমনের সময় থেকেই স্কটল্যাণ্ডে গোত্র-প্রথার পতন

* দল। — সম্পাঃ

** আমি আয়র্ল্যাণ্ডে অল্প কয়েকদিন থাকার সময় আবার উপলব্ধি করি যে, সেখানকার গ্রাম্য জনসংখ্যা তখনও কী পরিমাণে গোত্রের যুগের ধ্যান-ধারণার মধ্যে বাস করছিল। কৃষক যে জমিদারের প্রজা তাকে এখনও ক্ল্যানের প্রধানের মতো মনে করে, যে সকলের স্বার্থে চাষবাস তদারক করে; কৃষকদের কাছ থেকে খাজনা হিসাবে সে করের অধিকারী, কিন্তু সে আবার আপদে বিপদে কৃষককে সাহায্য করতেও বাধ্য। ঐ একইভাবে প্রত্যেকটি সচ্ছল অবস্থার লোক দরিদ্র প্রতিবেশী বিপন্ন হলে তাকে সাহায্য করতে বাধ্য বলে ধরা হয। এই সাহায্য মানে ভিক্ষাদান নয়; ধনী সদস্য অথবা ক্ল্যানের প্রধানের কাছ থেকে এটি ক্ল্যানের দরিদ্র সদস্যদের অধিকার বলেই প্রাপ্য। এতেই ব্যাখ্যা হয় কেন অর্থনীতিবিদ ও আইনজ্ঞরা অভিযোগ করেন যে, আইরিশ কৃষকের মাথায় আধুনিক বুর্জোয়া সম্পত্তির ধারণা প্রবেশ করান অসম্ভব। যে মালিকানার শুধু অধিকার আছে, কিন্তু দায়িত্ব নেই, তা বোঝার ক্ষমতা আইরিশ কৃষকের নেই। তাই আশ্চর্য হবার কথা নয় যখন দেখি যে, অনেক আইরিশ তাদের এই ধরনের সরল গোত্র ধারণাবলী নিয়ে সহসা ইংলণ্ড বা আমেরিকার আধুনিক নগরগুলিতে এসে গিয়ে সেখানকার জনসংখ্যার একেবারে পৃথক নৈতিক ও আইনী মাপকাঠির মধ্যে তাদের নীতি ও ন্যায়-বিচার একেবারে গুলিয়ে ফেলে এবং সমস্ত নির্ভর হারিয়ে ব্যাপকভাবে নীতিহীনতায় আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। (চতুর্থ সংস্করণে এঙ্গেলসের টীকা।)

দেখা যায়। এই প্রথার মধ্যে স্কচ ক্ল্যানের স্থান ঠিক যে কী তা অনুসন্ধান-সাপেক্ষ, তবে নিঃসন্দেহে এইটির বিশেষ স্থান ছিল। ওয়াল্টার স্কটের নভেলগুলি স্কটল্যাণ্ডের উচ্চভূমির ক্ল্যানের ছবি আমাদের চোখের সামনে জীবন্ত করে তুলেছে। এই বিষয়ে মর্গান বলছেন যে, 'এ হচ্ছে সংগঠন ও মনোবৃত্তির দিক দিয়ে গোত্রের একটি প্রকৃষ্ট নমুনা, গোত্র সদস্যদের উপর গোত্রবদ্ধ জীবনযাত্রার প্রভাবের একটি বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত... তাদের কলহ ও রক্তের বদলা, স্থানীয় এলাকায় তাদের অধিষ্ঠান, জমির যৌথ ব্যবহার, ক্ল্যানের প্রধানের প্রতি সভ্যদের আনুগত্য এবং সভ্যদের পরস্পর আনুগত্য, এইগুলির ভিতর আমরা গোত্র-সমাজের দুর্মর বৈশিষ্ট্যগুলি দেখতে পাই... বংশক্রম ছিল পুরুষ অনুযায়ী, পুরুষের ছেলেমেয়েরা ক্ল্যানের মধ্যে থাকত এবং নারীর ছেলেমেয়েরা তাদের বাপেদের ক্ল্যানে পড়ত।' আগে স্কটল্যাণ্ডে মাতৃ-অধিকার যে প্রচলিত ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় পিক্টসদের রাজপরিবারে যেখানে, বেডের কথায়, স্ত্রীলোক মারফত উত্তরাধিকার প্রচলিত ছিল। এমনকি মধ্য যুগ পর্যন্ত স্কচ ও ওয়েল্‌স্‌ পরিবারগুলির মধ্যে পুনালুয়া পরিবারের রেশের প্রমাণ পাই প্রথম রাত্রির অধিকার থেকে, তখন পর্যন্ত ক্ল্যানের প্রধান অথবা রাজা প্রাক্তন যৌথ স্বামীদের সর্বশেষ প্রতিনিধি হিসাবে মুক্তিপণ না পেলে সে অধিকার দাবি করতে পারত প্রত্যেক পাত্রীর কাছে।

জনসম্প্রদায়গুলির দেশান্তর-গমন শুরু হবার সময় পর্যন্ত যে জার্মানরা গোত্রে সংঘবদ্ধ ছিল সে কথা অকাট্য। সম্ভবতঃ তারা আমাদের খৃষ্টাব্দের মাত্র কয়েক শতাব্দী আগে ডানিয়ুব, রাইন, ভিস্টুলা ও উত্তরের সাগরগুলির মাঝখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করত; কিম্রি ও টিউটনরা তখনও পূর্ণমাত্রায় ভ্রাম্যমাণ এবং সিজারের সময় না আসা পর্যন্ত সুয়েভিরাও স্থায়ী বসত পাতেনি। সিজার স্পষ্টতঃ বলেছেন যে, শেষোক্তরা গোত্র ও আত্মীয় গোষ্ঠী হিসাবে (gentibus cognationibusque) বাস পেতেছে, এবং জুলিয়া গোত্রের (gens Julia) একজন রোমকের মুখের gentibus কথার যে সুনির্দিষ্ট অর্থ আছে তার অপব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। সমস্ত জার্মানদের সম্পর্কেই এই কথা প্রযোজ্য; এমনকি বিজিত রোমক প্রদেশগুলিতে তাদের বসতি স্থাপনটাও তখন গোত্র হিসাবেই চলেছে বলে মনে হয়। 'আলামান্নিয়ান আইন' প্রমাণ করে যে, ডানিয়ুবের দক্ষিণে দখলীকৃত ভূখণ্ডে জনগণ গোত্ররূপেই (genealogiae) বসবাস করে; genealogia কথাটি ঠিক সেই অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে যে অর্থে পরে ব্যবহৃত হয়েছে 'মার্ক' অথবা গ্রাম-গোষ্ঠী। সম্প্রতি কভালেভস্কি মত প্রকাশ করেছেন যে, এই genealogiae ছিল বৃহৎ গৃহস্থালী গোষ্ঠী, যাদের মধ্যে জমি ভাগ করা হত এবং যা থেকে পরে গ্রাম্য গোষ্ঠীগুলি দেখা দেয়। Fara সম্পর্কেই ঐ একই কথা সম্ভবতঃ

খাটে, এই শব্দটি বার্গাণ্ডিয়ান ও লাঙ্গোবার্ডরা — অর্থাৎ একটি গথিক ও একটি হার্মিনোনিয়ান বা উচ্চভূমির জার্মান উপজাতি — একেবারে এক অর্থে না হলেও প্রায় ঠিক সেই জিনিসটাই বোঝাত যাকে 'আলামান্নিয়ান আইনে' বলা হত genealogia। এই জিনিসটি ঠিক গোত্র অথবা গৃহস্থালী গোষ্ঠী, কোনটিকে বুঝাত তা আরও অনুসন্ধান সাপেক্ষ।

ভাষার রেকর্ড থেকে আমাদের সন্দেহ রয়ে যায় যে, জার্মানদের মধ্যে গোত্র বুঝাবার মতো একটিমাত্র সাধারণ প্রতিশব্দ ছিল কি না এবং থাকলে সে শব্দটি কী। বুৎপত্তির দিক দিয়ে গ্রীক genos, ল্যাটিন gens হল গথিক kuni, মধ্য উচ্চ অঞ্চলের জার্মান künne-এর অনুরূপ এবং একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। আমরা আবার মাতৃ-অধিকারের যুগের নির্দেশ পাই এই তথ্য থেকে যে, নারী শব্দটিও একই মূল থেকে এসেছে: গ্রীক gyne, স্লাভ žena, গথিক gvino, সাবেকি নর্স kona, kuna। আগেই বলা হয়েছে যে, লাঙ্গোবার্ড ও বার্গাণ্ডিয়ানদের মধ্যে আমরা fara শব্দটি পাই; গ্রিম অনুমান করেন যে, fara শব্দটির কল্পিত মূল হল fisan যার অর্থ প্রজনন। আমার অভিমতে এটি এসেছে সুস্পষ্টতর মূল faran থেকে, যার মানে ভ্রমণ করা; এটি যাযাবর দলের একটি সুনির্দিষ্ট অংশকে বুঝাত যারা নিঃসন্দেহেই আত্মীয় গোষ্ঠী নিয়ে গঠিত হত, বহু শতাব্দী ধরে প্রথমে পূর্ব দিকে ও পরে পশ্চিমে ভ্রমণের পরে এই শব্দটি ক্রমে গোত্র-গোষ্ঠী ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হতে থাকল। তারপর গথিক শব্দ sibja, অ্যাংলো-স্যাক্সন sib, সাবেকি উচ্চ ভূমির জার্মান sippia, sippa, Sippe*। পুরাতন নর্স ভাষায় আছে শুধু বহুবচনাত্মক শব্দ sifjar, মানে আত্মীয়স্বজন; একবচন শব্দটি কেবল একটি দেবীর নাম — Sif। সর্বশেষে আর একটি শব্দ 'হিল্ডেব্রাণ্ড সঙ্গীতে' পাওয়া যায়, যেখানে হিল্ডেব্রাণ্ড হাদুব্রাণ্ডকে জিজ্ঞাসা করছেন, 'এই জনসম্প্রদায়ের পুরুষদের মধ্যে কে তোমার পিতা... অথবা কী তোমার গোত্র?' (eddo huêlîhhes cnuosles du sîs)। যদি জার্মান ভাষায় গোত্রের কোন সাধারণ প্রতিশব্দ থেকে থাকে, তাহলে সেটি খুব সম্ভব গথিক kuni — এর ইঙ্গিত মিলছে শুধু ঘনিষ্ঠ ভাষাগুলিতে একই সমার্থজ্ঞাপক প্রতিশব্দই থেকেই নয়, এই থেকেও যে kuning (রাজা), আদিতে যা গোত্র বা উপজাতির প্রধানকে বুঝাত — তাও এই শব্দটি থেকেই উদ্ভূত। Sibja (আত্মীয়স্বজন) শব্দ নিয়ে সম্ভবতঃ মাথা ঘামাবার দরকার নেই; অন্ততঃ প্রাচীন নর্স ভাষায় sifjar বলতে শুধু রক্তসম্পর্কযুক্ত আত্মীয় নয়, পরন্তু বৈবাহিক সম্বন্ধযুক্তদেরও বুঝাত; অতএব এতে অন্ততঃ সংশ্লিষ্ট **দুটি গোত্রের** সদস্য ছিল এবং সেইজন্য sif শব্দটি নিশ্চয়ই গোত্রের প্রতিশব্দ ছিল না।

* অর্থ আত্মীয়স্বজন। — সম্পাঃ

মেক্সিকান ও গ্রীকদের মতো জার্মানদের মধ্যেও যুদ্ধক্ষেত্রে অশ্বারোহীদের এবং কীলকাকারে সন্নিবিষ্ট পদাতিক সৈন্যবাহিনীগুলিকেও গোত্র অনুযায়ী যুদ্ধসারিতে সাজান হত। ট্যাসিটাস যখন বলেছিলেন: পরিবার ও আত্মীয়তা অনুযায়ী, তখন তাঁর ভাষায় যে অনির্দিষ্টতা থাকছে তার ব্যাখ্যা হচ্ছে এই যে, তাঁর সময়ে রোমে বহুপূর্বেই জীবন্ত সংগঠন হিসাবে গোত্রের অবসান ঘটেছিল।

ট্যাসিটাসের একটি উদ্ধৃতি চূড়ান্ত গুরুত্বপূর্ণ যেখানে তিনি বলছেন: মায়ের ভাই ভাগিনেয়কে নিজের পুত্র মনে করে; কেউ কেউ এও বলেন যে, মামা ও ভাগিনেয়র রক্তসম্পর্ক পিতাপুত্রের রক্তসম্পর্কের চেয়ে বেশী পবিত্র ও ঘনিষ্ঠ, সেইজন্য জামিন রাখতে হলে যে ব্যক্তিকে সর্তবন্দী করা হচ্ছে তার নিজস্ব পুত্রটির চেয়ে তার ভাগিনেয়কেই ভালো জামিন মনে করা হয়। এখানে আমরা মাতৃ-অধিকারের এবং সেই হেতু আদি গোত্রেরও একটি জীবন্ত চিহ্ন দেখতে পাই, এবং এটি জার্মানদের একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য।* যদি এরকম কোন গোত্রের কোন ব্যক্তি নিজের কোন দায়ের জন্য নিজের ছেলেকে জামিন রাখে এবং বাপের বিশ্বাসভঙ্গের জন্য ছেলেকে আত্মবলি দিতে হয়, তাহলে তা ছিল মাত্র বাপেরই ভাববার ব্যাপার। কিন্তু বোনের ছেলে যদি উৎসর্গীকৃত হয়, তাহলে কিন্তু গোত্রের পবিত্র আইনই লঙ্ঘিত হয়। তার নিকটতম আত্মীয়ের সর্বোপরি দায়িত্ব ছিল ঐ বালক বা যুবককে রক্ষা করা, এখানে সে হচ্ছে তার মৃত্যুর জন্য দায়ী; তার উচিত ছিল হয় বালকটিকে জামিন রাখতে বিরত হওয়া অথবা চুক্তির শর্ত মিটিয়ে দেওয়া। জার্মানদের মধ্যে গোত্র সংগঠনের আর কোনো চিহ্ন না পেলেও এই একটি উদ্ধৃতিই প্রমাণ হিসাবে যথেষ্ট।

দেবতাদের গোধূলি এবং পৃথিবীর অবসান নিয়ে পুরনো নর্স সঙ্গীতের একটি অনুচ্ছেদ Völuspâ আরো গুরুত্বপূর্ণ, কেননা এটা রচিত হয়েছে আরো আটশ' বছর পরে। এই যে 'ভবিষ্য-দর্শিনীর দর্শনে' বাঙ্গ ও বুগে সম্প্রতি খ্রীষ্টধর্মের বিভিন্ন

---

* গ্রীকরা কেবলমাত্র বীর-যুগের পুরাণই থেকেই মামা ও ভাগিনেয়ের সম্পর্কের প্রকৃতিগত বিশেষ ঘনিষ্ঠতার কথা শুনেছে, এটি বহু জাতির মধ্যে মাতৃ-অধিকারের লুপ্তাবশেষ রূপে পাওয়া যায়। ডাইয়োড্রস (চতুর্থ, ৩৪) অনুসারে মিলিযেগার থিসিউসের পুত্রদের হত্যা করেন, এ'বা তাঁর মা অ্যালথিযার ভাই। অ্যালথিয়ার মতে এটি এত জঘন্য অপরাধ যে, তিনি হত্যাকারী নিজের ছেলেকেই অভিশাপ দেন এবং তাঁর মৃত্যু প্রার্থনা করেন। বিবরণে আছে যে, 'দেবতারা তাঁর ইচ্ছা পূরণ করলেন এবং মিলিয়েগারের মৃত্যু হল।' ঐ একই গ্রন্থকর্তার মতে (ডাইয়োড্রস, ৪র্থ, ৪৪) হেরাক্লিসের নেতৃত্বে আর্গোনটরা থ্রেসে নেমে সেখানে দেখল যে, ফিনিয়ুস তার দ্বিতীয় স্ত্রীর প্ররোচনায় তার পরিত্যক্তা প্রথমা স্ত্রীর দুটি পুত্রের প্রতি নির্লজ্জভাবে নির্মম আচরণ করছিলেন। এই প্রথমা স্ত্রী ক্লিওপেট্রা ছিলেন একজন বোরেয়াড। কিন্তু আর্গোনটদের মধ্যেও কয়েকজন ছিলেন বোরেয়াড, ক্লিওপেট্রার ভাই — অর্থাৎ নিপীড়িত বালকদের মামা। তাঁরা তৎক্ষণাৎ ভাগিনেয়দের সাহায্যে এগিয়ে আসেন, তাঁদের মুক্ত করেন ও রক্ষীদের মেরে ফেলেন। (এঙ্গেলসের টীকা।)

উপাদানের বিজড়নও আবিষ্কার করেছেন; তাতে আছে প্রলয়ের পূর্ববর্তী সার্বজনীন নীতিবিভ্রাট ও অধঃপতনের বিবরণের নিম্নলিখিত পঙ্‌ক্তিগুলি:

Broedhr munu berjask ok at bönum verdask,
munu *systrungar* sifjum spilla.

'ভায়েরা পরস্পর যুদ্ধ করবে এবং পরস্পরকে হত্যা করবে এবং **বোনের ছেলেরা** আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে।' Systrungr মানে মাসীর ছেলে এবং কবির চোখে এই ধরনের রক্তসম্পর্ক লংঘন করা হচ্ছে ভ্রাতৃহত্যা অপরাধের চরম। শীর্ষ ব্যাপার হল systrungar, এতে মায়ের দিকের আত্মীয়তার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। যদি syskina-börn অর্থাৎ ভাই ও বোনের ছেলেমেয়েরা অথবা syskina-synir অর্থাৎ ভাই ও বোনের ছেলেরা শব্দটি ব্যবহার করা হত, তাহলে প্রথম পঙ্‌ক্তির তুলনায় দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিটি উত্থান না হয়ে একটা দুর্বল পতন হয়ে দাঁড়াত। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, এমনকি ভাইকিংদের সময়ে যখন Völuspâ রচিত হয়, তখনও স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ায় মাতৃ-অধিকারের স্মৃতি মুছে যায়নি।

কিন্তু ট্যাসিটাসের সময়ে অন্ততঃ যাদের সঙ্গে তাঁর বেশী পরিচয় ছিল সেই জার্মানদের মধ্যে মাতৃ-অধিকারকে স্থানচ্যুত করে পিতৃ-অধিকার এসে গিয়েছিল: বাপের উত্তরাধিকারী হত ছেলেমেয়েরা; ছেলেমেয়ে না থাকলে ভায়েরা অথবা কাকা-জেঠা ও মামারা হত উত্তরাধিকারী। মায়ের ভায়ের উত্তরাধিকার মেনে নেওয়ার পিছনে পূর্বোল্লিখিত রীতিরই সংরক্ষণ দেখা যায় এবং এতে আরও প্রমাণ হয় যে, তদানীন্তন জার্মানদের মধ্যে তখনও পিতৃ-অধিকার কত সদ্য। এমনকি মধ্য যুগের অনেকটা গত হবার পরও আমরা মাতৃ-অধিকারের চিহ্ন দেখতে পাই। এই যুগে পিতৃত্ব তখনো ছিল অনিশ্চিত, বিশেষতঃ ভূমিদাসদের মধ্যে এবং একজন সামন্ত ভূস্বামী যখন নগরের কাছে পলাতক ভূমিদাস প্রত্যর্পণের দাবি করতেন, তখন দৃষ্টান্তস্বরূপ অগসবার্গে, বাসল ও কাইজের্সলাউতের্নে ঐ ব্যক্তি যে ভূমিদাস ছিল তা প্রমাণ করতে হত কেবলমাত্র মায়ের দিকের ছয়জন সবচেয়ে নিকট রক্তসম্পর্কযুক্ত আত্মীয়ের সাক্ষ্য অনুযায়ী। (মাউরার, 'নাগরিক সংবিধান'* ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৮১।)

মাতৃ-অধিকারের আর একটি জের যা তখন লুপ্ত হতে চলেছিল সেটি হচ্ছে স্ত্রীলোকদের প্রতি জার্মানদের শ্রদ্ধা যা রোমকদের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী ছিল প্রায় অবোধ্য। অভিজাত পরিবারের কন্যাদেরই জার্মানদের সঙ্গে চুক্তি রক্ষার পক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ জামিনদার বলে গণ্য হত। স্ত্রী ও কন্যারা বন্দী হয়ে দাস রূপে বিক্রি হবে, এই ভীষণ চিন্তা যুদ্ধক্ষেত্রে যতখানি সাহস জাগাত, আর কিছুতেই তেমন হত না। তারা

* G. L. Maurer, *Geschichte der Städteverfassung in Deutschland*, Bd. I—IV, Erlangen. 1869—1871. — সম্পাঃ

স্ত্রীলোকদের পবিত্র মনে করত, ভাবত একধরনের নবী, এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারগুলিতেও তাদের উপদেশ মানত। গোটা ব্যাটাভিয়ান অভ্যুত্থানে যেখানে সিভিলিস জার্মান ও বেলজিয়ানদের নেতা হয়ে গল প্রদেশে রোমক শাসনের ভিত্তি পর্যন্ত নাড়িয়ে দিয়েছিল, তার প্রাণস্বরূপ ছিল লিপ্পে নদীর তীরবর্তী ব্রুকতেরিয়ান নারী-পুরোহিত ভেলেদা। বাড়ির ভিতর স্ত্রীলোকদের অখণ্ড প্রতাপ ছিল বলে মনে হয়। ট্যাসিটাস বলেন যে, বৃদ্ধ ও শিশুদের সাহায্যে স্ত্রীলোকদেরই সমস্ত কাজ করতে হত, কারণ পুরুষেরা শিকারে বেরুত, মদ খেত ও আড্ডা দিত; কিন্তু তিনি অবশ্য বলেননি কারা চাষ করত এবং যেহেতু তার বিবরণে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, দাসেরা কেবল কর দিত, কিন্তু কোন বাধ্যতামূলক পরিশ্রম করত না, সেইজন্য মনে হয় যে সামান্য চাষবাসের প্রয়োজন হত, তা প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের অধিকাংশকেই করতে হত।

আগেই বলা হয়েছে বিবাহরূপ ছিল জোড়বাঁধা পরিবার যা ক্রমে একপতিপত্নীত্বের দিকে এগোচ্ছিল। তখনও কড়াকড়িভাবে একপতিপত্নীত্ব আসেনি, কারণ অভিজাতদের বহুপত্নী রাখতে দেওয়া হত। মোটের উপর এরা কন্যাদের মধ্যে কঠোর কৌমার্যরক্ষার উপর জোর দিত (কেল্টিকদের বিপরীতে)। ট্যাসিটাস বিশেষ উদ্দীপনার সঙ্গেই জার্মানদের বিবাহ-বন্ধনের অচ্ছেদ্যতার কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন বিবাহবিচ্ছেদের একটি মাত্র কারণ ছিল স্ত্রীলোকের দিক থেকে ব্যভিচার। কিন্তু এইখানে তাঁর বিবরণে অনেক ফাঁক আছে এবং অধিকন্তু এতে লম্পট রোমকদের সামনে খোলাখুলিই ধর্মের ছবি তুলে ধরা হয়েছে। অন্ততঃ এইটা নিশ্চিত: নিজেদের অরণ্যের মধ্যে জার্মানরা যদি এমন অসাধারণ নীতিনিষ্ঠার আদর্শ হয়েও থাকে, তাহলেও বাইরের জগতের সঙ্গে একটু সংস্পর্শই তাদের অপরাপর গড়পড়তা ইউরোপীয়দের স্তরে নামিয়ে আনবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। রোমক জীবনের আবর্তে নীতিনিষ্ঠার শেষ চিহ্নও মুছে গেল জার্মান ভাষার অবলুপ্তির চেয়েও ঢের তাড়াতাড়ি। এ বিষয়ে গ্রিগরি তুর্স্কীর লেখা পড়লেই হবে। এ কথা বলা দরকার করে না, রোমে যে মার্জিত লাম্পট্য ছিল, জার্মানীর আদিম অরণ্যে তা থাকা সম্ভব ছিল না এবং তাই সেদিক দিয়েও রোমক জগতের চেয়ে তারা উন্নত ছিল, যদিও তাদের উপর দৈহিক ব্যাপারে সংযম চাপাবার প্রয়োজন করে না — এটা সমগ্রভাবে কোনো জাতির মধ্যেই কোনকালে প্রাধান্য করেনি।

গোত্র-বিধি থেকেই এসেছিল নিজের পিতা ও আত্মীয়দের কাছ থেকে শত্রুতা ও বন্ধুত্ব উত্তরাধিকারের বাধ্যবাধকতা; এবং ভেয়ারগিল্দ্ প্রথাও, যাতে নিহত বা ক্ষতিগ্রস্ত করলে রক্তাক্ত প্রতিশোধের বদলে জরিমানা দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে হত। একপুরুষ আগেও ভেয়ারগিল্দ্ প্রথাকে একান্তই জার্মান প্রথা বলে মনে করা হত, কিন্তু তারপরে প্রমাণ হয়েছে যে, শত শত জাতির মধ্যে গোত্র-ব্যবস্থা থেকে উদ্ভূত রক্তাক্ত প্রতিশোধের এই নম্রতর রূপটা আচরিত হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ, আতিথ্যের বাধ্যবাধকতার মতো

আমেরিকার ইণ্ডিয়ানদের মধ্যেও এটি দেখা যায়। ট্যাসিটাস অতিথি সৎকারের যে বিবরণ দিয়েছেন ('জার্মানিয়া', পরিচ্ছেদ ২১) তা খুঁটিনাটি ব্যাপারে পর্যন্ত ইণ্ডিয়ানদের সম্পর্কে মর্গানের বিবরণের সঙ্গে প্রায় হুবহু মেলে।

ট্যাসিটাসের সময়ে জার্মানরা চাষের জমি চূড়ান্তভাবে ভাগ করে নিয়েছিল কি না এবং সংশ্লিষ্ট উদ্ধৃতিগুলিকে কী ভাবে ব্যাখ্যা করা হবে, তা নিয়ে উত্তপ্ত ও অবিরত বিতর্কটা আজ অতীতের ব্যাপার। সমস্ত জনসম্প্রদায়ের মধ্যেই যে চাষের জমি গোত্র কর্তৃক এবং পরে সাম্যতান্ত্রিক পারিবারিক গোষ্ঠীগুলির দ্বারা যৌথভাবে কর্ষিত হত — যেটার অস্তিত্ব সিজার সুয়োভিদের মধ্যে তখনো লক্ষ্য করেন; — পরে যে পরিবারগুলির মধ্যে জমি বণ্টিত ও কিছুকাল অন্তর পুনর্বণ্টিত হত; এবং এই চাষের জমির পর্যায়িক পুনর্বণ্টন যে আজও পর্যন্ত জার্মানির কোন কোন অংশে রয়ে গিয়েছে, — এসব প্রমাণিত হয়ে গেছে বলে তা নিয়ে আমাদের সময় নষ্ট করার বিশেষ কিছু নেই। সিজার স্পষ্টভাবে সুয়োভিদের সম্পর্কে বলেছেন, এদের কোনো খণ্ডিত অথবা ব্যক্তিগত জোত নেই, তাই জার্মানরা যদি ১৫০ বছরে এই ধরনের যৌথ কৃষি থেকে ট্যাসিটাসের যুগে জমির বার্ষিক পুনর্বণ্টন ও ব্যক্তিগত কৃষিতে পেঁছে থাকে তাহলে তাকে যথেষ্ট উন্নতি বলতে হবে; এত অল্প সময়ে এবং বাইরের কোন হস্তক্ষেপ ছাড়া যৌথ কৃষি থেকে জমির সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত মালিকানায় আসা একেবারে অসম্ভব মনে হয়। অতএব ট্যাসিটাসের বক্তব্যকে তাঁর কথাগুলি দিয়েই বুঝতে হবে: তারা প্রতি বছর চাষের জমি বদল বা পুনর্বণ্টন করে এবং এই প্রণালীতে যথেষ্ট যৌথ জমি বাকি থাকে। এটা হল কৃষির এবং ভূমি দখলের ঠিক সেই স্তর যা তদানীন্তন জার্মানদের গোত্র-প্রথার সঙ্গে যথাযথ খাপ খায়।

আমি পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদটি আগেকার সংস্করণে যা ছিল সেইভাবেই অপরিবর্তিত রাখছি। ইতিমধ্যে প্রশ্নটির আর একটি দিক এসে পড়েছে। যখন কভালেভস্কি দেখিয়ে দিলেন যে, (পূর্বের ৪৪ পৃ দ্রষ্টব্য)* পিতৃপ্রধান গৃহস্থালী গোষ্ঠী সর্বত্র না হলেও ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল এবং এইটিই ছিল মাতৃ-অধিকার সংবলিত সাম্যতান্ত্রিক পরিবার ও আধুনিক বিচ্ছিন্ন পরিবারের সংযোগ স্তর, তখন প্রশ্নটি আর এই থাকে না যে, জমি সাধারণ সম্পত্তি ছিল নাকি ব্যক্তিগত সম্পত্তি, মাউরার থেকে ভেইৎস পর্যন্ত যা নিয়ে আলোচনা চলছিল, পরন্তু প্রশ্নটি হয় এই যে সাধারণ সম্পত্তি কী রূপ নিয়েছিল? এ কথা নিঃসন্দেহ যে, সিজারের যুগে সুয়োভিরা শুধু জমির যৌথ মালিকই ছিল না, পরন্তু তারা সাধারণ স্বার্থে যৌথভাবেও তা চাষ করত। তাদের অর্থনৈতিক ইউনিট গোত্র অথবা গৃহস্থালী গোষ্ঠী অথবা

* এঙ্গেলস যে পৃষ্ঠার কথা বলছেন সেটি চতুর্থ জার্মান সংস্করণের। এই সংকলনের ২১৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

মাঝামাঝি কোন সাম্যতন্ত্রী আত্মীয়মণ্ডলী ছিল নাকি স্থানীয় ভূমি অবস্থার তারতম্যের ফলে এই তিন ধরনই ছিল, এই প্রশ্নগুলি এখনও বহুদিন বিতর্কমূলক থাকবে। কভালেভস্কি বলছেন যে, ট্যাসিটাস বর্ণিত অবস্থার পেছনে মার্ক অথবা গ্রাম্য গোষ্ঠী ছিল না, ছিল গৃহস্থালী গোষ্ঠী এবং এইটিই অনেক পরে জনসংখ্যাবৃদ্ধির ফলে গ্রাম্য গোষ্ঠীতে রূপান্তরিত হয়।

এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে রোমকদের সময় যেসব অঞ্চলে জার্মানরা ছিল এবং যে অঞ্চলগুলি পরে তারা রোমকদের কাছ থেকে কেড়ে নেয়, সেখানকার বসতিগুলি নিশ্চয় গ্রাম ছিল না, পরন্তু কয়েক পুরুষের লোক নিয়ে বৃহৎ পরিবারভিত্তিক গোষ্ঠী যারা সেইমতই এক বৃহৎ ভূখণ্ডে চাষ আবাদ করত এবং চারিপাশের বুনো জমিটা তাদের প্রতিবেশীদের সঙ্গে সাধারণ মার্ক হিসাবে ব্যবহার করত। চাষের জমি পরিবর্তন সম্পর্কে ট্যাসিটাসের উদ্ধৃতিটি তখন সত্যি একটি কৃষিগত তাৎপর্য পায় অর্থাৎ ঐ গোষ্ঠী প্রতি বৎসর ভিন্ন ভিন্ন ভূখণ্ডে চাষ করত এবং আগের বছরের ব্যবহৃত জমি হয় পতিত রাখা হত নয় একেবারে পরিত্যক্ত হত। জনসংখ্যার বিরলতার জন্য এত উদ্বৃত্ত অনাবাদী জমি থাকত যে, জমি নিয়ে কলহের কোন দরকার ছিল না। বহু শতাব্দীর পরেই কেবল যখন গৃহস্থালী গোষ্ঠীর সদস্যসংখ্যা এতদূর বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, প্রচলিত উৎপাদন-প্রণালীতে যৌথ কৃষি অসম্ভব হয়ে পড়েছিল তখনই গৃহস্থালী গোষ্ঠী ভেঙ্গে পড়ে। আগের যৌথ জমি ও মাঠ তখন থেকে বর্তমানের সুপরিচিত পদ্ধতিতে সম্প্রতি গঠিত বিভিন্ন ব্যক্তিগত পরিবারগুলির মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হত, এই ভাগ প্রথমে সাময়িকভাবে এবং পরে স্থায়ীভাবে হত, কিন্তু বনভূমি, চারণভূমি এবং জলাধার সাধারণ সম্পত্তি থেকে গেল।

রাশিয়ার ক্ষেত্রে বিকাশের এই পদ্ধতি ইতিহাসগতভাবে পুরাপুরি প্রমাণিত হয়েছে। জার্মানি সম্পর্কে এবং গৌণত অন্যান্য জার্মান দেশগুলি সম্পর্কে এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে, বহু বিষয়ে এই দৃষ্টিভঙ্গি মূল উৎসগুলির অনেক ভালো ব্যাখ্যা দেয় এবং ট্যাসিটাসের সময় পর্যন্ত গ্রাম্য গোষ্ঠী টেনে আনার পুরনো ধারণার চেয়ে সহজে সংকট সমাধান করে। সর্বপ্রাচীন দলিলগুলি যথা Codex Laureshamensis* — এর মোটামুটি অনেক সহজ ব্যাখ্যা হয় গৃহস্থালী গোষ্ঠী দিয়ে, গ্রাম্য মার্ক গোষ্ঠী দিয়ে ততটা হয় না। অপরপক্ষে এই ব্যাখ্যায় আবার নতুন সমস্যা ও নতুন প্রশ্ন সমাধান করা দরকার হয়ে পড়ে। ভবিষ্যৎ অনুসন্ধান এই ব্যাপারে নিষ্পত্তি

---

* Codex Laureshamensis — ফরাসী রাজ্যে ভর্মসা নগরের অনতিদূরে ৮ম শতকের দ্বিতীয়ার্ধে প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণ-পশ্চিম জার্মানির একটি বৃহৎ সামন্ততান্ত্রিক সম্পত্তি, লর্শ মঠের দানপত্র ও বিশেষাধিকার দলিলগুলির পাঠ-সংকলন; সংকলনটি রচিত হয় ১২শ শতকে; ৮ম-৯ম শতকের কৃষক ও সামন্ত মালিকানার ইতিহাসের ক্ষেত্রে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ দলিল এটি। — সম্পাঃ

করবে। কিন্তু এ কথা আমি অস্বীকার করতে পারি না যে, খুবই সম্ভবতঃ জার্মানি, স্ক্যান্ডিনেভিয়া ও ইংলণ্ডেও গৃহস্থালী গোষ্ঠীই ছিল মধ্যবর্তী স্তর।

সিজারের যুগে জার্মানরা আংশিকভাবে সদ্য স্থায়ী বসতি গেড়েছে এবং অংশতঃ গাড়তে চাইছে, কিন্তু ট্যাসিটাসের সময় তাদের পূর্ণ এক শতাব্দী স্থায়ী বসবাস হয়ে গিয়েছিল; এর ফলে জীবনযাত্রার উপকরণ উৎপাদনে যে প্রগতি হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। তারা কাঠের বাড়িতে বাস করত, তাদের পোষাক পরিচ্ছদ তখনও আদিম অরণ্যবাসীর মতো — কর্কশ পশমের আলখাল্লা ও পশু চর্ম এবং স্ত্রীলোক ও গণ্যমান্যদের জন্য সুতি অন্তর্বাস। তারা দুধ, মাংস, বুনো ফল এবং প্লিনির বিবরণ অনুযায়ী ওটমিল পরিজ খেত (আজ পর্যন্ত আয়র্ল্যান্ড ও স্কটল্যাণ্ডে এটি কেল্টিকদের জাতীয় খাদ্য এই ওট্মিল পরিজ)। তাদের সম্পদ ছিল গবাদি পশু, তবু এগুলি নিকৃষ্ট জাতের, ছোট আকৃতি, কুৎসিত ও শৃঙ্গহীন ছিল; ঘোড়াগুলো ছিল ছোট টাটু, যারা খুব জোরে দৌড়াতে পারত না। টাকা পয়সা একমাত্র রোমক মুদ্রা, তা ছিল অল্প আর ব্যবহার কদাচিৎ হত। তারা সোনা বা রূপার তৈজস তৈরি করত না এবং এই সব ধাতুকে তারা বিশেষ মূল্যও দিত না। লোহা দুষ্প্রাপ্য ছিল, অন্ততঃ রাইন ও ডানিয়ুবের তীরবর্তী উপজাতিগুলির মধ্যে মনে হয় এ জিনিস এখানকার আকরিক নিয়ে তৈরী হত না, সবটাই বাইরে থেকে আসত। রুণিক লিপি (গ্রীক ও ল্যাটিন অক্ষরমালার অনুকরণ) ব্যবহার হত কেবল গুপ্ত সংকেত হিসাবে, এবং কেবলমাত্র ধর্মীয় যাদুবিদ্যায়। নরবলি তখনও প্রচলিত ছিল। সংক্ষেপে বলা যায় যে, এরা বর্বরতার মধ্যবর্তী স্তর থেকে তখন সবেমাত্র উচ্চতন স্তরে পৌঁছেছিল। কিন্তু যখন রোমকদের আশু সংস্পর্শে এসে পড়া উপজাতিগুলির ক্ষেত্রে রোমকদের শিল্পজাত পণ্য সহজে আমদানি হয় এবং তাতে করে তাদের নিজস্ব লোহ ও বস্ত্রশিল্প গড়ে তোলা ব্যাহত হয়, তখন কিন্তু উত্তর-পূর্বে, বল্টিক সমুদ্রের তীরবর্তী উপজাতিগুলি নিঃসন্দেহে এইসব শিল্প গড়ে তুলেছিল। শ্লেজভিগের জলাভূমিতে অস্ত্রসজ্জার যে সব টুকরা পাওয়া গিয়েছে — একটা লম্বা লোহার তলোয়ার, একটি ধাতব বর্ম, একটি রূপোর শিরস্ত্রাণ প্রভৃতি এবং তারই সঙ্গে দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষের সময়ের রোমক মুদ্রা তথা দেশান্তরগামী জনসংখ্যার দ্বারা বিক্ষিপ্ত জার্মানদের ধাতব তৈজস স্বকীয় ধরনের সূক্ষ্ম কলাদক্ষতার পরিচয় দেয়, এমনকি রোমক ছাঁচের অনুকরণে নির্মিত জিনিসগুলিও। সভ্য রোমক সাম্রাজ্যে গিয়ে বসবাসের সঙ্গে সঙ্গেই ইংলণ্ড ছাড়া সর্বই জার্মান উপজাতিগুলির এই শিল্প নষ্ট হয়ে যায়। এই শিল্পের উৎপত্তি ও বিকাশ কত সমভাবে ঘটেছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় দৃষ্টান্তস্বরূপ ব্রোঞ্জ কঙ্কণ থেকে। বার্গান্ডি, রুমানিয়া ও আজভ সাগরের উপকূলে যে সব নমুনা পাওয়া গিয়েছে তা বৃটিশ অথবা সুইডিশ্দেরই কারখানা থেকে উৎপন্ন হতে পারত এবং সমভাবেই তার সন্দেহাতীত উৎস জার্মানিক।

তাদের প্রশাসনের সংবিধানও বর্বরতার উচ্চতন স্তর অনুযায়ী ছিল। ট্যাসিটাসের মতে তাদের মধ্যে সাধারণতঃ প্রধানদের (principes) একটি পরিষদ থাকত যারা অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারগুলিতে সিদ্ধান্ত করত এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি জনসভার সামনে উত্থাপনের ব্যবস্থা করত। এই শেষোক্ত সভা বর্বরতার নিম্নতন স্তরে, অন্ততঃপক্ষে আমেরিকানদের মতো যেসব ক্ষেত্রে আমরা এর সঙ্গে পরিচিত, সেক্ষেত্রে এটি গোত্রেরই হত, উপজাতি অথবা উপজাতি সমামেলের ক্ষেত্রে তখনও এ জিনিস পাইনি। তখনও পরিষদের প্রধানরা সর্দার (duces) থেকে ঠিক ইরকোয়াসদের মতোই সুস্পষ্টভাবে আলাদা। প্রথমোক্তরা তখনই অংশতঃ উপজাতির অন্যান্যদের কাছ থেকে গরু, শস্য প্রভৃতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিয়ে জীবিকা নির্বাহ করত। আমেরিকার মতো এখানেও এরা সাধারণতঃ একই পরিবার থেকে নির্বাচিত হত। পিতৃ-অধিকারে উৎক্রমণের ফলে গ্রীস ও রোমের মতোই ক্রমে ক্রমে নির্বাচিত পদের পক্ষে বংশগত পদ হয়ে ওঠার সুবিধা হল। এইভাবে প্রত্যেক গোত্রেই অভিজাত পরিবার দেখা দিল। বিভিন্ন জনসম্প্রদায়ের দেশান্তর যাত্রার সময়ে অথবা তার অব্যবহিত পরেই উপজাতিগুলির এই তথাকথিত সাবেকী অভিজাতদের অধিকাংশই লোপ পায়। সামরিক নেতারা শুধু নিজেদের গুণের জন্য এবং বংশ মর্যাদার বিচার বিবেচনা ছাড়াই নির্বাচিত হত। তাদের ক্ষমতা অল্পই ছিল, নিজেদের দৃষ্টান্ত দেখানই ছিল তাদের একমাত্র নির্ভর। ট্যাসিটাস স্পষ্টই বলেছেন যে, সৈন্যদলে সত্যকার শৃঙ্খলা বিধানের ক্ষমতা ছিল পুরোহিতদের হাতে। জনসভার হাতেই ছিল সত্যকার ক্ষমতা। রাজা অথবা উপজাতির প্রধান সভাপতিত্ব করতেন এবং জনগণ সিদ্ধান্ত করত: গুঞ্জন দিয়ে ব্যক্ত করা হত 'না' এবং উচ্চ ধ্বনি ও অস্ত্রের ঝঙ্কার ব্যক্ত করত 'হ্যাঁ'। জনসভা আবার বিচারসভাও ছিল। এখানে অভিযোগ উঠত এবং তার নিষ্পত্তি হত; মৃত্যুদণ্ডও এখান থেকেই দেওয়া হত, এটি কেবলমাত্র কাপুরুষতা, বিশ্বাসঘাতকতা অথবা অস্বাভাবিক লাম্পট্যের ক্ষেত্রেই দেওয়া হত। গোত্র ও অন্যান্য বিভাগগুলিতেও সভাই বিচার করত, গোত্র-প্রধান হত তার সভাপতি, সমস্ত আদি জার্মান বিচারলয়ের মতো সে শুধু বিচারকার্য পরিচালনা করত এবং প্রশ্ন উত্থাপন করত। জার্মানদের মধ্যে সর্বদা ও সর্বত্র রায় দিত সমগ্র জনসমষ্টি।

সিজারের সময় থেকে উপজাতিগুলির সমামেল দেখা দেয়। কয়েকটি ক্ষেত্রে তখনই তাদের রাজা ছিল। সর্বোচ্চ সমরাধিনায়ক গ্রীক ও রোমকদের মতো স্বৈরতান্ত্রিক ক্ষমতার অধিকারী হতে চাইত, এবং কখন কখন সে এ বিষয়ে সফলকাম হত। এই সফল ক্ষমতা-দখলকারীরা অবশ্য কখনই একচ্ছত্র শাসক ছিল না; তাহলেও তারা গোত্র-প্রথার শৃঙ্খল ভাঙতে থাকে। মুক্ত দাসেরা কোন গোত্রের সভ্য না হওয়ায় তাদের অবস্থা কিছুটা অনুন্নত ছিল বটে, কিন্তু নতুন রাজাদের প্রিয় পাত্র হিসাবে তারা প্রায়ই পদ, ধনসম্পত্তি ও সম্মান লাভ করত। এই একই জিনিস দেখা গেল যখন রোমক সাম্রাজ্যের বিজয়ের

পর সামরিক নেতারা বড় বড় দেশের রাজা হয়ে বসলেন। ফ্রাঙ্কদের মধ্যে রাজার দাসেদের ও মুক্ত অনুচরদের প্রথমে রাজদরবারে এবং পরে রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা ছিল এবং নূতন অভিজাতদের বেশির ভাগ অংশ ছিল এদেরই বংশজাত।

একটি প্রতিষ্ঠান ছিল রাজতন্ত্রের অভ্যুদয়ের বিশেষ অনুকূল: যোধ্বাহিনী। আমেরিকার লাল মানুষদের মধ্যে আমরা আগে দেখেছি, কী ভাবে গোত্রের পাশাপাশি শুধু নিজেদের উদ্যোগে যুদ্ধ চালাবার জন্য ব্যক্তিগত সংগঠন গড়ে উঠত। জার্মানদের মধ্যে এই ব্যক্তিগত সংগঠনগুলি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান হয়ে ওঠে। যে যুদ্ধনায়ক খ্যাতি লাভ করত, তাকে ঘিরে লুণ্ঠনকামী একদল তরুণ যোদ্ধা একত্র হত যারা ব্যক্তিগত আনুগত্যে তার কাছে দায়ী ছিল যেমন সেও দায়ী থাকত তাদের কাছে। সে তাদের ভরণপোষণ করত, দান দিত এবং ধাপে ধাপে তাদের সংঘবদ্ধ করত: ছোটখাট আক্রমণে শরীররক্ষী দল আর যুদ্ধের জন্য সর্বদা তৈরী একটি বাহিনী, বৃহত্তর অভিযানের জন্য শিক্ষিত অফিসারদল। এই যোধ্বাহিনী দুর্বল হতে বাধ্য ছিল, পরে, যথা ইতালিতে অডোয়েকারের সেনাপত্যে তা বস্তুতঃ প্রমাণ হয়, তবু তাদের মধ্যে জনগণের পুরাতন স্বাধীনতা ধ্বংসের ভ্রূণ ছিল এবং জনসম্প্রদায়গুলির দেশান্তর যাত্রার সময় ও পরে তারা এই ভূমিকাই নেয়। কারণ প্রথমতঃ, তারা রাজশক্তির অভ্যুদয়ের অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করে; দ্বিতীয়তঃ, ট্যাসিটাস যে ব্যাপারটি লক্ষ্য করেছিলেন, এই যোধ্বাহিনীকে অবিরাম যুদ্ধ ও লুণ্ঠনমূলক অভিযান দ্বারাই ধরে রাখা যেত। লুঠ হয়ে উঠল উদ্দেশ্য। দলপতি কাছাকাছি কিছু করবার না পেলে তার বাহিনী নিয়ে যেত অন্য দেশে, যেখানে যুদ্ধ চলত ও লুটপাটের সুযোগ মিলত। যেসব জার্মান সাহায্য-বাহিনী রোমক পতাকার অধীনে এমনকি বহুলাংশে জার্মানদেরই বিরুদ্ধে লড়াই করত তারা অংশতঃ ছিল এই ধরনের যোধ্বাহিনী। তারাই ছিল সেই ভাড়াটে সৈন্য ব্যবস্থার বীজ যা জার্মানদের লজ্জা ও অভিশাপ। রোমক সাম্রাজ্য জয় করবার পরে রাজাদের এই যোধ্বাহিনী, রোমের গোলাম ও দরবারী চাকরদের সঙ্গে পরবর্তী যুগের অভিজাতদের দ্বিতীয় মূল অঙ্গ হয়ে ওঠে।

অতএব জার্মান উপজাতিগুলির মিলনে যখন জনসম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল, তখন সাধারণভাবে তাদের ঠিক একই সংবিধান ছিল যা গ্রীকদের মধ্যে বীর-যুগে এবং রোমকদের মধ্যে তথাকথিত রাজাদের সময়ে ছিল: জনসভা, গোত্র-প্রধানদের পরিষদ এবং যুদ্ধনায়ক, যে ইতিমধ্যেই সত্যকার রাজকীয় ক্ষমতা পাবার অভিলাষী হয়ে উঠেছিল। গোত্র-ব্যবস্থার মধ্যে যা সম্ভব তার মধ্যে এইটিই ছিল সর্বোচ্চ বিকশিত সংবিধান, বর্বরতার উচতন স্তরের এইটাই ছিল আদর্শ সংবিধান। যে গণ্ডি পর্যন্ত এই সংবিধান চলত সমাজ যেই তা ছাড়িয়ে উঠল, অমনি গোত্র ব্যবস্থার শেষ হল; সে ব্যবস্থা ফেটে গেল, তার স্থান নিল রাষ্ট্র।

৮

জার্মানদের মধ্যে রাষ্ট্রের উৎপত্তি

ট্যাসিটাসের মতে জার্মানরা ছিল জনবহুল সম্প্রদায়। বিভিন্ন জার্মান জনসম্প্রদায়ের জনসংখ্যার একটা মোটামুটি হিসাব সিজার দিয়েছেন: যারা রাইন নদীর বাম তীরে এসে দেখা দিয়েছিল, সেই উসিপেটান ও টেংক্‌টেরানদের জনসংখ্যা স্ত্রীলোক ও শিশুদের নিয়ে তাঁর মতে ছিল ১,৮০,০০০। অর্থাৎ একটি জনসম্প্রদায়েই প্রায় এক লক্ষ লোক,* এটি ইরকোয়াসদের সর্বাধিক উন্নতির যুগের চেয়ে অনেক বেশী — শেষোক্তরা কুড়ি হাজারের কম লোক গ্রেট লেকস থেকে অহাইয়ো এবং পটোমাক পর্যন্ত গোটা দেশের ভীতি হয়ে উঠেছিল। রাইন অঞ্চলের বিভিন্ন জাতিগুলিকে যদি আমরা একটি মানচিত্রে দেখাবার চেষ্টা করি — বিবরণ থেকে এদের কথাই ভালো জানা যায় — তাহলে আমরা দেখব যে, গড়ে এক একটি জাতি বর্তমান প্রুশিয়ার একটি প্রশাসনিক জেলার মতো আয়তনে অর্থাৎ প্রায় ১০,০০০ বর্গ কিলোমিটার অথবা ১৮২ ভৌগোলিক বর্গ মাইল জুড়ে ছিল। কিন্তু রোমকদের Germania Magna** ভিস্টুলা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে আয়তনে ছিল পাঁচ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার। গড়ে একটি জনসম্প্রদায়ের জনসংখ্যা এক লক্ষ ধরলে বৃহত্তর জার্মানির সমগ্র জনসংখ্যা হত পঞ্চাশ লক্ষ — বর্বর-গোষ্ঠীর জনসম্প্রদায়গুলির মধ্যে এই সংখ্যাকে বৃহৎ বলতে হয় যদিও প্রত্যেক বর্গ কিলোমিটারে ১০ জন অধিবাসী অথবা প্রত্যেক ভৌগোলিক বর্গ মাইলে ৫৫০ জন বর্তমান যুগের তুলনায় নগণ্য। কিন্তু এই সংখ্যার মধ্যে তখনকার দিনের সমস্ত জার্মানদের ধরা হয়নি। আমরা জানি যে, কার্পেথিয়ান পর্বতমালা থেকে ডানিয়ুবের মোহানা পর্যন্ত অঞ্চলে বাস্তারনিয়ান, পিউকিনিয়ান ও অন্যান্য গথ বংশজাত জার্মান জাতিগুলি বাস করত। এগুলি এত জনবহুল ছিল যে, প্লিনি তাদের আখ্যা দিয়েছেন জার্মানদের পঞ্চম প্রধান উপজাতি; খৃীষ্টপূর্ব ১৮০ সালে তারা তখনই ম্যাসিডোনের রাজা পের্সিয়সের ভাড়াটে সৈন্যের কাজ করত এবং অগাস্টসের রাজত্বের গোড়ার দিকে তারা এ্যাড্রিয়ানোপ্‌ল্‌ নগরীর কাছাকাছি পর্যন্ত ঠেলে গিয়েছিল। যদি আমরা ধরে নিই যে,

* এখানে যে সংখ্যাটা ধরা হয়েছে তা গলের কেল্টিকদের সম্পর্কে ডিওডোরাসের একটি অনুচ্ছেদ দ্বারা প্রমাণিত হয়: 'গল অঞ্চলে অসমান জনসংখ্যার বহু জনসম্প্রদায় বাস করে। তাদের মধ্যে বৃহত্তম জনসম্প্রদায়ের জনসংখ্যা প্রায় দু-লক্ষ এবং ক্ষুদ্রতমের পঞ্চাশ হাজার' (Diodorus Siculus, v, 25)। এর থেকে গড়-সংখ্যা হয় সওয়া লক্ষ। গলের আলাদা জনসম্প্রদায়গুলি অধিকতর উন্নত হওয়ায় তাদের সংখ্যা জার্মানদের চেয়ে নিশ্চয়ই বেশি ছিল। (এঙ্গেলসের টীকা।)

** বৃহত্তর জার্মানি। — সম্পাঃ

তাদের সংখ্যা দশ লক্ষ মাত্র ছিল, তাহলে খ্রীষ্টীয় যুগের সূচনায় জার্মানদের সংখ্যা সম্ভবতঃ ষাট লক্ষের নিচে ছিল না।

জার্মানিতে বসত পাতার পর জনসংখ্যা নিশ্চয়ই তাড়াতাড়ি বাড়তে থাকে। আগে যে শিল্পোন্নতির উল্লেখ করা হয়েছে তার থেকেই এটি বেশ প্রমাণিত হয়। শ্লেজভিগের জলাভূমিতে যে জিনিসগুলি পাওয়া যায় তাদের মধ্যে রোমক মুদ্রাগুলি দিয়ে বিচার করলে তারিখ দাঁড়ায় তৃতীয় শতাব্দী। অতএব ঐ সময়ে বল্টিক অঞ্চলে ধাতু ও বস্ত্রশিল্প যথেষ্ট উন্নত হয়েছিল, রোমক সাম্রাজ্যের সঙ্গে রীতিমতো ব্যবসা-বাণিজ্য চলত এবং বিত্তশালী শ্রেণীর লোকেরা কিছুটা বিলাসের মধ্যে থাকত — এই সবই হচ্ছে বেশি ঘন জনসংখ্যার সাক্ষ্য। এই সময়েই জার্মানরা রাইন নদীর সমগ্র রেখা, রোমক সাম্রাজ্যের সীমান্ত প্রাচীর এবং ডানিয়ুব বরাবর, অর্থাৎ উত্তর সমুদ্র থেকে কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত রেখা বরাবর তাদের সাধারণ আক্রমণ শুরু করে — এটি হচ্ছে বাইরে ছড়িয়ে পড়বার জন্য সচেষ্ট ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। তিন শতাব্দীব্যাপী সংগ্রামে গথিক জনসম্প্রদায়গুলির প্রায় সমগ্র মূল অংশটা (স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার গথ এবং বার্গাণ্ডিয়ানরা বাদে) দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অগ্রসর হয় এবং বহুবিস্তীর্ণ আক্রমণ রেখার বাম ভাগ গঠন করে; এই রেখার কেন্দ্রে উচ্চ ভূমির জার্মানরা (হার্মিনোনিয়ান) ডানিয়ুব নদীর ঊর্ধ্ব দিকে প্রবেশ করে এবং ইস্তিভোনিয়ানরা যাদের বর্তমানে ফ্রাঙ্ক বলা হয় তারা দক্ষিণ পার্শ্বে রাইন নদী ধরে এগোতে থাকে। ইঙ্গিভোনিয়ানদের ভাগ্যে পড়ে বৃটেন জয়ের কাজ। পঞ্চম শতাব্দীর শেষে ক্লান্ত, রক্তহীন ও অসহায় রোম সাম্রাজ্য আক্রমণকারী জার্মানদের কাছে উন্মুক্ত হয়ে পড়ে।

পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদগুলিতে আমরা প্রাচীন গ্রীক ও রোমক সভ্যতার শৈশব দেখেছি। এখন আমরা তার অন্তিমে উপস্থিত। রোমকদের পৃথিবীব্যাপী আধিপত্য ভূমধ্যসাগরের তীরে সমস্ত দেশগুলিকে বহুশতাব্দী ধরে সমপর্যায়ভুক্ত করে চলেছিল। যেখানে গ্রীক ভাষার কোন প্রতিরোধ ছিল না, সেখানে সমস্ত জাতীয় ভাষা পথ ছেড়ে দিয়েছিল একধরনের বিকৃত ল্যাটিনের কাছে; এখন আর জাতিগত কোন পার্থক্য ছিল না, কেউই আর গল, আইবিরিয়ান, লিগুরিয়ান, নরিকান ছিল না; সকলেই হয়েছিল রোমক। রোমক শাসন এবং রোমক আইন সর্বত্রই পুরাতন গোত্র-সমামেল ভেঙ্গে দিয়েছিল এবং এইদিক দিয়ে স্থানীয় ও জাতীয় আত্মপ্রকাশের শেষ চিহ্ন পর্যন্ত ধ্বংস করেছিল। নবজাত রোমক সত্তা এই ক্ষতিপূরণ করতে পারেনি; কারণ এতে কোন জাতীয়তা প্রকাশ পেত না, প্রকাশ পেত শুধু জাতীয়তার অভাব। সর্বত্রই নতুন নতুন জাতির উপাদান ছিল। বিভিন্ন প্রদেশের ল্যাটিন উপভাষা ক্রমেই বেশী বেশী তফাৎ হতে থাকে; যে স্বাভাবিক সীমানাগুলি আগেকার দিনে ইতালি, গল, স্পেন ও আফ্রিকাকে স্বতন্ত্র অঞ্চল করেছিল সেগুলি তখনও ছিল, ও তাদের অস্তিত্ব তখনো অনুভূত হত। কিন্তু কোথাও এমন শক্তি

ছিল না যা এইসব উপাদানগুলিকে একত্র করে নতুন নতুন জাতি গড়ে তুলবে; কোথাও বিকাশের কোন ক্ষমতা তথা প্রতিরোধের কোন শক্তির, সৃজনশীল শক্তির কথা ছেড়েই দিলাম, চিহ্নমাত্র ছিল না। এই সুবৃহৎ ভূখণ্ডে অগণিত জনসংখ্যাকে একটিমাত্র বন্ধন ধরে রেখেছিল রোমক রাষ্ট্র; এবং কালক্রমে এইটিই হয়ে উঠেছিল তাদের জঘন্য শত্রু ও উৎপীড়ক। প্রদেশগুলি রোমকে সর্বস্বান্ত করেছিল; রোম নিজেও অপর নগরগুলির মতো একটি প্রাদেশিক নগর হয়ে পড়ে, তার কিছু সুযোগ-সুবিধা ছিল, কিন্তু শাসনদণ্ড আর ছিল না। সে আর পৃথিবীব্যাপী সাম্রাজ্যের কেন্দ্র ছিল না, সম্রাট ও তাদের শাসনকর্তাদের রাজধানীও ছিল না, কারণ তারা তখন কনস্টানটিনোপল, ট্রিভস এবং মিলানে থাকছে। কেবলমাত্র প্রজাদের শোষণের জন্য পরিকল্পিত এক বিরাট জটিল যন্ত্র হয়ে উঠেছিল রোমক রাষ্ট্র। খাজনা, রাষ্ট্রের জন্য বাধ্যতামূলক সেবা এবং বিভিন্ন ধরনের আদায় জনসাধারণকে গভীরতম দারিদ্র্যের মধ্যে ঠেলে দিচ্ছিল। শাসক, ট্যাক্স আদায়কারী এবং সৈন্যদের শোষণমূলক আচরণ সে চাপটাকে অসহ্য করেছিল। পৃথিবীব্যাপী আধিপত্য নিয়ে রোমক রাষ্ট্র এই অবস্থা করে তুলেছিল: এর অস্তিত্বের যে অধিকার তার ভিত্তি ছিল দেশের ভিতরে শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং বাইরের বর্বরদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করা। কিন্তু সে শৃঙ্খলা ছিল সর্বনিকৃষ্ট বিশৃঙ্খলার চেয়েও খারাপ এবং যে বর্বরদের হাত থেকে এই রাষ্ট্র নাগরিকদের রক্ষা করবার দাবি করত তাদেরই রক্ষাকর্তা বলে এই নাগরিকেরা অভিনন্দন জানাল।

সামাজিক অবস্থাও কম চরমে পৌঁছয়নি। প্রজাতন্ত্রের শেষ বছরগুলিতেই রোমক শাসনের ভিত্তি হয়ে উঠেছিল বিজিত প্রদেশগুলির নির্মম শোষণ। সাম্রাজ্য এই শোষণ তুলে দেয়নি, পরন্তু এইটিকেই নিয়ম করে তুলেছিল। সাম্রাজ্যের অধোগতির সঙ্গে সঙ্গেই ট্যাক্স এবং বাধ্যতামূলক সেবার মাত্রা বাড়তে থাকে এবং সরকারী কর্মচারীরা আরো নির্লজ্জভাবে জনগণের সম্পদ লুণ্ঠন ও অপহরণ করে চলে। বিভিন্ন জাতিগুলির উপর কর্তৃত্ব করত রোমকরা, কখনই তারা শিল্প ও বাণিজ্যের কাজ করত না। কেবল মহাজনিতেই তারা তাদের পুরোবর্তী ও পরবর্তীদের মধ্যে সেরা ছিল। ব্যবসা-বাণিজ্য যা কোনক্রমে কিছু কাল টিকে ছিল তাও সরকারী জবরদস্তি আদায়ের ফলে ধ্বংস পায়; যেটুকু অবশিষ্ট থাকে সেটা সাম্রাজ্যের পূর্ব অংশে, গ্রীসে চলতে থাকে, কিন্তু এ কথা এখন আমাদের আলোচ্য নয়। সার্বজনীন দারিদ্র্য, ব্যবসা, হস্তশিল্প, চারুকলার অবনতি, জনসংখ্যার হ্রাস; নগরগুলির অবক্ষয়; নিম্নতর স্তরে কৃষির অধঃপতন — এই হচ্ছে পৃথিবীব্যাপী রোমক আধিপত্যের চূড়ান্ত ফল।

সমগ্র প্রাচীন যুগ জুড়ে উৎপাদনের নির্ধারক শাখা ছিল কৃষি, এখন তা হয়ে উঠল আরো বেশি নির্ধারক। ইতালিতে বৃহদাকার মহালগুলি (ল্যাটিফাণ্ডিয়া) যেগুলি প্রজাতন্ত্রের অবসান কাল থেকে দেশের প্রায় সমগ্র ভূখণ্ড ছেয়ে ফেলেছিল, সেগুলিকে

দ্বভাবে কাজে লাগান হত: হয় চারণভূমি হিসাবে যেখানে জনসংখ্যাকে সরিয়ে তার স্থান নিয়েছিল ভেড়া ও গর্ব এবং যাদের দেখাশ্বনা করবার জন্য অল্প কয়েকজন ক্রীতদাসই যথেষ্ট ছিল; অথবা মহাল হিসাবে যেখানে বহ্বসংখ্যক দাসের সাহায্যে বৃহৎ আকারে ফলের চাষ চলত, অংশতঃ মালিকদের বিলাসের উপকরণ যোগাবার জন্য এবং অংশতঃ শহরের বাজারে বিক্রয়ের জন্য। বড় বড় চারণভূমি সংরক্ষিত রাখা হয়েছিল, এমনকি সম্ভবতঃ তাদের আরও প্রসার করা হয়েছিল। কিন্তু মহাল ও সেখানকার বাগানও মালিকদের দারিদ্র্য ও শহরগ্বলির ক্ষয়িষ্ণুতার জন্য ধ্বংস পেতে থাকে। ক্রীতদাসদের পরিশ্রমের উপর প্রতিষ্ঠিত ল্যাটিফাণ্ডিয়ার অর্থনীতি আর লাভজনক ছিল না; কিন্তু তখনকার দিনে এইটেই ছিল বৃহদাকার কৃষির একমাত্র সম্ভবপর র্প। ছোট হারে কৃষি আবার হয়ে উঠল কৃষির একমাত্র লাভজনক র্প। মহালের পর মহাল খণ্ড খণ্ড করে ছোট জোত হিসাবে বিলি-ব্যবস্থা করা হল বংশান্বক্রমিক প্রজাদের মধ্যে যারা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দিত অথবা দেওয়া হল partiarii-দের, প্রজা নয় যাদের বলা ভালো জোত পরিচালক। এরা তাদের কাজের জন্য বার্ষিক ফসলের ষষ্ঠাংশ, এমনকি নবমাংশ মাত্র পেত। ম্লতঃ কিন্তু এই ছোট জোতগ্বলি বিলি হত কলোনিদের (coloni) মধ্যে যারা বৎসরে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দিত, জমির সঙ্গে বাঁধা থাকত এবং জমির সঙ্গে তাদেরও বিক্রি করা চলত। এরা দাস ছিল না বটে, কিন্তু স্বাধীনও ছিল না; এরা স্বাধীন নাগরিকদের বিবাহ করতে পারত না এবং এদের নিজেদের মধ্যে বিবাহকেও বৈধ বিবাহ মনে করা হত না, যেমন দাসদের ক্ষেত্রে তেমনই এখানেও একে শ্বধ্বমাত্র সহবাস (contubernium) মনে করা হত। এরা হচ্ছে মধ্য য্বগের ভূমিদাসদের প্র্বস্রী।

প্রাচীন য্বগের দাসপ্রথা অচল হয়ে উঠল। গ্রামাঞ্চলে বৃহদায়তন কৃষিতে অথবা শহরের কারখানাতে কোনো ক্ষেত্রেই এ প্রথা আর মালিককে লাভ যোগাত না — এদের উৎপন্ন জিনিসের বাজারই লোপ পেয়েছিল। সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধির য্বগের বৃহদায়তন উৎপাদন এখন যেখানে নেমে এসেছিল সেই ছোট হারে কৃষি এবং ক্ষ্বদ্র কুটিরশিল্পের মধ্যে অসংখ্য ক্রীতদাসের কোনো স্থান ছিল না। এখন ক্রীতদাসের স্থান রইল কেবল ধনীদের গার্হস্থ্য কাজ ও বিলাস জীবনের সেবায়। কিন্তু ক্ষয়িষ্ণু দাসপ্রথার এখনও যতখানি প্রাণশক্তি ছিল তাতে উৎপাদনের ক্ষেত্রে সমস্ত শ্রমকেই গোলামের কাজ মনে হত, যে কাজ স্বাধীন রোমকদের মানমর্যাদার অন্বপযোগী — এবং এখন সকলেই হয়ে উঠেছিল স্বাধীন রোমক। এইজন্য একদিকে যেমন অপ্রয়োজনীয় ক্রীতদাসরা বোঝার মতো হয়ে ওঠায় তাদের ম্বক্ত করে দিয়ে ম্বক্তিপ্রাপ্ত দাসদের সংখ্যা বেড়ে উঠল, তেমনই অপরপক্ষে কলোনির সংখ্যা এবং নিঃস্ব হয়ে পড়া স্বাধীন নাগরিকের সংখ্যা (আমেরিকায় প্রাক্তন দাস স্টেটগ্বলির গরিব শ্বেতজাতি লোকদের মতো) বাড়তে থাকে।

প্রাচীন দাসপ্রথার এই ক্রমশঃ ধ্বংসের জন্য খ্রীষ্টধর্মের কোন কৃতিত্ব নেই। রোমক সাম্রাজ্যে বহু শতাব্দী ধরে খ্রীষ্টধর্ম দাসপ্রথার ফল ভোগ করেছে এবং পরবর্তী কালে তারা খ্রীষ্টানদের দাস ব্যবসা বন্ধ করবার কোন চেষ্টাই করেনি, তা উত্তরে জার্মানদের দাসব্যবসা অথবা ভূমধ্যসাগরের তীরে ভেনিশিয়ান দাসব্যবসা অথবা আরও অনেক পরে নিগ্রোদের নিয়ে দাসব্যবসা* — কোনোক্ষেত্রেই নয়। দাসপ্রথা আর লাভজনক ছিল না বলেই লোপ পেল। কিন্তু মুমূর্ষু দাসপ্রথা স্বাধীন মানুষের পক্ষে উৎপাদনী পরিশ্রম করাকে হেয় বলে চিহ্নিত করে সমাজে তার বিষাক্ত দংশন রেখে গেল। রোমক জগৎ এই কানাগলির মধ্যেই আটকে যায়: দাসপ্রথা অর্থনীতির দিক দিয়ে অসম্ভব, কিন্তু স্বাধীন মানুষের পরিশ্রম আবার নীতির দিক দিয়ে ঘৃণ্য। প্রথমটি আর সামাজিক উৎপাদনের মূল রূপ হিসাবে টিকতে পারছিল না এবং দ্বিতীয়টি তখনও মূল রূপ হয়ে উঠতে পারে না। একটি আমূল বিপ্লবই কেবল এখানে কাজ করতে পারত।

প্রদেশগুলিতে অবস্থা এর চেয়ে ভাল ছিল না। বেশীর ভাগ বিবরণ যা আমরা পেয়েছি তা হচ্ছে গল সম্পর্কে। কলোনিদের পাশাপাশি তখনও সেখানে স্বাধীন ছোট কৃষক ছিল। সরকারী কর্মচারী, বিচারক ও মহাজনদের অত্যাচার থেকে নিজেদের বাঁচাবার জন্য এরা প্রায়ই ক্ষমতাশালী লোকদের রক্ষণাবেক্ষণ ও আশ্রয় চাইত; এবং তারা একা একা নয়, পরন্তু গোটা গোষ্ঠী এই কাজ করত, তার জন্য চতুর্থ শতাব্দীর সম্রাটেরা বারবারই এই ব্যবস্থা নিষিদ্ধ করে হুকুম জারি করত। আশ্রয় চেয়ে এদের কী সুবিধা হত? রক্ষাকর্তা শর্ত হিসাবে জমির দখলী স্বত্ব নিজে নিতেন এবং প্রতিদানে তিনি কৃষককে আজীবন জমি চাষের নিরাপদ অধিকার দিতেন। হোলি চার্চ এই কৌশলটি স্মরণ করে নবম ও দশম শতাব্দীতে অবাধে তার অনুকরণ করে ভগবানের গৌরব ও নিজেদের জমিদারী বাড়াবার জন্য। এ সময় কিন্তু, আনুমানিক ৪৭৫ খ্রীষ্টাব্দে, মার্সাইয়ের বিশপ সালভিয়েনস এই দস্যুবৃত্তির তীব্র নিন্দা করেন এবং তাঁর বিবরণে বলেন যে, রোমক কর্মচারী ও বড় জমিদারদের অত্যাচার এতই অসহ্য হয়ে ওঠে যে, অনেক 'রোমক' বর্বরদের দখলী অঞ্চলে পালিয়ে যায় এবং সেখানে বসতকারী রোমকরা ফের রোমক শাসনের কবলিত হওয়ার চেয়ে আর কিছুকেই বেশী ভয় করত না। গরীব পিতামাতারা যে ঐ সময়ে প্রায় তাদের ছেলেমেয়েদের দাস হিসাবে বিক্রি করত তার প্রমাণ পাওয়া যায় একটি আইন থেকে, যাতে ঐ কাজকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

* ক্রিমোনার বিশপ্ লুইতপ্রান্দের কথায় দশম শতাব্দীতে ভেরদে'-এ অর্থাৎ পবিত্র জার্মান সাম্রাজ্যের মধ্যে প্রধান শিল্প ছিল খোজা তৈরী করা, স্পেন দেশে মুরদের হারেমের জন্য খুব লাভ রেখে এদের চালান দেওয়া হত। (এঙ্গেলসের টীকা।)

রোমকদের নিজেদের রাষ্ট্রের হাত থেকে মুক্তি দেওয়ার বিনিময়ে জার্মান বর্বররা তাদের সমস্ত জমির তিন ভাগের দু-ভাগ দখল করে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিল। এই ভাগ হল গোত্র-প্রথা অনুযায়ী; বিজেতারা সংখ্যায় আপেক্ষিকভাবে কম ছিল বলে বৃহৎ বৃহৎ ভূখণ্ড অবিভক্ত রয়ে গেল; এটি অংশতঃ সমগ্র জনসম্প্রদায় ভোগদখল করত এবং অংশতঃ উপজাতি অথবা গোত্রের সম্পত্তি ছিল। প্রত্যেক গোত্রে চাষের জমি ও চারণভূমি বিভিন্ন গৃহস্থালীর মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দেওয়া হত। ঐ সময়ে বারবার পুনর্বণ্টন হত কিনা আমরা জানি না; অন্ততঃ রোমক প্রদেশগুলিতে এই ব্যবস্থা শীঘ্রই পরিত্যক্ত হয় এবং ব্যক্তিগত অংশগুলি হস্তান্তরযোগ্য ব্যক্তিগত সম্পত্তি (allodium) হয়ে ওঠে। বনভূমি ও চারণভূমি সাধারণ ব্যবহারের জন্য অবিভক্ত থাকে; এরই ব্যবহার ও বিভক্ত জমি চাষের ধরন প্রাচীন রীতিনীতি এবং সমগ্র গোষ্ঠীর সিদ্ধান্ত দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হত। গোত্রগুলি যত বেশী দিন নিজের গ্রামে থাকত এবং কালক্রমে যত বেশী বেশী জার্মান ও রোমকরা মিশে যেত, ততই আত্মীয়তার বন্ধনের জায়গায় এসে যেত আঞ্চলিক বন্ধন। গোত্র বিলুপ্ত হয়ে আসছিল মার্ক, যেখানে অবশ্য তার উৎপত্তি হিসাবে সভ্যদের আদিম আত্মীয়তার যথেষ্ট চিহ্ন দেখা যেত। এইভাবে, অন্ততঃপক্ষে যে সব দেশগুলিতে মার্ক বেঁচে রইল — ফ্রান্সের উত্তরে, ইংলণ্ডে, জার্মানি ও স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ায় — সেখানে গোত্রের সংবিধান অলক্ষ্যে আঞ্চলিক সংবিধানে রূপান্তরিত হয় এবং এইভাবে রাষ্ট্রের মধ্যে গ্রথিত হবার যোগ্যতা পায়। তথাপি সমগ্র গোত্র-প্রথার যা বৈশিষ্ট্য, সেই স্বাভাবিক গণতান্ত্রিক চরিত্র এর মধ্যে ছিল এবং পরবর্তী কালে তার উপর চাপানো অবনতির মধ্যেও গোত্র-সংবিধানের একটা টুকরো এতে থেকে যায়; এর ফলে নিপীড়িতদের হাতে এই হাতিয়ারটি আধুনিক যুগে ব্যবহারের জন্যও রয়ে গিয়েছে।

গোত্রের রক্তসম্পর্কের দ্রুত বিলোপের কারণ হচ্ছে এই যে, বিজয়লাভের ফলে উপজাতি ও সমগ্র জনসম্প্রদায়ের মধ্যে গোত্র-সংস্থাগুলিরও অধঃপতন ঘটে। আমরা জানি গোত্র-প্রথার সঙ্গে পরাধীন জাতির উপর শাসন মোটেই খাপ খায় না। এখানে এই জিনিসটি বৃহদাকারে দেখা যায়। জার্মান জনসম্প্রদায় রোমক প্রদেশগুলি দখল করার পর তাদের জয়লাভকে সংহত করা দরকার ছিল; কিন্তু রোমক জনগণকে গোত্র-সংগঠনের মধ্যে নিয়ে নেওয়াও যেমন সম্ভব ছিল না তেমনই গোত্র-সংস্থার সাহায্যে তাদের শাসন করাও অসম্ভব ছিল। প্রথমে রোমকদের আঞ্চলিক শাসনের যে সংস্থাগুলি বহুলাংশেই কাজ চালিয়ে যেতে থাকে তাদের শীর্ষে রোমক রাষ্ট্রের বদলে অন্য কোনো শক্তি প্রতিষ্ঠা করা দরকার ছিল এবং সেই শক্তি শুধুমাত্র অন্য একটি রাষ্ট্রই হতে পারে। এইভাবে গোত্র-সংবিধানের প্রশাসন-সংস্থাগুলিকে রাষ্ট্র-সংস্থায় রূপান্তরিত করতে হত এবং অবস্থার চাপে এই কাজ করতে হত খুব তাড়াতাড়ি। বিজয়ী জাতির প্রথম প্রতিনিধি

কিন্তু ছিল তার যুদ্ধনায়ক। বিজিত এলাকার ভিতরের ও বাইরের নিরাপত্তার জন্য যুদ্ধনায়কের ক্ষমতা বাড়াবার দরকার হয়ে পড়ে। তাই সমরনায়ককে রাজায় রূপান্তরিত করার সময় এসে গেল। সেটি করাও হল।

ফ্রাঙ্কদের রাজত্ব ধরা যাক। এখানে শুধু রোমক রাষ্ট্রের বিস্তীর্ণ জমি নয়, পরন্তু আরও যে সব বৃহৎ ভূখন্ড বড় ও ছোট প্রদেশ ও মার্ক গোষ্ঠীগুলির মধ্যে বণ্টন করা হয়নি সেগুলি, বিশেষতঃ সমস্ত বৃহৎ বনভূমি, বিজয়ী সালিয়ান ফ্রাঙ্কদের নিরঙ্কুশ অধিকারে এল। সাধারণ সেনাপতি থেকে খাঁটি রাজায় রূপান্তরিত হবার পর ফ্রাঙ্কদের রাজা প্রথমে যে কাজটি করলেন তা হচ্ছে জাতির এই সম্পত্তিকে রাজকীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা, জনগণের কাছ থেকে এই সম্পত্তি হরণ করে তাঁর যোধবাহিনীর মধ্যে এটি দান করা, অথবা চাকরান দেওয়া। এই যোধবাহিনীতে প্রথমে ছিল শুধু তাঁর ব্যক্তিগত সামরিক রক্ষীরা এবং সৈন্যবাহিনীর বাকি উপনায়কেরা, অচিরেই তাদের সংখ্যাবৃদ্ধি হল শুধু রোমকদের নিয়ে, অর্থাৎ রোমান-সংস্কৃতিসম্পন্ন গলদের নিয়ে নয় — যারা শীঘ্রই নিজেদের লেখাপড়া, বিদ্যাবত্তা, রোমান কথ্য ভাষা ও সাহিত্যিক ল্যাটিন এবং দেশের আইনকানুনের সঙ্গে পরিচয়ের জন্য তাঁর কাছে অপরিহার্য হয়ে উঠল, — সংখ্যায় বৃদ্ধি করা হল পরন্তু ক্রীতদাস, ভূমিদাস ও মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের নিয়েও, এরাই গড়ে তুলল তাঁর রাজদরবার, তাদের মধ্যে থেকেই তিনি প্রিয় পাত্র বাছাই করতেন। প্রথমে এদের সকলকেই জাতীয় জমির অংশ দেওয়া হল প্রধানতঃ দান হিসাবে এবং পরে বেনিফিসিয়া* রূপে — গোড়ার দিকে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে রাজার জীবদ্দশার জন্য — এবং এইভাবে জনসাধারণের ঘাড় ভেঙে একটি নতুন আভিজাত্যের ভিত্তি স্থাপিত হল।

কিন্তু এইতেই শেষ নয়। পুরান গোত্র-প্রথা দিয়ে বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য শাসন করা যায় না। প্রধানদের পরিষদ অনেক আগেই অচল হয়ে না পড়লেও এখন আর তার সভা

* বেনিফিসিয়া — beneficium (আক্ষরিক অর্থে 'দান') — ৮ম শতকের প্রথমার্ধে ফ্রাঙ্ক রাষ্ট্রে ব্যাপক প্রচলিত ভূমি পুরস্কারের রূপ। বেনিফিসিয়া রূপে প্রদত্ত ভূমি তথাধিবাসী অধীন কৃষকগণসহ প্রাপকের যাবজ্জীবন ব্যবহারে তুলে দেওয়া হত কতকগুলি সুনির্দিষ্ট সর্তে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে যুদ্ধ সেবার সর্তে। পুরস্কারদাতা বা বেনিফিসিয়ারির মৃত্যু হলে অথবা শেষোক্ত জন তার দায় পূরণ না করলে বা তার মহাল অবহেলিত হতে থাকলে বেনিফিসিয়া ফিরে আসত মালিক বা তার উত্তরাধিকারীর হাতে, বেনিফিসিয়া পুনরায় দান করতে হলে পুরস্কার প্রদান ক্রিয়ার পুনরানুষ্ঠান প্রয়োজন হত। বেনিফিসিয়া দান করার অধিকার শুধু রাজক্ষমতা নয়, গির্জা এবং বৃহৎ ভূস্বামীদেরও ছিল। বেনিফিসিয়া প্রথায় সামন্ত শ্রেণী, বিশেষ করে ছোটো ও মাঝারি অভিজাত সৃষ্টি, কৃষকদের ভূমিদাসে পরিণতি, অনুসামন্ত সম্পর্ক, সামন্ততান্ত্রিক সোপানতন্ত্রের বিকাশ সুগম হয়। পরে বেনিফিসিয়া পরিণত হয় উত্তরাধিকাররূপে প্রাপ্ত লেনায় বা ফিয়োদানে (সামন্ত সম্পত্তিতে)। — সম্পাঃ

ডাকা যায় না এবং শীঘ্রই এর জায়গায় এল রাজার স্থায়ী পারিষদবর্গ। পুরাতন জনসভাকে তখনও আনুষ্ঠানিকভাবে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছিল, কিন্তু ক্রমশঃই এটি হয়ে উঠল সেনাদলের উপনায়ক ও নতুন উদীয়মান অভিজাতদের সভা। জমির মালিক স্বাধীন কৃষকগণ যারা ছিল ফ্রাংক জাতির বহুলাংশ তারা তখন অবিরাম অন্তর্যুদ্ধ ও দেশজয়ের যুদ্ধের ফলে, বিশেষতঃ শার্লেমেনির আমলে, অবসন্ন ও নিঃস্ব হয়ে পড়েছিল, — ঠিক যেমন প্রজাতন্ত্রের শেষদিকে রোমের কৃষকদের অবস্থা হয়েছিল। এই কৃষকগণ যাদের নিয়ে প্রথমে গোটা সৈন্যবাহিনী গঠিত হয় এবং ফ্রাংক দেশের ভূখণ্ড জয়ের পরে যারা ছিল সৈন্যবাহিনীর কেন্দ্র, তারা নবম শতাব্দীর সূচনায় এত দরিদ্র হয়ে পড়ে যে, পাঁচ জনের মধ্যে একজনের পক্ষেও যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম জোটানো মুস্কিল হয়। স্বাধীন কৃষকদের নিয়ে পূর্বতন সৈন্যবাহিনী যা প্রত্যক্ষভাবে রাজার আহ্বানে এগিয়ে আসত তাদের জায়গায় এল সদ্যোত্থিত অভিজাতদের বংশবদদের নিয়ে গড়া একটি বাহিনী। এই বশংবদদের মধ্যে পরাধীন কৃষকও ছিল, এরা সেইসব কৃষকদের বংশধর যারা আগে রাজা ছাড়া কোন মনিব মানত না এবং আরও আগে তারা কোনও মনিবকেই, এমনকি রাজাকেও, মানত না। শার্লেমেনির উত্তরাধিকারীদের আমলে ফ্রাংক কৃষকদের সর্বনাশ পরিপূর্ণ হয় অন্তর্যুদ্ধ, রাজকীয় শক্তির দুর্বলতায় এবং সেই সঙ্গে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের জবরদখলে — এদের সংখ্যা বাড়িয়ে তোলে শার্লেমেনির প্রতিষ্ঠিত আঞ্চলিক কাউন্টরা, যারা নিজেদের পদাধিকার বংশানুক্রমিক করবার জন্য ব্যগ্র, এবং সর্বশেষে নর্মানদের হামলার ফলে। শার্লেমেনির মৃত্যুর পঞ্চাশ বছর পরে ফ্রাংক সাম্রাজ্য নর্মানদের পদতলে তেমনই অসহায় হয়ে পড়ল চারশ' বছর আগে রোমক সাম্রাজ্য যেমন পড়েছিল ফ্রাংকদের সামনে।

শুধু বাইরের দিকের অক্ষমতাই নয়, পরন্তু সমাজের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা বা বলা ভালো অব্যবস্থাও ছিল প্রায় একই ধরনের। স্বাধীন ফ্রাংক কৃষকদের ঠিক সেই হাল হল, যা হয়েছিল তাদের পূর্ববর্তী রোমক কলোনিদের। যুদ্ধ ও লুণ্ঠনে সর্বস্বান্ত হয়ে তাদের সদ্যোত্থিত অভিজাতদের অথবা গির্জার আশ্রয় নিতে হত, কারণ রাজকীয় শক্তি তাদের রক্ষা করবার পক্ষে বড় বেশী দুর্বল ছিল; এই রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তাদেব খুব বেশী দাম দিতে হয়। তাদের পূর্ববর্তী গলের কৃষকদের মতোই নিজেদের জমিজমার অধিকার রক্ষাকারীদের হাতে তুলে দিতে হল এবং সেই জমি তারা বিভিন্ন ও পরিবর্তনশীল রূপের প্রজা হিসাবে ফিরে পেল, কিন্তু সর্বদাই সেবা ও কর দেবার শর্ত থাকত। এই ধরনের অধীনতার মধ্যে একবার গিয়ে পড়ার পর তারা ক্রমে ক্রমে নিজেদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা হারায়; কয়েক পুরুষ পরে তাদের মধ্যে বেশীর ভাগই ভূমিদাস হয়ে পড়ে। কত তাড়াতাড়ি স্বাধীন কৃষকদের অবলুপ্তি হয় তার নমুনা দেখা যায় সাঁ-জার্ম্যাঁ দ্য প্রে-এর মঠের জমিসংক্রান্ত ইর্মিনোঁ-র নথিপত্র থেকে; তখন ঐ জায়গাটি প্যারিসের কাছে

ছিল, এখন ঐটি প্যারিসের মধ্যে। এমনকি শার্লেমেনের জীবিত কালেই এই মঠের বহুদূর বিস্তৃত ভূসম্পত্তির মধ্যে ২,৭৮৮টি গৃহস্থালী ছিল, তাদের সকলেই হচ্ছে জার্মান নামওয়ালা ফ্রাঙ্ক; তাদের মধ্যে ২,০৮০টি ছিল কলোনি, ৩৫টি লিটি, ২২০টি দাস এবং কেবল ৮টি মাত্র স্বাধীন জোতের মালিক! যে পদ্ধতিতে রক্ষক কৃষকের জমি নিজে দখল করে তাকে শুধু আজীবন ব্যবহারের অধিকার দেয়, যে পদ্ধতিকে সালভিয়েনস ঈশ্বরবিরোধী বলে নিন্দা করেছিলেন সেইটিই এখন কৃষকদের ক্ষেত্রে গির্জা সর্বত্রই আচরিত করছে। বেগার খাটুনি যা এখন ক্রমে ক্রমে প্রচলিত হয়ে পড়ল, এটি যেমন রোমক 'আঙ্গেরী' (angariae) অর্থাৎ রাষ্ট্রের জন্য বাধ্যতামূলক সেবার আদর্শে গঠিত, তেমনি জার্মান মার্কের সদস্যরা পুল, রাস্তা নির্মাণ ও অন্যান্য গোষ্ঠীর কাজে যে পরিশ্রম করত তার ছাঁচেও গড়া। অতএব দেখায় যেন চারশ' বছর পরে সাধারণ মানুষ যেখান থেকে শুরু করেছিল, সেখানেই আবার ফিরে এসেছে।

এতে কিন্তু মাত্র দুটি জিনিস প্রমাণ হয়: প্রথমত, রোমক সাম্রাজ্যের অবনতির সময়ে সমাজের স্তরবিভাগ ও সম্পত্তির বণ্টন ছিল কৃষি ও শিল্পে প্রচলিত উৎপাদনের স্তরের সম্পূর্ণ উপযোগী, অতএব তা ছিল অপরিহার্য; দ্বিতীয়ত, পরবর্তী চারশ' বছরে এই স্তর থেকে উৎপাদনের তেমন কিছু উন্নতি বা অবনতি হয়নি এবং সেইজন্য তেমনি অবশ্যম্ভাবীভাবে এতে একই ধরনের সম্পত্তির বণ্টন এবং জনসংখ্যার মধ্যে একইরকম শ্রেণী-বিভাগ দেখা দেয়। রোমক সাম্রাজ্যের শেষ কয়েক শতাব্দীতে গ্রামাঞ্চলের উপর নগরের পুরাতন আধিপত্য নষ্ট হয়ে গিয়েছিল এবং জার্মান শাসনের প্রথম শতাব্দীগুলিতে এটি ফিরে আসেনি। এতে ধরে নিতে হয় কৃষি এবং সেই সঙ্গে শিল্প বিকাশের এক নিম্ন স্তর। এরকম সাধারণ অবস্থায় অনিবার্যভাবে দেখা দেয় বড় বড় শাসক জমিদার এবং তাদের অধীনে ছোট ছোট কৃষক। এরকম সমাজের সঙ্গে ক্রীতদাসের পরিশ্রম দ্বারা চালিত রোমক ল্যাটিফান্ডিয়ার অর্থনীতি অথবা ভূমিদাসের পরিশ্রমে পরিচালিত নতুনতর বৃহদাকার ব্যবস্থা জুড়ে দেওয়া যে কী রকম অসম্ভব ছিল তার প্রমাণ মেলে শার্লেমেনের সুবিদিত রাজকীয় মহাল নিয়ে তার অত্যন্ত ব্যাপক পরীক্ষামূলক চেষ্টার মধ্যে, যা প্রায় কোনো চিহ্ন না রেখেই লোপ পেয়েছে। পরে কেবল মঠগুলিতেই এই পরীক্ষা চলে এবং এগুলি কেবল তাদের পক্ষেই ফলপ্রসূ হয়; কিন্তু মঠগুলি ছিল ব্রহ্মচর্যের ভিত্তিতে গঠিত অস্বাভাবিক সামাজিক প্রতিষ্ঠান। তারা এই ব্যতিক্রান্ত ফল ঘটাতে পেরেছিল, কিন্তু সেই কারণেই তাদের নিজেদেরও ব্যতিক্রম হয়েই থাকতে হয়।

তথাপি এই চারশ' বছরে অগ্রগতি দেখা যায়। যদিও সূচনায় যাদের দেখেছিলাম প্রায় হুবহু সেই প্রধান শ্রেণীগুলিকেই যুগের শেষেও দেখতে পাই, তথাপি এই শ্রেণীগুলির ভিতরের মানুষ বদলে গিয়েছিল। প্রাচীন দাসপ্রথা লুপ্ত হয়েছিল; গরিব

হয়ে পড়ে যেসব স্বাধীন মানুষ পরিশ্রম করাকে দাসকর্মের মতো ঘৃণা করত, তারাও লোপ পেয়েছিল। রোমক কলোনি এবং নতুন ভূমিদাস — এই দুয়ের মাঝামাঝি ছিল স্বাধীন ফ্রাঙ্ক কৃষক। ক্ষয়িষ্ণু রোমক জগতের 'প্রয়োজনহীন স্মৃতি এবং নিষ্ফল সংঘাত' তখন মৃত ও সমাধিস্থ। নবম শতাব্দীর সামাজিক শ্রেণীগুলি কোন ক্ষয়িষ্ণু সভ্যতার বদ্ধজলায় জন্ম নেয়নি, নিয়েছে নতুন সভ্যতার গর্ভযন্ত্রণার মধ্যে। পূর্ববর্তী রোমকদের তুলনায় নতুন জাতি তার প্রভু ও ভৃত্য নিয়ে ছিল একটি তাগড়াই জাতি। শক্তিশালী জমিদার ও তার কাছে অধীন কৃষকগণের যে সম্পর্কটা রোমে ছিল প্রাচীন দুনিয়ার আশাহীন পতনের একটা পথ, সেইটাই এখন হল একটা নতুন বিকাশের সূত্রপাত। উপরন্তু, এই চারশ' বছর যতই নিষ্ফল বলে মনে হোক না কেন তবু এই বছরগুলি রেখে গেল এক মহৎ ফল, তা হল আধুনিক জাতিসত্তাসমূহ, আসন্ন ইতিহাসের জন্য পশ্চিম ইউরোপের মানুষদের নতুন করে সংবিন্যাস ও সন্নিবেশ। বস্তুতঃ, জার্মানরা ইউরোপের মধ্যে নতুন জীবন সঞ্চার করল; এবং সেইজন্যই জার্মান যুগে রাষ্ট্রের ভাঙনের পরিণামে নর্স ও সরোসেনদের বিজয় আসেনি, এল benefices ও অভিভাবক সম্পর্ক (commendation)* থেকে সামন্ততন্ত্রে বিকাশ এবং জনসংখ্যার এমন প্রচণ্ড একটা বৃদ্ধি যে, নিতান্ত দু-শতাব্দী পরে ক্রুশেড-এর রক্তক্ষয়ও বিনা ক্ষতিতেই তা সহ্য করতে পারে।

মুমূর্ষু ইউরোপের মধ্যে কী রহস্যময় যাদু দিয়ে জার্মানরা নতুন প্রাণ সঞ্চার করল? যে কথা আমাদের উগ্রজাতিবাদী ঐতিহাসিকরা বলে থাকেন, এটা কি জার্মান জাতির তেমন কোনো সহজাত যাদুশক্তি? আদৌ না। জার্মানরা ছিল বিশেষতঃ সেই সময় একটি অতি গুণবান আর্য উপজাতি, যাদের তখন সতেজ বিকাশ চলছে। কিন্তু তাদের কোনো বিশেষ জাতিগত গুণ ইউরোপকে নবজীবন দেয়নি, এটা ঘটিয়েছে নিতান্তই তাদের বর্বরতা, তাদের গোত্র-সংবিধান।

তাদের ব্যক্তিগত গুণ ও সাহস, স্বাধীনতার প্রতি তাদের ভালোবাসা এবং তাদের গণতান্ত্রিক প্রবৃত্তি যাতে সমস্ত সামাজিক ব্যাপারকে নিজের ব্যাপার বলে ধরা হত,

* Commendation — নির্দিষ্ট কতকগুলি শর্তে ('অভিভাবকদের' জন্য সমর-সেবা ও অন্যান্য সেবা, তার হাতে নিজের জমি তুলে দিয়ে শর্তবন্দী ভোগস্বত্ব হিসাবে তা ফিরে নেওয়া) কৃষকদের সামন্ত অভিভাবকত্বে অথবা ছোটো সামন্তদের বড়ো সামন্তদের অভিভাবকত্বে আনয়নের একটি প্রথা যা ৮ম—৯ম শতক থেকে ইউরোপে প্রচলিত হয়। এই চুক্তিতে কৃষকদের আসতে বাধ্য করা হত প্রায়শই জোরজবরদস্তি করে, তাদের কাছে এটির অর্থ ছিল স্বাধীনতা লোপ এবং ছোটো সামন্তদের কাছে এর অর্থ ছিল বড়োদের সঙ্গে অনুসামন্ত সম্পর্ক। ফলে commendation একদিক থেকে কৃষকদের ভূমিদাসে পরিণতি এবং অন্য দিক থেকে সামন্ত সোপানতন্ত্রের সংহতিতে সাহায্য করে। — সম্পাঃ

সংক্ষেপে সেই গুণগুলি যা রোমকরা হারিয়ে ফেলেছিল এবং কেবলমাত্র যেগুলি রোমক দুনিয়ার পাঁক থেকে নতুন রাষ্ট্র গঠন করতে এবং নতুন জাতিসত্তাগুলিকে টেনে তুলতে পারত — এগুলি উচ্চতন স্তরের বর্বরদের বৈশিষ্ট্য, তাদের গোত্র-সংবিধানের ফল ছাড়া আর কী?

যদি জার্মানরা একপতিপত্নীর প্রাচীন রূপকে পরিবর্তিত করে থাকে, পরিবারের মধ্যে পুরুষের আধিপত্যকে সংযত করে নারীর এমন একটি উচ্চতর মর্যাদা দিয়ে থাকে যা প্রাচীন জগতে কখনও জানা ছিল না, তবে সেটা তাদের বর্বরতা, তাদের গোত্র-প্রথা, তাদের মধ্যে মাতৃ-অধিকার যুগের তখনও জীবন্ত উত্তরাধিকার ছাড়া আর কীসের জোরে তারা করতে পেরেছিল?

যদি তারা অন্ততঃ তিনটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দেশে — জার্মানি, উত্তর ফ্রান্স ও ইংলন্ডে — মার্ক গোষ্ঠী হিসাবে সত্যিকার গোত্র-প্রথার একটা টুকরো বাঁচিয়ে সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রের মধ্যে পেঁাছে দিতে পেরে থাকে এবং এইভাবে মধ্য যুগের ভূমিদাসপ্রথার নিদারুণ নির্মমতার মধ্যেও শোষিত শ্রেণীদের, কৃষকদের স্থানীয় ঐক্য ও প্রতিরোধের উপায় দিয়ে দেয় যা প্রাচীন কালের ক্রীতদাসরা অথবা বর্তমানের প্রলেতারীয় শ্রেণী হাতের কাছে তৈরী জিনিস হিসাবে পায়নি — তবে বর্বরতা ছাড়া, গোত্র অনুযায়ী বসতি স্থাপন করার একান্ত বর্বর-যুগীয় তাদের এই পদ্ধতি ছাড়া তার আর কী কারণ?

এবং সর্বশেষে তারা যদি তাদের নিজেদের মধ্যে প্রচলিত পরাধীনতার একটি নম্রতর রূপ বিকশিত ও সর্বত্র তার প্রবর্তন করে থাকে, যেটি ক্রমে ক্রমে রোমক সাম্রাজ্যেও দাসত্বপ্রথার জায়গা নেয় — এমন একটি রূপ যার প্রসঙ্গে ফুরিয়ে সর্বপ্রথম বলেন যে, এইটি **শ্রেণীগতভাবে** নিপীড়িতদের ক্রমশঃ মুক্তিলাভের একটি উপায় তুলে দেয়, **(fournit aux cultivateurs des moyens d'affranchissement *collectif et progressif*),** — এবং এইজন্য যেটি দাসত্বপ্রথার চেয়ে বহুগুণে ভাল, কারণ দাসপ্রথায় মুক্তি হতে পারত শুধুমাত্র ব্যক্তিগতভাবে এবং মধ্যবর্তী কোন স্তর ছাড়াই (প্রাচীন যুগে সফল বিদ্রোহের দ্বারা দাসপ্রথা অবসানের কোন দৃষ্টান্ত নেই), অপরপক্ষে মধ্য যুগের ভূমিদাসেরা ধাপে ধাপে সত্যিই শ্রেণীগতভাবে মুক্তিলাভ করেছে — তবে এই জিনিসটার কারণ তাদের বর্বরতা ছাড়া আর কী যার কল্যাণে তাদের মধ্যে তখনও পূর্ণমাত্রায় দাসপ্রথা দেখা দেয়নি, প্রাচীন যুগের শ্রম দাসত্বও নয় অথবা প্রাচ্যের গার্হস্থ্য দাসত্বও নয়?

জার্মানরা রোমক জগতে প্রাণবান ও সঞ্জীবনী যা কিছুর সঞ্চার করল, তা হল এই বর্বরতা। বস্তুতঃ, মুমূর্ষু এক সভ্যতার মৃত্যু যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট এক জগতে নবজীবন সঞ্চার করবার ক্ষমতা ধরে কেবল বর্বররাই। এবং জাতিসমূহের দেশান্তর যাত্রার প্রাক্কালে

জার্মানরা বর্বরতার যে উচ্চতন স্তরে উঠেছিল, ঠিক সেই স্তরটাই হল এ প্রক্রিয়ার পক্ষে সর্বাধিক অনুকূল। এইতেই সবকিছুর ব্যাখ্যা হয়।

৯

বর্বরতা ও সভ্যতা

আমরা তিনটি বড় বড় পৃথক দৃষ্টান্ত নিয়ে গোত্র-প্রথার ধ্বংসের প্রণালী দেখেছি: গ্রীক, রোমক এবং জার্মান। কোন কোন সাধারণ অর্থনৈতিক অবস্থা বর্বরতার উচ্চতন স্তরেই সমাজের গোত্র-সংগঠনকে দুর্বল করে দেয় এবং সভ্যতার আবির্ভাবের সঙ্গে একেবারে এর বিলোপ ঘটায় সেটা উপসংহারে আমরা সন্ধান করে দেখব। এর জন্য মর্গানের রচনার মতো মার্কসের 'পুঁজি'ও দরকার।

বন্য অবস্থার মধ্যবর্তী স্তর থেকে উদ্ভূত হয়ে উচ্চতন স্তরে আরো বিকশিত হয়ে গোত্র-প্রথা, যতদূর আমরা প্রাপ্ত তথ্য দিয়ে বিচার করতে পারি, বর্বরতার নিম্নতন স্তরে পরিণতির শীর্ষে উঠে। তাই এই স্তর থেকেই আমরা অনুসন্ধান শুরু করব।

এই স্তরের জন্য আমেরিকার ইন্ডিয়ানদের আমাদের দৃষ্টান্ত ধরতে হবে, — এই স্তরে গোত্র-প্রথার পূর্ণ পরিণতি হয়েছিল। একটি উপজাতি কয়েকটি, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে দুটি গোত্রে বিভক্ত হত; জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে এই মূল গোত্রগুলি আবার কয়েকটি সন্তান-গোত্রে বিভক্ত হত যাদের সঙ্গে মাতৃ-গোত্রের সম্পর্ক দেখাত ফ্রাত্রীর মতো; উপজাতিও বিভক্ত হয়ে কয়েকটি উপজাতি হত যাদের প্রত্যেকের মধ্যে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ফের পুরান গোত্রগুলিকে দেখা যেত। অন্ততঃ কোন কোন ক্ষেত্রে আত্মীয় উপজাতিগুলি মিলিত হয়ে সমামেল গঠন করত। এই সরল সংগঠন যে সামাজিক অবস্থা থেকে উদ্ভূত, ঠিক তার উপযোগী ছিল। এটা একটা বিশেষ ধরনের স্বাভাবিক জোটবন্ধনের বেশি কিছু নয়, যা এইভাবে সংগঠিত সমাজে যে সব আভ্যন্তরীণ বিরোধ হতে পারে তার সমাধান করতে সমর্থ। বাইরের ক্ষেত্রে বিরোধের নিষ্পত্তি হত যুদ্ধ করে, যার পরিণতিতে একটি উপজাতির ধ্বংস হতে পারে কিন্তু বশ্যতা কদাচ নয়। গোত্র-ব্যবস্থার মহিমা এবং সেইসঙ্গে তার সীমাবদ্ধতা ছিল এই যে, এতে শাসক ও শাসিত কারো স্থান ছিল না। আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে অধিকার ও কর্তব্যের মধ্যে তখনও কোন পার্থক্য ছিল না; সামাজিক ব্যাপারে অংশগ্রহণ, রক্তের বদলা অথবা ক্ষতিপূরণ অধিকার নাকি কর্তব্য, ইন্ডিয়ানদের কাছে এ প্রশ্ন কখনো ছিল না; আহার, নিদ্রা বা শিকার করা অধিকার না কর্তব্য ঠিক এই প্রশ্নের মতো সেটা তাদের কাছে অবাস্তব মনে হত। তেমনি কোনো উপজাতি অথবা গোত্র বিভিন্ন শ্রেণীতেও বিভক্ত হতে পারত না। এখান থেকে আমরা এই অবস্থার অর্থনৈতিক ভিত্তির প্রশ্নে গিয়ে পেঁছাই।

জনসংখ্যা ছিল অত্যন্ত বিরল, উপজাতির বসতি অঞ্চলেই কেবল তার সংখ্যা বেশি ছিল, তার চারদিকে থাকত শিকারের বিস্তীর্ণ অঞ্চল এবং তারপরে থাকত নিরপেক্ষ অরণ্যের রক্ষাবেষ্টনী যা দিয়ে অন্যান্য উপজাতি থেকে তাদের পৃথক রাখা হত। শ্রমবিভাগ ছিল নিতান্তই প্রাকৃতিক চরিত্রের। এটি ছিল কেবলমাত্র নারীপুরুষের শ্রমবিভাগ। পুরুষমানুষ যুদ্ধে যেত, শিকার করত, মাছ ধরত, খাদ্য যোগাড় করত এবং এইসব আহরণের উপযোগী হাতিয়ার জোগাত। মেয়েরা গৃহস্থালী দেখত এবং খাদ্য ও বস্ত্র তৈরি করত; তারা রাঁধত, কাপড় বুনত এবং সেলাই করত। নিজের নিজের কর্মক্ষেত্রে প্রত্যেকেই কর্তা — পুরুষেরা জঙ্গলে, মেয়েরা ঘরে। পুরুষ বা স্ত্রী যে যা হাতিয়ার তৈরি ও ব্যবহার করত সে তার মালিক ছিল: পুরুষদের মালিকানায় ছিল অস্ত্রশস্ত্র এবং শিকার ও মাছ ধরার হাতিয়ারগুলি, স্ত্রীলোকদের মালিকানায় ছিল ঘরের জিনিসপত্র ও তৈজসপত্র। গৃহস্থালী ছিল সাম্যভিত্তিক, একই গৃহে কয়েকটি এবং প্রায়ই বহু পরিবার থাকত।* যা কিছু সমবেতভাবে উৎপন্ন ও ব্যবহৃত হত তাই ছিল সাধারণ সম্পত্তি: বাড়ি, বাগান, নৌকা। এখানে এবং কেবলমাত্র এখানেই আমরা সেই 'নিজের শ্রমে অর্জিত সম্পত্তি' দেখতে পাই যাকে আইনজ্ঞ ও অর্থনীতিবিদরা মিথ্যা করে সভ্য সমাজের উপর চাপিয়েছেন — আইনগত এই শেষ মিথ্যা অজুহাতের উপরই আধুনিক পুঁজিবাদী মালিকানা দাঁড়িয়ে আছে।

কিন্তু মানুষ সর্বত্রই এই স্তরে থেমে থাকেনি। এশিয়ায় সে এমন পশুর খোঁজ পেল যাদের পোষ-মানান যায় এবং বন্দী অবস্থায় যাদের প্রজনন করা যায়। বন্য স্ত্রী-মহিষকে শিকার করতে হয়, পোষা গোরু বছরে একটি করে বাচ্চা দেয় এবং তার উপর দুধ দেয়। সবচেয়ে অগ্রগামী কয়েকটি উপজাতি — আর্যরা, সেমিটিকরা, সম্ভবত তুরানিরাও — বন্য পশু পোষ-মানানো এবং পরে গবাদি পশুর প্রজনন ও প্রতিপালন তাদের মূল পেশা করে তোলে। পশুপালক উপজাতিগুলি সাধারণ বর্বরদের থেকে পৃথক হয়ে পড়ে: এই হচ্ছে **প্রথম বিরাটাকার সামাজিক শ্রমবিভাগ।** এই পশুপালক উপজাতিগুলি বাকি বর্বরদের চেয়ে শুধু অধিক পরিমাণে খাদ্যই উৎপাদন করত না, তারা বেশী বৈচিত্র্যের খাদ্যও তৈরী করত। অপরদের চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণে তাদের শুধু দুধ, দুগ্ধজাত সামগ্রী এবং মাংসই ছিল না, পরন্তু ছিল চামড়া, পশম, ছাগলের লোম এবং ক্রমবর্ধমান কাঁচামালের ফলে অধিকতর পরিমাণে প্রচলিত তন্তুবস্ত্র। এটাই সর্বপ্রথম নিয়মিত বিনিময় সম্ভব করল। পূর্ববর্তী স্তরগুলিতে বিনিময় হত কালেভদ্রে; অস্ত্র ও যন্ত্রপাতি নির্মাণে অসাধারণ নিপুণতার জন্য সাময়িক শ্রমবিভাগ

* বিশেষ করে আমেরিকার উত্তর-পশ্চিম উপকূলে — বানক্রফ্ট দ্রষ্টব্য। কুইন শার্লট দ্বীপের হাইদাদের মধ্যে কোনো কোনো চালার নিচে সাতশজন পর্যন্ত লোক জুটত। নুটকাদের মধ্যে গোটা উপজাতিই থাকত একই চালার নিচে। (এঙ্গেলসের টীকা।)

দেখা দিয়ে থাকতে পারে। এইভাবে নবপ্রস্তরযুগে পাথরের হাতিয়ারসমূহের কারখানার অবিসংবাদিত চিহ্নও বহু জায়গায় পাওয়া গিয়েছে। এই সব কারখানায় যাদের নৈপুণ্য গড়ে ওঠে সেই কারিগরেরা খুব সম্ভবতঃ সমগ্র জনসমাজের প্রতিপালনে কাজ করত, যেমন আজ পর্যন্ত গোত্রভিত্তিক ভারতীয় গোষ্ঠীগুলির স্থায়ী কারিগরেরা এখনও করে থাকে। সে যাই হোক, ঐ স্তরে উপজাতির মধ্যেই আভ্যন্তরীণ বিনিময় ছাড়া অন্য কোনো বিনিময়ের উদ্ভব সম্ভব ছিল না এবং তাও ছিল ব্যতিক্রম মাত্র। পশুপালক উপজাতিগুলি দানা বাঁধার পর কিন্তু বিভিন্ন উপজাতির লোকের মধ্যে বিনিময় এবং স্থায়ী প্রতিষ্ঠান হিসাবে এর উত্তরোত্তর বিকাশ ও সংহতির অনুকূল অবস্থা দেখা দেয়। সূচনায় নিজের নিজের গোত্র-প্রধানদের মারফৎ একটি উপজাতি অপর একটির সঙ্গে বিনিময় চালাত। কিন্তু যখন পশুযূথগুলি স্বতন্ত্র সম্পত্তিতে পরিণত হতে লাগল, তখন থেকে ব্যক্তিদের মধ্যে বিনিময় ক্রমশঃ বাড়তে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত এইটাই হয়ে উঠল একমাত্র ধরন। পশুপালক জাতিগুলি বিনিময়ের জন্য প্রতিবেশীর কাছে যে প্রধান জিনিসটি আনত, সেটি হচ্ছে গবাদি পশু; গবাদি পশু হয়ে উঠল এমন একটি পণ্য যা দিয়ে অপর সব পণ্যের মূল্য মাপা হত এবং সর্বত্র এর বিনিময়ে সহজেই অপরাপর পণ্য পাওয়া যেত — সংক্ষেপে, গবাদি পশু মুদ্রার কাজ করতে শুরু করল এবং সেই স্তর থেকেই মুদ্রা হিসাবে ব্যবহৃত হল। পণ্য-বিনিময়ের একেবারে সূচনাতেই মুদ্রা পণ্যের চাহিদা বাড়তে থাকল এই প্রয়োজনীয়তায় এবং এই দ্রুততায়।

সম্ভবতঃ নিম্নতন স্তরে এশিয়াবাসী বর্বরদের মধ্যে বাগিচার চাষ অজানা ছিল, এটি তাদের মধ্যে অন্ততঃ বর্বরতার মধ্যবর্তী স্তরে ক্ষেত্রকর্ষণের পুরোগামী হিসাবে দেখা দেয়। তুরানের মালভূমির জলবায়ুতে পশুপালন সম্ভব হত না যদি না দীর্ঘস্থায়ী কঠোর শীতকালের জন্য পশুখাদ্যের যথেষ্ট যোগান থাকত। এইজন্যই মাঠ চাষ ও খাদ্যশস্য চাষ এখানে অপরিহার্য ছিল। কৃষ্ণসাগরের উত্তরদিকের তৃণভূমি সম্পর্কেও এই একই কথা খাটে। শস্য দানা পশুর জন্য উৎপাদন হবার পরে শীঘ্রই মানুষের খাদ্য হয়ে ওঠে। চাষের জমি তখনও উপজাতির সম্পত্তি ছিল এবং প্রথমে তা বরাদ্দ হয় গোত্রের জন্য, পরে গৃহস্থালী গোষ্ঠীগুলির ব্যবহারের জন্য এবং সর্বশেষে আলাদা আলাদা ব্যক্তিদের জন্য; এদের কিছু কিছু দখলীস্বত্ব থেকে থাকতে পারে কিন্তু তার বেশী নয়।

শিল্পের ক্ষেত্রে এই স্তরের দুটি কৃতিত্ব হচ্ছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমটি হচ্ছে বুনবার তাঁত, দ্বিতীয়টি হচ্ছে ধাতু আকরিকের গালাই ও ধাতু কর্ম। তামা, টিন এবং তাদের সংমিশ্রণে ব্রোঞ্জই ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধাতু; ব্রোঞ্জ দিয়ে প্রয়োজনীয় হাতিয়ারপত্র ও অস্ত্রশস্ত্র হত, কিন্তু এটি তখনও পাথরের উপকরণকে হটিয়ে দিতে পারেনি। কেবল লোহাই এই কাজটি করতে পারত, কিন্তু তখনও লোহার উৎপাদন

অজ্ঞাত ছিল। সোনা ও রূপা অলঙ্কার ও সাজসজ্জা হিসাবে ব্যবহার করা শুরু হয়েছিল এবং ইতিমধ্যে মনে হয় এদের মূল্য তামা ও ব্রোঞ্জ থেকে অনেক বেশী ছিল।

পশুপালন, কৃষি, গার্হস্থ্য শিল্প — সমস্ত শাখায় উৎপাদনের বৃদ্ধিতে মানুষের শ্রমশক্তির পুনরুৎপাদনের জন্য যা প্রয়োজন তার চেয়ে বেশী জিনিস উৎপন্ন করা সম্ভব হল। ঐ একই সময়ে এতে গোত্র অথবা গৃহস্থালী গোষ্ঠী অথবা একক পরিবারের সমস্ত সদস্যের দৈনিক কাজের পরিমাণ বাড়ল। আরও শ্রমশক্তির জোগান বাঞ্ছনীয় হয়ে পড়ল। এটি জোগাল যুদ্ধ; যুদ্ধ-বন্দীদের দাস করা হল। ঐ বিশেষ ঐতিহাসিক অবস্থায় প্রথম বৃহৎ সামাজিক শ্রমবিভাগ শ্রমের উৎপাদিকা বাড়িয়ে অর্থাৎ সম্পদ বাড়িয়ে এবং উৎপাদনের ক্ষেত্রকে প্রসারিত করে তার পেছু পেছু অনিবার্যভাবেই দাসপ্রথাকে টেনে আনল। প্রথম বৃহৎ সামাজিক শ্রমবিভাগ থেকে এল দুটি শ্রেণীতে প্রথম বৃহৎ সামাজিক বিভাগ — মালিক ও ক্রীতদাস, শোষক ও শোষিত।

কী করে এবং কবে যে পশুযূথগুলি উপজাতি বা গোত্রের যৌথ সম্পত্তি থেকে বিভিন্ন পরিবারের প্রধানদের ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হল তা আজও আমরা জানি না। কিন্তু প্রধানতঃ এই ঘটনা এই-স্তরেই ঘটে থাকবে। পশুযূথ ও অন্যান্য নতুন নতুন ধনসামগ্রী পরিবারের ভিতর একটি বিপ্লব আনল। জীবিকা অর্জন সব সময়েই ছিল পুরুষের কাজ; সেইজন্য সে জীবিকার উপকরণগুলি তৈরী করত ও দখলে রাখত। পশুযূথগুলি এখন হয়ে উঠল জীবিকার নতুন উপায় এবং গোড়ায় তাদের পোষ-মানানো ও পরে প্রতিপালন হল তার কাজ। এইজন্য গবাদি পশু, এবং তাদের বিনিময়ে যেসব পণ্য ও ক্রীতদাস পাওয়া যেত সেইসবের মালিক হল পুরুষ। উৎপাদনের ক্ষেত্রে সমস্ত উদ্বৃত্তই পুরুষের ভাগে গেল; স্ত্রীলোকেরা ছিল শুধুমাত্র তার ভোগের অংশীদার, কিন্তু মালিকানার অংশীদার আর নয়। 'বন্য', যোদ্ধা ও শিকারী ঘরের মধ্যে গৌণ ভূমিকা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকত এবং স্ত্রীলোকের প্রাধান্য মানত। 'অপেক্ষাকৃত নম্র' পশুপালক তার সম্পত্তির জোরে প্রথম স্থান দখল করল এবং স্ত্রীলোককে গৌণ ভূমিকা নিতে বাধ্য করল। এবং এতে স্ত্রীলোকের অভিযোগ করার কিছু ছিল না। পরিবারের মধ্যে শ্রমবিভাগই পুরুষ ও নারীর মধ্যে সম্পত্তির বণ্টন নিয়ন্ত্রিত করত। এই শ্রমবিভাগ পরিবর্তিত হল না, কিন্তু তা সত্ত্বেও এখন এতে আগেকার পারিবারিক সম্পর্কের ওলটপালট হল শুধু এইজন্য যে, পরিবারের বাইরে শ্রমবিভাগের ধরন বদলে গিয়েছিল। ঠিক যে কারণে আগেকার দিনে স্ত্রীলোক সংসারের মধ্যে সর্বেসর্বা হয়েছিল, অর্থাৎ তাকে ঘরের কাজ করতে হত বলে, এখন ঠিক সেই কারণেই সংসারের মধ্যে পুরুষের আধিপত্য সুনিশ্চিত হল; স্ত্রীলোকের ঘরের কাজ জীবিকা অর্জনের ক্ষেত্রে পুরুষের কাজের তুলনায় তাৎপর্য হারাল; এই দ্বিতীয় কাজটিই ছিল সব, প্রথমটার অবদান ছিল তুচ্ছ। এখানেই আমরা দেখতে পাই যে,

স্ত্রীলোকের মুক্তি এবং পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকার হচ্ছে অসম্ভব এবং ততদিন অসম্ভব থাকবে যতদিন স্ত্রীলোক সামাজিক উৎপাদনের কাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সীমাবদ্ধ থাকবে গৃহস্থালীর ব্যক্তিগত কাজে। নারীর মুক্তি তখনই সম্ভব যখন সে বৃহদাকারে, সামাজিক আকারে উৎপাদনে অংশ নিতে পারছে এবং যখন গৃহস্থালী কাজের প্রয়োজন হচ্ছে গৌণ মাত্রায়। এবং কেবল আধুনিক বৃহৎ শিল্পের ফলেই এই জিনিসটি সম্ভব হয়েছে, এতে বিপুল সংখ্যায় নারীর পক্ষে উৎপাদনে অংশ গ্রহণ করা চলে শুধু তাই নয়, আসলে সেইটাই আবশ্যক হয়ে পড়ে এবং উপরন্তু গৃহস্থালীর ব্যক্তিগত কাজকেও একটা সামাজিক শিল্পে পরিণত করার উত্তরোত্তর চেষ্টা হয়।

সংসারের মধ্যে বাস্তব আধিপত্য লাভই পুরুষের স্বৈরাচারের শেষ প্রতিবন্ধক দূর করে। মাতৃ-অধিকারের পরাজয়, পিতৃ-অধিকারের প্রবর্তন এবং জোড়বাঁধা পরিবার থেকে একপতিপত্নীত্বে ক্রমপরিণতির ফলে এই স্বৈরাচার সুদৃঢ় ও চিরস্থায়ী হয়। এতে প্রাচীন গোত্র-ব্যবস্থায় ভাঙ্গন ধরল: একক পরিবার পরিণত হল একটা শক্তিতে এবং গোত্রের বিরুদ্ধে দাঁড়াল শত্রুর মতো।

পরের ধাপে আমরা বর্বরতার উচ্চতন স্তরে এসে পেঁছাই, যে পর্বে সমস্ত সভ্য জাতি তাদের বীর-যুগের মধ্যে দিয়ে যায়: এটি লোহার তরবারির যুগ, সেই সঙ্গে লোহার লাঙ্গল ও কুঠারেরও যুগ। লোহা হল মানুষের ভৃত্য, ইতিহাসে বিপ্লবী ভূমিকা পালন করেছে এমন সমস্ত কাঁচামালের মধ্যে এটি হচ্ছে সর্বশেষ ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাঁচামাল, সর্বশেষ, যদি আলুর কথা বাদ দিই। লোহা বৃহত্তর আকারে ক্ষেতচাষ এবং কর্ষণের জন্য বৃহৎ বনভূমি সাফ করা সম্ভব করল; কারিগরের হাতে লোহা এমন শক্ত ও ধারাল একটি হাতিয়ার তুলে দিল যার কাছে কোন পাথর বা অন্য যে কোনো পরিচিত ধাতুই হার মানত। এসব ঘটে ক্রমে ক্রমে, প্রথম প্রস্তুত লোহা প্রায়ই ছিল ব্রোঞ্জের চেয়েও নরম। এইভাবে পাথরের হাতিয়ার লোপ পেল কিন্তু আস্তে আস্তে; 'হিল্ডেব্রান্ড সঙ্গীতেই' শুধু নয়, ১০৬৬ খৃষ্টাব্দে হেস্টিংসের যুদ্ধেও* পাথরের কুঠার ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু প্রগতি এবার হল অপ্রতিরোধ্য, কম ব্যাহত এবং অধিক দ্রুত। মিনার ও পাথরের দেওয়ালের বেষ্টনীর মধ্যে পাথর অথবা ইটের বাড়ি সমেত নগরই হয়ে উঠল উপজাতি বা উপজাতিসমূহের সমামেলের কেন্দ্রীয় পীঠ। এতে গৃহ-নির্মাণকলার দ্রুত উন্নতি সূচিত হল; কিন্তু সেই সঙ্গে বিপদবৃদ্ধি ও আত্মরক্ষার আবশ্যকতারও লক্ষণ সেটা। ধনসম্পত্তির দ্রুত বৃদ্ধি হয়, কিন্তু সে হল স্বতন্ত্র ব্যক্তির

* ১০৬৬ সালে হেস্টিংসে লড়াই হয় ইংলন্ড অভিযানী নর্ম্যান্ডির ডিউক উইলিয়মের সৈন্যদের সঙ্গে অ্যাঙলো-স্যাক্সন সৈন্যের। এদের সৈন্য সংগঠনের মধ্যে গোষ্ঠী ব্যবস্থার জের বর্তমান ছিল এবং অস্ত্রশস্ত্র ছিল আদিম ধরনের; পরাজিত হয় এরা। ইংরেজদের রাজা হ্যারল্ড যুদ্ধে নিহত হন, এবং বিজয়ী উইলিয়ম, প্রথম, এই নামে উইলিয়ম ইংলন্ডের রাজা হন। — সম্পাঃ

ধনসম্পত্তি। বয়ন, ধাতুর কাজ ও অন্যান্য যে সব কারুশিল্প এখন ক্রমেই বেশী করে বিশিষ্ট হয়ে উঠেছিল তাদের উৎপাদনে বেশি বৈচিত্র্য ও শিল্পসূক্ষ্মতা দেখা গেল; কৃষি থেকে এখন শুধু খাদ্যশস্য, ডাল ও ফল নয়, তেল ও মদও মিলছিল, তার উৎপাদন-পদ্ধতি জানা হয়ে গিয়েছিল। এত বিভিন্ন ধরনের কাজকর্ম একই ব্যক্তির দ্বারা চালান আর সম্ভব ছিল না; **দ্বিতীয় বিরাট শ্রমবিভাগ** দেখা দিল; কুটিরশিল্প কৃষি থেকে বিচ্ছিন্ন হল। উৎপাদনের অবিরাম প্রসার এবং তার সঙ্গে শ্রমের অধিকতর উৎপাদনশীলতার ফলে মানুষের শ্রমশক্তির মূল্য বাড়ল। পূর্ববর্তী স্তরে যা ছিল একটা সদ্যোজাত ও আপতিক ব্যাপার, সেই দাসপ্রথা এখন সামাজিক ব্যবস্থার একটি মূল অঙ্গ হয়ে উঠল। দাসরা এখন আর মাত্র সাহায্যকারী থাকল না, পরন্তু তাদের দলে দলে তাড়িয়ে নিয়ে ক্ষেতে ও কারখানায় কাজ করান হতে থাকল। উৎপাদনকে দুটি প্রধান শাখায়, কৃষি ও হস্তশিল্পে ভাগ করার ফলে বিনিময়ের জন্যই উৎপাদন, পণ্যের উৎপাদন শুরু হল; এবং এর সঙ্গে এল বাণিজ্য, শুধু উপজাতির অভ্যন্তরে এবং তার সীমানা বরাবর নয়, পরন্তু সমুদ্রপারেও। এইসবই তখনো খুব অপরিণত ছিল; সর্বজনীন মুদ্রা-পণ্য হিসাবে মূল্যবান ধাতুগুলির সমাদর হল, কিন্তু তখনও মুদ্রা তৈরী হয়নি এবং বিনিময় হত কেবল ওজন দেখে।

এখন স্বাধীন মানুষ ও দাসের মধ্যে বৈষম্যের সঙ্গে ধনী ও দরিদ্রের বৈষম্য যোগ হল -- নতুন শ্রমবিভাগের সঙ্গে এল বিভিন্ন শ্রেণীতে সমাজের নতুন বিভাগ। বিভিন্ন পরিবারের প্রধানদের ধনসম্পদে অসাম্যের ফলে তখনও যে পুরান সাম্যতান্ত্রিক গৃহস্থালী গোষ্ঠীগুলি টিকে ছিল তারা ভেঙ্গে পড়ল; এবং এতে গোষ্ঠীর জন্য জমির যৌথ চাষ বন্ধ হয়ে গেল। কর্ষিত জমি বিভিন্ন পরিবারে ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট হল, প্রথমে সাময়িকভাবে এবং পরে চিরস্থায়ীভাবে; পরিপূর্ণ ব্যক্তিগত মালিকানায় উত্তরণ ঘটে ক্রমে ক্রমে এবং জোড়বাঁধা পরিবার থেকে একপতিপত্নীত্বে উত্তরণের সমান্তরালে। এক একটি পরিবারই সমাজের অর্থনৈতিক একক হয়ে উঠতে লাগল।

জনসংখ্যার ঘনত্ব বাড়ার জন্য ভিতরে ও বাহিরে নিবিড়তর ঐক্যের প্রয়োজন হল। সর্বত্রই প্রয়োজনীয় হয়ে উঠল আত্মীয় উপজাতিগুলির সমামেল এবং তার কিছু পরেই তাদের মিশ্রণ আর তাতে করে একটি জনসম্প্রদায়ের একক ভূখণ্ডে বিভিন্ন উপজাতির পৃথক পৃথক ভূখণ্ডের মিলন। জনগণের সামরিক নেতা — rex, basileus, thiudans হলেন এক প্রয়োজনীয় ও স্থায়ী পদাধিকারী। জনগণের সভা যেখানে ছিল না সেখানে তা প্রতিষ্ঠিত হল। সামরিক নেতা, পরিষদ এবং জনসভা — এরাই হল গোত্র-প্রথা থেকে বিকশিত সামরিক গণতন্ত্রের সংস্থা। সামরিক গণতন্ত্র এইজন্য যে, এখন জনগণের জীবনে যুদ্ধ ও যুদ্ধের সংগঠন নিয়মিত ব্যাপার হয়ে উঠেছিল। প্রতিবেশীর ধনসম্পত্তি দেখে অপরাপর জনসম্প্রদায়ের লোভ হত, এরা ধন সংগ্রহকেই জীবনের অন্যতম মূল

লক্ষ্য বলে ভাবতে শুরু করল। এরা ছিল বর্বর: উৎপাদনমূলক কাজকর্মের চেয়ে লুণ্ঠনই এদের কাছে সহজ, এমনকি অধিকতর সম্মানজনক মনে হল। একদা যুদ্ধ করা হত শুধু আক্রমণের প্রতিশোধে অথবা নিজেদের ভূখণ্ড ছোট হলে তাকে বাড়াবার জন্য; এখন শুধু লুঠের জন্য যুদ্ধ চালান হল এবং এটি একটি নিয়মিত পেশা হয়ে উঠল। নতুন সংরক্ষিত নগরের চারপাশে দুর্ভেদ্য দেওয়াল অকারণে তোলান হয়নি: তাদের প্রসারিত পরিখাগুলি হল গোত্র-প্রথার কবর এবং তাদের মিনারগুলি ইতিমধ্যেই সভ্যতা স্পর্শ করেছিল। সমাজের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারেও অনুরূপ পরিবর্তন হল। লুণ্ঠনমূলক যুদ্ধগুলি সর্বপ্রধান সামরিক অধিনায়ক ও উপনায়কদের ক্ষমতা বাড়িয়ে তুলল। একই পরিবার থেকে পদাধিকারী নির্বাচনের প্রথা ক্রমে ক্রমে, বিশেষতঃ পিতৃ-অধিকার প্রতিষ্ঠার পরে, উত্তরাধিকারে পরিণত হল, প্রথমে এটিকে সহ্য করা হত, পরে এটি দাবি হয়ে উঠল এবং সর্বশেষে জোর করে দখল করা হল; বংশানুক্রমিক রাজত্ব ও আভিজাত্যের ভিত্তি স্থাপিত হল। এইভাবে গোত্র, ফ্রাত্রী ও উপজাতির মধ্যে, জনগণের মধ্যে তাদের যে শিকড় ছিল সেখান থেকে গোত্র-প্রথার বিভিন্ন সংস্থার মূলোচ্ছেদ করা হল এবং সমগ্র গোত্র-প্রথা পরিণত হল তার বিপরীতে: উপজাতিগুলির নিজেদের কাজকর্ম স্বাধীনভাবে পরিচালনার সংগঠন থেকে এটি হয়ে উঠল প্রতিবেশীদের লুণ্ঠন ও পীড়নের সংগঠন; এবং সেই সঙ্গে এর বিভিন্ন সংস্থাগুলি জনগণের অভিপ্রায়ের হাতিয়ার থেকে হয়ে উঠল স্বীয় জনগণের উপরেই শাসন ও পীড়নের স্বতন্ত্র সংস্থা। এটি হতে পারত না যদি ধন-লালসা গোত্রের সভ্যদের ধনী ও দরিদ্রে বিভক্ত না করত; যদি 'গোত্রের মধ্যে সম্পত্তিভেদের ফলে গোত্র-সভ্যদের স্বার্থের ঐক্য না পরিণত হত তার বিরোধে' (মার্কস) এবং যদি না দাসপ্রথার বিকাশ ইতিমধ্যেই জীবিকার জন্য পরিশ্রম করাকে দাসোচিত এবং লুণ্ঠনের চেয়ে অনেক বেশী অসম্মানজনক বলে চিহ্নিত না করত।

* * *

এখন আমরা সভ্যতার দোরগোড়ায় পৌঁছে গেছি। শ্রমবিভাগের আরও উন্নতি দিয়ে এই পর্বের সূচনা হয়। নিম্নতন স্তরে মানুষ নিজের প্রত্যক্ষ প্রয়োজন পূরণের জন্য উৎপাদন করত; বিনিময় সীমাবদ্ধ ছিল সেইসব আপতিক ক্ষেত্রে যেখানে আকস্মিকভাবে কোনো কিছু উদ্বৃত্ত হত। বর্বরতার মধ্যবর্তী স্তরে পশুপালক জাতিগুলির মধ্যে আমরা দেখি যে, গবাদি পশুগুলির মধ্যে এমন একধরনের সম্পত্তি পাওয়া গেছে যাতে পশুযূথ যথেষ্ট বড় হলে নিয়মিতভাবে নিজেদের প্রয়োজন পূরণ হয়ে উদ্বৃত্ত থাকে; পশুপালক জাতিগুলি এবং পশুসম্পদহীন অনুন্নত উপজাতিগুলির মধ্যে একটি শ্রমবিভাগও আমরা দেখি; এতে পাশাপাশি দুটি বিভিন্ন স্তরের উৎপাদন

চলে এবং তাই নিয়মিত বিনিময়ের মতো অবস্থা সৃষ্টি হয়। বর্বরতার উচ্চতন স্তরে আরও একটি শ্রমবিভাগ এল, কৃষি ও হস্তশিল্পের শ্রমবিভাগ এবং এর ফলে ক্রমাগত বর্ধমান পরিমাণে পণ্য উৎপন্ন হতে থাকল বিশেষ করে বিনিময়ের জন্য এবং এতে করে বিভিন্ন উৎপাদকদের মধ্যে বিনিময় এমন এক পর্যায়ে পৌঁছাল যাতে এটি হয়ে দাঁড়াল সমাজজীবনের পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয়। সভ্যতা এইসব পূর্ব প্রতিষ্ঠিত শ্রমবিভাগকে শক্তিশালী করল ও তাকে বাড়িয়ে তুলল, বিশেষতঃ গ্রাম ও নগরের বৈপরিত্য বাড়িয়ে (হয় নগর গ্রামের উপর অর্থনৈতিক আধিপত্য খাটাত, যেমন প্রাচীন যুগে, অথবা গ্রাম নগরের উপর আধিপত্য করত, যেমন মধ্য যুগে) এবং তৃতীয় একটি শ্রমবিভাগ যোগ করল, যেটি তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য এবং চূড়ান্ত গুরুত্বপূর্ণ: সভ্যতা এমন একটা শ্রেণী সৃষ্টি করল যারা উৎপাদনে কোনও অংশ নিত না, শুধু পণ্যের বিনিময়ে ব্যাপৃত থাকত — **বণিকশ্রেণী**। পূর্বে শ্রেণী সৃষ্টির সমস্ত প্রবণতা একান্তই উৎপাদনের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল। উৎপাদনে নিযুক্ত লোকেরা এতে পরিচালক ও কর্মীতে অথবা বৃহৎ হারে উৎপাদক ও ছোট হারে উৎপাদকে বিভক্ত হয়। এই প্রথম এমন একটি শ্রেণী দেখা দিল যারা উৎপাদনে কোন অংশ না নিয়েও গোটা উৎপাদনের পরিচালনা ভার দখল করল এবং অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সমস্ত উৎপাদকদের স্বীয় শাসনের অধীনে আনল; এই শ্রেণী দুই দল উৎপাদকদের প্রত্যেকের পক্ষে অপরিহার্য মধ্যবর্তী হয়ে উঠল এবং উভয়কেই শোষণ করতে থাকল। বিনিময় করবার কষ্ট ও ঝুঁকি থেকে উৎপাদকদের বাঁচাবার, তাদের পণ্যের দূর দূরান্তের বাজার খুঁজে দেবার এবং এইভাবে সমাজের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় শ্রেণী হয়ে ওঠার অজুহাতে দেখা দিল পরগাছাদের এক শ্রেণী, খাঁটি সামাজিক পরাশ্রিত এক শ্রেণী যারা নিজেদের আসলে অতি তুচ্ছ কাজের পুরস্কার হিসাবে দেশের ও বিদেশের উৎপাদনের সার অংশটুকু দখল করত; দ্রুত জমিয়ে তুলত প্রভূত ধনসম্পত্তি এবং সেই অনুপাতে সামাজিক প্রভাব প্রতিপত্তি; এবং শুধু এই কারণেই সভ্যতার যুগে তাদের ভাগ্যে নতুন নতুন সম্মান এবং উৎপাদনের উপর ক্রমবর্ধমান প্রতিপত্তি দেখা দিতে বাধ্য, যতদিন না পর্যন্ত তারা নিজেরাই অবশেষে গড়ছে তাদের এক স্বকীয় সৃষ্টি — পর্যায়িক বাণিজ্য সংকট।

বিকাশের যে স্তরের কথা আমরা আলোচনা করছি, তখন তরুণ বণিকশ্রেণীর ধারণাও ছিল না ভবিষ্যতে কী বৃহৎ ব্যাপার আছে তাদের ভাগ্যে। কিন্তু এই শ্রেণী অবয়ব নিল, নিজেদের অপরিহার্য করে তুলল এবং এইটাই যথেষ্ট। তারই সঙ্গে কিন্তু **ধাতুর মুদ্রা**, টাঁকশালে তৈরী মুদ্রার প্রচলন হল এবং এর ফলে যারা উৎপাদন করে না, তাদের হাতে এমন একটি হাতিয়ার এল যার সাহায্যে তারা উৎপাদক এবং তার উৎপাদনের উপর আধিপত্য করতে পারল। সমস্ত পণ্যের সেরা পণ্য, যার মধ্যে অন্য সব পণ্যই লুকান আছে, তার আবিষ্কার হল; আবিষ্কৃত হল সেই যাদু যা ইচ্ছা মাত্র বাঞ্ছনীয় বা বাঞ্ছিত

যে কোনো বস্তুতেই পরিণত হতে পারে। যার হাতে এই জিনিস আছে, সেই উৎপাদনের জগতে আধিপত্য করে, এবং কার হাতে এই অর্থ সবচেয়ে বেশী? বণিকের। তার হাতেই মুদ্রা-পূজো নিরাপদ। সে এইটি বেশ করে বুঝিয়ে দিতে চাইল যে, সমস্ত পণ্য এবং সুতরাং সকল পণ্য-উৎপাদক অর্থের সামনে ধুলায় গড়াগড়ি দিতে বাধ্য। সে কার্যক্ষেত্রে প্রমাণ করল যে, অন্য সব রকমের ধনসম্পদ হচ্ছে সম্পদের এই মূর্তিমান রূপের কাছে ছায়া মাত্র। অর্থের ক্ষমতা তার এই প্রথম যৌবনে যতখানি স্থূল ও হিংস্রভাবে প্রকট হয়, তেমন আর কখনও হয়নি। অর্থের বিনিময়ে পণ্যবিক্রয়ের পরে এল আর্থিক ঋণ দেওয়া এবং তার আনুষঙ্গিক সুদ ও মহাজনি। এবং আর কোথাও পরবর্তী কালের আইনবিধি দেনদারকে সুদখোর মহাজনের পায়ের তলায় এত নির্মম ও অসহায়ভাবে ফেলে দেয়নি যেমন প্রাচীন এথেন্স ও রোমে দিয়েছিল — এই দু-জায়গায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাধারণ আইন হিসাবেই এই বিধান দেখা দেয় এবং তার পিছনে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক বাধ্যবাধকতা ছাড়া আর কোন চাপ ছিল না।

পণ্য ও ক্রীতদাসের সম্পদ ছাড়োও, মুদ্রা সম্পদ ছাড়াও জমিরূপী সম্পদ দেখা দিল। যে খণ্ড খণ্ড জমি গোত্র বা উপজাতি আদিতে বিভিন্ন ব্যক্তির জন্য বরাদ্দ করেছিল, সেগুলির উপর ব্যক্তির স্বত্ব এত সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় যে, এই খণ্ড খণ্ড জমি হল তাদের বংশগত সম্পত্তি। ঠিক এই সময়টির আগে মানুষ সবচেয়ে বেশি যা চেষ্টা করে এসেছে তা হচ্ছে তাদের এই খণ্ড খণ্ড জমিগুলির উপর গোত্র-গোষ্ঠীর দাবি থেকে মুক্তি, যে দাবিটি তাদের একটি প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তারা এই বন্ধন থেকে মুক্তি পেল, কিন্তু তার অল্পকাল পরে তাদের নূতন ভূসম্পত্তি থেকেও মুক্তি পেল। জমির উপর পূর্ণ ও স্বাধীন মালিকানা মানে শুধুই অবাধ ও অবিচ্ছিন্ন ভোগদখলের নয়, পরন্তু ঐ-জমি হস্তান্তরের সম্ভাবনাও থাকছে। যতদিন জমি গোত্রের সম্পত্তি ছিল, ততদিন এ সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু যখন জমির নতুন মালিক গোত্র ও উপজাতির সার্বভৌম স্বত্বের বন্ধন ছিঁড়ে ফেলল, তখনই যে বন্ধন তাকে অচ্ছেদ্যভাবে জমির সঙ্গে বেঁধে রেখেছিল তাও ছিঁড়ে গেল। জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানা উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গেই অর্থেরও যুগপৎ আবিষ্কার হয়েছিল, সেই অর্থই এই জিনিসের তাৎপর্য স্পষ্ট করে দিল। জমি এখন একটি পণ্য হয়ে উঠতে পারল যা বিক্রয় করা ও বন্ধক দেওয়া চলে। জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানা দেখা দিতে-না-দিতে বন্ধক দেওয়া আবিষ্কার হয় (এথেন্সের দৃষ্টান্ত দেখুন)। একপতিপত্নীত্বের পিছু পিছু যেমন হেটায়ারিজম ও ব্যভিচারবৃত্তি এসেছে, তেমনি জমির মালিকানার সঙ্গে এখন থেকে বন্ধকী প্রথা সেঁটে বসল। জমির স্বাধীন, পূর্ণ ও হস্তান্তরযোগ্য মালিকানার জন্য চিৎকার করেছিলে তাই পেলে — 'তুমি এই চেয়েছিলে জর্জেস্ ডাণ্ডিন্!'*

* এই উক্তিটি মলিয়ার রচিত 'জর্জেস্ ডাণ্ডিন্' কমেডি থেকে নেওয়া হয়েছে। — সম্পাঃ

বাণিজ্যের প্রসার, অর্থ, আর্থিক তেজারতি প্রথা, ভূসম্পত্তি এবং বন্ধকী প্রথার সঙ্গে সঙ্গে একদিকে চলল মুষ্টিমেয় একটি শ্রেণীর হাতে ধনসম্পত্তির দ্রুত সঞ্চয় ও কেন্দ্রীকরণ এবং অপরদিকে এল জনগণের ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য ও ক্রমবর্ধমান সংখ্যার নিঃস্বতা। অর্থশালী এই নতুন অভিজাতরা যেখানে শুরু থেকেই উপজাতির পুরাতন অভিজাতদের সঙ্গে অভিন্ন ছিল না সেখানেই তারা এই শেষোক্তদের চিরকালের জন্য পেছনে হঠিয়ে দিয়েছে (এথেন্সে, রোমে, জার্মানদের মধ্যে)। এবং ধন অনুযায়ী স্বাধীন নাগরিকদের বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভাগের সঙ্গেই বিশেষতঃ গ্রীসে ক্রীতদাসের সংখ্যা* বিরাটভাবে বাড়ল, এদেরই বাধ্যতামূলক পরিশ্রমের ভিত্তির উপর গড়ে উঠেছিল সমগ্র সমাজের উপরিকাঠামো।

এখন দেখা যাক এই সমাজবিপ্লবের ফলে গোত্র-প্রথায় কী হল। এই প্রথার সাহায্য ছাড়াই যে নতুন উপাদানগুলি দেখা দিয়েছিল, তাদের সামনে এ প্রথা অক্ষম হয়ে পড়ে। এ প্রথা নির্ভর করত এই শর্তের উপর যে, গোত্র অথবা উপজাতির লোকেরা একই ভূখণ্ডে একত্র বসবাস করবে এবং তারাই হবে সেখানকার একমাত্র অধিবাসী। এই অবস্থা বহুকাল আগে চলে যায়। গোত্র উপজাতি সর্বত্রই একে অপরের সঙ্গে মিলেমিশে গিয়েছিল; স্বাধীন নাগরিকদের মধ্যে সর্বত্রই বাস করত ক্রীতদাস, পরাশ্রিত এবং বিদেশীরা। বর্বরতার মধ্যবর্তী স্তরের একেবারে শেষ দিকেই যে স্থানভিত্তিক বসত গড়ে উঠেছিল বারবার তা ব্যাহত হয় গতিশীলতা বা বাসভূমির পরিবর্তনে, যা ঘটত ব্যবসা-বাণিজ্য, পেশা বদল ও জমি হস্তান্তরের কারণে। গোত্র-সংগঠনের লোকেরা নিজেদের সাধারণ ব্যাপারে আর একত্রে বসতেও পারত না; কেবল অপেক্ষাকৃত নগণ্য বিষয়গুলি যথা ধর্মোৎসব এখনও পালিত হত, তাও যেমন-তেমনভাবে। গোত্রের বিভিন্ন সংস্থা যে সব প্রয়োজন ও স্বার্থ দেখবার জন্য নিযুক্ত হয়েছিল এবং দেখবার যোগ্যও ছিল, এখন জীবিকা অর্জনের অবস্থায় বিপ্লব আসায় এবং তজ্জনিত সমাজের কাঠামোয় পরিবর্তন হওয়ায় নতুন সব প্রয়োজন ও স্বার্থ দেখা দিল। এইসব নতুন প্রয়োজন ও স্বার্থ পুরাতন গোত্র-প্রথার কাছে শুধু অজানাই নয়, পরন্তু এরা সর্বতোভাবে তার বিরোধী। শ্রমবিভাগের ফলে উদ্ভূত বিভিন্ন দলের হস্তশিল্পীদের স্বার্থ এবং গ্রামের বিপরীতে নগরগুলির বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনের জন্য নতুন নতুন সংস্থা দরকার হল; কিন্তু এই প্রতিটি দলের মধ্যেই ছিল ভিন্ন ভিন্ন গোত্র, ফ্রাত্রী ও উপজাতির লোক, এমনকি তাদের মধ্যে বিদেশীও থাকত। এইজন্য

* এথেন্সে ক্রীতদাসদের সংখ্যা এই পুস্তকে ১১৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য। করিন্থে ঐ নগরীর সর্বাধিক প্রতিপত্তির সময় ক্রীতদাসদের সংখ্যা ছিল ৪,৬০,০০০-এর মতো, এবং এজিনাতে ৪,৭০,০০০-এর মতো; উভয় ক্ষেত্রেই স্বাধীন বার্গারদের সংখ্যার দশগুণ। (এঙ্গেলসের টীকা।) এঙ্গেলস পৃষ্ঠা উল্লেখ করেছেন চতুর্থ সংস্করণ অনুযায়ী। বর্তমান পুস্তকে ২৭০ পৃঃ দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

নতুন সংস্থাগুলি অপরিহার্যভাবে গড়ে ওঠে গোত্র-সংবিধানের বাইরেই, তার সঙ্গে সমান্তরালে, আবার এর বিরুদ্ধেও। অপরপক্ষে, একই গোত্র ও উপজাতির মধ্যে ধনী ও দরিদ্র, মহাজন ও দেনদার থাকায় প্রত্যেকটি গোত্র-সংগঠনের মধ্যে এই স্বার্থের বিরোধ প্রকট হয় এবং চরমে ওঠে। এদিকে সেখানে এসেছিল নতুন বাসিন্দারা, যারা গোত্র-সংগঠনের বাইরের লোক এবং রোমের মতো ক্ষেত্রে তারা দেশের একটি বিশিষ্ট শক্তি হতে পারত, তাছাড়া সংখ্যায় তারা এত বেশী ছিল যে, রক্তসম্পর্কযুক্ত গোত্র ও উপজাতির মধ্যে তাদের ক্রমে ক্রমে মিশে যাওয়াও সম্ভব ছিল না। এদের কাছে গোত্র-সংগঠনগুলি ছিল এক রুদ্ধদ্বার সুবিধাভোগী সংস্থা; সূচনায় যা ছিল স্বভাবসিদ্ধ গণতন্ত্র তাই এখন একটি ঘৃণিত আভিজাত্যে পরিণত হল। সর্বশেষে, গোত্র-প্রথা এমন একটি সমাজ থেকে উদ্ভূত হয়েছিল যেখানে কোন আভ্যন্তরীণ বিরোধ ছিল না, এবং এই প্রথা কেবলমাত্র এইরূপ সমাজেরই উপযোগী ছিল। জনমত ছাড়া এর আর কোনো জবরদস্তি শক্তি ছিল না। কিন্তু এখন এমন একটি সমাজ দেখা দিল যেখানে জীবনযাত্রার সমস্ত অর্থনৈতিক অবস্থার ফলে সমাজদেহকে বিভক্ত হতে হল স্বাধীন নাগরিক এবং ক্রীতদাসে, ধনী শোষক এবং শোষিত দরিদ্রে; এই সমাজ শুধু এই বিরোধগুলির সমাধানে অক্ষমই ছিল না, পরন্তু এগুলোকে বাড়াতে বাড়াতে চরম পর্যায়ে ঠেলে নিয়েও যাবে। এমন একটি সমাজ টিকে থাকতে পারে কেবল হয় এইসব শ্রেণীগুলির মধ্যে নিরন্তর প্রকাশ্য সংগ্রামের পরিস্থিতিতে অথবা তৃতীয় একটি শক্তির শাসনাধীনে, যে শক্তি বাহ্যতঃ পরস্পর সংগ্রামশীল শ্রেণীগুলির ঊর্ধ্বে থেকে তাদের প্রকাশ্য সংগ্রাম দমন করবে এবং বড়জোর অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, তথাকথিত আইনসম্মত রূপে একটা শ্রেণী-সংগ্রাম চলতে দেবে। গোত্র-প্রথার উপযোগিতা ফুরিয়ে গিয়েছিল। শ্রমবিভাগ এবং তার পরিণাম — সমাজের শ্রেণী-বিভাগ একে ধ্বংস করল। এর জায়গায় এল **রাষ্ট্র**।

* * *

উপরে আমরা গোত্র-প্রথার ধ্বংসস্তূপের উপরে যে তিনটি মূল ধরনের রাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল, পৃথকভাবে তার আলোচনা করেছি। এথেন্সেই সবচেয়ে বিশুদ্ধ, সবচেয়ে চিরায়ত রূপটি দেখা যায়: এখানে গোত্রভিত্তিক সমাজের মধ্যেই যে শ্রেণী-বিরোধিতা দেখা দিয়েছিল তার থেকেই সরাসরিভাবে ও প্রধানতঃ রাষ্ট্রের উদ্ভব হল। রোমে গোত্রভিত্তিক সমাজ হয়ে উঠল একটি রুদ্ধদ্বার আভিজাত্য, যার চারদিকে ছিল বিরাট সংখ্যক প্লেব, যারা এই সমাজের বাইরে এবং যাদের কোন অধিকার ছিল না, কিন্তু শুধুমাত্র কর্তব্য ছিল। প্লেবদের জয়লাভের ফলে পুরাতন গোত্র-প্রথা ভেঙ্গে পড়ল এবং তার ধ্বংসস্তূপের উপর রাষ্ট্র গড়ে উঠল, তাতে গোত্রের আভিজাত্য এবং প্লেব উভয়েই অচিরে সম্পূর্ণভাবে মিলে গেল। সর্বশেষে, রোমক সাম্রাজ্যের জার্মান বিজেতাদের

মধ্যে বৃহৎ বৃহৎ বিদেশী ভূখন্ড জয়ের প্রত্যক্ষ ফল হিসাবে রাষ্ট্রের উদ্ভব হল, এ ভূখন্ডগুলিকে শাসন করার কোনো উপায় গোত্র-প্রথার ছিল না। যেহেতু এই জয়লাভের জন্য পুরাতন জনসংখ্যার সঙ্গে তেমন কোন গুরুতর সংগ্রাম করতে হয়নি অথবা এতে উন্নততর কোন শ্রমবিভাগ প্রয়োজন হয়নি এবং যেহেতু বিজিত ও বিজেতারা অর্থনৈতিক বিকাশের প্রায় একই স্তরে ছিল এবং তার ফলে সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তিও আগেকার মতোই থাকল, সেইজন্য বহু শতাব্দী ধরে গোত্র-প্রথা এখানে বেঁচে থাকতে পেয়েছিল একটা পরিবর্তিত আঞ্চলিক রূপে, মার্ক ব্যবস্থায়, এমনকি পরবর্তী কালের অভিজাত ও প্যাট্রিশিয়ান পরিবারগুলির মধ্যে এবং এমনকি কৃষক পরিবারগুলির মধ্যে, যেমন দিতমার্শেনে, কিছু কালের জন্য দুর্বলভাবে এর পুনরুজ্জীবনও হয়।*

অতএব রাষ্ট্র কোনক্রমেই সমাজের উপর বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া একটি শক্তি নয়; যেমন একে বলা যায় না 'নৈতিক ধারণার বাস্তবরূপ' অথবা 'যুক্তির প্রতিমূর্তি ও বাস্তবতা' যেমনটি হেগেল দাবী করেছেন। পরন্তু এটি বিকাশের একটি বিশেষ স্তরে সমাজ থেকেই উদ্ভূত; সমাজ যে নিজের ভিতরকার সমাধানহীন বিরোধগুলির মধ্যে একেবারে জড়িয়ে পড়েছে, এমন অনপনেয় দ্বন্দ্বে সে বিভক্ত যার নিরাকরণ করতে সে অক্ষম, এটি তারই স্বীকৃতি। কিন্তু যাতে এইসব বিরোধ, বিরোধী অর্থনৈতিক স্বার্থসম্বলিত শ্রেণীগুলি নিজেদের এবং সমাজকেও নিষ্ফল সংগ্রামের মধ্যে ধ্বংস করে না ফেলে তাই দরকার হল এমন একটি শক্তি যা আপাতদৃষ্টিতে সমাজের ঊর্ধ্বে থেকে এই সংগ্রামকে সংযত করবে, একে 'শৃঙ্খলার' চৌহদ্দির মধ্যে রাখবে। এবং এই যে শক্তি সমাজ থেকে উদ্ভূত হয়ে তার ঊর্ধ্বে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে এবং ক্রমাগত সমাজ থেকে পৃথক হতে থাকে, এই শক্তি হল রাষ্ট্র।

পুরাতন গোত্র-সংগঠনের বিপরীতে রাষ্ট্র, প্রথমত, প্রজাদের **আঞ্চলিক ভিত্তিতে ভাগ করে।** আমরা আগে দেখেছি যে, রক্তসম্পর্কের উপরে প্রতিষ্ঠিত এবং সংহত পুরাতন রক্তভিত্তিক সমামেল অনুপযোগী হয়ে পড়েছিল প্রধানতঃ এই জন্যে যে, তারা ধরে নিত যে, তাদের সভ্যেরা একটি বিশেষ ভূখন্ডের সঙ্গে বাঁধা, যে বন্ধন বহুদিন আগেই লুপ্ত হয়ে যায়। ভূখন্ড রইল, কিন্তু জনগণ সচল হয়ে উঠল। তাই আঞ্চলিক ভিত্তিতে বিভাগ থেকেই শুরু করা হল এবং নাগরিকরা যেখানেই বসবাস করুক না কেন, তাদের সামাজিক অধিকার ও কর্তব্য, গোত্র অথবা উপজাতি নির্বিশেষে, সেখানেই পালন করতে পারল। এইভাবে আঞ্চলিক ভিত্তিতে নাগরিকদের সংগঠনই সমস্ত রাষ্ট্রের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য। এইজন্যই এটি আমাদের কাছে স্বাভাবিক মনে হয়; কিন্তু

* গোত্রের প্রকৃতি সম্পর্কে প্রথম যে ঐতিহাসিকের অন্ততঃ কিছুটা কাছাকাছি ধারণা ছিল তিনি হচ্ছেন নিয়েবুর; এবং সেটা দিতমার্শেনের গোত্র-গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে তাঁর পরিচয়ের কল্যাণে — অবশ্য তাঁর ভ্রান্তিগুলির জন্যও তিনি সে পরিচয়ের কাছে দায়ী। (এঙ্গেলসের টীকা।)

আমরা দেখেছি যে, কত দীর্ঘ ও তিক্ত সংগ্রামের পরে এথেন্স ও রোমে এই জিনিসটা পুরাতন গোত্রভিত্তিক সংগঠনের জায়গা নিতে পেরেছিল।

দ্বিতীয়ত, একটি **পাবলিক ক্ষমতার** প্রতিষ্ঠা যা আর সশস্ত্র বাহিনী রূপে সংগঠিত জাতির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে মিলছে না। এই বিশেষ পাবলিক ক্ষমতা প্রয়োজনীয় ছিল, কারণ সমগ্র জনসংখ্যাকে নিয়ে একটি স্বয়ংচালিত অস্ত্রসজ্জিত সংগঠন শ্রেণী-বিভাগের সময় থেকে আর সম্ভব ছিল না। জনসংখ্যার মধ্যে ক্রীতদাসরাও ছিল; এথেন্সের ৯০,০০০ নাগরিক ৩,৬৫,০০০ ক্রীতদাসের বিরুদ্ধে ছিল একটি সুবিধাভোগী শ্রেণী। এথেনীয় গণতন্ত্রের গণফৌজ ছিল ক্রীতদাসদের বিরুদ্ধে অভিজাতদের এক পাবলিক ক্ষমতা যা দাসদের সংযত রাখত; কিন্তু নাগরিকদের সংযত রাখার জন্য একটি পুলিশ বাহিনীরও প্রয়োজন ছিল, এ কথা আমরা আগেই বলেছি। প্রত্যেক রাষ্ট্রেই থাকে এই পাবলিক ক্ষমতা; এতে শুধুমাত্র অস্ত্রধারী লোক থাকে না, আরও থাকে নানা বৈষয়িক লেজুড়, জেলখানা ও বিভিন্ন রকমের বাধ্যতার প্রতিষ্ঠানসমূহ, — এইসবের কিছুই গোত্রভিত্তিক সমাজে ছিল না। যেসব সমাজে শ্রেণী-বিরোধ তখনো অপরিণত, সেখানে এবং একটেরে কোন কোন এলাকায়, যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে কোনো কোনো সময়ে ও কোনো কোনো জায়গায়, এই পাবলিক ক্ষমতা অতি নগণ্য প্রায় অলক্ষ্য হতে পারে। যতই রাষ্ট্রের মধ্যে শ্রেণী-বিরোধ তীব্রতর হতে থাকে এবং যতই প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির আয়তন ও জনসংখ্যা বাড়তে থাকে, ততই এর শক্তি বাড়ে। শুধুমাত্র বর্তমানের ইউরোপের দিকে তাকালেই তা দেখা যায়, এখানে শ্রেণী-বিরোধ এবং দেশজয়ের প্রতিযোগিতা পাবলিক ক্ষমতাকে এত বাড়িয়ে তুলেছে যে ভয় হয় এটি এখন সমগ্র সমাজ, এমনকি রাষ্ট্রকেও গ্রাস করবে।

এই পাবলিক ক্ষমতা বাঁচিয়ে রাখবার জন্য দরকার নাগরিকদের কাছ থেকে চাঁদা - **ট্যাক্স**। গোত্র-সমাজে এইসব ব্যাপার একেবারে অজানা; কিন্তু আজকের দিনে আমরা এর অস্তিত্ব হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে শুধু ট্যাক্সে আর কুলায় না; রাষ্ট্র তখন ভবিষ্যৎ হুন্ডি দেয়, ঋণ করে, **রাষ্ট্রীয় ঋণ**। পুরাতন ইউরোপও এই সম্পর্কে অনেক কিছু সাক্ষ্য দিতে পারে।

পাবলিক ক্ষমতা ও ট্যাক্স ধার্য করবার অধিকারের বলে এখন রাজপুরুষেরা সমাজের সংস্থা হিসাবে সমাজের **ঊর্ধ্বে** ওঠে। গোত্র-প্রথার বিভিন্ন সংস্থা যে স্বাধীন ও স্বতঃপ্রবৃত্ত শ্রদ্ধা পেত, এরা তা যদি বা পেত তবুও তাতে আর সন্তুষ্ট থাকত না; তারা এমন একটি ক্ষমতার বাহন যা ক্রমেই সমাজের কাছে বিজাতীয় হতে থাকে এবং তাই তাদের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাবার জন্য বিশেষ বিশেষ আইনের সাহায্য নিতে হয়, যেগুলির জোরে তারা বিশেষ পবিত্রতা ও অলঙ্ঘনীয়তা ভোগ করে। সভ্য রাষ্ট্রের সবচেয়ে আনাড়ী পুলিশ কর্মচারীরও 'কর্তৃত্ব' হচ্ছে গোত্র-সংগঠনের সমস্ত সংস্থার

চেয়ে বেশী; কিন্তু সভ্যতার যুগে সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাসম্পন্ন রাজা এবং শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রনায়ক অথবা সেনাপতিও বেশ ঈর্ষা করবেন তুচ্ছাতিতুচ্ছ এক গোত্র-প্রধানকে যিনি কোন পীড়ন না করে অবিসংবাদিত শ্রদ্ধা পেতেন। শেষের জন সমাজের মাঝখানে প্রতিষ্ঠিত অথচ অন্যজন সমাজের বাইরে ও তার ঊর্ধ্বে কিছু একটার প্রতিনিধিত্ব করার চেষ্টা করতে বাধ্য।

যেহেতু রাষ্ট্রের আবির্ভাব শ্রেণী-বিরোধকে সংযত করবার প্রয়োজন থেকে, সেই সঙ্গে তার উদ্ভব হয় শ্রেণী-বিরোধের মধ্যেই, সেজন্য রাষ্ট্র হল সাধারণতঃ সবচেয়ে শক্তিশালী ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে প্রভুত্বকারী শ্রেণীর রাষ্ট্র, এই শ্রেণী রাষ্ট্রের মাধ্যমে রাজনীতির ক্ষেত্রেও আধিপত্যকারী শ্রেণী হয়ে ওঠে এবং তার ফলে নিপীড়িত শ্রেণীর দমন এবং তার শোষণে নতুন হাতিয়ার লাভ করে। এইভাবে প্রাচীন যুগে রাষ্ট্র ছিল সর্বোপরি ক্রীতদাসের দমনের জন্য দাসমালিকদের রাষ্ট্র, যেমন সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্র ছিল ভূমিদাস কৃষকদের বশে রাখার জন্য অভিজাতদের সংস্থা এবং আধুনিক প্রতিনিধিত্বমূলক রাষ্ট্র হচ্ছে পুঁজি কর্তৃক মজুরি-শ্রম শোষণের হাতিয়ার। ব্যতিক্রম হিসাবে অবশ্য এমন কোন কোন সময় দেখা দেয় যখন যুধ্যমান শ্রেণীগুলির শক্তি প্রায় এতটা সমান সমান হয়ে পড়ে যে, রাষ্ট্রীয় শক্তি বাহ্যতঃ মধ্যস্থ হিসাবে সাময়িকভাবে উভয় থেকেই কিছুটা স্বতন্ত্রতা লাভ করে। সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতকের নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র ছিল এইরূপ, এই রাজতন্ত্র আভিজাত্য ও বার্গার শ্রেণীর মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করত; এই ছিল প্রথম ও আরো বেশি দ্বিতীয় ফরাসী সাম্রাজ্যের যুগে বোনাপার্টতন্ত্র যা বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে প্রলেতারিয়েতকে এবং প্রলেতারিয়েতের বিরুদ্ধে বুর্জোয়াকে খেলাত। এই ধরনের কেরামতির শেষ দৃষ্টান্ত হচ্ছে বিস্‌মার্কী জাতির নূতন জার্মান সাম্রাজ্য যেখানে শাসক ও শাসিত উভয়েই সমান হাস্যকর: এখানে পুঁজিপতি ও শ্রমিকদের পরস্পরের বিরুদ্ধে ভারসাম্য রক্ষা হয় এবং প্রাশিয়ার নিঃস্ব হয়ে পড়া মফস্বল য়ুংকারদের স্বার্থে সমান প্রতারিত হয় উভয়েই।

ইতিহাসের ক্ষেত্রে অধিকাংশ রাষ্ট্রেই দেখা যায় যে, নাগরিকদের অধিকার স্থির হয় ধনসম্পত্তির অনুপাতে এবং এইভাবে প্রত্যক্ষভাবে এই তথ্য প্রকাশ পায় যে, রাষ্ট্র হচ্ছে বিত্তহীন শ্রেণীদের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য বিত্তশীল শ্রেণীর একটি সংগঠন। সম্পত্তির ভিত্তিতে এথেনীয় ও রোমকদের বর্গবিভাগের ক্ষেত্রেও তাই ছিল। মধ্য যুগের সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও তাই, সেখানে রাজনৈতিক ক্ষমতার বণ্টন ছিল মালিকানাধীন জমির পরিমাণ অনুসারে। আধুনিক প্রতিনিধিত্বমূলক রাষ্ট্রের ভোটাধিকার যোগ্যতার মধ্যেও এই জিনিসটি দেখা যায়। অথচ সম্পত্তিভেদের এই রাজনৈতিক স্বীকৃতি মোটেই অবশ্য মূলকথা নয়। বরং এতে রাষ্ট্র বিকাশের একটা নিম্নস্তরই ফুটে ওঠে। রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ রূপ, গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র, আমাদের সমাজের

আধুনিক অবস্থায় যে রূপটি ক্রমেই অপরিহার্য হয়ে উঠছে এবং যে রাষ্ট্র রূপের মধ্যেই শ্রমিক শ্রেণী ও বুর্জোয়া শ্রেণীর চূড়ান্ত সংগ্রাম শেষ পর্যন্ত লড়া চলতে পারে — সেই গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে আনুষ্ঠানিকভাবে সম্পত্তিভেদের কোনো কথা নেই। ধন এখানে জোর খাটায় পরোক্ষভাবে, কিন্তু আরো নিশ্চিতভাবে: একদিকে সরকারী কর্মচারীদের সরাসরিভাবে হাত করে (যার বিশুদ্ধ দৃষ্টান্ত হচ্ছে আমেরিকা), অপরদিকে সরকার ও ফাটকা বাজারের সঙ্গে সহযোগিতা করে, যা রাষ্ট্রীয় ঋণ বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে এবং যতবেশী পরিমাণে ফাটকা বাজারকে কেন্দ্র করে যৌথ কোম্পানিগুলি নিজেদের হাতে যানবাহন ছাড়াও উৎপাদনেরই বিভিন্ন শাখা কেন্দ্রীভূত করে, ততই এটি সহজসাধ্য হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া সম্প্রতিকালের ফরাসী প্রজাতন্ত্র হচ্ছে এর জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত; এবং ভালোমানুষ সুইজারল্যান্ডেরও এই ক্ষেত্রে কিছু কৃতিত্ব আছে। কিন্তু সরকার ও ফাটকা বাজারের সঙ্গে এই সৌহার্দের জন্য গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র যে অপরিহার্য নয় তার প্রমাণ হচ্ছে ইংলন্ড ছাড়া নতুন জার্মান সাম্রাজ্য, যেখানে বলা শক্ত, সর্বজনীন ভোটাধিকারের ফলে কে বেশী বড় হল, বিসমার্ক না ব্লাইখরোদার। এবং সর্বশেষে বিত্তশীল শ্রেণী শাসন করে সরাসরি সর্বজনীন ভোটাধিকারের মাধ্যমে। যতদিন পর্যন্ত শোষিত শ্রেণী, অর্থাৎ আমাদের ক্ষেত্রে প্রলেতারিয়েত নিজের মুক্তির জন্য পরিণত না হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত এ শ্রেণীর বৃহৎসংখ্যাধিকেরা বর্তমান সমাজব্যবস্থাকেই একমাত্র সম্ভবপর ব্যবস্থা বলেই মেনে নেবে এবং রাজনীতির ক্ষেত্রে পুঁজিপতি শ্রেণীর লেজুড়, এর চরম বামপন্থী অংশ হয়ে থাকবে। কিন্তু যে পরিমাণে এই শ্রেণী নিজের মুক্তির জন্য পরিণত হতে থাকে, সেই পরিমাণেই এরা নিজেদের পার্টিতে সংঘবদ্ধ হয় এবং পুঁজিপতিদের প্রতিনিধিদের নির্বাচন না করে নিজেদের প্রতিনিধি নির্বাচন করে। সর্বজনীন ভোটাধিকার হল শ্রমিক শ্রেণীর পরিপক্কতার মাপকাঠি। বর্তমান রাষ্ট্রে এর থেকে আর বেশী কিছু তা হতে পারে না ও কদাচ হবে না, কিন্তু এইটাই যথেষ্ট। যেদিন সর্বজনীন ভোটাধিকারের থার্মোমিটারে শ্রমিকদের মধ্যে স্ফুটনাঙ্ক দেখা যাবে সেদিন পুঁজিপতিদের মতো শ্রমিক শ্রেণীরও জানা থাকবে কী করতে হবে।

অতএব অনন্তকাল থেকে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব নেই। এমন সব সমাজ ছিল যারা রাষ্ট্র ছাড়াই চলত, যাদের রাষ্ট্র অথবা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার কোনো ধারণাই ছিল না। অর্থনৈতিক বিকাশের একটা বিশেষ স্তরে যখন অনিবার্যভাবে সমাজে শ্রেণী-বিভাগ এল, তখন এই বিভাগের জন্যই রাষ্ট্র প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ল। এখন আমরা দ্রুত পায়ে উৎপাদনের বিকাশের এমন একটি স্তরে পৌঁছাচ্ছি যখন এইসব বিভিন্ন শ্রেণীর অস্তিত্ব আর শুধু যে অবশ্য প্রয়োজনীয় থাকবে না তাই নয়, পরন্তু উৎপাদনের প্রত্যক্ষ বন্ধন হয়েই উঠবে। আগেকার স্তরে যেমন অনিবার্যভাবে তাদের উদ্ভব হয়েছিল তেমনি এখন তাদের পতনও অনিবার্য। তাদের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রেরও পতন হবে। উৎপাদকদের স্বাধীন ও সমান

সম্মিলনের ভিত্তিতে যে সমাজ উৎপাদনকে সংগঠিত করবে, সে সমাজ সমগ্র রাষ্ট্র-যন্ত্রকে পাঠিয়ে দেবে তার যোগ্যস্থানে: পুরাতত্ত্বের যাদুঘরে, চরকা ও ব্রোঞ্জের কুড়ুলের পাশে।

* * *

অতএব পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে আমরা দেখতে পাই যে, সভ্যতা হচ্ছে সমাজের অগ্রগতির সেই স্তর যেখানে শ্রমবিভাগ ও তার ফলে বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে বিনিময় এবং পণ্য-উৎপাদন যা এ দুটিকে একত্র মেলায়, — এইসবের সম্পূর্ণ বিকাশ হয়ে তদানীন্তন সমগ্র সমাজে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটেছে।

পূর্ববর্তী সকল স্তরে সমাজের উৎপাদন ছিল মূলতঃ সমষ্টিগত এবং সেইমত ভোগদখলও হত সাম্যতান্ত্রিক ছোট বড় গোষ্ঠীর মধ্যে উৎপন্ন দ্রব্যাদি প্রত্যক্ষভাবে বণ্টন করে। এই সমষ্টিগত উৎপাদন অত্যন্ত সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে চলত, কিন্তু সেই সঙ্গে উৎপাদকরা তাদের উৎপাদন প্রক্রিয়া এবং উৎপন্ন বস্তুর মালিক ছিল। তারা জানত উৎপন্ন দ্রব্য কোথায় গেল, তারা নিজেরাই ভোগ করত, ঐ জিনিস তাদের হাতছাড়া হত না; এবং যতদিন উৎপাদন এই ভিত্তিতে চলে, ততদিন তা উৎপাদকদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে যেতে পারে না এবং তাদের বিরুদ্ধে কোন বিজাতীয় ভৌতিক শক্তিও দাঁড় করাতে পারে না, যা নিয়মিত এবং অনিবার্য হয়ে উঠেছে সভ্যতার যুগে।

কিন্তু ধীরে ধীরে উৎপাদনের এই প্রক্রিয়ার মধ্যে শ্রমবিভাগ ঢুকে পড়ল। এতে উৎপাদন ও দখলির সমষ্টিগত প্রকৃতি ক্ষুণ্ণ হল, এতে ব্যক্তিগত দখলই প্রাধান্য লাভ করল এবং এইভাবে বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে বিনিময়ের উদ্ভব হল, — কেমন করে হল সেটা আমরা আগে দেখেছি। ক্রমশঃ পণ্য-উৎপাদনই হয়ে পড়ে প্রধান রূপ।

পণ্য-উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে, যখন নিজেদের ভোগের জন্য নয়, পরন্তু বিনিময়ের জন্য উৎপাদন হতে থাকল, তখন উৎপন্ন দ্রব্য আবশ্যিকভাবেই এক হাত থেকে হস্তান্তরে যেত। বিনিময়ের মাধ্যমে উৎপাদক তার তৈরী জিনিস হাতছাড়া করে এবং তারপর ঐ জিনিসের কী হল তার কোন খবর রাখে না। যখনই অর্থ ও তার সঙ্গে বণিক এসে উৎপাদকদের মধ্যে মধ্যস্থের ভূমিকা নেয়, তখন থেকে বিনিময়ের প্রক্রিয়া অধিকতর জটিল হয় এবং উৎপন্ন জিনিসের শেষ ভাগ্য হয় আরও অনিশ্চিত। বণিকরা সংখ্যায় অনেক এবং তাদের কেউ জানে না অপরে কী করছে। পণ্য এখন শুধু হাত থেকে হাতেই ফেরে না, অধিকন্তু এক বাজার থেকে অন্য বাজারে যায়। উৎপাদকরা তাদের জীবনযাত্রার মোট উৎপাদনের উপর আধিপত্য হারিয়ে ফেলে এবং বণিকরা সে আধিপত্য পায় না। উৎপন্ন দ্রব্য এবং উৎপাদন হয়ে পড়ে আপতিকতার ক্রীড়নক।

কিন্তু পরস্পর-সম্পর্কের ক্ষেত্রে এক মেরু হল আপতিকতা, অপর মেরু হচ্ছে যাকে বলি আবশ্যিকতা। প্রকৃতির ক্ষেত্রে যেখানে আপতিকতার আধিপত্য মনে হয়,

সেখানে বহু আগেই প্রমাণিত হয়েছে যে, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই এই আপাতিকতার মধ্যে অন্তর্নিহিত আবশ্যিকতা ও নিয়মই প্রকাশ পাচ্ছে। প্রকৃতি সম্পর্কে যা সত্য তা সমাজ সম্পর্কেও সত্য। যতই সামাজিক একটা ক্রিয়া, সামাজিক একটা প্রক্রিয়া ধারা সচেতন মানবীয় নিয়ন্ত্রণের পক্ষে অত্যধিক শক্তিশালী হয়ে ওঠে, মানুষের নাগালের বাইরে চলে যায়, যতই মনে হয় এগুলি নিছক আপাতিকতার আওতায় চলে গিয়েছে, ততই তার বিশিষ্ট অন্তর্নিহিত নিয়মগুলি এই আপাতিকতা ভেদ করে প্রাকৃতিক আবশ্যিকতায় আত্মপ্রকাশ করে। পণ্য-উৎপাদন ও বিনিময়ের সমস্ত আপাতিকতাও নিয়ন্ত্রিত হয় এই ধরনের নিয়মে: ব্যক্তিগত উৎপাদক ও বিনিময়কারীর সামনে এই নিয়মগুলি বিজাতীয় এবং প্রথমটা অজ্ঞাত শক্তির রূপেই দেখা দেয় — এদের প্রকৃতি এখনো খুঁটিনাটি অনুসন্ধান ও অনুধাবনসাপেক্ষ। পণ্য-উৎপাদনের এই অর্থনৈতিক নিয়মগুলি এই রূপের উৎপাদনের বিভিন্ন স্তরের বিকাশ অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়, মোটের উপর কিন্তু সভ্যতার সমস্ত যুগটাই এই সব নিয়মের অধীন। আজ পর্যন্ত উৎপন্ন জিনিসই হচ্ছে উৎপাদকদের প্রভু, আজ পর্যন্ত সমাজের সমগ্র উৎপাদন সমষ্টিগতভাবে ভাবা কোন পরিকল্পনা দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয় না, তা চলে অন্ধ নিয়মে যা কাজ করে চলে স্বতঃস্ফূর্ত শক্তিতে এবং শেষ পর্যন্ত পর্যায়িক বাণিজ্য সংকটের ঝঞ্ঝার মধ্যে।

আমরা দেখেছি কী ভাবে মানুষের শ্রমশক্তি উৎপাদনের বিকাশের খুব গোড়ার দিকেই উৎপাদকের জীবনধারণের প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশী উৎপাদন করতে সক্ষম হয়ে উঠে এবং মূলতঃ বিকাশের এই স্তরটায় শ্রমবিভাগ এবং বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে বিনিময়ের আবির্ভাব হয়। অতঃপর এই মহা 'সত্য' আবিষ্কারে খুব বেশী দেরী হল না যে, মানুষও একটি পণ্য হয়ে উঠতে পারে: মানুষকে দাসে পরিণত করে মনুষ্য শক্তির বিনিময় ও ব্যবহার সম্ভব। মানুষ বিনিময় শুরু করতে না করতেই তারা নিজেরাই বিনিময়-বস্তু হয়ে গেল। সক্রিয় হল নিষ্ক্রিয়; মানুষের চাওয়া না চাওয়ার উপর এটি নির্ভর করেনি।

দাসপ্রথা, যা সভ্যতার যুগে পূর্ণ বিকাশ লাভ করে, তার সঙ্গেই সমাজে শোষক ও শোষিতের প্রথম বৃহৎ শ্রেণীভেদ আসে। এই ভেদ সভ্যতার গোটা যুগেই চলতে থাকে। দাসপ্রথাই হচ্ছে শোষণের প্রথম রূপ, যা প্রাচীন জগতের বৈশিষ্ট্য: এর পরে মধ্য যুগে এল ভূমিদাসত্ব এবং আধুনিক যুগে মজুরী-শ্রম। এরাই হচ্ছে সভ্যতার তিনটি বৃহৎ যুগের বৈশিষ্ট্যসূচক পরাধীনতার তিনটি প্রধান রূপ: প্রথমে প্রকাশ্য ও অধুনা ছদ্মবেশী দাসপ্রথা হচ্ছে এর নিত্য সঙ্গী।

পণ্য-উৎপাদনের যে স্তরে সভ্যতার সূত্রপাত, সে স্তরটির অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য হল: ১। ধাতব মুদ্রা, এবং সেইহেতু আর্থিক মূলধন, সুদ ও তেজারতির প্রবর্তন; ২। উৎপাদকদের মধ্যে মধ্যস্থ রূপে বণিকের অভ্যুদয়; ৩। জমির ব্যক্তিগত মালিকানা

এবং বন্ধক-প্রথার উদ্ভব; ৪। উৎপাদনের প্রধান রূপ হিসাবে দাস-শ্রমের প্রচলন। সভ্যতার উপযোগী ও সভ্যতার আমলেই সুনির্দিষ্টরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ওঠা পরিবার রূপ হল একপতিপত্নী প্রথা, স্ত্রীলোকের উপর পুরুষের আধিপত্য, সমাজের অর্থনৈতিক একক হিসাবে ব্যক্তিগত পরিবার। সভ্য সমাজে রাষ্ট্রই সমাজকে একত্র ধরে রাখে এবং প্রত্যেকটি বিশিষ্ট পর্বেই এ রাষ্ট্র হল একমাত্র শাসক শ্রেণীর রাষ্ট্র এবং সকল ক্ষেত্রেই এটি হল মূলতঃ শোষিত, নিপীড়িত শ্রেণীকে দমন করবার যন্ত্র। সভ্যতার অন্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, একদিকে সমাজের সমগ্র শ্রমবিভাগের ভিত্তি হিসাবে শহর ও গ্রামের বৈপরিত্য স্থায়ী করা; অপরদিকে উইলের প্রচলন যা দিয়ে সম্পত্তির মালিক তার বিষয়-আশয় এমনকি মৃত্যুর পরেও নিয়ন্ত্রিত করতে পারত। এই প্রথা পুরাতন গোত্র-প্রথার সরাসরি বিরোধী, এই প্রথা সোলনের আগে পর্যন্ত এথেন্সে অজ্ঞাত ছিল; রোমে এটি একেবারে গোড়ার দিকেই এসে যায়, কিন্তু ঠিক কোন সময়ে* এটি আসে তা আমরা জানি না। জার্মানদের মধ্যে পুরোহিতরা এই ব্যবস্থা প্রবর্তন করে এই উদ্দেশ্যে যাতে ধর্মভীরু সৎ জার্মানরা বিনা বাধায় গির্জার নামে নিজেদের সম্পত্তি দান করতে পারে।

এই সংবিধানকে ভিত্তি করে সভ্যতা যেসব কাজ করেছে, তা কোনদিন পুরাতন গোত্র-সংগঠন মোটেই সামাল দিতে পারত না। কিন্তু এটি করতে গিয়ে মানুষের সবচেয়ে ঘৃণ্য প্রবৃত্তি ও আবেগগুলিকে উদ্দীপিত করতে হয়েছে এবং মানুষের অন্যসব গুণের বদলে এইগুলিকেই বিকশিত করা হয়েছে। নগ্ন লোভই সভ্যতার সূচনার প্রথম দিন থেকে আজ পর্যন্ত তার চালন শক্তি; ধনদৌলত, আরো আরো বেশী ধনদৌলত, সমাজের নয়, এই নোংরা ব্যক্তির ধনদৌলতই হল তার একমাত্র চূড়ান্ত লক্ষ্য। যদি এই লক্ষ্য সাধন করবার পথে তার ভাগ্যে বিজ্ঞানের ক্রমবর্ধমান বিকাশ এবং পুনঃপুনঃ চারুকলার পূর্ণতম স্ফুটনের যুগ এসে থাকে তাহলে তার একমাত্র কারণ এই যে, ঐগুলি ছাড়া ধন সঞ্চয়ের আধুনিক বিরাট কৃতিত্ব অসম্ভব হত।

* লাসাল রচিত 'অর্জিত অধিকার প্রণালীর' (Das system der erworben Rechte) দ্বিতীয় খণ্ডে প্রধানতঃ এই প্রতিপাদ্য ধরা হয়েছে যে, রোমক ইচ্ছাপত্র রোমের মতোই পুরান, রোমেব ইতিহাসে কখনো 'এমন সময় ছিল না যখন ইচ্ছাপত্র ছিল না', প্রাক্ রোমক যুগে প্রেতাচার থেকেই ইচ্ছাপত্রের উদ্ভব হয়। সাবেকী ধারার গোঁড়া হেগেলবাদী হওয়ায় লাসাল রোমক সামাজিক সম্পর্ক থেকে রোমান আইনের ধারাগুলির উদ্ভব টানেননি, টেনেছেন ইচ্ছার 'কল্পনামূলক প্রত্যয়' থেকে এবং এইভাবে তিনি সম্পূর্ণ ইতিহাসবিরুদ্ধ, উপরে বর্ণিত উক্তিতে পৌঁছেছেন। যে পুস্তকেই ঐ একই কল্পনামূলক ধারণা থেকে সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে, সম্পত্তির হস্তান্তর রোমকদের উত্তরাধিকারের ব্যবস্থায় নিতান্ত একটি গৌণ ব্যাপার, সে পুস্তকের পক্ষে এটা আশ্চর্য কিছু নয়। লাসাল শুধু যে রোমের আইনজ্ঞদের, বিশেষতঃ আদি যুগের, মোহগুলি বিশ্বাস করেন তাই নয়, তাদেরও ছাড়িয়ে গেছেন। (এঙ্গেলসের টীকা।)

যেহেতু এক শ্রেণীর দ্বারা অপর শ্রেণীর শোষণ হচ্ছে সভ্যতার ভিত্তি সেইজন্য এর সমগ্র বিকাশ চলেছে অবিরাম বিরোধের মধ্যে। উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি অগ্রসর পদক্ষেপ একই সঙ্গে নিপীড়িত শ্রেণী অর্থাৎ বৃহৎ সংখ্যাধিক মানুষের অবস্থার ক্ষেত্রে পশ্চাদ্গতি। একজনের পক্ষে যা আশীর্বাদ তাই অপরের পক্ষে অনিবার্যভাবে অভিশাপ; একটি শ্রেণীর প্রত্যেকটি নূতন মুক্তির অর্থই হল সর্বদা অপর এক শ্রেণীর উপর নতুন উৎপীড়ন। এই ব্যাপারের সবচেয়ে চমকপ্রদ দৃষ্টান্ত হচ্ছে যন্ত্রপাতির প্রচলন যার ফলাফল আজ সুবিদিত। এবং বর্বরদের মধ্যে যেখানে অধিকার ও দায়িত্বের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য ছিল না, — তা আমরা দেখেছি, — সেক্ষেত্রে একটি শ্রেণীকে প্রায় সব অধিকার দিয়ে এবং অপর শ্রেণীর ঘাড়ে প্রায় সব কর্তব্য চাপিয়ে সভ্যতার যুগে এদের পার্থক্য ও বিচ্ছেদ নির্বোধ লোকের কাছেও সুস্পষ্ট করা হয়েছে।

কিন্তু এমনটি হওয়া উচিত নয়। শাসক শ্রেণীর পক্ষে যা ভাল তা সমগ্র সমাজের পক্ষেও ভাল হওয়া উচিত, কারণ শাসক শ্রেণী নিজেদের সঙ্গেই সমাজকে এক করে দেখে। অতএব সভ্যতা যত অগ্রসর হয় ততই এরা এদের অনিবার্যরূপে সৃষ্ট অন্যায়গুলিকে প্রেমের আবরণ দিয়ে ঢাকতে, বার্নিশ করতে অথবা এগুলির অস্তিত্বই অস্বীকার করতে বাধ্য হয়, — সংক্ষেপে বাধ্য হয় চলতি ভণ্ডামির প্রবর্তন করতে যা সমাজের পূর্ববর্তী স্তরগুলিতে, এমনকি সভ্যতার সূচনাতেও অজ্ঞাত ছিল আর যার চূড়ান্ত হয় নিম্নোক্ত ঘোষণায়: শোষক শ্রেণী নিপীড়িত শ্রেণীকে শোষণ করে নিতান্ত ও শুধুমাত্র শোষিত শ্রেণীরই স্বার্থে; যদি শোষিত শ্রেণী এটি বুঝতে না পারে এবং এমনকি বিদ্রোহী হয়ে ওঠে, তাহলে তাতে করে উপকারীর প্রতি অর্থাৎ শোষকদের প্রতি নিতান্ত নীচ কৃতঘ্নতাই প্রকাশ পায়।*

এবং এখন সমাপ্তি প্রসঙ্গে সভ্যতা সম্পর্কে মর্গানের রায়: 'সভ্যতার উদ্ভবের সময় থেকে সম্পত্তির অতিবৃদ্ধি এত বিপুল, এর রূপগুলি এত বিচিত্র ধরনের, এর ব্যবহার এতই প্রসারশীল এবং মালিকদের স্বার্থে এর পরিচালনা এতখানি বুদ্ধিদীপ্ত যে, জনগণের পক্ষে এটা **হয়ে উঠেছে এক অবাধ্য শক্তি। মানবচিত্ত তার নিজ সৃষ্টির সামনে বিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে।** তাহলেও এমন সময় আসবে যখন মানুষের বুদ্ধি

* প্রথমে আমি চেয়েছিলাম ফুরিয়ের রচনায় সভ্যতার যে চমৎকার সমালোচনা বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে, সেইটিকে মর্গান ও আমার সমালোচনার পাশাপাশি দেব। দুর্ভাগ্যক্রমে এই কাজ করার মতো যথেষ্ট সময় নেই। কেবল এইটুকু মাত্রই আমি মন্তব্য করতে চাই যে, ইতিপূর্বেই ফুরিয়ে একপতিপত্নীত্ব ও জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানাকে সভ্যতার মূল বৈশিষ্ট্য বলে মনে করেন এবং তাকে তিনি বলেন দরিদ্রের বিরুদ্ধে ধনীর লড়াই। তাঁর রচনায় আরও দেখি যে, তিনি ইতিমধ্যেই গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন যে, পরস্পর বিরোধী স্বার্থের দ্বন্দ্বে বিভক্ত সকল অপরিণত সমাজেই পৃথক পৃথক পরিবারগুলিই (les familles incohérentes) হচ্ছে অর্থনীতির একক। (এঙ্গেলসের টীকা।)

এই সম্পত্তির উপর আধিপত্য করবার পর্যায়ে উঠবে এবং রাষ্ট্র যে সম্পত্তি রক্ষা করছে তার সঙ্গে এ রাষ্ট্রের সম্বন্ধ নির্দিষ্ট করবে তথা মালিকদের অধিকারের সীমানাও স্থির করবে। সমাজের স্বার্থ ব্যক্তির স্বার্থের চেয়ে নিশ্চয় বড় এবং তাদের মধ্যে ন্যায়সঙ্গত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। শুধুমাত্র সম্পত্তি সন্ধানই মানুষের চরম ভবিতব্য নয়, অবশ্য যদি অতীতের মতো ভবিষ্যতেরও নিয়ম হয় প্রগতি। সভ্যতার সূত্রপাত থেকে যে সময় চলে গিয়েছে তা হচ্ছে মানুষের অতীত অস্তিত্বের একটি ভগ্নাংশমাত্র এবং আগামী যুগেরও একটি ভগ্নাংশমাত্র। সম্পত্তির আহরণ যার একমাত্র লক্ষ্য সেই ঐতিহাসিক পর্বের পতন হিসাবে সমাজের বিলুপ্তি অবধারিত, কারণ এই পর্বের মধ্যেই নিহিত তার নিজ ধ্বংসের বীজ। সরকারের ক্ষেত্রে গণতন্ত্র, সমাজের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব, অধিকার ও সুবিধার ক্ষেত্রে সাম্য এবং সর্বজনীন শিক্ষা পবিত্র করে তুলবে সমাজের পরবর্তী উচ্চতর স্তরটিকে যেদিকে মানুষের অভিজ্ঞতা, বুদ্ধি ও জ্ঞান অবিচলিতভাবে এগোচ্ছে। **সেটা হবে উচ্চতর রূপে প্রাচীন গোত্রগুলির স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের পুনরুজ্জীবন।**' (মর্গান, 'প্রাচীন সমাজ', পৃঃ ৫৫২)

এঙ্গেলস কর্তৃক ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ — জুনে রচিত
১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে জুরিখে পৃথক রচনা হিসাবে প্রথম প্রকাশিত

চতুর্থ সংস্করণ অনুযায়ী মুদ্রিত
জার্মান থেকে ইংরেজী অনুবাদের ভাষান্তর

বিষয় সূচি

অ

আ

ই

উ

ঐ

ও

ক

খ

গ

চ

জ

ট

ফ

ব

ভ

ল

শ

স

নামের সূচি

গ

ত

থ

দ

র

ল

পাঠকদের প্রতি

বইটির অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জার বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে প্রকাশালয় বাধিত হবে। অন্যান্য পরামর্শও সাদরে গ্রহণীয়।

আমাদের ঠিকানা:

প্রগতি প্রকাশন
২১, জুবোভ্স্কি বুলভার,
মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন

Progress Publishers
21, Zubovsky Boulevard,
Moscow, Soviet Union